2 YEARS B.Ed New Syllabus

Uniform Curriculum Structure for 2 Year B.Ed. Programme in West Bengal

SEMESTER-II

COURSE-VII-(A)

every child has a right to education

সমাজবিজ্ঞান শিক্ষণ : তত্ত্ব ও প্রয়োগ (শিক্ষাবিজ্ঞান)

Pedagogy of Social Science Teaching (Education)

অধ্যাপক (ড.) দুলাল মুখোপাধ্যায়
ড. উদয় শঙ্কর কবিরাজ

ebook.dascoaching.in

আহেলি পাবলিশার্স

Scanned with CamScanner

'The West Bengal University of Teachers' Training, Education Planning and Administration' অধীনস্থ পশ্চিমবঙ্গের সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, West Bengal State University, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, সিধু কানু বিশ্ববিদ্যালয়) সুনির্দিষ্ট, অভিন্ন (Uniform) পাঠ্যক্রম অনুসারে রচিত একটি আদর্শ মানের বিষয়ভিত্তিক গ্রন্থ।

সমাজবিজ্ঞান শিক্ষণ : তত্ত্ব ও প্রয়োগ (শিক্ষাবিজ্ঞান)

Pedagogy of Social Science Teaching (Education)

Course–VII-(A) (1.2.7A)

অধ্যাপক ড. দুলাল মুখোপাধ্যায়

প্রফেসর অফ্ এডুকেশন, স্কুল অফ্ এডুকেশন নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা;
পরিদর্শক অধ্যাপক (শিক্ষা), শিক্ষা বিভাগ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়;
পরিদর্শক UGC, NAAC, NCTE, সদস্য NCF'-2005;
সদস্য বোর্ড অফ্ স্টাডিজ (শিক্ষা), পশ্চিমবঙ্গের সকল বিশ্ববিদ্যালয়
অধ্যাপক (প্রাক্তন) এবং প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান
শিক্ষা বিভাগ (IASE), কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী

ড. উদয় শঙ্কর কবিরাজ

পোস্ট ডক্টরাল রিসার্চ স্কলার (শিক্ষা), শিক্ষক ভাটপাড়া অমরকৃষ্ণ পাঠশালা (উ. মা.)
প্রাক্তন অতিথি অধ্যাপক-রামকৃষ্ণ মিশন বেলুড় শিক্ষণ মন্দির, বেলুড়মঠ, হাওড়া
প্রাক্তন অতিথি অধ্যাপক, গঙ্গাধর পুর মহাবিদ্যালয়, হাওড়া

আহেলি পাবলিশার্স

৫/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা—৭০০ ০০৯
Ph : (033) 2241 0308 Mb : 9007428045/9874378128
E-mail : aahelipublisherscal@gmail.com
Website : www.aahelipublishers.com

Scanned with CamScanner

Dakshin Dinajpur B. Ed. College
Call No ...
Acc No 3087

প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল, ২০১৬

প্রকাশক : অসীমকুমার মহান্তি ও দেবব্রত সরকার

আহেলি পাবলিশার্স

৫/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-৯

অক্ষরবিন্যাস : আহেলি পাবলিশার্স

মুদ্রণ : অনিতা এন্টারপ্রাইজ

ISBN : 81-89169-22-X

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক ও প্রকাশক

প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনো অংশের কোনো ধরনের প্রতিলিপি অথবা পুনরুৎপাদন করা যাবে না। অন্য কোনোরকম বাঁধাই বা প্রচ্ছদে এই বইটি কোনো ব্যক্তি অন্য কোনো ব্যক্তিকে দিতে পারবেন না এবং বইটির কোনো গ্রহীতার ক্ষেত্রেও তাকে এই একই শর্ত আরোপ করতে হবে। এই শর্ত অমান্য করা হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মূল্য : ২২৫.০০ টাকা (INR 225/-)

ভূমিকা

শিক্ষা একটি জীবন ব্যাপী প্রক্রিয়া। শিক্ষা আমাদের অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে যায়। পৃথিবীর নানা পরিবর্তনের হাত ধরে সমাজের পরিবর্তনের হাত ধরে শিক্ষারও পরিবর্তন ঘটেছে, পরিবর্তন ঘটেছে বিষয়বস্তুর, পাঠ্যক্রমের, পঠন-পাঠন পদ্ধতির ; পরিবর্তন ঘটেছে আজকের ছাত্রছাত্রীদের, শিক্ষকের, অভিভাবকেরও।

NCTE 2014-র নতুন Regulation অনুসারে, West Bengal Government থেকে বর্তমান শিক্ষাবর্ষে "The West Bengal University of Teachers Training, Education Planning and Administration" অধীনে একটি Uniform B.Ed. Syllabus দেওয়া হয়েছে। এটি পশ্চিমবঙ্গে সমগ্র বিএড কলেজের শিক্ষার্থীদের জন্য দ্বিবার্ষিক সুনির্দিষ্ট পাঠক্রম।

এই পাঠক্রমে এসেছে অভিনবত্ব ও নতুনত্বের ছোঁয়া। এই পাঠক্রমকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অভ্রান্ত দিকদর্শন হল বই, যা শিক্ষার্থীদের উজ্জীবিত করে নানা ভাবরসে। সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নতুন পাঠক্রম অনুসারে বিএড শিক্ষার্থীদের জন্য প্রকাশিত হল— **সমাজবিজ্ঞান শিক্ষণ : তত্ত্ব ও প্রয়োগ (শিক্ষাবিজ্ঞান)** [Pedagogy of Social Science Teaching (Education) Course–VII-(A) (1.2.7A)] বইটি।

বইটিতে মোট পাঁচটি অধ্যায় রাখা হয়েছে। এখানে প্রথম অধ্যায়ে 'শিক্ষাবিজ্ঞান শিক্ষণের ভিত্তি' থেকে শুরু হয়েছে; আর শেষ হয়েছে 'শিক্ষাবিজ্ঞান শিক্ষণে মূল্যায়ন'! এই বিষয় বস্তুর মধ্যে রয়েছে শিক্ষা বিজ্ঞানের নানা গুরুত্বপূর্ণ দিক। যেমন—'বিভিন্ন দক্ষতা শিখন', 'প্রদীপন', 'শিক্ষণের বিভিন্ন পদ্ধতি', 'নির্মিতিবাদ এবং শিক্ষায় তার প্রয়োগ', 'শিক্ষাবিজ্ঞান শিক্ষণে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি', 'শিক্ষণ প্রদীপনের তাৎক্ষণিক উদ্ভাবন', 'চিন্তন মূলক শিখন (Reflective teaching), 'মস্তিষ্ক ঝঞ্ঝা সংগঠিত করার পদ্ধতি', 'নিরাময়কারী শিক্ষা' (Remedial Education), 'শিক্ষাবিজ্ঞান শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়ন', 'শিক্ষণের বিভিন্ন শিখন সম্পদ', 'মূল্যায়ন ব্যবস্থা' এবং সম্পর্কিত নানা বিষয়, কী, কেন এবং কীভাবে—এ সমস্ত কিছুই আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে এই বইতে।

এই প্রকাশনার ক্ষেত্রে আহেলি পাবলিশার্স-এর তরুণ দুই কর্ণধার অসীমকুমার মহান্তি ও দেবব্রত সরকারকে জানাই অশেষ ধন্যবাদ। ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক/শিক্ষার্থী এবং পাঠক/পাঠিকা বইটির ত্রুটি, অসম্পূর্ণতা ইত্যাদি দেখিয়ে দিলে আমরা তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে। সবশেষে ধন্যবাদ জানাই প্রকাশকদ্বয়কে। তাঁদের নিরন্তর প্রচেষ্টা, উৎসাহ এবং উদ্দম না থাকলে এ বই সূর্যের আলো দেখতো কিনা সন্দেহ।

৮ এপ্রিল, ২০১৬
কলকাতা-৯

অধ্যাপক ড. দুলাল মুখোপাধ্যায়
ড. উদয় শঙ্কর কবিরাজ

Scanned with CamScanner

This E-Book Download From>>

www.ebook.dascoaching.in

The West Bengal University of Teachers Training, Education Planning and Administration

SEMESTER-II

Course-VII-(A) (1.2.7A)	Pedagogy of a School Subject Part-I	Theory	Engagement With the Field	Credit	2+2
		50	50	Class Hours	32+64
Pedagogy of Social Science Teaching	History, Geography, Political Science, Economics, Education, Commerce, Sociology, Philosophy, Music, Fine Arts, Psychology				
Objectives	The student teachers will be able to :- 1. Appreciate the significance of teaching Social Science. 2. Be acquainted with the approaches & Methods of Teaching Social Science. 3. Be used to the application of knowledge and skills in Social Science. 4. Be acquainted with various practical aspects of Social Science.				
COURSE CONTENT/SYLLABUS					
Unit-I	**Foundation of Social Science Teaching:** ● Aims and objectives of Social Science Teaching. ● Social Science Curriculum, Values of Social Science Teaching. ● Inter relationship of various branches of Social Science ● Innovations in Social Science teaching ● Inculcation of National Integrity through social science teaching.				6 hrs.
Unit-II	**Strategies of Social Science Teaching:** ● Features, Limitations and comparison of different me ● Lecture Method, ● Interactive Method ● Demonstration-observation method, ● Regional Method ● Heuristic Method, ● Project Method ● CAI				7 hrs.

Scanned with CamScanner

Unit-III	**Learning Resource in Social Science Teaching:** ● Meaning, type and importance of Learning Resources. ● Quality of good social science text book. ● Teaching aids in Social Science. ● Improvisation of Teaching Aids. ● Planning and organization of Social Science Laboratory	6 hrs.
Unit-IV	**Social Science Teacher:** ● Qualifications and qualities of social science Teachers. ● Professional growth of Social Science Teacher.	6 hrs.
Unit-V	**Evaluation in Social Science Education:** ● Evaluation devices, evaluation programme in social studies ● Competency based evaluation, continuous and comprehensive evaluation; formative and summative evaluation, diagnose and remediation; construction of assessment tools like achievement test.	7 hrs.

Follow Our B.Ed Related Website>>

www.dascoaching.in

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

সমাজবিজ্ঞান (শিক্ষাবিজ্ঞান) শিক্ষণের ভিত্তি ১৭-১৯২
[Foundation of Social Science (Education) Teaching]

১.১ সমাজবিজ্ঞান (শিক্ষাবিজ্ঞান) শিক্ষণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য [**Aims and objectives of Social Science (Education) Teaching**]

১.১.১ ভূমিকা (Introduction) ১.১.২ বিষয় হিসাবে শিক্ষাবিজ্ঞানের ক্রমপরিবর্তন (Gradual changes of education as a subject)

১.১.২.১ আদিমযুগে মানুষের জীবন ও শিক্ষা (Life and education of man in primitive age) ১.১.২.২ প্রাচীনযুগে মানুষের জীবন ও শিক্ষা (Life and education of man in ancient age) ১.১.২.৩ মধ্যযুগে মানুষের জীবন ও শিক্ষা (Life and education of man in medieval age) ১.১.২.৪ আধুনিকযুগে মানুষের জীবন ও শিক্ষা (Life and education of man in modern age)

১.১.৩ শিক্ষাবিজ্ঞান শিক্ষণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aims and objectives of Education Teaching)

১.১.৩.১ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aims and objectives) ১.১.৩.২ উদ্দেশ্য গঠনের ভিত্তি (Bases of Formulation of objectives) ১.১.৩.৩ শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যের কার্যাবলি (Functions of Educational Objectives) ১.১.৩.৪ উদ্দেশ্য নির্বাচনের মাপকাঠি বা শর্ত (Criteria of Selection of Objectives) ১.১.৩.৫ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মধ্যে পার্থক্য (Difference between 'Aims' and 'Objectives') ১.১.৩.৬ বিদ্যালয় স্তরে শিক্ষাবিজ্ঞান শিক্ষণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aims and objectives of

Scanned with CamScanner

Teaching Education in School Level) ১.১.৩.৭ শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যের স্তর বিন্যাসে ব্লুম-এর দৃষ্টিভঙ্গি (Bloom's approach to the Taxonomy of Educational Objectives) ১.১.৩.৮ নির্দেশনামূলক উদ্দেশ্যের কাঠামো বা স্তরবিন্যাস (Structure of Instructional Objectives) ১.১.৩.৯ ব্লুমের পরিমার্জিত ও রূপান্তরিত বর্গীকরণ (Bloom's revised and modificd Taxonomy) ১.১.৩.১০ নির্দেশনামূলক উদ্দেশ্যের ধারণা (Concept of Instructional Objectives) ১.১.৩.১১ নির্দেশনামূলক উদ্দেশ্য লেখার পদ্ধতি (Way of Writing Instructional Objectives) ১.১.৩.১২ নির্দেশনামূলক উদ্দেশ্য লেখার ক্ষেত্রে মাগেরের দৃষিভঙ্গি ১.১.৩.১৩ শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রগুলির জন্য শিখন উদ্দেশ্য এবং কার্যকরী ক্রিয়াপদ সমূহ

১.২ সমাজবিজ্ঞান (শিক্ষাবিজ্ঞান) পাঠক্রম এবং সমাজবিজ্ঞান শিক্ষণের মূল্য [Social Science Curriculum, Values of Social Science (Education Teaching]

১.২.১ উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষাবিজ্ঞানের পাঠ্যসূচি (Syllabus of Education in Higher Secondary Level) ১.২.২ শিক্ষাবিজ্ঞান শিক্ষণের মূল্য (Values of Teaching Education) ১.২.৩ **ভারতে স্বতন্ত্র বিষয় হিসাবে শিক্ষাবিজ্ঞানের বিবর্তন** (Evolution of Education as a subject in India) ১.২.৪ বিদ্যালয় স্তরের পাঠক্রমে শিক্ষাবিজ্ঞানের স্থান (Place of Education in School curriculum)

১.৩ সমাজবিজ্ঞানের (শিক্ষাবিজ্ঞান) বিভিন্ন শাখার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক [Inter relationship of various branches of Social Science (Education)]

১.৩.১ শিক্ষাবিজ্ঞানের সঙ্গে অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের পারস্পরিক সম্পর্ক (Interrelationship of various social science subjects with Education)

১.৩.১.১ দর্শনশাস্ত্র ও শিক্ষাবিজ্ঞানের পারস্পরিক সম্পর্ক (Interrelationship of philosophy with Education) ১.৩.১.২ মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষাবিজ্ঞানের পারস্পরিক সম্পর্ক (Relation of Education with Psychology) ১.৩.১.৩ সমাজতত্ত্ব ও শিক্ষাবিজ্ঞানের পারস্পরিক সম্পর্ক (Relation of Education with Sociology) ১.৩.১.৪ অর্থশাস্ত্র ও শিক্ষাবিজ্ঞানের পারস্পরিক সম্পর্ক (Relation of Education with Economics) ১.৩.১.৫ নৃ-বিজ্ঞান ও শিক্ষাবিজ্ঞানের পারস্পরিক সম্পর্ক (Relation of Education with Anthropology) ১.৩.১.৬ ইতিহাস ও শিক্ষাবিজ্ঞানের পারস্পরিক

সম্পর্ক (Relation of Education with History) ১.৩.১.৭ ভূগোল ও শিক্ষাবিজ্ঞানের পারস্পরিক সম্পর্ক (Relation of Education with Geography)

১.৩.২ শিক্ষাবিজ্ঞানের সঙ্গে অন্যান্য বিজ্ঞানের সম্পর্ক (Interrelation of Education and other Science Subject)

১.৩.২.১ ভৌতবিজ্ঞান ও শিক্ষাবিজ্ঞানের পারস্পরিক সম্পর্ক (Relation of Education with Physical Science) ১.৩.২.২ জীবনবিজ্ঞান ও শিক্ষাবিজ্ঞানের পারস্পরিক সম্পর্ক (Relation of Education with Life Science) ১.৩.২.৩ রাশিবিজ্ঞান ও শিক্ষাবিজ্ঞানের পারস্পরিক সম্পর্ক (Relation of Education with Statistics) ১.৩.২.৪ প্রযুক্তিবিজ্ঞান ও শিক্ষাবিজ্ঞানের পারস্পরিক সম্পর্ক (Relation of Education with Technology)

১.৪ সমাজবিদ্যা (শিক্ষাবিজ্ঞান) শিক্ষণে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি [Innovations in teaching Social Science (Education)]

১.৪.১ নির্মিতিবাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে শিক্ষণ (Constructivist Approach of Teaching)

১.৪.১.১ নির্মিতিবাদের অর্থ (Meaning of Constructivism)

১.৪.১.২ নির্মিতিবাদের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of constructivism)

১.৪.১.৩ নির্মিতিবাদের প্রকারভেদ (Type of constructivism)

১.৪.১.৪ নির্মিতিবাদী শিখনের নক্শা (Constructivist Learning Design)

১.৪.১.৫ নির্মিতিবাদের পঞ্চ 'E' (Finve Es of Constructivism)

১.৪.১.৬ নির্মিতিবাদী শ্রেণিকক্ষের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Constructivist classroom) ১.৪.১.৭ নির্মিতিবাদী শিক্ষণে শিক্ষকের ভূমিকা (Role of Teacher in constructivist approach of Teaching)

১.৪.২ চিন্তার আলোড়ন বা মস্তিষ্ক ঝঞ্ঝা কৌশল (Brain Storming Strategy)

১.৪.২.১ মস্তিষ্ক ঝঞ্ঝার অর্থ (Meaning of Brain Storming) ১.৪.২.২ চিন্তার আলোড়ন বা মস্তিষ্ক ঝঞ্ঝা সংগঠিত করার পদ্ধতি (Brain Storming Method) ১.৪.২.৩ চিন্তার আলোড়ন কৌশলের সুবিধা (Advantages of Brain Storming Strategy) ১.৪.২.৪ চিন্তার আলোড়ন কৌশলের অসুবিধা (Disadvantages of Brain Storming Strategy)

১.৪.৩ চিন্তনমূলক শিক্ষণ (Reflective Teaching)

Scanned with CamScanner

১.৪.৩.১ চিন্তনমূলক শিক্ষণের অর্থ ও সংজ্ঞা (Meaning and defination of Reflective teaching) ১.৪.৩.২ চিন্তনমূলক শিক্ষণের বৈশিষ্ট্যসমূহ (Characteristics of Reflective Teaching) ১.৪.৩.৩ চিন্তনমূলক শিক্ষণের উদ্দেশ্যসমূহ (Objectives of Reflective Teaching) ১.৪.৩.৪ চিন্তনমূলক শিক্ষণে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর ভূমিকা (Role of teacher & learner in Reflective Teaching) ১.৪.৩.৫ চিন্তনমূলক শিক্ষণের সুবিধাসমূহ (Advantages of Reflective Teaching) ১.৪.৩.৬ চিন্তনমূলক শিক্ষণের অসুবিধা বা ত্রুটি (Disadvantages of Reflective Teaching)

১.৪.৪ নিরাময়কারী শিক্ষণ (Remedial Teaching)

১.৪.৪.১ শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট কিছু সমস্যা (Specific Problems of Learners) ১.৪.৪.২ নিরাময়কারী শিক্ষার অর্থ (Meaning of Remedial Education) ১.৪.৪.৩ শিখন অক্ষমতা এবং নিরাময়কারী শিক্ষা (Learning Disabilities and Remedial Education) ১.৪.৪.৪ নির্দিষ্ট পশ্চাদপদতা এবং শিখন অক্ষমতার বিভিন্ন লক্ষণ (Specific Backward ness and different warning signs of learning disabilities)

১.৪.৫ শিক্ষণ কৌশলে নতুন প্রযুক্তি (New Technology in Teaching Stratigies)

১.৪.৫.১ শিক্ষণ কৌশলে প্রযুক্তি হিসেবে মাল্টিমিডিয়ার ভূমিকা (Role of Multimedia as Technology in Teaching Stratigies) ১.৪.৫.২ শিক্ষণ কৌশলে প্রযুক্তি হিসেবে সি.ডি.রম (CD-Rom as Technology in teaching strategies) ১.৪.৫.৩ শিক্ষণ-কৌশলে প্রযুক্তি হিসেবে ওয়েব ভিত্তিক নির্দেশনা (Web-based instructions as Tecechnology in Teaching Stratigies) ১.৪.৫.৪ শিক্ষণ কৌশলে প্রযুক্তি হিসেবে ইনটেলিজেন্ট টিউটরিং পদ্ধতি (Intelligent Tutoring System as Technology in Teaching Strategies)

১.৫ **সমাজবিজ্ঞান (শিক্ষাবিজ্ঞান) শিক্ষণের মাধ্যমে জাতীয় সংহতির ধারণাকে বদ্ধমূলকরণ (In culcation of National Integraty through teaching Education)**

১.৫.১ জাতীয় সংহতির অর্থ (Meaning of National Integration)

১.৫.২ জাতীয় সংহতির সংজ্ঞা ও প্রকৃতি (Definition and Nature of National Integration) ১.৫.৩ জাতীয় সংহতির উপাদান (Components of National Integration) ১.৫.৪ জাতীয় সংহতির প্রয়োজনীয়তা (Need for National Integration) ১.৫.৫ জাতীয় সংহতির বাধাসমূহ (Obstacts to National

Integration) ১.৫.৬ জাতীয় সংহতিতে শিক্ষার ভূমিকা (Role of Education in National Integration) ১.৫.৭ জাতীয় সংহতিতে শিক্ষাবিজ্ঞান শিক্ষণের ভূমিকা (Role of Teaching Education in National Integration) ১.৫.৮ জাতীয় সংহতিতে শিক্ষকের ভূমিকা (Role of Teachers in National Integration) ১.৫.৯ জাতীয় সংহতিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা (Role of Educational Institution in National Integration)

দ্বিতীয় অধ্যায়

সমাজবিজ্ঞান (শিক্ষাবিজ্ঞান) শিক্ষণের কৌশলসমূহ [Strategies of Social Science (Education) Teaching] ১৯৩-২০৪

২.০ ভূমিকা **(Introduction)**

২.১ বিভিন্ন শিক্ষার পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য, সীমাবদ্ধতা এবং তুলনা **(Features, Limitations and comparison of different methods)**

২.২ বক্তৃতা পদ্ধতি **(Lecture Method)**

২.৩ পারস্পরিক ক্রিয়া পদ্ধতি **(Interactive Method)**

২.৩.১ শ্রেণিকক্ষে পারস্পরিক ক্রিয়া (Interaction in the class)

২.৩.২ ছোট দলে পারস্পরিক ক্রিয়া পদ্ধতি শিক্ষণ (Interactive Instruction in Small Group)

২.৪ প্রতিপাদন-পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি **(Demonstration Observation Method)**

২.৫ হিউরিস্টিক পদ্ধতি **(Heuristic Method)**

২.৬ প্রোজেক্ট পদ্ধতি **(Project Method)**

২.৭ কম্পিউটার সহায়ক নির্দেশনা **(Computer Assisted Instruction/CAI)**

Scanned with CamScanner

তৃতীয় অধ্যায় — সমাজবিজ্ঞানের (শিক্ষাবিজ্ঞান) শিখন সম্পদ ২৩৫-৩৩০

[Learning Resource in Social Science (Education) Teaching]

৩.০ ভূমিকা **(Introduction)**

৩.১ শিখন সম্পদের অর্থ, প্রকারভেদ ও গুরুত্ব **(Meaning, Type and Importance of Learning Resources)**

৩.১.১ সম্পদের অর্থ ও প্রকৃতি (Meaning and Nature of Resoures)

৩.১.২ শিখন সম্পদের অর্থ (Meaning of Learning Resources)

৩.১.৩ শিখন সম্পদের গুরুত্ব (Importance of Learning Resources)

৩.১.৪ শিখন সম্পদের প্রকারভেদ (Types of Learning Resources)

৩.১.৫ শিখন সম্পদ হিসাবে পুস্তক (Book as Learning Resorce)

৩.১.৫.১ পাঠ্যপুস্তক (Text Book) ৩.১.৫.২ আকরগ্রন্থ (Reference Book) ৩.১.৫.৩ হাতবই (Handbook) ৩.১.৫.৪ বিশ্বকোশ (Encyclopedia) ৩.১.৫.৫ অভিধান (Dictionary) ৩.১.৫.৬ স্বনির্দেশনামূলক উপকরণ (Self-Unstructional Material) ৩.১.৫.৭ প্রোগ্রামড্ লার্নিং মেটেরিয়াল (Programmed Learning Material) ৩.১.৫.৮ অনুশীলনী বই (Work Book) ৩.১.৫.৯ প্রশ্নভান্ডার (Question Bank)

৩.২ ভালো শিক্ষাবিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তকের গুণাবলি **(Qualities of good Education Text book)**

৩.৩ শিখন সম্পদ হিসাবে শিক্ষণ প্রদীপন **(Teaching Aids in Social Science Resources)**

৩.৩.১ শিক্ষণ প্রদীপন ও শিক্ষামূলক উপকরণ (Teaching Aids and Teaching Application) ৩.৩.২ শিক্ষণ প্রদীপনের উপযোগিতা (Utility of Teaching Aids) ৩.৩.৩ শিক্ষণ প্রদীপনের সংজ্ঞা (Definition of Teaching Aids) ৩.৩.৪ শিক্ষণ প্রদীপনের অত্যাবশকীয় গুণাবলি (Essential Qualities of Teaching Aids) ৩.৩.৫ শিক্ষণ প্রদীপন ব্যবহারে সীমাবদ্ধতা (Limitation in the uses of Teaching Aids) ৩.৩.৬ শিক্ষণ প্রদীপনের শ্রেণিবিভাগ (Classification of Teaching Aids)

৩.৩.৭ কিছু শিক্ষণ প্রদীপনের বিবরণ (Description of some Teaching Aids)

৩.৩.৭.১ বেতার (Radio) ৩.৩.৭.২ টেপরেকর্ডার (Tape-Recoder) ৩.৩.৭.৩ গ্রামোফোন (Gramophone) ৩.৩.৭.৪ চার্ট (Chart)

৩.৩.৭.৫ মডেল (Model) ৩.৩.৭.৬ বাস্তবস্তু বা নমুনা (Real object/ Specimen) ৩.৩.৭.৭ ছবি ও ফটোগ্রাফ (Picture and Photograph) ৩.৩.৭.৮ মানচিত্র (Map) ৩.৩.৭.৯ স্লাইড (Slide) ৩.৩.৭.১০ রেখাচিত্র (Diagram) ৩.৩.৭.১১ লেখচিত্র (Graph) ৩.৩.৭.১২ গ্লোব (Globe) ৩.৩.৭.১৩ ফিলম্ স্ট্রিপ (Film strip) ৩.৩.৭.১৪ চলচিত্র (Cinema) ৩.৩.৭.১৫ দূরদর্শন (Television) ৩.৩.৭.১৬ কম্পিউটার (Computer) ৩.৩.৭.১৭ ট্রান্সপারেনসি (Transperency) ৩.৩.৭.১৮ ভিডিয়ো (Video) ৩.৩.৭.১৯ অ্যানিমেশন (Animation)

৩.৩.৮ শ্রবণ-দৃষ্টি নির্ভর প্রদীপনের নির্বাচন, প্রস্তুতি ও ব্যবহার (Selection, Preparation and uses of Audio-visual Aids)

৩.৪ শিক্ষণ প্রদীপনের তাৎক্ষণিক উদ্ভাবন **(Improvisation of Teaching Aids)**

৩.৪.১ ভূমিকা (Introduction) ৩.৪.২ তাৎক্ষণিক উদ্ভাবিত শিক্ষণ প্রদীপনের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Improvised Teaching Aids) ৩.৪.৩ তাৎক্ষণিক উদ্ভাবিত শিক্ষণ প্রদীপনের নির্মাণ পদ্ধতি (Process of Developing Improvised Teaching Aids) ৩.৪.৪ শিক্ষাবিজ্ঞান শিক্ষণে শিক্ষণ প্রদীপন উদ্ভাবনের গুরুত্ব (Importance of Improvised Teaching Aids in Teaching Education) ৩.৪.৫ তাৎক্ষণিক উদ্ভাবিত শিক্ষণ প্রদীপনের কিছু দৃষ্টান্ত (Examples of some Improvised Teaching Aids) ৩.৪.৬ তাৎক্ষণিক উদ্ভাবিত শিক্ষণ প্রদীপনের নির্মাণ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে সমস্যা (Problem in the Development and Effective use of Improvised Teaching Aids)

৩.৫ সমাজবিজ্ঞান (শিক্ষাবিজ্ঞান) ল্যাবরেটরির পরিকল্পনা ও সংগঠন **(Planning and Organisation of Social Science (Education) Laboratory)**

৩.৫.১ শিক্ষাবিজ্ঞান ল্যাবরেটারির অর্থ (Meaning of Education Laboratory) ৩.৫.২ শিক্ষাবিজ্ঞান ল্যাবরেটারির প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব (Need and Importance of Education Laboratory) ৩.৫.৩ শিক্ষাবিজ্ঞান ল্যাবরেটারির পরিকল্পনা (Designing of Education Laboratory) ৩.৫.৪ শিক্ষাবিজ্ঞান ল্যাবরেটরিতে যে সমস্ত শিক্ষামূলক সামগ্রী ও উপকরণ রাখা যেতে পারে (Type of Material and Eqipment to be kept in a Education Laboratory)

Scanned with CamScanner

চতুর্থ অধ্যায় — সমাজবিজ্ঞান (শিক্ষাবিজ্ঞান) শিক্ষক ৩৩১-৩৬৬
[Social Science(Education) Teacher]

৪.০ ভূমিকা **(Introduction)**

৪.১ **সমাজবিজ্ঞান (শিক্ষাবিজ্ঞান) শিক্ষকের যোগ্যতা ও গুণাবলি [Qualifications and qualities of social science (Education) Teachers]**

৪.১.১ শিক্ষাবিজ্ঞান শিক্ষকের গুণাবলি (Qualities of Education Teacher) ৪.১.১.১ শিক্ষাবিজ্ঞান শিক্ষকের ব্যক্তিগত গুণাবলি (Individual qualities of Education Teacher) ৪.১.১.২ শিক্ষাবিজ্ঞান শিক্ষকের পেশাগত গুণাবলি (Professional qualities of Education Teacher) ৪.১.১.৩ ন্যাশনাল নলেজ কমিশনের মতে শিক্ষকের গুরুত্বপূর্ণ গুণাবলি (Important Qualities of Teacher according to National Knowledge Commission, 2008) ৪.১.১.৪ শিক্ষাবিজ্ঞান শিক্ষকের নীতিবোধ (Ethics of an Education Teacher) ৪.১.১.৫ আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষাবিজ্ঞান শিক্ষকের ভূমিকা (Role of Education Teacher in Modern Education)

৪.২ **সমাজবিজ্ঞান (শিক্ষাবিজ্ঞান) শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়ন [Professional Growth of Social Science (Education) Teacher]**

৪.২.১ ভূমিকা (Introduction) ৪.২.২ ভারতে শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়নের ঐতিহাসিক পটভূমিকা (Historical Background of Professional Development of Teachers in India) ৪.২.৩ শিক্ষকের পেশাগত মান উন্নয়নের বিভিন্ন দিক (Different aspects of Professional Growth of Teachers) ৪.২.৪ কর্ম-পূর্ববর্তী ও কর্মরত অবস্থায় শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা (Pre-service and Inservice Training and Education of Teachers) ৪.২.৫ শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়নে সম্প্রসারণমূলক ও সমাজ উন্নয়নমূলক কার্যাবলি (Extension and Community Development Activities for Professional Development of the Teachers) ৪.২.৬ শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়নে সরকার এবং শিক্ষক সংগঠনের ভূমিকা (Role of Government and Teacher Organisation in Professional Growth of Teacher)

This E-Book Download From>>

www.ebook.dascoaching.in

পঞ্চম অধ্যায় — সমাজবিজ্ঞান (শিক্ষাবিজ্ঞান) শিক্ষণে মূল্যায়ন ৩৬৭-৪৪৮
[Evaluation in (Social Science) Teaching Education]

৫.০ ভূমিকা (Introduction)

৫.১ সমাজবিজ্ঞানে (শিক্ষাবিজ্ঞান) মূল্যায়নের হাতিয়ার ও মূল্যায়নের কর্মসূচি [Evaluation devices, evaluation programme in social studies (Education)]

৫.১.১ মূল্যায়নের ধারণা (Concept of Evaluation) ৫.১.২ মূল্য নিরূপণের ধারণা (Concept of Assessment) ৫.১.৩ পরিমাপের ধারণা (Concept of Measurement) ৫.১.৪ মূল্যায়ন ও পরিমাপের মধ্যে পার্থক্য (Difference between Evaluation and Measurement) ৫.১.৫ মূল্য নিরূপণ ও পরিমাপের সঙ্গে মূল্যায়নের সম্পর্ক (Relation of Evaluation with Assessment and Measurement) ৫.১.৬ মূল্যায়নের উদ্দেশ্য (Purpose of Evaluation) ৫.১.৭ মূল্যায়নের পরিধি (Scope of Explanation) ৫.১.৮ মূল্যায়নের গুরুত্ব (Importance Explanation) ৫.১.৯ মূল্যায়নের কৌশলসমূহ (Evaluation Devices)

৫.১.৯.১ পর্যবেক্ষনমূলক কৌশল (Observational Teachnique)

৫.১.৯.২ আত্মবিবৃতিমূলক কৌশল (Self-Reporting Techniques)

৫.১.৯.৩ পরীক্ষামূলক কৌশল (Experimental Technique)

৫.২ **সামর্থভিত্তিক মূল্যায়ন, নিরবচ্ছিন্ন ও সার্বিক মূল্যায়ন, গঠনধর্মী ও সামগ্রিক বা চূড়ান্ত মূল্যায়ন, নির্ণায়ক ও প্রতিকারধর্মী মূল্যায়ন, মূল্যায়নকারী হাতিয়ার গঠন : পারদর্শিতার অভীক্ষা** (Competency based evaluation, continuous and comprehensive evaluation, formative and summative evaluation, diagnose and remediation, construction of assessment tools like achievement test.)

৫.২.১ শিক্ষাবিজ্ঞানে মূল্যায়ন কর্মপরিকল্পনা (Evaluation Programme in Education) ৫.২.২ সামর্থভিত্তিক মূল্যায়ন (Competency based evaluation) ৫.২.৩নিরবচ্ছিন্ন ও সার্বিক মূল্যায়ন (Continuous and Comprehensive Evaluation or CCE) ৫.২.৪ গঠনমূলক ও সমষ্টিগত মূল্যায়ন (Formative and Summative Evaluation) ৫.২.৫ নির্ণায়ক ও প্রতিকারধর্মী মূল্যায়ন (Diagnos and Remediation) ৫.২.৬ আদর্শ মান ভিত্তিক অভীক্ষা এবং কৃতিত্ব ভিত্তিক অভীক্ষা (Norm-reference test and criterion reference test) ৫.২.৭ পারদর্শিতার অভীক্ষা গঠন (Construction of Achievement Test)

Scanned with CamScanner

ব্যবহারিক অংশ ৪৪৯
Practicum [Engagement with Field]

Thank You

Visit Our Educational Website

Regularly For More Update:

https://www.dascoaching.in/

Our Free Service

Free B.Ed EBook

Online Class

Edu Blogs

Contact Us On:

Facebook: fb/dascoaching.in

YouTube: DAS Coaching

Mail: contact.dascoaching@gmail.com

Follow on Dailyhunt Apps: DAS Coaching

Telegram: DAS Coaching

অধ্যায় ১

সমাজবিজ্ঞান (শিক্ষাবিজ্ঞান) শিক্ষণের ভিত্তি
[Foundation of Social Science (Education) Teaching]

◈ বিষয়বস্তুর রূপরেখা :

১.১ সমাজবিজ্ঞান (শিক্ষাবিজ্ঞান) শিক্ষণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য [Aims and objectives of Social Science (Education) Teaching]
১.১.১ ভূমিকা (Introduction)
১.১.২ বিষয় হিসাবে শিক্ষাবিজ্ঞানের ক্রমপরিবর্তন (Gradual changes of education as a subject)
১.১.২.১ আদিমযুগে মানুষের জীবন ও শিক্ষা (Life and education of man in primitive age)
১.১.২.২ প্রাচীনযুগে মানুষের জীবন ও শিক্ষা (Life and education of man in ancient age)
১.১.২.৩ মধ্যযুগে মানুষের জীবন ও শিক্ষা (Life and education of man in medieval age)
১.১.২.৪ আধুনিকযুগে মানুষের জীবন ও শিক্ষা (Life and education of man in modern age)
১.১.৩ শিক্ষাবিজ্ঞান শিক্ষণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aims and objectives of Education Teaching)
১.১.৩.১ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aims and objectives)
১.১.৩.২ উদ্দেশ্য গঠনের ভিত্তি (Bases of Formulation of objectives)
১.১.৩.৩ শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যের কার্যাবলি (Functions of Educational Objectives)
১.১.৩.৪ উদ্দেশ্য নির্বাচনের মাপকাঠি বা শর্ত (Criteria of Selection of Objectives)
১.১.৩.৫ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মধ্যে পার্থক্য (Difference between 'Aims' and 'Objectives')

Scanned with CamScanner

১.১.৩.৬ বিদ্যালয় স্তরে শিক্ষাবিজ্ঞান শিক্ষণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aims and objectives of Teaching Education in School Level)
১.১.৩.৭ শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যের স্তর বিন্যাসে ব্লুম-এর দৃষ্টিভঙ্গি (Bloom's approach to the Taxonomy of Educational Objectives)
১.১.৩.৮ নির্দেশনামূলক উদ্দেশ্যের কাঠামো বা স্তরবিন্যাস (Structure of Instructional Objectives)
১.১.৩.৯ ব্লুমের পরিমার্জিত ও রূপান্তরিত বর্গীকরণ (Bloom's revised and modificd Taxonomy)
১.১.৩.১০ নির্দেশনামূলক উদ্দেশ্যের ধারণা (Concept of Instructional Objectives)
১.১.৩.১১ নির্দেশনামূলক উদ্দেশ্য লেখার পদ্ধতি (Way of Writing Instructional Objectives)
১.১.৩.১২ নির্দেশনামূলক উদ্দেশ্য লেখার ক্ষেত্রে মাগেরের দৃষিভঙ্গি
১.১.৩.১৩ শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রগুলির জন্য শিখন উদ্দেশ্য এবং কার্যকরী ক্রিয়াপদ সমূহ

১.২ সমাজবিজ্ঞান (শিক্ষাবিজ্ঞান) পাঠক্রম এবং সমাজবিজ্ঞান শিক্ষণের মূল্য [Social Science Curriculum, Values of Social Science (Education Teaching]

১.২.১ উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষাবিজ্ঞানের পাঠ্যসূচি (Syllabus of Education in Higher Secondary Level)
১.২.২ শিক্ষাবিজ্ঞান শিক্ষণের মূল্য (Values of Teaching Education)
১.২.৩ **ভারতে স্বতন্ত্র বিষয় হিসাবে শিক্ষাবিজ্ঞানের বিবর্তন** (Evolution of Education as a subject in India)
১.২.৪ বিদ্যালয় স্তরের পাঠক্রমে শিক্ষাবিজ্ঞানের স্থান (Place of Education in School curriculum)

১.৩ সমাজবিজ্ঞানের (শিক্ষাবিজ্ঞান) বিভিন্ন শাখার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক [Inter relationship of various branches of Social Science (Education)]

১.৩.১ শিক্ষাবিজ্ঞানের সঙ্গে অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের পারস্পরিক সম্পর্ক (Interrelationship of various social science subjects with Education)
১.৩.১.১ দর্শনশাস্ত্র ও শিক্ষাবিজ্ঞানের পারস্পরিক সম্পর্ক (Interrelationship of philosophy with Education)

১.৩.১.২ মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষাবিজ্ঞানের পারস্পরিক সম্পর্ক (Relation of Education with Psychology)
১.৩.১.৩ সমাজতত্ত্ব ও শিক্ষাবিজ্ঞানের পারস্পরিক সম্পর্ক (Relation of Education with Sociology)
১.৩.১.৪ অর্থশাস্ত্র ও শিক্ষাবিজ্ঞানের পারস্পরিক সম্পর্ক (Relation of Education with Economics)
১.৩.১.৫ নৃ-বিজ্ঞান ও শিক্ষাবিজ্ঞানের পারস্পরিক সম্পর্ক (Relation of Education with Anthropology)
১.৩.১.৬ ইতিহাস ও শিক্ষাবিজ্ঞানের পারস্পরিক সম্পর্ক (Relation of Education with History)
১.৩.১.৭ ভূগোল ও শিক্ষাবিজ্ঞানের পারস্পরিক সম্পর্ক (Relation of Education with Geography)
১.৩.২ শিক্ষাবিজ্ঞানের সঙ্গে অন্যান্য বিজ্ঞানের সম্পর্ক (Interrelation of Education and other Science Subject)
১.৩.২.১ ভৌতবিজ্ঞান ও শিক্ষাবিজ্ঞানের পারস্পরিক সম্পর্ক (Relation of Education with Physical Science)
১.৩.২.২ জীবনবিজ্ঞান ও শিক্ষাবিজ্ঞানের পারস্পরিক সম্পর্ক (Relation of Education with Life Science)
১.৩.২.৩ রাশিবিজ্ঞান ও শিক্ষাবিজ্ঞানের পারস্পরিক সম্পর্ক (Relation of Education with Statistics)
১.৩.২.৪ প্রযুক্তিবিজ্ঞান ও শিক্ষাবিজ্ঞানের পারস্পরিক সম্পর্ক (Relation of Education with Technology)

১.৪ সমাজবিদ্যা (শিক্ষাবিজ্ঞান) শিক্ষণে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি [Innovations in teaching Social Science (Education)]

১.৪.১ নির্মিতিবাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে শিক্ষণ (Constructivist Approach of Teaching)
১.৪.১.১ নির্মিতিবাদের অর্থ (Meaning of Constructivism)
১.৪.১.২ নির্মিতিবাদের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of constructivism)
১.৪.১.৩ নির্মিতিবাদের প্রকারভেদ (Type of constructivism)
১.৪.১.৪ নির্মিতিবাদী শিখনের নক্শা (Constructivist Learning Design)
১.৪.১.৫ নির্মিতিবাদের পঞ্চ 'E' (Finve Es of Constructivism)
১.৪.১.৬ নির্মিতিবাদী শ্রেণিকক্ষের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Constructivist classroom)

Scanned with CamScanner

১.৪.১.৭ নির্মিতিবাদী শিক্ষণে শিক্ষকের ভূমিকা (Role of Teacher in constructivist approach of Teaching)

১.৪.২ চিন্তার আলোড়ন বা মস্তিষ্ক ঝঞ্ঝা কৌশল (Brain Storming Strategy)

১.৪.২.১ মস্তিষ্ক ঝঞ্ঝার অর্থ (Meaning of Brain Storming)

১.৪.২.২ চিন্তার আলোড়ন বা মস্তিষ্ক ঝঞ্ঝা সংগঠিত করার পদ্ধতি (Brain Storming Method)

১.৪.২.৩ চিন্তার আলোড়ন কৌশলের সুবিধা (Advantages of Brain Storming Strategy)

১.৪.২.৪ চিন্তার আলোড়ন কৌশলের অসুবিধা (Disadvantages of Brain Storming Strategy)

১.৪.৩ চিন্তনমূলক শিক্ষণ (Reflective Teaching)

১.৪.৩.১ চিন্তনমূলক শিক্ষণের অর্থ ও সংজ্ঞা (Meaning and defination of Reflective teaching)

১.৪.৩.২ চিন্তনমূলক শিক্ষণের বৈশিষ্ট্যসমূহ (Characteristics of Reflective Teaching)

১.৪.৩.৩ চিন্তনমূলক শিক্ষণের উদ্দেশ্যসমূহ (Objectives of Reflective Teaching)

১.৪.৩.৪ চিন্তনমূলক শিক্ষণে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর ভূমিকা (Role of teacher & learner in Reflective Teaching)

১.৪.৩.৫ চিন্তনমূলক শিক্ষণের সুবিধাসমূহ (Advantages of Reflective Teaching)

১.৪.৩.৬ চিন্তনমূলক শিক্ষণের অসুবিধা বা ত্রুটি (Disadvantages of Reflective Teaching)

১.৪.৪ নিরাময়কারী শিক্ষণ (Remedial Teaching)

১.৪.৪.১ শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট কিছু সমস্যা (Specific Problems of Learners)

১.৪.৪.২ নিরাময়কারী শিক্ষার অর্থ (Meaning of Remedial Education)

১.৪.৪.৩ শিখন অক্ষমতা এবং নিরাময়কারী শিক্ষা (Learning Disabilities and Remedial Education)

১.৪.৪.৪ নির্দিষ্ট পশ্চাদপদতা এবং শিখন অক্ষমতার বিভিন্ন লক্ষণ (Specific Backward ness and different warning signs of learning disabilities)

১.৪.৫ শিক্ষণ কৌশলে নতুন প্রযুক্তি (New Technology in Teaching Stratigies)

১.৪.৫.১ শিক্ষণ কৌশলে প্রযুক্তি হিসেবে মাল্টিমিডিয়ার ভূমিকা (Role of Multimedia as Technology in Teaching Stratigies)

১.৪.৫.২ শিক্ষণ কৌশলে প্রযুক্তি হিসেবে সি.ডি.রম (CD-Rom as Technology in teaching strategies)

১.৪.৫.৩ শিক্ষণ-কৌশলে প্রযুক্তি হিসেবে ওয়েব ভিত্তিক নির্দেশনা (Web-based instructions as Tecechnology in Teaching Stratigies)

১.৪.৫.৪ শিক্ষণ কৌশলে প্রযুক্তি হিসেবে ইনটেলিজেন্ট টিউটরিং পদ্ধতি (Intelligent Tutoring System as Technology in Teaching Strategies)

১.৫ সমাজবিজ্ঞান (শিক্ষাবিজ্ঞান) শিক্ষণের মাধ্যমে জাতীয় সংহতির ধারণাকে বদ্ধমূলকরণ (In culcation of National Integraty through teaching Education)

১.৫.১ জাতীয় সংহতির অর্থ (Meaning of National Integration)

১.৫.২ জাতীয় সংহতির সংজ্ঞা ও প্রকৃতি (Definition and Nature of National Integration)

১.৫.৩ জাতীয় সংহতির উপাদান (Components of National Integration)

১.৫.৪ জাতীয় সংহতির প্রয়োজনীয়তা (Need for National Integration)

১.৫.৫ জাতীয় সংহতির বাধাসমূহ (Obstacts to National Integration)

১.৫.৬ জাতীয় সংহতিতে শিক্ষার ভূমিকা (Role of Education in National Integration)

১.৫.৭ জাতীয় সংহতিতে শিক্ষাবিজ্ঞান শিক্ষণের ভূমিকা (Role of Teaching Education in National Integration)

১.৫.৮ জাতীয় সংহতিতে শিক্ষকের ভূমিকা (Role of Teachers in National Integration)

১.৫.৯ জাতীয় সংহতিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা (Role of Educational Institution in National Integration)

Scanned with CamScanner

✪ ১.১ সমাজবিজ্ঞান (শিক্ষাবিজ্ঞান) শিক্ষণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য [Aims and objectives of Social Science (Education) Teaching] :

❑ ১.১.১ ভূমিকা (Introduction) :

সৃষ্টির পর থেকে অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে মানুষের জীবনসংগ্রাম চলছে নিরন্তর। যেভাবে মানুষের জীবনসংগ্রাম অগ্রবর্তী হয়েছে, যেভাবে তা সময়ের সমান্তরালে পরিবর্তিত হয়েছে, ঠিক সেইভাবে মানুষের গোষ্ঠীজীবন বা সমাজও পরিবর্তিত হয়েছে। আবার সমাজ যেভাবে পরিবর্তিত হয়েছে সেই অনুযায়ী বদলেছে তার শিক্ষাও অর্থাৎ মানুষের জীবনধারা আর শিক্ষাধারা বিবর্তিত হয়েছে সমান্তরালভাবে। **মানুষের গোষ্ঠীজীবন বা সামাজিক বিবর্তনের চারটি পর্যায় লক্ষ করা যায়—আদিম যুগ, প্রাচীনযুগ, মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগ।** আদিম যুগে মানুষ যখন শুধুমাত্র সমাজবদ্ধ জীবনে অভ্যস্থ হয়েছে তখন সেই যুগের প্রয়োজন অনুযায়ী গড়ে উঠেছে তখনকার শিক্ষা। এরপর ক্রমান্বয়ে এসেছে প্রাচীনযুগ ও মধ্যযুগ। তখনকার মতো শিক্ষাও হয়েছে যুগের চাহিদা অনুযায়ী বা যুগোপযোগী। সবশেষে আসে আধুনিকযুগ, মানুষের শিক্ষার ধারাও লাভ করেছে তার আধুনিক রূপ। সুতরাং শিক্ষার মধ্যে কোনো সমাজ জীবন যেমন প্রতিফলিত হয়, তেমনি সমাজ জীবনও শিক্ষার দ্বারা প্রভাবিত হয়। যুগে যুগে কীভাবে শিক্ষার ধারার ক্রমপরিবর্তন ঘটেছে তা এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হল :

❑ ১.১.২ বিষয় হিসাবে শিক্ষাবিজ্ঞানের ক্রমপরিবর্তন (Gradual changes of education as a subject) :

❖ ১.১.২.১ আদিমযুগে মানুষের জীবন ও শিক্ষা (Life and education of man in primitive age) :

আদিম যুগে মানুষের জীবনযাত্রার ধরন বা প্রকৃতি ছিল সহজ-সরল, যদিও জীবনসংগ্রাম ছিল বেশ কঠিন। মানুষের জীবনযাপনের চাহিদা ছিল অতি সামান্য। খাদ্য আর আশ্রয়ের সংস্থানটুকুই ছিল তাদের চাহিদা। আদিম যুগের মানুষের জীবনের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল সর্বপ্রাণ বাদ (animism)। মানুষ তখন বিশ্বাস করত এই বিশ্বপ্রকৃতির জড় এবং সজীব সমস্ত বস্তু; পাহাড় পর্বত, সমুদ্র, আকাশ, বাতাস, গাছপালা, পশুপাখি, মনুষ্যেতর সমস্ত প্রাণীর মধ্যেই মানুষের মতো আত্মা (soul) বিরাজমান। ফলে বিশ্ব-প্রকৃতির অন্যান্য বস্তুকে নিজেদের থেকে পৃথক করে চিন্তা করতে পারত না। মানুষের চিন্তাধারার এই বৈশিষ্ট্যই হল **সর্বপ্রাণবাদ**। আদিম মানুষের জীবনে আর একটি বৈশিষ্ট্য হল জীবনে বাঁচার জন্য লড়াই করা। প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিস্থিতিতে কীভাবে হিংস্র জীবজন্তু ও শত্রুর মোকাবিলা করবে এই ছিল চিন্তা।

আদিমযুগের পরবর্তী পর্যায়ে মানুষ যাযাবর স্বভাব ত্যাগ করে তৈরি করল স্থায়ী বাসস্থান, খাদ্য সংগ্রাহী থেকে হল খাদ্য উৎপাদী। উৎপাদন ক্ষেত্রে এল শ্রমবিভাগের প্রসঙ্গ, জমি হল মানুষের সম্পদ, গোষ্ঠী মালিকানা থেকে এল ব্যক্তি মালিকানার প্রভাব আর তার প্রভাবে উৎপাদন ব্যবস্থার অর্থনৈতিক কারণে জন্ম নিল দাস-প্রথা, শ্রেণিবিভাগ; অপরিবর্তনীয় বর্ণবিভাগ।

এবার আসা যাক আদিম মানুষের শিক্ষার প্রসঙ্গে। আদিম মানুষের জীবনে শিক্ষার দুটি গুরুত্বপূর্ণ দিক লক্ষ করা যায়, একটি হল তাত্ত্বিক শিক্ষা অপরটি হল ব্যবহারিক শিক্ষা। খাদ্য, পরিচ্ছদ ও আশ্রয়-এর সংস্থান করাই ছিল ব্যবহারিক শিক্ষার দিক। প্রয়োজনীয় বস্তুগুলি সংগ্রহের জন্য নির্দিষ্ট কতকগুলি কৌশল বা রীতিনীতি আয়ত্ত করতে শিশুদের সাহায্য করাই ছিল এই ব্যবহারিক শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। এই ধরনের ব্যবহারিক শিক্ষা দেওয়ার প্রাথমিক স্থান ছিল নিজেদের পরিবার। শিশুরা দৈনন্দিন জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে পরিণত বয়স্ক ব্যক্তিদের কাছ থেকে অনুকরণের মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করত। ছেলে এবং মেয়ে উভয়েই বয়স্কদের আচরণগুলি অনুকরণের মাধ্যমে রপ্ত করে অনুশীলন করত। এইভাবে আদিম মানুষ ব্যবহারিক জীবনের চাহিদাগুলি পূরণ করত ব্যবহারিক শিক্ষার দ্বারা।

পরবর্তীকালে নতুন প্রস্তর যুগে নিজেদের জীবনধারাকে কেন্দ্র করে আদিম মানুষ শিখল কৃষিকার্য, পশুপালন, ঘরবাড়ি নির্মাণ কার্য ইত্যাদি। তাদের জীবন হল সুসংবদ্ধ। বৃত্তিমূলক কার্যের সুবাদে তাদের জীবনে এল অনেকখানি অবসর সময়। ক্রমে তারা উন্নত চিন্তাভাবনার সময় পেয়ে গেল, যার ফলশ্রুতিতে ধীরে ধীরে শিল্পকলা, লোকসাহিত্য, লোকক্রীড়া, দর্শন, গণিত, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়গুলির ভিত্তি স্থাপিত হল। শুরু হল প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রয়াস।

❖ ১.১.২.২ প্রাচীনযুগে মানুষের জীবন ও শিক্ষা (Life and education of man in ancient age) :

ভালো আর মন্দ উভয় পটভূমি নিয়ে মানুষ প্রবেশ করেছিল ইতিহাসের প্রাচীন যুগে। এ কথা ঠিক যে, পৃথিবীর সব দেশে সব মানব গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে সামাজিক পরিবর্তন সমান্তরালে এবং সমান হারেও ঘটেনি। অর্থাৎ প্রাচীনযুগের সূচনা পৃথিবীর সর্বত্র একই সময়ে ঘটেনি। আবার এই প্রাচীনযুগের বিস্তৃতিও সর্বত্র সমান নয়, কোথাও ছয় হাজার বছর, কোথাও বা তিন হাজার বছর। এই প্রাচীন সভ্যতার প্রধান প্রধান কেন্দ্রগুলি ছিল মেসোপটেমিয়া, মিশর, চিন, ভারত এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে গ্রিস ও রোমে।

প্রাচীনযুগে সভ্যতার বিভিন্ন কেন্দ্রে মানুষের জীবনে বিভিন্ন বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও কিছু সাদৃশ্যও লক্ষ করা যায়, সেগুলি হল—নদীমাতৃক সভ্যতা, সেচব্যবস্থা, সংগঠিত ও ব্যক্তিমালিকানায় কৃষি, বাণিজ্য, সংগঠিত হস্তশিল্প, নতুন নগরের পত্তন ইত্যাদি।

Scanned with CamScanner

(১) **মধ্যপ্রাচ্যের শিক্ষা :** প্রাচীন মেসোপটেমিয়া (বর্তমান ইরাক) অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল সুমেরীয় সভ্যতা। কৃষি, জলসেচ এবং বাণিজ্যকে অবলম্বন করেই এই সভ্যতার বিকাশ। মানবসভ্যতার আঁতুড়ঘর হিসেবে এই সুমেরীয় সভ্যতাকে চিহ্নিত করা হয়। স্বাভাবিক ভাবেই চিন্তা-চেতনায় উন্নত এই সুমেরীয়রা অনুভব করেছিলেন শিক্ষার গুরুত্ব। প্রায় ৫৫০০ বছর আগেই এই সুমেরীয়রা সৃষ্টি করেছিলেন কিউনিফর্ম্ (cuniform) লিপি। এই সমস্ত লিপি মাটির প্লেটে লেখা হত।

সুমেরকে কেন্দ্র করে স্বল্পকাল পরেই গড়ে ওঠে ব্যবিলন ও অ্যাসিরীয় সাম্রাজ্য। কিউনিফর্ম লিপির তখন আরও উন্নতি ঘটে। যে সমস্ত প্লেটে এই লিপি উৎকীর্ণ ছিল সেগুলির বিষয় বস্তুর $^{১}/_{৪}$ অংশ ছিল ব্যাকরণ ও অভিধান ভিত্তিক। ব্যাবিলনীয়রা তৈরি করেছিলেন হিসেব রাখার পদ্ধতি, দলিল লেখার পদ্ধতি, গাণিতিক সংখ্যা ও নামতার তালিকা। সৌর ও চান্দ্র ক্যালেন্ডারও তারা বানিয়ে ছিলেন। ছিল সুচিন্তিত আইনবিধি। সম্রাট হামুরাবির আইনবিধির কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে।

(২) **মিশর দেশের শিক্ষা :** ঐতিহাসিকদের মতে খ্রি. পূর্ব ৩০০০ থেকে ২০০০-এর মধ্যে মিশরে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সূত্রপাত ঘটেছিল। সে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাও ছিল জীবনকেন্দ্রিক। ব্যক্তির প্রয়োজন অপেক্ষা সমাজের প্রয়োজনকেই গুরুত্ব দেওয়া হত বেশি। তাই শিক্ষাক্ষেত্রেও প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীকে সামাজিক দায়-দায়িত্ব পালনের উপযোগী করে গড়ে তোলা হত। প্রাচীন মিশরীয় সমাজে শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষার্থীকে তার সামাজিক শ্রেণির অন্তর্ভুক্তি অনুসারে পেশা বা বৃত্তিমুখী প্রশিক্ষণ দেওয়া। আবার মিশরে অর্থনীতি যেহেতু কৃষিভিত্তিক ছিল তাই কৃষিকে কেন্দ্র করে নানা বৃত্তির প্রচলন ছিল। প্রয়োজন ছিল কৃষি উৎপাদক হিসেবে রক্ষকের, জলসেচ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ব্যক্তির। শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল ওই ধরনের বিশেষজ্ঞ সৃষ্টি করা। বিশেষধর্মী শিক্ষার আরো কতকগুলি বিষয় পরে অন্তর্ভুক্ত হয়। সেগুলি হল—ভেষজবিদ্যা, স্থাপত্যবিদ্যা, সামরিক বিদ্যা প্রভৃতি। প্রাচীন মিশরীয়রা পরস্পরের মধ্যে মনের ভাব বিনিময়ের জন্য সৃষ্টি করেছিল লিখিত ভাষার। শিশু শিক্ষার প্রাথমিক পর্যায়ে এই ভাষা শিক্ষা ও লেখার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হত। আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানীদের মতে প্রাচীন মিশরীয় শিক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষকরা সম্পূর্ণ নিজেদের নিয়ন্ত্রণে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে শিক্ষণকার্য পরিচালনা করতেন।

পরবর্তীকালে মিশরে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সূত্রপাত ঘটে। চার বছর বয়সেই শিক্ষার্থী শিক্ষা জীবন শুরু করত। লেখার কৌশল সহ গণিত, জ্যামিতি, সংগীত এবং বৃত্তিমুখী শিক্ষা দেওয়া হত। শিক্ষার্থীরা শিক্ষান্তে নিজ নিজ বৃত্তি গ্রহণ করত। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল প্রাচীন মিশরীয় শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের আগ্রহ অনুযায়ী শিক্ষণীয় বিষয় নির্বাচনের সুযোগ ছিল।

(৩) **চিন দেশের শিক্ষা :** প্রাচীন চিনদেশের মানুষের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল নিজেদের সংস্কৃতি বা কৃষ্টিকে সংরক্ষণ করা। শিক্ষা ব্যবস্থাতেও তার প্রভাব পড়েছিল খুব বেশি। চৈনিক শিক্ষার লক্ষ্যই ছিল অতীতে কৃষ্টির সংরক্ষণ এবং সমাজের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের তার সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিতি ঘটানো; প্রাচীন রীতিনীতিগুলিকে আক্ষরিক ভাবে অনুসরণ করতে শেখানো। প্রাচীন চিনের শিক্ষা সংস্কৃতির জীবনে সবচেয়ে বেশি প্রভাব ছিল **কনফুসিয়াসের**। কনফুসিয়াস জোর দিয়েছিলেন বুদ্ধিমত্তা, সাহস এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উপর। বিনয়, প্রেম, ন্যায়, সত্যের ভিত্তিতে আচরণ পরিমার্জনা করে মনুষ্যত্ব অর্জনই ছিল কনফুসিয়াসের মতে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা। প্রাচীন চিনে শিক্ষার কার্য পরিচালিত হত মূলত তিনটি পর্যায়ে—প্রথম পর্যায়ে দেওয়া হত বর্ণ-শিক্ষা, এতে শিক্ষার্থীদের বর্ণমালা আয়ত্ত করানো হত, দ্বিতীয় পর্যায়ে মুখস্থ করানো হত ধর্মগ্রন্থগুলিকে; তৃতীয় পর্যায়ে মুখস্থ করানো হত বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের উপর প্রচলিত টীকাগুলি। চিনদেশে দুই ধরনের বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়—প্রাথমিক বিদ্যালয় ও উচ্চবিদ্যালয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি কোনো ব্যক্তির অব্যবহৃত ঘরে অথবা মন্দিরে পরিচালিত হত। এখানে শিক্ষার্থীদের বেতন দিয়ে পড়তে হত। শিক্ষার্থীদের কাজ ছিল লিপি আয়ত্ত করা এবং নীতিমূলক গ্রন্থ মুখস্থ করা। উচ্চ বিদ্যালয়গুলি সাধারণত উন্নত সংস্কৃতি সম্পন্ন অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের কাজ ছিল ধর্মগ্রন্থগুলির টীকা পাঠ, স্বাধীনভাবে রচনা লেখা অভ্যাস করা এবং পরীক্ষার জন্য নিজেদের প্রস্তুত করা। পরীক্ষার ফলাফলের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হত। ফলাফলের উপর ভিত্তি করে যে ডিগ্রি দেওয়া হত তার মূল্য ছিল অনেকখানি। কারণ ডিগ্রিপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্য থেকেই উচ্চপদের জন্য দেশের কর্মচারী নির্বাচিত করা হত।

(৪) **ভারতবর্ষে শিক্ষা** (Education in India) :

(ক) **বৈদিক শিক্ষা**— ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের ফলে যে সর্বাধুনিক তথ্য পাওয়া গেছে তাতে, এখনও পর্যন্ত মেহেরগড় সভ্যতাকেই ভারতের প্রাচীন সভ্যতা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এই **মেহেরগড়** সভ্যতারই পরিবর্তিত রূপ হল **হরপ্পা সভ্যতা**। আনুমানিক ৭০০০-৬০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের এই প্রাচীন সভ্যতার মানুষ ছিলেন বেশ উন্নত। এই উন্নত হরপ্পা সভ্যতার মানুষ নাগরিক জীবনে অভ্যস্থ হলেও তাদের শিক্ষার বিভিন্ন দিক তেমনভাবে জানা যায় না, কারণ সিন্ধু লিপি এখনও সম্পূর্ণভাবে পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়নি। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার যে পর্যায়টি উজ্জ্বল হয়ে আছে সেটি হল বৈদিক সভ্যতা। নদীমাতৃক এই বৈদিক সভ্যতার মানুষগুলি গ্রামীণ সভ্যতায় অবস্থান করলেও তাদের শিক্ষা সংস্কৃতির দিকটি ছিল বেশ উজ্জ্বল। বৈদিকশিক্ষা হিসেবে পরিচিত এই সভ্যতার মানুষের চিন্তা-চেতনা ছিল তাঁদের জীবনের সঙ্গে যেমন সঙ্গতিপূর্ণ তেমনি যথেষ্ট ভারসাম্যযুক্ত। প্রাচীন বৈদিক শিক্ষাচেতনায় বিশ্বাস করা হত যে, তপস্যার মাধ্যমে নিজের এবং পরমাত্মার শক্তিকে অনুসন্ধান করাই হল প্রকৃত শিক্ষা। এই সাধনা ছিল জীবনব্যাপী। শিক্ষার কাল শুরু হত ব্রহ্মচর্যের জীবন দিয়ে

Scanned with CamScanner

অর্থাৎ ব্রহ্মচর্যকালই ছিল প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার কাল। ব্রহ্মচর্যের জীবন অতিবাহিত হত গুরুগৃহে। আর্য-ঋষিরা তত্ত্বজ্ঞান আর ব্যবহারিক জ্ঞানের মধ্যে ভেদ রেখা টেনে নির্বাচন করেছিলেন দুই ধরনের শিক্ষার বিষয়—**পরাবিদ্যা ও অপরাবিদ্যা**। ঐশ্বরিক পরমজ্ঞানের বিষয় পরাবিদ্যা আর ব্যবহারিক জীবনের পার্থিব জ্ঞানকে তাঁরা বলেছিলেন অপরাবিদ্যা। যেহেতু বৈদিকযুগে বর্ণাশ্রম প্রথা প্রচলিত ছিল; তাই পৃথক গোষ্ঠীর পাঠ্যক্রম ছিল পৃথক পৃথক। আবার যেহেতু ধর্ম ছিল প্রাচীন ভারতের সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তি তাই সমাজের সকল স্তরে নৈতিক ও ধর্মীয় জীবনের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। তৎকালীনযুগে সামাজিক জীবনের আদর্শকে অনুসরণ করেই অগ্রসর হয়েছিল শিক্ষাব্যবস্থা, যে আদর্শ এখনও অনেকখানি প্রাসঙ্গিক। সেদিন শিক্ষাব্যবস্থায় যেগুলি ছিল মহামূল্যবান তা হল—গুরু-শিষ্যর সম্পর্ক, শিক্ষকের মর্যাদার দিক, অবৈতনিক শিক্ষা এবং শিক্ষার পদ্ধতি।

(খ) **বৌদ্ধশিক্ষা**— বৈদিকশিক্ষা যেমন ছিল ধর্মভিত্তিক শিক্ষা তেমনি বৌদ্ধশিক্ষাও গড়ে উঠেছিল বৌদ্ধধর্মমতকে কেন্দ্র করে। বৌদ্ধশিক্ষার লক্ষ্য ছিল জাগতিক বন্ধনমুক্তির মাধ্যমে পরিনির্বাণ লাভ। মানুষের অজ্ঞতা দূর করে যে বন্ধনমুক্তি ঘটবে তার থেকে আসবে নির্বাণলাভ। বৌদ্ধশিক্ষা যেহেতু ছিল প্রতিবাদী ধর্ম, তাই এই শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল বর্ণভেদহীন এবং অনেকখানি গণতান্ত্রিক চেতনায় সমৃদ্ধ। শিক্ষার সুযোগ ছিল সবার। আবার শিক্ষার বিস্তারে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল মাতৃভাষার উপর। বৌদ্ধশিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি ছিল গুরু-শিষ্যের মধ্যে মধুর সম্পর্ক, গণতান্ত্রিক চেতনার বিস্তার, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রতি জনগণের আস্থা, অহিংসা আর নৈতিক আদর্শের বিষয়। যে মানবিক উদ্দেশ্যবোধের মহান বাণী নিহীত ছিল বৌদ্ধশিক্ষার ধারায় তার লক্ষ্য ছিল প্রগতির দিকেই, আধুনিকতার দিকেই।

(গ) **জৈনশিক্ষা**— বৌদ্ধ ধর্মের মতো জৈনধর্মও ছিল প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরে উচ্চারিত ও উদ্ভাবিত। জৈন তীর্থঙ্করা জৈনধর্মের নানা তাত্ত্বিক নীতির সঙ্গে শিক্ষাদর্শনের নানা দিকও নির্দেশ করেছিলেন। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির অন্য একটি রূপ এই জৈন সংস্কৃতি শিক্ষার যে বড়ো বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরেছিল তা হল—সচেতনতা বোধের অগ্রাধিকার। ঈশ্বরের অস্তিত্ব, যাগযজ্ঞের প্রসঙ্গ, আত্মা-পরমাত্মা নিয়ে ব্যয়বহুল আচার-অনুষ্ঠানের পরিবর্তে জৈনশিক্ষা গুরুত্ব দিয়েছিল সৎ আচার-আচরণের দ্বারা অন্তরের জ্ঞানালোককে প্রজ্জ্বলিত করে আত্মনির্ভরশীলতার শিক্ষার প্রকাশকে। বৌদ্ধদের মতো জৈনরাও প্রাতিষ্ঠানিক আদর্শকে গুরুত্ব দিয়ে জনমানসে শিক্ষার আদর্শকে বাস্তব রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন।

❖ ১.১.২.৩ মধ্যযুগে মানুষের জীবন ও শিক্ষা (Life and education of man in medieval age) :

(১) **ইউরোপে মধ্যযুগের শিক্ষা :** হূন আর জার্মান আঘাতে জর্জরিত ইউরোপে রোমান সাম্রাজ্য ভেঙে টুকরো টুকরো হতে থাকে। খ্রিস্টধর্ম তার সহনশীল বৈশিষ্ট্যের কারণেই

সমস্ত প্রতিকূলতা কাটিয়ে তার শক্তিবৃদ্ধি ঘটিয়ে আপন অস্তিত্বকে নিশ্চিত করে। অন্যদিকে ইসলাম ধর্মের উত্থান এবং বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় সংঘাতের পরিবেশ, এর সঙ্গে যুক্ত হল ভূমিদাস ব্যবস্থার উত্থান। আর্থ-বাণিজ্য বৃদ্ধি আর ধর্মীয় সংঘাতের পরিপ্রেক্ষিতেই ইউরোপীয় জগতের মানুষের জীবন অতিবাহিত হতে শুরু হল। এতসব সমস্যার মধ্যেও কিন্তু জ্ঞানের আলোকবর্তিকাটি প্রজ্জ্বলিত ছিল ভিতরে ভিতরে। এরকম অবস্থায় ইউরোপীয় খ্রিস্টান সমাজে শিক্ষার ক্ষেত্রটিতে তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়, সেগুলি হল—**প্রজ্ঞাবাদ, সন্ন্যাসবাদ এবং বীরত্ববাদ**। প্রজ্ঞাবাদের মূল কথা ছিল দর্শন আর ধর্মতত্ত্বের সংমিশ্রিত অনুশীলন বা চর্চা। ধর্মতত্ত্বের চুলচেরা তর্ক-সমৃদ্ধ দক্ষতা অর্জনই ছিল প্রজ্ঞার পরিচয়। এর মধ্যেও আবির্ভাব ঘটেছিল কিছু পণ্ডিত মানুষের, যেমন— **রজার বেকন, সেন্ট টমাস অ্যাকুইনাস প্রমুখ।**

সন্ন্যাসবাদ-এর ক্ষেত্রে শিক্ষার মূল বক্তব্য ছিল আকাঙ্ক্ষা পরিহার, ইন্দ্রিয়ের সংযম ও আত্ম নিগ্রহের দ্বারা নৈতিক জীবনের উন্নতি সাধন এবং নিয়মানুবর্তিতার জীবন। শিক্ষার মূল আদর্শই ছিল— তপস্যা, কৌমার্য-ব্রত, দারিদ্র্যের জীবন, আত্মপীড়ন এবং চাহিদার অবদমন। সেন্ট বেনিডিক্টের নিয়মবিধি সর্বত্র প্রসারিত হয়।

বীরত্ববাদের শিক্ষায় প্রাধান্য পেয়েছিল সামরিক শিক্ষা আর আদর্শ আচরণবিধি। অভিজাত পরিবারের পুত্র সন্তানদের উপযুক্ত সামরিক শিক্ষার মাধ্যমে 'নাইট' তৈরি করাই ছিল এই শিক্ষার মূল লক্ষ্য; এর জন্য সাত-আট বছর কোনো 'সামরিক বীর' নাইট-এর কাছে থেকে 'ধর্ম উপদেশ', 'শরীর চর্চা' এবং কঠোর নিয়ম অনুশীলন করতে হত।

(২) **ভারতে মধ্যযুগের শিক্ষা :** একথা স্বীকার করতেই হবে যে, পৃথিবীর সবদেশেই মধ্যযুগ একই সময়ে অবতীর্ণ হয়নি। কিন্তু মধ্যযুগের যে সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলি অন্যান্য দেশে দেখা গেছে সেই সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলি কম-বেশি বা একটু ভিন্ন রূপে ভারতবর্ষেও দেখা গেছে। ঐতিহাসিকগণ ভারতবর্ষে মধ্যযুগের আগমন নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করলেও কতকগুলি বিষয় উল্লেখ করতে পারি যেগুলি ভারতবর্ষের মধ্যযুগেও বর্তমান ছিল। মধ্যযুগীয় ইউরোপের মতো ভূমিদাস এখানে না থাকলেও ক্রীতদাস প্রথার উপস্থিতি স্বীকার করা হয়। সাধারণ মানুষের অধিকার আর স্বাধীনতা হয়েছিল অনেকখানি সংকুচিত। ধর্মীয় গোঁড়ামির সঙ্গে ছিল কুসংস্কার। নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার সুযোগ ছিল কম। সাহিত্য, শিল্প, সংগীত, নৃত্য অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যেই ছিল অনেকখানি সীমাবদ্ধ। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে তুর্কি-আফগান বিজয়ের ফলশ্রুতিতে ভারতীয় জীবন ধারায় যুক্ত হল আর একটি নতুন ধারা। নতুন ধর্ম ও রাষ্ট্রচিন্তার সঙ্গে আরোপিত হল সমান্তরাল নতুন শিক্ষা। মুসলিম শাসকগণ ভারতীয় প্রচলিত সংস্কৃতি আর ধর্মবিশ্বাসের উপর একদিকে যেমন আঘাত হেনেছেন তেমনি আবার অন্যদিকে ইসলামিক সংস্কৃতিকে উজ্জীবিত করেছেন। শিক্ষা ব্যবস্থাতে এই বৈশিষ্ট্যগুলির প্রভাব লক্ষ করা যায় স্বাভাবিক ভাবেই। কার্যত মধ্যযুগীয় ভারতীয় জীবন

dascoaching.in

Scanned with CamScanner

ধারায় প্রচলিত এবং ইসলামিক দুটি শিক্ষাব্যবস্থাই চলেছে সমান্তরাল ভাবে। ভারতে মধ্যযুগের শিক্ষার আর একটি বৈশিষ্ট্য হল ধর্মভিত্তিক শিক্ষা। ইসলামিক শিক্ষায় ছিল মক্তব আর মাদ্রাসা এই দুই ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। খলজি আমলে এই বিষয়টি স্বীকৃতি পায় যে, ইসলামীয় সংস্কৃতি ভারতীয় সংস্কৃতির একটি অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের ধারা। মহম্মদ বিন তুঘলক এবং ফিরোজ তুঘলকের শাসনকালে ভারতীয় শিক্ষার কিছুটা অগ্রগতি ঘটে। ভাষার বিকাশে হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির প্রভাব বিশেষ ভাবে লক্ষ করার বিষয়। এই দুই ভিন্ন সংস্কৃতির মিলনের প্রতীক হিসেবে উর্দুভাষার উদ্ভবের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। আবার, সম্রাট আকবরের আমলে শিক্ষার দিকটি বিশেষ আনুকূল্য পেয়েছিল। তাঁর সময়ে শিক্ষা ক্ষেত্রে একটা উদার ও সার্বজনীন নীতি লক্ষ করা যায়। শাহজাহানের আমলেও শিক্ষা ক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। মুসলিম যুগের শেষ পর্যায়ে পাশ্চাত্যশিক্ষার আমদানি হয় ভারতবর্ষে।

❖ ১.১.২.৪ আধুনিকযুগে মানুষের জীবন ও শিক্ষা (Life and education of man in modern age) :

মধ্যযুগের মতো আধুনিক যুগও পৃথিবীর সর্বত্র সমান সময়ে বা একই সময়ে আসেনি। ইউরোপে যেখানে পঞ্চদশ শতাব্দীতে আধুনিক যুগের সূত্রপাত ঘটে সেখানে ভারতে আধুনিক যুগের পদার্পণ ঘটেছে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে। সাধারণ ভাবে আধুনিক যুগের যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য প্রকটিত হয় সেগুলি হল–

(১) সামন্তপ্রথা বিলোপ, ভূমিদাস প্রথার বদলে নতুন এক সামাজিক সম্পর্ক।
(২) ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের স্বীকৃতি ও ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা।
(৩) নারীমুক্তি, নারীবাদের প্রতিষ্ঠা, নারী স্বাধীনতার প্রকাশ।
(৪) মানবতাবাদ ও জাতীয়তাবাদের প্রতিষ্ঠা আর জাতীয় ভাষায় প্রাধান্য।
(৫) ধর্মীয় সংস্কার, ধর্মীয় সহনশীলতার স্থায়িত্ব, ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তার প্রসার
(৬) যাজক বা পুরোহিত প্রভুত্বের অবসান, যুক্তিবাদের প্রতিষ্ঠা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিজ্ঞানের অগ্রগতি।
(৭) নবজাগরণের প্রকাশ ও শিল্প, সাহিত্য, চারুকলার পুনঃপ্রতিষ্ঠা।
(৮) গণতান্ত্রিক শিক্ষার প্রসার ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব স্বীকার।
(৯) সকলের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
(১০) শিক্ষায় সমান অধিকারের প্রসঙ্গ ও স্বীকৃতি।

আধুনিক যুগের উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি নতুন যুগে আলোকবর্তিকা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিল পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপীয় সমাজ জীবনে নবজাগরণের হাত ধরে। শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান চেতনায় এসেছিল নতুন দৃষ্টি, গুরুত্ব পেয়েছিল মানুষের জীবন আর মনুষত্বের স্বীকৃতি। এর প্রভাব পড়েছিল তৎকালীন ইউরোপীয় মানবসমাজে, তাদের শিক্ষাক্ষেত্রে। মানবিক অস্তিত্বের

পরিপ্রেক্ষিতে পাঠ্যক্রমে স্থান পেয়েছিল নান্দনিক অনুভূতি, নৈতিক মূল্যবোধ, চিন্তার মুক্তি আর প্রসারতা। পরবর্তী সময়ে গুরুত্ব পেল ব্যক্তি আর সমাজ কল্যাণে শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা। শিক্ষা শুধুমাত্র তত্ত্ব সর্বস্ব না থেকে হয়ে উঠল বাস্তব ও প্রয়োগধর্মী। **কনেনিয়াসের** তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করল যে, "মানুষই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ।" প্রকৃতিকে উপলব্ধি করার জন্য প্রয়োজন প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ আর বাস্তব জ্ঞান। জ্ঞানার্জনের প্রকৃত পথ হল ইন্দ্রিয় অনুশীলন। মানুষ আর প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক উপলব্ধিতে স্থান পেল।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত হল যুক্তিবাদ (Rationalism) আর বুদ্ধি বা প্রজ্ঞাবাদ। প্রকৃতির সবকিছুই গ্রহণ করতে হবে বুদ্ধি দিয়ে, যুক্তির দ্বারা বিচার করে, ফরাসি দার্শনিক **ভলতেয়ার** ছিলেন যাঁর অন্যতম পুরোধা। এই শতকেই এলেন **জ্যাঁ জ্যাক রুশো**। এই ফরাসি দার্শনিক বললেন মানুষ প্রকৃতিরই সৃষ্টি, আর তার শিক্ষাও হবে প্রকৃতি অনুযায়ী। দাবি উঠল শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার। প্রাধান্য পেল শিক্ষার্থীর প্রকৃতি, আগ্রহ, ক্ষমতা আর চাহিদা। ক্রমে শিক্ষা চিন্তায় এল মনোবিজ্ঞানের প্রভাব। উনবিংশ শতাব্দীতে **হার্বার্ট স্পেনসারের** পথ নির্দেশে প্রতিষ্ঠিত হল শিক্ষাক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা। এই উনবিংশ শতাব্দীতেই এল আধুনিক জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্রবাদ। ইউরোপের মতো অন্যান্য দেশগুলিতে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার দাবি উঠল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে **জন ডিউই** প্রতিষ্ঠা করলেন গণতান্ত্রিক আর প্রয়োগধর্মী শিক্ষা। এই সময়কালের মধ্যে আবার পৃথিবীর অনেক দেশে শিক্ষায় সমাজবাদী ধারা প্রতিষ্ঠা পেল। এই প্রেক্ষাপটেই আধুনিক শিক্ষার বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নলিখিত রূপ ধারণ করল।

(১) শিক্ষাক্ষেত্রে রাষ্ট্রের দায়িত্ব এবং সাংবিধানিক স্বীকৃতি।
(২) শিক্ষার অধিকার সমস্ত নাগরিকেরই অধিকার, দাবি উঠল সর্বজনীন শিক্ষার প্রসঙ্গ।
(৩) গুরুত্ব পেল শিক্ষায় সমসুযোগের নীতি, অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা।
(৪) গৃহীত হল জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসঙ্গ, জাতির উন্নতিতে তার প্রয়োজন অনেকখানি।
(৫) পাঠ্যক্রমে স্থান পেল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার গুরুত্ব, সমাজবিজ্ঞানের যথার্থ মূল্য, ব্যক্তি বৈষম্যের নীতিকে কার্যকরী করার প্রয়াস।
(৬) শিক্ষাক্ষেত্রে স্বীকৃতি পেল শিশুকেন্দ্রিক নীতি, জীবনমুখী শিক্ষা, বৃত্তি ও কারিগরি শিক্ষার প্রসঙ্গ, মাতৃভাষার গুরুত্ব।

● ভারতে শিক্ষায় আধুনিক যুগের সূত্রপাত :

ভারতে আধুনিক শিক্ষার সূত্রপাত ঘটে ইউরোপীয় মিশনারিদের হাত ধরে, এই ব্যাপারে তাঁদের বিশেষ অবদান অস্বীকার করা যায় না। একথা ঠিক যে খ্রিস্ট ধর্মপ্রচার ও ধর্মান্তরিত মানুষগুলিকে তৎকালীন সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য শিক্ষাবিস্তারে তাঁরা অগ্রসর হলেও ভারতবাসীর জীবনে তার সুফলগুলিও স্মরণযোগ্য। দেশের নানা স্থানে মিশনারি বিদ্যালয়গুলিতে যে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন ঘটেছিল পরবর্তীকালে ভারতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে

Scanned with CamScanner

সেই ব্যবস্থা অনুসৃত হয়েছিল অনেকখানি। মিশনারি বিদ্যালয়গুলির মধ্য দিয়েই ভারতে আধুনিক শিক্ষাধারার পত্তন ঘটে। ভারতে আধুনিক শিক্ষাধারাকে দুটি পর্যায়ে আলোচনা করা যেতে পারে—স্বাধীনতা পূর্বযুগ এবং স্বাধীনতা পরবর্তী যুগ।

(ক) **স্বাধীনতা পূর্বযুগ :** পোর্তুগিজ মিশনারিরাই ভারতে আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রথম প্রবর্তন ঘটায়। পোর্তুগিজরা ক্রমে ক্রমে গোয়া, দমন, দিউ, মুম্বাই প্রভৃতি স্থানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন। বিদ্যালয়গুলিতে পড়ানো হত পোর্তুগিজ ও স্থানীয় ভাষা এবং খ্রিস্টধর্মের মূলতত্ত্ব। কলেজ বা মহাবিদ্যালয়গুলিতে পড়ানো হত লাতিন ভাষা, তর্কশাস্ত্র আর ধর্মতত্ত্বের বিষয়।

ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ফরাসি মিশনারি ভারতে শিক্ষাবিস্তারে উদ্যোগী হয়। কারিকল, পণ্ডিচেরী, মাহে এবং চন্দননগরে বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। এই বিদ্যালয়গুলিতে যেমন মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয় তেমনি ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা দেওয়া হত।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে দিনেমার মিশনারিগণ দক্ষিণ ভারতে তাঁদের শিক্ষাদানের কাজ শুরু করেন। **১৭১৬ খ্রিস্টাব্দে তাঁরা শিক্ষক শিক্ষণ-বিদ্যালয়ও খুলেছিলেন।** এই সময় বিদ্যালয়গুলির বিশেষত্ব ছিল যে, এখানে স্থানীয় তামিল ও তেলেগু ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হত। উচ্চ বিদ্যালয় এবং শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয়গুলিতে ইংরেজিও শেখানো হত।

অন্যান্য ইউরোপীয় মিশনারিদের মতো ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ধর্মপ্রচার ও শিক্ষাদানের কাজেতে খুব একটা উৎসাহ দেখায়নি। যদিও প্রথমদিকে কোম্পানি মিশনারিদের সহায়তা করেছিল কিন্তু পলাশি যুদ্ধের পর রাজনৈতিক কারণে কোম্পানির নীতি পরিবর্তিত হলে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় নিরপেক্ষ নীতি গৃহীত হয়। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে সনদ আইনের দ্বারা মিশনারিরা বিস্তৃতভাবে শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে সুযোগ পান। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মিশনারিরা ভারতবর্ষে ইংরেজি শিক্ষার বিস্তারে বিশেষভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে নতুন করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সনদ নেওয়ার সময় আসে। তখন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার একটি সামগ্রিক পর্যালোচনার সুযোগ আসে। ব্রিটিশ শাসিত ভারতের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট কেন্দ্রীয় নীতি গ্রহণের প্রয়োজন উপলব্ধ হয়। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে চার্লস উডের নির্দেশে মহা মূল্যবান শিক্ষাদলিল রচিত এবং প্রকাশিত হয়, যা **'উডের ডেসপ্যাচ'** নামে পরিচিত। এই ডেসপ্যাচে ব্রিটিশরা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধিকারভুক্ত বাংলা, বম্বে, মাদ্রাজ, উত্তরপ্রদেশ ও পাঞ্জাব পাঁচটি প্রদেশে একটি করে শিক্ষাবিভাগ স্থাপন করার কথা নির্দেশিত হয়। এই ডেসপ্যাচে যে সমস্ত নির্দেশ দেওয়া হয় সেগুলির মধ্যে অন্যতম হল বিদ্যালয়-শিক্ষকদের জন্য, উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য বিভিন্ন ধরনের নর্ম্যাল স্কুল প্রতিষ্ঠার কথা। উডের ডেসপ্যাচের নির্দেশ অনুসারেই যেমন শিক্ষাবিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয় তেমনি ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শে কলকাতা, বম্বে, মাদ্রাজ শহরে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে মাদ্রাজ এবং ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে সরকারি নর্ম্যাল স্কুল স্থাপিত হয় বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের

শিক্ষার জন্য। **উডের ডেসপ্যাচে** শিক্ষক-শিক্ষণের নির্দেশ দেওয়া হলেও ১৮২২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি, খুব একটা গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। যদিও ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত স্ট্যানলির ডেসপ্যাচে প্রাথমিক শিক্ষকদের যোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য বহুসংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপনের কথা বলা হয়। ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হান্টার কমিশনও উন্নত শিক্ষাদানের প্রসঙ্গ গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষকদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষণের সুপারিশ করেন এবং প্রতিটি প্রদেশে অন্তর্গত প্রতি শিক্ষাবিভাগে শিক্ষক-শিক্ষণের জন্য নর্ম্যাল স্কুল স্থাপনের সুপারিশ করা হয়।

১৯০২ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন প্রকাশিত হয়। এই কমিশনের অন্যতম উল্লেখযোগ্য সুপারিশ ছিল শিক্ষণ ও গবেষণা সংক্রান্ত সুপারিশ। ১৯০১-১৯০২ খ্রিস্টাব্দে মাধ্যমিক শিক্ষকদের জন্য ৬টি ট্রেনিং কলেজ এবং ৫০টি ট্রেনিং স্কুল দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন বা স্যাডলার কমিশনের সুপারিশ প্রকাশিত হয়। এই কমিশন একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। সেটি হল—ইন্টার-মিডিয়েট শ্রেণিকে ডিগ্রি কলেজ থেকে পৃথক করে ইন্টার মিডিয়েট কলেজ স্থাপনের সুপারিশ। এই নতুন ধরনের কলেজে অন্যতম কতকগুলি বিষয়ের মধ্যে শিক্ষাতত্ত্ব (Education) পঠন-পাঠনের জন্য একটি বিষয় নির্দিষ্ট হয়। এ ছাড়াও প্রতিটি বিশ্ববিদালয়ে শিক্ষক শিক্ষণের জন্য স্বতন্ত্র শিক্ষাবিভাগ (Department of Education) গঠনের সুপারিশ করা হয় এবং বি.এ. ও আই.এ পরীক্ষায় শিক্ষাতত্ত্বকে (Education) একটি বিষয় রূপে গ্রহণ করার জন্য সুপারিশ করা হয়।

১৯২১ খ্রিস্টাব্দে গঠিত হয় কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা সমিতি (Central Advisory Board of Education)। এই সমিতির উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন প্রদেশের শিক্ষার সমন্বয় সাধন ও প্রয়োজনীয় উপদেশ দান এবং সেইসঙ্গে প্রাসঙ্গিক পরামর্শ প্রদান। এরপর ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে সাইমন কমিশন **স্যার ফিলিপ হার্টগের** নেতৃত্বে ও সভাপতিত্বে একটি উপসমিতি নিয়োগ করে। ওই উপসমিতি ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে ভারতীয় শিক্ষার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে একটি রিপোর্ট পেশ করেন। রিপোর্টটি **হার্টগ রিপোর্ট** নামে পরিচিত। এই কমিটির উল্লেখযোগ্য সুপারিশের মধ্যে কয়েকটি হল—

(১) প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির পরিচালনার জন্য সংগঠন ব্যবস্থাকে গুরুত্ব দিতে হবে, এবং ঢেলে সাজাতে হবে।

(২) উন্নত গুণমানের শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে এবং এই সব শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্র পুনর্গঠন করতে হবে।

(৩) শিক্ষকদের বেতনক্রম নির্ধারণ এবং তাদের জন্য Refresher course-এর চালুর ব্যবস্থা করতে হবে।

(৪) মাধ্যমিক শিক্ষাকে বহুমুখী করতে হবে।

ebook.dascoaching.in

Scanned with CamScanner

(৫) নির্বাচিত কিছু কলেজে অনার্স কোর্স চালু করতে হবে।

(৬) মেধাবী শিক্ষার্থীরা যাতে গবেষণায় আগ্রহ বোধ করে তার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

হার্টগ কমিটির পরামর্শ ক্রমে ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে। কেন্দ্রীয় শিক্ষা-উপদেষ্টা সমিতিকে পুনর্গঠন করা হয়। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে **মি. এ. অ্যাবট** এবং **মি.এস. এইচ. উডকে** ভারত সরকার আমন্ত্রণ জানায় ভারতে বৃত্তি শিক্ষায় সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে পরামর্শ দানের জন্যে। অ্যাবট ও উড ভারত সরকারের নিকট তাদের যে রিপোর্ট পেশ করেন তাতে শিক্ষা সংক্রান্ত যে সমস্ত সুপারিশ ছিল সেগুলির কয়েকটি হল–

(১) বিদ্যালয়গুলিতে উপযুক্ত পরিমাণে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকদের নিযুক্ত করতে হবে। নারী শিক্ষার অগ্রগতির জন্য শিক্ষিকাদের নিয়োগকে সুনিশ্চিত করতে হবে।

(২) মাতৃভাষার মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের বিদ্যালয় গুলিতে পঠন-পাঠন পরিচালনার ব্যবস্থা করতে হবে।

(৩) দুটি পর্যায়ে শিক্ষক-শিক্ষণের ব্যবস্থা নির্দিষ্ট থাকবে। Pre-service শিক্ষকদের জন্য থাকবে 'নর্মাল স্কুল' এবং In-service শিক্ষকদের জন্য থাকবে 'রিফ্রেসার ট্রেনিং' কলেজ।

(৪) বৃত্তিমূলক শিক্ষার ভিত্তি হবে সাধারণ শিক্ষা এবং সরকারকে সাধারণ শিক্ষার কলেজের অনুরূপ বৃত্তিমূলক শিক্ষার কলেজ স্থাপন করতে হবে।

১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় সার্জেন্ট রিপোর্ট। এই পরিকল্পনাটির লক্ষ্য ছিল ৪০ (চল্লিশ) বছরের চেষ্টায় ভারতীয় শিক্ষার মানকে সমসাময়িক ইংল্যান্ডের শিক্ষামানের সমান করা। উচ্চশিক্ষার সুপারিশে শিক্ষক-শিক্ষণ প্রসঙ্গে যে বক্তব্য ছিল তা হল—স্নাতক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষণ বিভাগ এবং নতুন শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে। স্নাতক নন এমন শিক্ষকদের জন্য তিন ধরনের শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয় স্থাপনের সুপারিশ করা হয়।

(খ) স্বাধীনতা পরবর্তী যুগ : ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা লাভের পর ভারতের জাতীয় পুনর্গঠনের কাজ শুরু হয়। স্বাধীনতা পরবর্তী এই যুগে অন্যান্য বিভিন্ন দিকের মতো শিক্ষার ক্ষেত্রেও শুরু হয় উন্নয়নের প্রচেষ্টা। এই যুগের কর্ম প্রচেষ্টার প্রধান প্রধান দিকগুলি হল–

(১) সাংবিধানিক ভাবে শিক্ষার ব্যাপারে রাষ্ট্র দায়িত্ব স্বীকার করে।

(২) উচ্চশিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা প্রভৃতি কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া সাধারণ শিক্ষার নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থার দায়িত্ব বর্তায় রাজ্যের উপর।

(৩) ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার সাংবিধানিক নীতি ঘোষণা করা হয় (১৯৬০ খ্রিস্টাব্দ সময় সীমার মধ্যে)।

(৪) সাধারণ শিশু ছাড়াও স্ত্রী শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা, অনুন্নত শ্রেণির শিক্ষা এবং প্রতিবন্ধী বা ভিন্নধর্মী ক্ষমতা সম্পন্ন শিশুদের প্রতি মনোযোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

(৫) কারিগরি ও বৃত্তিশিক্ষার প্রতি জোর দেওয়া হয়।

(৬) শিক্ষার সর্বস্তরের উন্নতি বিধানের জন্য বিভিন্ন কমিশন ও কমিটি গঠন করা হয়। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন বা **রাধাকৃষ্ণন কমিশন** (১৯৪৮-১৯৪৯) খ্রিস্টাব্দে গঠিত হয়। ভারতের উচ্চশিক্ষা বিষয়ে কমিশনের সুপারিশগুলি ছিল এক মহামূল্যবান দলিল। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. **লক্ষ্মণ স্বামী মুদালিয়র**-এর নেতৃত্বে গঠিত হয় মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন (১৯৫২-৫৩), ভারতীয় শিক্ষা কমিশন বা **কোঠারি কোমিশন** গঠিত হয় ১৯৬৪-১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে। বস্তুত, এই শিক্ষা কমিশনেই প্রাক্-প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষার সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত সবরকম শিক্ষার কথা স্থান পেয়েছে। এই কমিশনের সুপারিশ ও অভিমত অনুসারে ভারতের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে।

(৭) ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে যে জাতীয় শিক্ষানীতি রচিত হয় তার সমস্ত কিছু বাস্তবায়িত হয়নি। কিন্তু আর একটি নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি রূপায়ণের প্রয়োজন অনুভূত হয়। যার ফলশ্রুতি হিসেবে ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দের জাতীয় শিক্ষা নীতিটি সংসদে পাস হয়।

(৮) ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দের জাতীয় শিক্ষানীতির প্রেক্ষিতে গড়ে ওঠে কতকগুলি কেন্দ্রীয় সংস্থা। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—UGC, NCTE, NCERT, NIEPA ইত্যাদি।

(৯) ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় রায়মূর্তি কমিটির প্রতিবেদন, ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে পরিবর্তিত জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে বিদ্যালয় শিক্ষার উন্নয়নকল্পে National Knowledge Commission গঠিত হয়।

সবশেষ পরিস্থিতি হিসেবে শিক্ষার অধিকার আইন, ২০০৯ প্রকাশিত হয়। শিশুদের শিক্ষার অধিকার ভারতীয় সংবিধানের নির্দেশাত্মক নীতি সমূহ থেকে মৌলিক অধিকারে স্বকৃতি প্রদান এবং অন্তর্ভুক্তিকরণ এদশের শিক্ষার ইতিহাসে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত এ নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

❑ ১.১.৩ শিক্ষাবিজ্ঞান শিক্ষণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aims and objectives of Education Teaching) :

❖ ১.১.৩.১ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aims and objectives) :

শিক্ষাক্ষেত্রে প্রায়শ দুটি শব্দ ব্যবহার করা হয়—একটি লক্ষ্য, অপরটি উদ্দেশ্য। দুটি শব্দকেই যেমন অনেক ক্ষেত্রে সমার্থক শব্দ ভেবে আমরা ভুল করি, তেমনি অনেক ক্ষেত্রে শব্দ দুটি

Scanned with CamScanner

আমাদের মধ্যে বিভ্রান্তিরও সৃষ্টি করে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে দুটি শব্দ মোটেই একই ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায় না। সাধারণত ইংরেজি aims এবং goals অনেকটা কাছাকাছি অর্থ বহন করলেও objectives কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার হয়ে থাকে। আমাদের আলোচনার এই অংশে আমরা শিক্ষার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করব।

(ক) লক্ষ্য (Aims) : শিক্ষাক্ষেত্রে 'লক্ষ্য' শব্দটি অনেক ব্যাপক এবং এর পরিধি অনেকখানি বিস্তৃত। উদাহরণ-এর সাহায্যে বিষয়টি বোঝা যেতে পারে। ভারতীয় আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্য হল 'ভারতের সমাজ ব্যবস্থার' উন্নয়ন। এই লক্ষ্যে পৌঁছাতে গেলে সমাজের দার্শনিক, ঐতিহাসিক, নৃ-বৈজ্ঞানিক এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর নির্ভর করতে হয়। শিক্ষার লক্ষ্য বলতে ঠিক কী বোঝায় তা উপলব্ধি করার জন্য আমরা আরও কিছু উদাহরণের অবতারণা করতে পারি।

(ক) শিক্ষার লক্ষ্য সুনাগরিক প্রস্তুত করা এবং জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করা।

(খ) শিক্ষার লক্ষ্য নৈতিক, আধ্যাত্মিক এবং মূল্যবোধের বিকাশ ঘটানো।

(গ) শিক্ষার লক্ষ্য ব্যক্তি এবং সমাজের বৃত্তিগত চাহিদার পূরণ করা।

(ঘ) শিক্ষার লক্ষ্য সঠিকভাবে অবসর বিনোদন করতে শেখানো এবং অবসর বিনোদনের মাধ্যমে সংগীত, নৃত্য, বাগান তৈরি, সৃজনশীল কার্য সম্পাদন এবং খেলাধুলার প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করা।

(ঙ) শিক্ষার লক্ষ্য হল দৈহিক এবং মানসিক, স্বাস্থ্যের বিকাশ এবং সেই সঙ্গে সৌন্দর্যবোধের বিকাশ ঘটানো।

(চ) শিক্ষার লক্ষ্য হল দৈহিক, মানসিক এবং সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া অংশের মানুষের উন্নতি সাধন করা ইত্যাদি।

সুতরাং আমরা উল্লেখ করতে পারি, সংক্ষেপে শিক্ষার লক্ষ্য হল সমাজের গতানুগতিক কাজের সঙ্গে নতুন যুগের চাহিদা এবং উদ্ভূত নতুন নতুন সমস্যার সুষ্ঠু সঙ্গতি বিধান করা। কাজেই শিক্ষার লক্ষ্য অনেক ব্যাপক এবং সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলিকে সঠিকভাবে পরিচালিত করে চরম লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করা। সমাজের চাহিদার সুষ্ঠু সঙ্গতি বিধানের মাধ্যমে ছাত্রদের নির্দিষ্ট পথে পৌঁছাতে সাহায্য করতে 'লক্ষ্য' স্থিরীকৃত করা অতীব জরুরি।

লক্ষ্য স্থির করার প্রসঙ্গে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য সমধর্মী প্রতিষ্ঠানগুলি শিক্ষার্থীদের নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে সাহায্য করতে পারে–

(১) শিক্ষার্থীদের সঠিকভাবে ব্যক্তিত্ব এবং চরিত্রগঠনের মাধ্যমে সমাজের মূলস্রোতে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে সাহায্য করবে।

(২) বৃত্তিমূলক এবং প্রয়োজনীয় সামাজিক জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে।

(৩) উন্নত, জটিল এবং সৃজনশীল চিন্তাশক্তির বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করবে।

(৪) বিভিন্ন সমস্যা এবং ঘটনাবলিকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাখ্যা করতে শেখাবে।

(৫) দেশ ও জাতির পক্ষে যা কিছু মঙ্গল সেই সমস্ত চিন্তা-ভাবনাকে বাস্তব রূপ দিতে চেষ্টা করবে।

(খ) উদ্দেশ্য (Objectives) **:** শিক্ষার উদ্দেশ্য লক্ষ্যের একটি বিচ্ছেদ্য অংশ। লক্ষ্য ব্যাপক ও অনেকখানি বিস্তৃত হলেও উদ্দেশ্য কিন্তু লক্ষ্যের চেয়ে সংকীর্ণ ও সুনির্দিষ্ট। কাঙ্ক্ষিত স্থানে (Goal) পৌঁছতে গেলে কতকগুলি স্তর অতিক্রম করতে হয়। এগুলির প্রথমটি হল লক্ষ্য (Aims) নির্ধারণ। এই লক্ষ্য বিভিন্ন রকম হতে পারে, যেগুলির সব অর্জন করানো বিদ্যালয়ের দ্বারা সম্ভব নয়। এর কতকগুলি বিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রমে থাকলেও অন্যগুলি কিন্তু অর্জন করতে হয় পরিবারে, সমাজে এবং রাষ্ট্রের কার্যাবলির মাধ্যমে। সুতরাং লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে কতকগুলি স্তর অতিক্রমের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। লক্ষ্যের এই ছোটো ছোটো অংশগুলিই হল উদ্দেশ্য বা Objective । কাজেই উদ্দেশ্য হল নির্দিষ্ট একটি লক্ষ্যে পৌঁছবার ছোটো ছোটো ধাপ। শিক্ষক যখন বিদ্যালয়ের কর্মপরিকল্পনা (Programme) প্রস্তুত করেন এবং তা কার্যকরী করার কথা চিন্তা করেন তখন তাঁকে প্রকৃত পক্ষে উদ্দেশ্যের কথাই মাথায় রাখতে হয়।

এখন প্রশ্ন হল, উদ্দেশ্য কাকে বলে? শিক্ষাবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা উদ্দেশ্যের সংজ্ঞা বিভিন্নভাবে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। এলিংটন, পার্সিভাল এবং রেস (১৯৯৩) উদ্দেশ্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন—

> **"They (objectives) describe in greater detail the intended learning outcomes of a course. They describe learning outcomes in terms of things that successful learners will be able to do at the end of a specified part of a course."**

নিম্নলিখিত চিত্রের সাহায্যে লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যের সম্পর্ক অনুধাবন করা যেতে পারে–

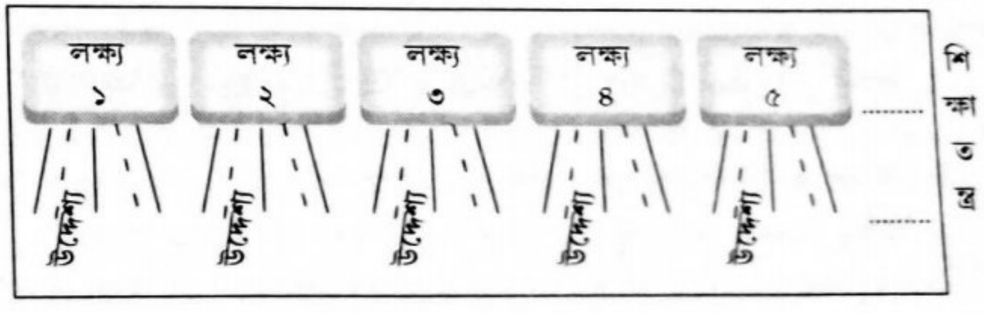

চিত্র- ২ : লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মধ্যে সম্পর্ক

Scanned with CamScanner

উপরের চিত্র থেকে বলা যেতে পারে যে শিক্ষাতন্ত্রের (Education System) এক বা একাধিক লক্ষ্য থাকতে পারে। প্রতিটি লক্ষ্যে পৌঁছোবার জন্য উদ্দেশ্য স্থির করা দরকার। ওই উদ্দেশ্যগুলিতে উপনীত হতে পারলেই ওই লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে।

কাজেই উদ্দেশ্যের সংজ্ঞা নিম্নরূপেও দেওয়া যেতে পারে:

একটি লক্ষ্যের উদ্দেশ্য হল শিখনের প্রান্তসীমা। শিখনের শেষে শিক্ষার্থীর শিখন যদি ওই প্রান্ত সীমায় উপস্থিত হয় তবেই মনে করা হবে যে উদ্দেশ্যগুলি অর্জন করা সম্ভব হয়েছে।

এলিংটনের মতে উদ্দেশ্যের মূল কাজ তিনটি, যথা:

১) উদ্দেশ্য পাঠ্যক্রমের সাধারণ প্রকৃতিকে চিহ্নিত করে এবং কতটুকু বিষয়বস্তু এই উদ্দেশ্যের অধীন থাকবে তা নির্দিষ্ট করে।

২) উদ্দেশ্য শিখন এবং শিক্ষণ (Learning and Teaching) পদ্ধতি কী হবে তা জানতেও সাহায্য করে।

৩) বিষয়বস্তু নির্ধারণে উদ্দেশ্য মুখ্য ভূমিকা পালন করে এবং মূল্যায়নের পদ্ধতিও নির্দেশ করে।

সুতরাং উদ্দেশ্য হল :

(i) একটি প্রান্ত সীমা, যে প্রান্তসীমার দিকে শিক্ষাপ্রক্রিয়া অগ্রসর হয়;

(ii) সক্রিয়তার মাধ্যমে পরিকল্পিত পরিবর্তন পদ্ধতি;

(iii) আমরা যা করতে চাই।

উদ্দেশ্যের প্রয়োজনীয়তা :

একটি অতি প্রচলিত প্রবাদবাক্য হল 'লক্ষ্যহীন লোক মাস্তুল ছাড়া জাহাজের মতো।' এটি শিক্ষা পদ্ধতির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সত্য। শিক্ষার লক্ষ্য না থাকলে শিক্ষার গতিও বিপথগামী হবে। শিক্ষার লক্ষ্য স্থির হলেই পাঠ্যক্রম প্রস্তুত করা যাবে। আর পাঠ্যক্রম প্রস্তুত হলে সেই পাঠ্যক্রমের সাফল্য নির্ভর করবে সঠিকভাবে এবং সুবিন্যস্তভাবে উদ্দেশ্য নির্ধারণের উপর। উদ্দেশ্য নির্ধারণ করার সময় শিক্ষার স্তর এবং বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া হয়। কারণ বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য বিভিন্ন। যেমন—প্রাক প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার উদ্দেশ্য প্রাথমিক, মাধ্যমিক অথবা উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যের মতো নয়। আবার মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য প্রাথমিক শিক্ষা বা উচ্চশিক্ষার মতো নাও হতে পারে। অন্য দিকে ভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্য বিজ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশ্য থেকে পৃথক; যদিও কিছু উদ্দেশ্য এক হতেও পারে।

বিষয় বস্তুর উদ্দেশ্যের উপর নির্ভর করে বিষয়বস্তুর গভীরতা কতটা হবে। শিক্ষার্থীকে শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা প্রদানের জন্য শিক্ষক পাঠ্যক্রমের বিষয়বস্তুকে বিশ্লেষণ করেন, একে

বলা হয়, **বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ** (Content Analysis)। শিক্ষার্থী শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা অর্জনের পর, শিক্ষক তার মূল্যায়ন করেন। এই মূল্যায়নের উপর নির্ভর করেই পাঠ্যক্রম, পাঠদান পদ্ধতি, বিষয়বস্তুর অথবা উদ্দেশ্যের কোথায় কোথায় এবং কতটা পরিবর্তন প্রয়োজন তা নির্ধারণ করা হয়। এই সমস্ত প্রক্রিয়া বৃত্তাকারে যুক্ত। পরের পাতায় চিত্রের মাধ্যমের বিষয়টি দেখানো যেতে পারে।

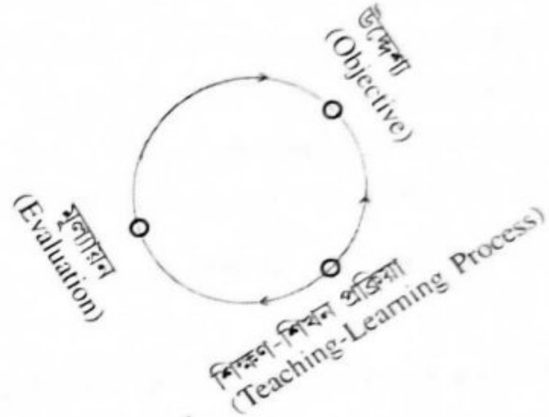

চিত্র- ৩ : মূল্যায়ণ, উদ্দেশ্য ও শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়া

❖ ১.১.৩.২ উদ্দেশ্য গঠনের ভিত্তি (Bases of Formulation of objectives) :

যে-কোনো বিষয় শিক্ষণের মতো শিক্ষাবিজ্ঞান শিক্ষণের উদ্দেশ্যগুলি একটি দৃঢ় দার্শনিক, মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক এবং বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর গঠন করা দরকার। উদ্দেশ্য গঠনের এই প্রধান উৎসগুলি হল নিম্নরূপ—

(i) শিক্ষার্থীর চাহিদা এবং সক্ষমতা (The needs and capabilities of the learner)

(ii) সমাজের চাহিদা (The needs of the society)

(iii) বিষয়বস্তুর প্রকৃতি (The nature of the subject matter)

(iv) শিক্ষাব্যবস্থার প্রকৃতি (The nature of the educational system)

(v) সম্ভাব্যতার বাধ্যবাধকতা (Feasibility constraint)

❖ ১.১.৩.৩ শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যের কার্যাবলি (Functions of Educational objectives) :

শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যগুলি কীভাবে ব্যক্তির জীবনে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করে? এই প্রশ্নের উত্তর এককথায় দেওয়া বেশ কঠিন। সংক্ষেপে বলা যায় উদ্দেশ্যগুলি ব্যক্তিজীবনে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন সাধনে নিম্নলিখিত ভাবে সাহায্যে করে :

(১) শিক্ষামূলক কাজ কর্মের প্রকৃতি এবং শিক্ষা প্রক্রিয়ার নির্দিষ্ট দিক নির্দেশ করে;

Scanned with CamScanner

(২) শিখনের বিভিন্ন দিকের পার্থক্য নির্ণয় করে;
(৩) শিখন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন সঠিক প্রকৃতিকে নির্দেশিত করে;
(৪) শিক্ষা প্রক্রিয়ার প্রকৃতি নির্ণয় করে;
(৫) শিখনের অভিজ্ঞতাকে ক্রমানুসারে সজ্জিত করে;
(৬) মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ চিহ্নিত করে;
(৭) শিক্ষামূলক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে;
(৮) বিষয়বস্তু নির্বাচনে সাহায্য করে;
(৯) পাঠ্যক্রমের অর্থ ব্যাখ্যা করে;
(১০) বিভিন্ন স্তরে শিক্ষার উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করে;
(১১) শিখন প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীর শক্তি এবং দুর্বলতা নির্ণয় করে ইত্যাদি।

❖ ১.১.৩.৪ উদ্দেশ্য নির্বাচনের মাপকাঠি বা শর্ত (Criteria of Selection of Objectives) :

থার্বার এবং কোলেট (Thurber and Collette) উদ্দেশ্য নির্বাচনের মাপকাঠি হিসেবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উল্লেখ করেছেন :

(১) **কার্যকারিতা বা উপযোগিতা** (Usefulness) : শিক্ষার্থীর জীবনের সঙ্গে শিখনটির মূল্য বা গুরুত্ব থাকতে হবে।

(২) **ব্যবহার যোগ্যতা** (Practicability) : শিক্ষার্থীর শিখন উন্নতিতে প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতাগুলি অর্জনের সম্ভাব্যতা থাকতে হবে।

(৩) **মানানসই** (Fitness) : শিখনের বিষয়গুলিকে একটি বৃহৎ উদ্দেশ্য সাধনের পথে মানানসই হতে হবে।

(৪) **সময়োপযোগিতা** (Timeliness) : শিখনকে অবশ্যই শিক্ষার্থীর পরিচিত পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে সময় উপযোগী হতে হবে।

(৫) **উপযুক্ততা** (Appropriateness) : শিখনকে অবশ্যই শিক্ষার্থীর পরিণমনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এবং যে পরিবেশে থেকে বিকশিত হচ্ছে তার প্রেক্ষাপট অনুযায়ী বা উপযোগী হতে হবে।

❖ ১.১.৩.৫ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মধ্যে পার্থক্য (Difference between 'Aims' and 'Objectives') :

সাধারণত, লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য শব্দ দুটিকে সমার্থক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। কখনও-বা একটিকে অন্যটির পরিবর্তে ব্যবহার করতে দেখা যায়। লক্ষ্য হল আদর্শগত দিক, উচ্চাশার উপলব্ধির জগৎ যা প্রত্যাশাকে সম্ভব করে তুলতে পারে আবার নাও পারে। সুদুর প্রসারী

পরিকল্পনার ক্ষেত্রে যার প্রয়োজন থাকে। কিন্তু উদ্দেশ্য হল বাস্তবতার উপর দাঁড়িয়ে সুনির্দিষ্ট পথে লক্ষ্য পূরণের উপায়। সুতরাং শিক্ষাবিজ্ঞান শিক্ষণের ক্ষেত্রেও শিক্ষার্থীর কাঙ্ক্ষিত আচরণগত পরিবর্তন ঘটানোর জন্য লক্ষ্যকে কতকগুলি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে বিভক্ত করা দরকার। নিম্নে লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যের মধ্যে পার্থক্যগুলি উল্লেখ করা হল :

লক্ষ্য	উদ্দেশ্য
(১) একটি বিষয় (Subject) কেন শেখানো হয়, সেই প্রশ্নের উত্তর হল লক্ষ্য।	(১) একটি বিষয়ের কোনো অংশ (topic) শেখানোর পর কী অর্জিত হয় সেই প্রশ্নের উত্তর হল উদ্দেশ্য।
(২) লক্ষ্য হল অভিপ্রায় বা উদ্দেশ্যের সাধারণ ঘোষণা যা শিক্ষণ কর্মসূচির দিক নির্দেশ করে ।	(২) উদ্দেশ্য হল সেই দিক নির্দেশের ছোটো ছোটো স্তর বা ধাপ।
(৩) লক্ষ্য আদর্শের খুব নিকট সম্পর্কিত যা সম্পূর্ণভাবে অর্জন করা যায় না।	(৩) উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে অর্জন করা সম্ভব।
(৪) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা বিদ্যালয়ের সঙ্গে সঙ্গে সমাজও লক্ষ্য অর্জনের জন্য দায়ী।	(৪) উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য শুধু বিদ্যালয় দায়ী।

❖ ১.১.৩.৬ বিদ্যালয় স্তরে শিক্ষাবিজ্ঞান শিক্ষণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aims and objectives of Teaching Education in School Level) :

★ লক্ষ্য :

এই অধ্যায়ের শুরুতেই আমরা আলোচনা করেছি যে, **লক্ষ্য ব্যাপক ও অনেকখানি বিস্তৃত। উদ্দেশ্য লক্ষ্যের তুলনায় সংকীর্ণ** সুনির্দিষ্ট কাঙ্ক্ষিত স্থানে (Goal) পৌঁছাতে গেলে অনেকগুলি স্তর অতিক্রম করতে হয়। লক্ষ্যের এই স্তর বা ছোটো ছোটো অংশগুলিই হল উদ্দেশ্য বা objective । অর্থাৎ উদ্দেশ্য হল নির্দিষ্ট একটি লক্ষ্যে পৌঁছোবার ছোটো ছোটো ধাপ বা সিঁড়ি। শিক্ষক যখন বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনাকে কার্যকরী করার কথা চিন্তা করেন তখন তাঁকে উদ্দেশ্যের কথাকেই মাথায় রাখতে হয়। সুতরাং প্রতিটি লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্য উদ্দেশ্য স্থির করার দরকার হয় এবং ওই উদ্দেশ্যগুলিতে সার্থকভাবে উপনীত হতে পারলেই ওই লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে বলে মনে করা হয়।

বিদ্যালয় স্তরে শিক্ষাবিজ্ঞান শিক্ষণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এই পরিপ্রেক্ষিতেই বিবেচনা করা হয়।

বিদ্যালয় স্তরে শিক্ষার মূল লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্য যে সমস্ত উদ্দেশ্য স্থির করা হয়, সেগুলি যদি শিক্ষার্থী অর্জন করতে পারে বা শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সেই উদ্দেশ্যে উপনীত করতে পারেন তাহলে ধরা হয় শিক্ষক তাঁর কাজে সফল হয়েছেন।

Scanned with CamScanner

সুতরাং উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় শিক্ষাবিজ্ঞান শিক্ষণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে জানার আগে শিক্ষাবিজ্ঞানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কী এই প্রশ্নের জবাব দেওয়া যেতে পারে নিম্নরূপভারে—

শিক্ষাবিজ্ঞানের লক্ষ্যগুলিকে নিম্নলিখিতভাবে উপস্থাপিত করা যায়—

(১) সৌন্দর্যবোধের লক্ষ্য (Aesthetic aim)
(২) পূর্ণাঙ্গ জীবনযাপনের লক্ষ্য (Complete living aim)
(৩) সাংস্কৃতিক লক্ষ্য (Cultural aim)
(৪) অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার লক্ষ্য (Economic self sufficiency aim)
(৫) সর্বাঙ্গীণ বিকাশের লক্ষ্য (Harmonious and all round development aim)
(৬) ব্যক্তিতান্ত্রিক লক্ষ্য (Individual aim)
(৭) আন্তর্জাতিকতাবোধের লক্ষ্য (International understanding aim)
(৮) জ্ঞানার্জনের লক্ষ্য (knowledge acquisition aim)
(৯) অবসর যাপনের লক্ষ্য (Leisure aim)
(১০) নৈতিক লক্ষ্য (Moral aim)
(১১) দৈহিক বিকাশের লক্ষ্য (Physical Aim)
(১২) বৌদ্ধিক বিকাশের লক্ষ্য (Mental aim)
(১৩) সামাজিক বিকাশের লক্ষ্য (Social aim)
(১৪) প্রাক্ষোভিক বিকাশের লক্ষ্য (Emotional aim)
(১৫) আধ্যাত্মিক লক্ষ্য (Spiritual aim)
(১৬) রাজনৈতিক লক্ষ্য (Political aim)
(১৭) ধর্মীয় লক্ষ্য (Religious aim)
(১৮) আত্ম উপলব্ধির লক্ষ্য (Self-realization aim)
(১৯) ঔদার্যের লক্ষ্য (Liberal aim)

ebook.dascoaching.in

★ **উদ্দেশ্য :**

১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে **জ্যাকস্ ডেলর** (Jacques Delor)-এর সভাপতিত্বে যে আন্তর্জাতিক শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়, সেই কমিশন ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে একটি প্রতিবেদন পেশ করেন। প্রতিবেদনটি পেশ করা হয় **"Learning : The Treasure Within"** (শিখন অন্তর্নিহিত সম্পদ) এই শিরোনামে। এই প্রতিবেদনে কমিশন একবিংশ শতকের শিক্ষা সম্পর্কে তাদের সুচিন্তিত মতামত প্রকাশ করেন। কমিশন শিক্ষার ক্ষেত্রে চারটি দিকের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। শিক্ষার এই চারটি দিক **'Four Pillers of Education' বা শিক্ষার চারটি স্তম্ভ হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।** বিশ্বের বিভিন্ন বিশেষজ্ঞদের দীর্ঘ তি

বছরের আলোচনা ও বিশ্লেষণের ফলশ্রুতি হল এই প্রতিবেদন। প্রতিবেদনের মতে শিক্ষা ব্যবস্থাটি গড়ে উঠবে নিম্নলিখিত চারটি স্তম্ভকে ভিত্তি করে :

(১) জানার জন্য শিক্ষা (Learning to know)
(২) কর্মের জন্য শিক্ষা (Learning to do)
(৩) একত্রে বসবাসের জন্য শিক্ষা ((Learning to live together)
(৪) মানুষ হয়ে ওঠার জন্য শিক্ষা (Learning to be)

(১) **জানার জন্য শিক্ষা** (Learning to know) :

প্রথাগত শিক্ষা অনুযায়ী শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র জ্ঞান অর্জন নয়, শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হল জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন। শিশু তার চারপাশের বিশ্বকে জানতে শিখবে, মর্যাদার সঙ্গে জীবনযাপন করতে শিখবে, সমাজের অন্যান্য ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে শিখবে। এজন্য শিশু উপলব্ধি করতে সমর্থ হবে :

(i) মানব দেহের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মৌলিক গঠন ও কার্যাবলি।
(ii) সামাজিক, সাংস্কৃতিক, প্রাকৃতিক এবং মনুষ্যসৃষ্ট পরিবেশ এবং তাদের পারস্পরিক আন্তঃসম্পর্ক।
(iii) নিজস্ব ব্যক্তিগত মঙ্গলসাধন প্রসঙ্গে চারপাশের পরিবেশের সঙ্গে তার সম্পর্ক ও সচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা এবং পরিবেশকে পরিচ্ছন্নতা রাখা।
(iv) প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ, পরিবেশকে রক্ষা ও গৃহীত ব্যবস্থা এবং সম্পদের সঠিক ব্যবহারের প্রসঙ্গ।
(v) স্থান-কালের দূরত্ব এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে প্রদর্শন।

(২) **কর্মের জন্য শিখন** (Learning to do) :

'কর্মের জন্য শিক্ষা'-এর অর্থ, কোনো নির্দিষ্ট কাজ করার শুধুমাত্র দক্ষতা অর্জনই নয় বরং ব্যক্তির নিজস্ব ক্ষমতার বিকাশসাধন হল শিক্ষার উদ্দেশ্য। অর্থাৎ এই ধরনের শিক্ষার উদ্দেশ্য হল যে, শিক্ষাকে এমনভাবে কাজে লাগাতে হবে যাতে ব্যক্তির ভবিষ্যতের প্রয়োজনে বিভিন্ন ধরনের কাজের ক্ষেত্রে নিজেকে উপযুক্তভাবে তৈরি করতে সক্ষম হয়।

এই উদ্দেশ্য অর্জিত হলে ব্যক্তি—

(i) জীবনব্যাপী শিখনের (জীবনের গুণগত মান) জন্য নিজের যোগ্যতা এবং কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করতে পারবে, যেমন—পর্যবেক্ষণের দক্ষতা, প্রতিবেদন তৈরি, তথ্য সংগ্রহের ক্ষমতা, পার্থক্য নির্ণয়, শ্রেণিবিন্যাস, পরীক্ষণ, ভবিষ্যৎ চিন্তা (prediction) ও মূল্যবিচার (estimation) সিদ্ধান্তগ্রহণ ইত্যাদি করতে সক্ষম হবে।

Scanned with CamScanner

(ii) কোনো বিষয়ের ব্যাখ্যা করতে এবং বিভিন্ন উপায় রিপোর্ট পর্যবেক্ষণ যেমন— মৌখিক, লিখিত, চিত্র তৈরি (লেখচিত্র, চার্ট, টেবিল) করতে সক্ষম হবে।

(iii) সুস্থ অভ্যাসগঠন যেমন পরিচ্ছন্নতা, শৃঙ্খলা, নিয়মানবর্তিতা ইত্যাদি বজায় রাখতে সক্ষম হবে।

(iv) শ্রমের প্রতি মর্যাদা এবং জীবন সংগ্রামে মুখোমুখি হওয়ার জন্য সুস্থ মনোভাব গঠন করতে পারবে।

(v) মানচিত্র পঠন এবং মানচিত্রে বিভিন্ন স্থান চিহ্নিত করণের দক্ষতা অর্জন করতে পারবে।

(vi) গ্লোব ব্যবহারের দক্ষতা অর্জন করতে সক্ষম হবে।

(vii) শিক্ষকের পরিচালনায় কোনো কর্মসূচি পরীক্ষণ কার্যের পরিকল্পনা গ্রহণ এবং এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হবে।

(৩) **একত্রে বসবাসের জন্য শিক্ষা** (Learning to live together) :

১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে **ডেলর কমিশনে** উল্লিখিত তৃতীয় স্তম্ভটি হল একত্রে বসবাস করতে শেখা বা একসঙ্গে বাঁচার জন্য শেখা। আজকের বর্তমান প্রতিটি সমাজে হিংসা হানাহানি, অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা মানব সভ্যতার অগ্রগতির পথে প্রধান অন্তরায়। কমিশনের মতে বিদ্যালয় পাঠক্রমে অহিংসা, প্রেম, স্বার্থত্যাগ, মূল্যবোধ গঠনে জোর দেওয়া হলেও শুধুমাত্র তত্ত্বগত শিখন দ্বারা শিক্ষার্থীদের মধ্যে উপরোক্ত গুণগুলি জাগ্রত করা এবং সমস্ত দ্বন্দ্বের নিরসন ঘটিয়ে শান্তি স্থাপন সম্ভব নয়। এর জন্য দরকার শিক্ষাকে ব্যবহারিক জীবনে কাজে লাগানো। শিক্ষার্থীদের একত্রে বসবাস করতে শেখা—উদ্দেশ্যটি পূরণ করতে পারলে শিক্ষার্থীরা নিম্নলিখিত গুণগুলি অর্জন করতে সক্ষম হবে।

(i) সামাজিক দক্ষতা এবং মূল্যবোধ যেমন দলগত কাজে অংশগ্রহণ, পারস্পরিক সহযোগিতায় অংশগ্রহণ, দলগত সংহতিতে সহনশীলতা, যৌথ কল্যাণের জন্য একসঙ্গে কাজ করা ইত্যাদি।

(ii) বিভিন্ন সম্প্রদায়, বিভিন্ন আদর্শে বিশ্বাসী, বিভিন্ন ধর্মে বিশ্বাসী ব্যক্তিদের একসঙ্গে নিয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পরিবেশ গঠন করে বসবাস করতে শিখবে।

(iii) অতীত এবং বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে যে-কোনো সম্প্রদায়ের কল্যাণকর কাজের ভূমিকায় মানুষের অবদানকে স্বীকৃতি দিতে, মান্যতা দিতে এবং সর্বোপরি উদারতার সঙ্গে গ্রহণ করতে শিখবে।

(iv) প্রতিটি সম্প্রদায়ে কল্যাণমূলক কাজের ভূমিকায় গৃহীত নীতি সমূহকে শ্রদ্ধা জানাতে পারবে এবং নীতিবোধের দ্বারা সেগুলিকে অনুসরণ করতে পারবে।

(৪) **মানুষ হয়ে ওঠার জন্য শিক্ষা** (Learning to be) :

পরিবেশে নিজের অস্তিত্ব রক্ষা এবং অভিযোজনের মাধ্যমে জ্ঞান সঞ্চয়ের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন এবং সবার সাথে একত্রে মিলেমিশে জ্ঞানভাণ্ডারের মাধ্যমে ব্যক্তি জীবনে পরি প্রগতি। **ডেলর কমিশনের** চতুর্থ স্তম্ভটির এটিই হল মূল কথা।

প্রকৃতপক্ষে শুধুমাত্র জ্ঞানমূলক অভিজ্ঞতা এবং তার ভিত্তিতে দক্ষতা অর্জন শিক্ষার পক্ষে যথেষ্ট নয়। ব্যক্তি তার জীবনধারণের মাধ্যমে যে সমস্ত জ্ঞান অর্জন করে তাই সভ্যতার জীবনের পথে অগ্রসর হতে সাহায্য করে। সুতরাং শিক্ষার উদ্দেশ্য (Objectives) হওয়া উচিত পূর্ণাঙ্গ জীবন-যাপনের ইতিবাচক সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন। এ ব্যাপারে **হার্বার্ট স্পেনসারের** বক্তব্য উল্লেখ করা যায়। **স্পেনসার** বলেন— "Education is preparation for complete living"

অর্থাৎ তাঁর মতে ব্যক্তি তার সম্ভাবনাগুলির সুষম বিকাশের মধ্য দিয়ে জীবনে সুখের রসদ সঞ্চয় করে বা জীবনের সার্থকতার সন্ধান পায়। সুতরাং প্রকৃত শিক্ষার তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া যায় ব্যক্তির সামগ্রিক বিকাশের মধ্যে। স্পেনসারের মতে শিক্ষার উদ্দেশ্য হল ব্যক্তিকে পরিপূর্ণ জীবনযাপনের (complete living) উপযোগী করে গড়ে তোলা। এই উদ্দেশ্য অর্জিত হলে শিক্ষার্থী নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে সক্ষম হবে—

(i) বাড়িতে, বিদ্যালয়ে, প্রতিবেশীদের মধ্যে একাত্মভাবে অবস্থান করে তার নিজস্ব ভূমিকা বা দায়িত্ব পালনে সক্ষম হয়।

(ii) নিজেকে স্বাধীনভাবে সৃজনশীল কাজের মাধ্যমে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়।

(iii) সৃষ্টিশীল এবং উৎপাদনধর্মী কাজের দ্বারা আত্মশিখনের অভ্যাস গঠন করতে সক্ষম হয়।

(iv) প্রাকৃতিক এবং সামাজিক যে-কোনো পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্কিত সহজ প্রশ্নের অবতারনা এবং উত্তরদানে পারঙ্গম হয়।

(v) নিজের জীবন অভিজ্ঞতায় কিছু ইতিবাচক মূল্যবোধ গঠন করতে পারে যেমন— সত্যবাদিতা, সততা, ভ্রাতৃত্ববোধ, দেশপ্রেম, সেবাধর্মী গুণ ইত্যাদি।

(vi) পরিবেশের যা কিছু সুন্দর তাকে আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারে এবং সৌন্দর্যবোধের বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হয়।

(vii) নিজের দেশের সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যকে শ্রদ্ধা করতে শেখে এবং তার জন্য নিজেকে গর্বিত অনুভব করতে পারে।

(viii) পরিবেশের সকল বস্তু এবং তার চারপাশের ব্যক্তিবর্গকে শ্রদ্ধা জানাতে শেখে।

(ix) জীবনের চলার পথে সব রকম অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হলে তথ্য সংগ্রহ এবং সেগুলিকে স্বাধীনভাবে নিজের জীবনে কাজে প্রয়োগ করতে পারে।

Scanned with CamScanner

(x) বিজ্ঞান মনস্ক ও যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি গঠন করতে পারে।

(xi) সুষ্ঠুভাবে অবসরকাল যাপন করতে পারে সার্থকভাবে।

● **উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ কর্তৃক নির্ধারিত শিক্ষা বিজ্ঞানের উদ্দেশ্যাবলি** (Objectives of Educations envisaged by W.B.C.H.S.E) :

২০১৩ খ্রিস্টাব্দের নতুন শিক্ষাবর্ষে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাসংসদের দ্বারা উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের বিভিন্ন বিষয়ের পাঠ্য সূচিতে যে পরিবর্তন সূচিত হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষাবিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলিকে নিম্নে উল্লেখ করা হল। **উচ্চমাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের নিম্নলিখিত বিষয়গুলির সঙ্গে পরিচিতি ঘটানোর কথা বলা হয়েছে—**

(ক) সামগ্রিকভাবে 'শিক্ষাবিজ্ঞান' বিষয়টি সম্পর্কে পরিচিতি ঘটানো।

(খ) 'শিক্ষা' সম্পর্কে সংজ্ঞা ও ধারণা গঠন।

(গ) শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে পরিচিতি প্রদান।

(ঘ) 'শিক্ষা'র বিভিন্ন উপাদান, যেমন—শিক্ষার্থী, পাঠ্যক্রম, সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলি সম্পর্কে ধারণা প্রদান।

(ঙ) শিক্ষার বিভিন্ন উৎস বা শিক্ষার বিভিন্ন রূপ সম্পর্কে ধারণা গঠন এবং সক্রিয় ভাবে ভূমিকা গ্রহণ করে এমন মাধ্যম (agencies)গুলি সম্পর্কে পরিচিতি প্রদান।

(চ) মনোবৈজ্ঞানিক পরিপ্রেক্ষিতে 'শিক্ষাবিজ্ঞান' বা মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষাবিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক এবং মনোবিজ্ঞানের প্রভাবে আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানের উন্নতির বিষয়ে ধারণা প্রদান।

(ছ) মানবশিশুর বিভিন্ন দিকের বিকাশ সম্পর্কে পরিচিতি প্রদান।

(জ) আচরণ পরিবর্তনের বিভিন্ন প্রক্রিয়াসমূহ : শিখনের বিভিন্ন শর্ত ও কৌশল এবং জ্ঞান অর্জনের বিভিন্ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা প্রদান।

(ঝ) ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষাবিজ্ঞান : ভারতে বিভিন্ন সময়ে শিক্ষার বিবর্তন, সেই সমস্ত ক্ষেত্রে গৃহীত পরিবর্তন, প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান/আধুনিক কাল পর্যন্ত (স্বাধীন ভারত) আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় সংঘটিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাসমূহ। এইগুলির বিস্তৃত ধারণা প্রদান।

(ঞ) ভারতে আধুনিক শিক্ষার বিকাশে বিভিন্ন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদদের অবদানগুলি সম্পর্কে পরিচিতি প্রদান।

(ট) ভারতে বর্তমানকালে প্রচলিত শিক্ষার বিভিন্ন স্তর এবং প্রকার সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অবহিত করা।

(ঠ) ভারতে আধুনিককালে শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় যেমন— বিভিন্ন ক্ষমতা সম্পন্ন শিশুর শিক্ষা, বিদ্যালয় স্তরের শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন আচরণগত সমস্যা এবং

সেই সমস্ত সমস্যার প্রসঙ্গে শিক্ষকদের ভূমিকা, ভারতীয় সংবিধানে স্বীকৃত প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীনকরণ প্রভৃতি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অবহিত করে তোলা।

(ড) একবিংশ শতাব্দীতে শিক্ষার ব্যাপারে আন্তর্জাতিক শিক্ষা কমিশনের দ্বারা নিরূপিত শিক্ষার প্রবণতা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অবহিত করা।

(ঢ) রাশিবিজ্ঞানের মৌলিক পদ্ধতিগুলিকে যাতে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন শিক্ষাসংক্রান্ত তথ্য পরিবেশনে এবং বিশ্লেষণে কাজে লাগাতে পারে সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পরিচিতি ঘটানো।

(ণ) Project work অথবা ক্ষেত্র-সমীক্ষা (Field study) : শিক্ষার্থীদেরকে তাদের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত তাত্ত্বিক ধারণার অংশগুলিকে যাতে তাদের প্রকৃত বাস্তব জীবনের পরিস্থিতির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে তার সম্পর্কে ধারণা দেওয়া। জীবনকেন্দ্রিক এবং কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার অভিজ্ঞতা অর্জনেও এটি সাহায্যে করবে। সেই সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সৃজনী ক্ষমতা এবং বিভিন্ন দক্ষতার বিকাশ-সাধনে সহায়তাও করবে। project work শিক্ষার্থীদের আত্ম শিখনে যথেষ্ট প্রেষণা সঞ্চারও করবে।

❖ ১.১.৩.৭ শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যের স্তর বিন্যাসে ব্লুম-এর দৃষ্টিভঙ্গি (Bloom's approach to the Taxonomy of Educational Objectives) :

বৈচিত্র্যময় জীবজগতের আবাসস্থল এই পৃথিবী। বিচিত্র এই জীবজগৎ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয় জীববিদ্যায় (Biology)। এই পৃথিবীর জীব জগতের বৈচিত্র্যকে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পরিস্ফুট করা, তাদের সংগঠন ও আন্তঃসম্পর্কে সঠিকভাবে অনুধাবন করার উপায় হিসেবে শ্রেণিবিন্যাসকে কাজে লাগানো হয় এবং উদ্ভিদ ও প্রাণীগোষ্ঠীকে শ্রেণিবদ্ধ করা হয় পর্ব (phylum), শ্রেণি (class), বর্গ (order), গোত্র (family), গণ (genus), প্রজাতি (species) এবং প্রকারে (variety)। সুশৃঙ্খল ও বিজ্ঞানভিত্তিক জীব শ্রেণিবিভাগ সর্বপ্রথম স্থাপনা করেন সুইডেনের প্রখ্যাত বিজ্ঞানী **ক্যারোলাস লিনিয়াস** [Carolus Linnaeus, (১৭০৭-১৭৭৮)] তাঁর প্রসিদ্ধ **সিস্টেমা নেচারিতে** (Systema Naturae)। লিনিয়াসই প্রথম সুশৃঙ্খল পদ্ধতি অবলম্বনে সুস্পষ্ট **আরোহী-অবরোহী ধাপের** (Hierarchy) প্রচলন করেন। ঠিক একইভাবে শিক্ষামূলক ব্যবস্থায় লক্ষ্যগুলিকে সুনির্দিষ্টভাবে শ্রেণিবদ্ধ করার প্রয়োজন অনুভূত হয়। শিক্ষাব্যবস্থায় বিভিন্ন উদ্দেশ্যগুলির ব্যাপারে কোনো সাধারণ মত (common view) নেই।

শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যের বর্গীকরণকে কাজে লাগিয়ে শিক্ষকগণ তথ্যের আদান-প্রদান (exchange of information), পাঠ্যক্রম গঠন (curriculum development) এবং মূল্যায়ন ব্যবস্থার যন্ত্র বা উপায় (evaluation devieces) নির্ধারণ করতে সক্ষম হবেন।

dascoaching.in

Scanned with CamScanner

অধ্যাপক **বেঞ্জামিন, এস. ব্লুম** এবং সহযোগী গবেষকগণ ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যের যে বিভাজন করেছেন তা সারা পৃথিবী গ্রহণ করেছে। বেশ কিছু সমালোচনা সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত ব্লুমের বিভাজনকেই অধিকাংশ গ্রহণ করেছেন।

অধ্যাপক ব্লুম এবং সহযোগী গবেষকগণ শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যকে **বর্গীকরণ** (Taxonomy) করেছেন। এই ট্যাক্সোনমি শব্দটির বহুল প্রচলন দেখা যায় উদ্ভিদ ও প্রাণী বিজ্ঞানের আলোচনায়। **Taxonomy** শব্দটি দুটি গ্রিকশব্দ Taxis (যার অর্থ বিন্যাস) এবং Nomos (যার অর্থ আইন, নিয়ম বা সূত্র)-এর সংযোগে গড়ে উঠেছে। অর্থাৎ সূত্রাকারে বিন্যাস করাই হল Taxonomy। Taxonomy শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন **Candolle** (১৮১৩)। বিজ্ঞানী **Simpson** (১৯৬১) শ্রেণিবিন্যাস বিজ্ঞানকে শ্রেণিবিভাগের বুনিয়াদ, নিয়ম ও পদ্ধতির তাত্ত্বিক আলোচনা বলেছেন—"Taxonomy is the theoretical study of classification including its basis, principles and rules"। বিজ্ঞানী Mayr (১৯৬৯)-এর কথায়—"Taxonomy is the theroy and practice of classification"—

অনুরূপভাবে ট্যাক্সোনমি বা বর্গীকরণ সূত্রের সাহায্যে যখন শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলিকে ক্রমানুসারে এবং কাঠিন্য অনুসারে বিন্যস্ত করা হয় তখন তাকে বলা হয় শিক্ষার উদ্দেশ্যের **বর্গীকরণ সূত্র বা Taxonomy**। অধ্যাপক ব্লুম এবং তাঁর সহযোগী গবেষকগণ এই বিষয়টিকেই প্রথম শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ণয়ে ব্যবহার করেন। নির্দেশনামূলক উদ্দেশ্যের বর্গীকরণ সূত্র প্রসঙ্গে ব্লুম তাঁর নিজের ভাষাতে বলেছেন : "The taxonomy places the behavioural aspects of the objective within a hierarchical frame work : each category is assumed to include behaviour more complex, abstract or internalised than the previous category. These categories are arranged along a continuum from simple to complex ..." [Bloom, B.S., Hastings, J.T. Madaus, G.F. 1971]।

ব্লুম এবং সহযোগী গবেষকগণ শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলিকে কাঠিন্য এবং জটিলতার ভিত্তিতে সহজ থেকে কঠিন বা কঠিন থেকে সহজে সাজাবার চেষ্টা করেছেন। শিক্ষার নির্দেশনামূলক উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে বর্গীকরণের ব্যবহারের কতকগুলি লক্ষ্য আছে। এদের কয়েকটি হল নিম্নরূপ :

(i) শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলিকে নিখুঁতভাবে উপস্থাপিত করা।

(ii) সাধারণভাবে ব্যবহার করা শব্দের যেমন : জানা, যুক্তি দেওয়া, বুঝতে পারা, আগ্রহ দেখানো ইত্যাদি ব্যবহারের অস্পষ্টতা দূর করা।

(iii) উদ্দেশ্যের শ্রেণিবিভাগের শ্রেণি কাঠামো (hierarchy) বিন্যস্ত করে সাধারণভাবে প্রকাশ করা।

(iv) মানুষের বুদ্ধির ধারাবাহিকতাকে অনুধাবন করতে পারা এবং সংগঠিত করা।

(v) বিদ্যালয়ের শিক্ষাগত মান-মূল্যায়নের বাস্তব সম্মত উপায় নির্ধারণ করা।

শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যের বর্গীকরণ সূত্র শিক্ষাক্রমকে নানাভাবে সাহায্য করে যেমন—

(i) মূল্যায়ন ব্যবস্থায় ব্যবহৃত উপকরণ (অভীক্ষা)গুলি যথেষ্ট বিষয়নুখী হয়।

(ii) শিক্ষার্থীর বৃদ্ধি ও বিকাশের বিভিন্ন দিকের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা যায়।

(iii) মূল্যায়নের উপকরণগুলির (tools) যথার্থতা এবং নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি করা যায়।

(iv) শিক্ষার্থীর বিকাশের তিনটি ক্ষেত্রের (যেমন— বৌদ্ধিক, অনুভূতিমূলক ও মানসিক ক্রিয়ায় গতি সংক্রান্ত) মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে শিক্ষা প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করা যায়।

(v) শিখন এবং শিক্ষণ সংক্রান্ত পরিবেশের উপর নির্ভর করে উদ্দেশ্যগুলিকে যুক্তিসম্মতভাবে সাজানো যেতে পারে।

(vi) পাঠ্যক্রম পুনর্গঠন ও প্রস্তুতি এবং নির্দেশনার বিষয়বস্তুকে উপযুক্তভাবে বিন্যস্ত করে সমগ্র শিক্ষণ প্রক্রিয়াকে পরিকল্পিতভাবে সাজানো যেতে পারে।

(vii) বর্গীকরণের মাধ্যমে শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষণ প্রক্রিয়া, শিক্ষা সংক্রান্ত অন্যান্য ক্ষেত্র, শিক্ষামূলক গবেষণার নতুন নতুন ক্ষেত্র প্রস্তুত প্রভৃতিতে সাহায্য করা যায়।

❖ ১.১.৩.৮ নির্দেশনামূলক উদ্দেশ্যের কাঠামো বা স্তরবিন্যাস (Structure of Instructional Objectives) :

শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যের শ্রেণিবিনাসের ধারণা গঠিত হয় ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে বোস্টনে American Psychological Association-এর একটি কনভেনশানে। এর পরবর্তীকালে আমেরিকার শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক **বেঞ্জামিন এস. ব্লুম** এই ব্যাপারে পথ প্রদর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করেন। আমেরিকান কমিটি অফ কলেজ অ্যান্ড ইউনিভার্সিটি এগ্‌জামিনাররা অধ্যাপক ব্লুমের সম্পাদনায় Taxonomy of Educational Objectives (1956)-এর প্রথম খণ্ড প্রকাশ করেন। আচরণমূলক উদ্দেশ্যগুলি তিনটি ভাগের কথা তিনি উল্লেখ করেন। এই তিনটি ভাগ হল নিম্নরূপ :

(ক) জ্ঞানমূলক ক্ষেত্র (Cognitive Domain)

(খ) অনুভূতিমূলক ক্ষেত্র (Affective Domain)

(গ) মানসিক ক্রিয়ার গতি সংক্রান্ত ক্ষেত্র (Psychomotor Domain)

১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে ব্লুম এবং তাঁর সহযোগীরা জ্ঞানমূলক ক্ষেত্রের উদ্দেশ্যগুলিকে বর্গীকরণ সূত্রের মাধ্যমে নির্ধারণ এবং সেই সঙ্গে ব্যাখ্যা করেন। একই বছরে ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে **ক্রথল** এবং তাঁর সহযোগীরা অনুভূতিমূলক ক্ষেত্রের (Affective Domain) উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে সক্ষম হন। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে **হ্যারো** মানসিক ক্রিয়ার গতি সংক্রান্ত ক্ষেত্রের

Scanned with CamScanner

(Psychomotor Domain) উদ্দেশ্য নির্ণয় করেন। এই তিনটি ক্ষেত্রের উদ্দেশ্যই শ্রেণিক্রমে বিন্যস্ত করার চেষ্টা করা হয়।

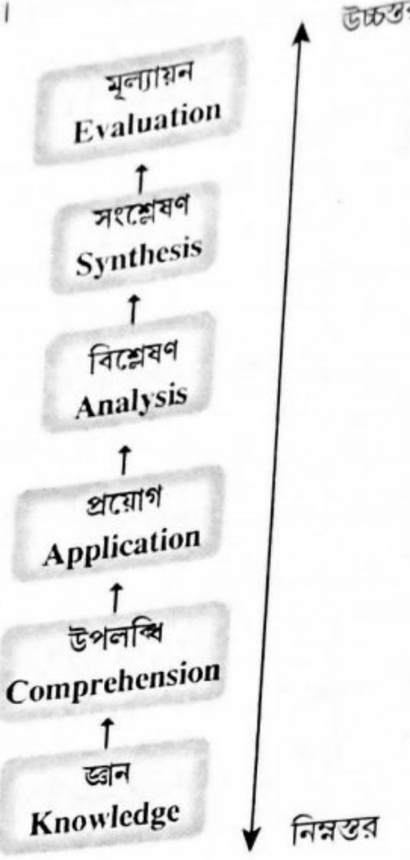

চিত্র- ৪ : বোধমূলক উদ্দেশ্যের স্তরবিন্যাস

◆ **জ্ঞানমূলক ক্ষেত্র (Cognitive Domain) :**

শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যের জ্ঞানমূলক ক্ষেত্রটি শিক্ষার্থীর মেধা সম্বন্ধীয় উদ্দেশ্য গুলিকে নির্ধারণ করে। অধ্যাপক ব্লুমের প্রস্তুত বর্গীকরণ সূত্রে উদ্দেশ্যগুলিকে কাঠিন্য অনুসারে ছয়টি অংশে বিভক্ত করে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রতিটি উদ্দেশ্য তার পরেরটির সাথে যুক্ত, তার কারণ হল একটি উদ্দেশ্য অর্জন করতে হলে তার পূর্বের উদ্দেশ্যটির মাধ্যমে অগ্রসর হতে হয়। প্রতিটি উদ্দেশ্যকে আবার বিস্তারিত ভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে। এই বিষয়টিকে বলা হয় **নির্দিষ্টকরণ** বা **specification**।

ব্লুম জ্ঞানমূলক এই ক্ষেত্রটির সংজ্ঞা দিয়েছেন এই ভাবে, "The Cognitive domain includes those objectives which deal with recall or recognition of knowledge and the development of intellectual abilities and skills" [Bloom. B.S. & others 1956]

জ্ঞানমূলক ক্ষেত্রকে ব্লুম প্রধানত দুটি অংশে ভাগ করেছেন : প্রথমটি জ্ঞানের অংশ; অংশে 'মনে করা', 'চিনতে পারা' ইত্যাদির মতো জ্ঞানের সহজ দিকগুলি অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয় অংশে মেধা সম্বন্ধীয় সক্ষমতা এবং নৈপুণ্যকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

জ্ঞানমূলক ক্ষেত্রের অন্তর্গত ছয়টি প্রধান শ্রেণি বা দিক হল :

(১) জ্ঞান (Knowledge) (২) উপলব্ধি (Comprehension)
(৩) প্রয়োগ (Application) (৪) বিশ্লেষণ (Analysis)
(৫) সংশ্লেষণ (Synthesis) (৬) মূল্যায়ন (Evaluation)

নিম্নে এদের সম্পর্কে আলোচনা করা হল—

(১) **জ্ঞান** (Knowledge) :

ব্লুম বর্ণিত শ্রেণিবিভাজনে সর্বনিম্ন ক্ষেত্র বা domain হল জ্ঞান। জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি হল—কোনো পদ, ধারণা, পদ্ধতি, নীতি বা সামান্যীকরণের মাধ্যমে উপনীত হওয়া তত্ত্ব এবং পুনরুদ্রেক করা। এর মনোবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হচ্ছে স্মরণ ক্রিয়া। অন্য পাঁচটি বিভাগের থেকে এটিকে সহজেই পৃথক করা যায়। অন্যগুলি সাধারণত সংগঠিত সাধারণ কৌশল এবং সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যবহার করা হয়। শিক্ষার উদ্দেশ্য হিসেবে যদি জ্ঞানকে অর্জন করতে হয় তবে শিক্ষার্থীকে নির্দিষ্ট বস্তু, পদ্ধতি এবং অন্য বস্তু থেকে একে পৃথকীকরণের জ্ঞান অর্জন করতে হবে। পড়া, সেমিনার বা আলোচনা চক্র, প্যানেল আলোচনা, মুখোমুখি আলোচনা, শিক্ষামূলক ভ্রমণ ইত্যাদির মাধ্যমে এই ধরনের উদ্দেশ্য অর্জন করা যায়। যে তিনটি অংশ জ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত সেগুলি সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল :

(ক) **নির্দিষ্ট জ্ঞান** (Knowledge of Specifics) : বিভিন্ন চিহ্ন বা প্রতীক, বিশেষ অর্থ বোধক শব্দ (term), ঘটনা, ধারণা, তত্ত্ব, স্থান ইত্যাদি চিনতে পারা এবং স্মরণ করতে পারা এই অংশটির সাথে যুক্ত। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে : 'নিউটনের প্রথম গতি সূত্রটি বল।'

(খ) **পদ্ধতি বিষয়ক জ্ঞান** (Knowledge of Methodology) : এই অংশটিতে জ্ঞানের সংগঠন, পঠন, বিচারকরণের সঠিক পন্থা পদ্ধতি যুক্ত। যেমন—'আলোকের প্রতিফলনের সূত্রের পরীক্ষা করা', 'রসায়নাগারে অক্সিজেন গ্যাস প্রস্তুত করা', 'সালোক-সংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন নির্গমনের পরীক্ষা করা ইত্যাদি।

(গ) **পৃথকীকরণের জ্ঞান** (Knowledge of Abstractions) : এই অংশটির অন্তর্ভুক্ত হল তত্ত্ব, সামান্যীকরণ অথবা নীতির গঠন সম্পর্কীয় জ্ঞান। যেমন—আর্কিমিডিসের নীতি তরলের উর্ধ্বচাপের ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত।

Scanned with CamScanner

(২) **উপলব্ধি** (Comprehension) :

ব্লুমের বর্গীকরণের নীতির পরবর্তী দ্বিতীয় উচ্চতর স্তর হল উপলব্ধি। জ্ঞানমূলক ক্ষেত্রের এই স্তরটিতে শিক্ষার্থীকে তথ্য, বস্তু, ইত্যাদি সম্বন্ধে পূর্ণ ধারণা অর্জন করানোর চেষ্টা করা হয়। উপলব্ধিমূলক উদ্দেশ্যগুলি শিক্ষার্থীরা অর্জন করতে সক্ষম হলে তারা অনুবাদ (translation) করতে পারবে, বিশেষ ব্যাখ্যা (interpretation) দিতে পারবে, ধারণা, সূত্র ইত্যাদির বর্ধিত অর্থ (extrapolation) করতে পারবে। বর্গীকরণের এই স্তরের উদ্দেশ্য অর্জন করানোর জন্য প্রয়োজন সংক্ষিপ্তকরণ, প্রশ্নকরণ, বিষয়ভিত্তিক প্রশ্নের উত্তর প্রদান, হাতে কলমে কাজ করা, দলবদ্ধ আলোচনাকরণ ইত্যাদি। উপযুক্ত শিক্ষণের মাধ্যমে এগুলিকে সংগঠিত করা হয়। উপলব্ধি স্তরের তিনটি বিভাগ সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল—

(ক) **অনুবাদকরণ** (Translation) : এই স্তরে শিক্ষার্থীরা প্রতীক নির্ভর ধারণাকে ভাষায় অথবা ভাষা নির্ভর ধারণাকে প্রতীক নির্ভর ধারণায় রূপান্তরিত করতে পারে। নিম্নে একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হল। "একক আয়তনের বস্তুর ভরকে ঐ বস্তুর ঘনত্ব বলে।" এই স্তরে উদ্দেশ্য শিক্ষার্থী তখনই রপ্ত কতে পারবে যখন ওই উদাহরণকে নিম্নলিখিত প্রতীক নির্ভর ধারণায় রূপান্তরিত করতে পারবে।

$D = \frac{M}{V}$ এখানে D (Density) = ঘনত্ব,

M (Mass) = বস্তুরভর, এবং

V (Volume) = বস্তুর আয়তন।

(খ) **ব্যাখ্যাকরণ** (Interpretation) : এই স্তরে শিক্ষার্থীরা একটি ধারণাকে তাদের নিজেদের মতো করে ব্যাখ্যা করতে পারবে। ব্যাখ্যাকরণ বলতে বোঝায় একটি ভাবনা বা ধারণাকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা দিতে পারা বা নতুন ভাবে বিন্যস্ত করা। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় 'সত্য' সম্পর্কে ধারণা, 'ন্যায়' সম্পর্কে ধারণা, মূল্যবোধ সম্পর্কে ধারণা ইত্যাদি।

(গ) **বহির্পাতন** (Extrapolation) : এই স্তরে শিক্ষার্থী একটি ধারণাকে প্রকৃত অর্থ বিকৃত না করে আরও বর্ধিত করতে সমর্থ হবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, মূল্যবোধ, মানবিকতা, সুনাগরিকতা ইত্যাদির অর্থকে শিক্ষার্থী এই স্তরে আরও বেশি পরিস্ফুট করতে পারবে।

(৩) **প্রয়োগ** (Application) :

ব্লুমের বর্গীকরণে জ্ঞানমূলক উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে তৃতীয় উচ্চস্তর হল প্রয়োগ। পূর্ববর্তী দুটি স্তরের উদ্দেশ্য অর্জন করতে সক্ষম হলে এই স্তরের উদ্দেশ্যগুলি আয়ত্ত করা সম্ভব হয়। তথ্য ও নীতির জ্ঞান এবং উপলব্ধি সংক্রান্ত ধারণা সমূহ শিক্ষার্থীরা এখানে নতুন পরিস্থিতিতে

প্রয়োগ করে আয়ত্ত করতে পারবে। সুতরাং শিক্ষার্থীরা এখানে জ্ঞান এবং উপলব্ধি সংক্রান্ত শেখা তথ্য নতুন ক্ষেত্রে সমস্যা সমাধানে ব্যবহার করতে পারবে। কারও কারও মতে এই অংশের উদ্দেশ্যের ব্যবহার খুবই কম। কিন্তু প্রকৃত ব্যবহারিক ক্ষেত্রে-এর গুরুত্ব অনেকখানি। প্রয়োগমূলক উদ্দেশ্যের একটি উদাহরণ নিম্নে দেওয়া হল:

'কেরোসিন জলের উপর ভেসে থাকে।' কেন?

এই শ্রেণির উদ্দেশ্য আয়ত্ত করতে হলে আলোচনা, ল্যাবরেটারির কাজ, রোল প্লে, সিমুলেশন ইত্যাদি পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করা দরকার। এই স্তরের নির্দিষ্টকরণের (specification) উপায়গুলি নিম্নে উল্লেখ করা হল :

নির্দিষ্টকরণের উপায়সমূহ (Specifications) :

১. অজানা পরিস্থিতির বিশ্লেষণ।
২. কঠিন সমস্যায় জ্ঞান এবং ধারণাশক্তির প্রয়োগ।
৩. নীতি, পদ্ধতি ইত্যাদির সামান্যীকরণ।
৪. নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে মানের বিষয়বস্তুকে পৃথকীকরণ।
৫. কঠিন সমস্যার ব্যাখ্যা দান।

(৪) **বিশ্লেষণ** (Analysis) :

জ্ঞানমূলক ক্ষেত্রের চতুর্থ স্তর এটি। পূর্ববর্তী তিনটি স্তরের তুলনায় এই স্তরের উদ্দেশ্যগুলি কাঠিন্য বেশি। পূর্ববর্তী তিনটি স্তর আয়ত্ত করতে পারলেই এই স্তরে উন্নীত হওয়া যায়। এই স্তরের উদ্দেশ্যগুলি আয়ত্ত করার জন্য অন্য তিনটি স্তরের ব্যবহার হয়।

এই চতুর্থ স্তরে শিক্ষার্থীদের নিকট প্রত্যাশা করা হয় যে, তারা কোনো ঘটনা বা সমস্যাকে ছোটো ছোটো অংশে ভাগ করে প্রত্যেকটি অংশের ব্যাখ্যা দিতে পারবে। এর ফলে প্রত্যেকটি অংশকেই বুঝতে পারা যাবে এবং প্রতিটি অংশের সম্পর্ক নির্ণয় করা যাবে।

অনেকে বিশ্লেষণ সংক্রান্ত উদ্দেশ্যগুলিকে সমালোচনামূলক চিন্তনের উদ্দেশ্যের সঙ্গে এক করে ফেলেন। প্রকৃত পক্ষে সমালোচনামূলক চিন্তনের কিছু উদ্দেশ্যের সঙ্গে বিশ্লেষণ সংক্রান্ত উদ্দেশ্যের মিল থাকলেও দুটি কিন্তু এক নয়। বিশ্লেষণ সংক্রান্ত উদ্দেশ্যের বিভাগগুলি: বস্তুর বিশ্লেষণ, সম্পর্ক নির্ধারণের বিশ্লেষণ এবং সাংগঠনিক নীতির বিশ্লেষণ। এই বিষয়গুলি সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল :

(ক) **বস্তুর বিশ্লেষণ** (Analysis of elements) : কোনো নির্দিষ্ট সমস্যার উৎসগুলিকে চিহ্নিত করা হল এই অংশের উদ্দেশ্যের অন্তর্গত। উদাহরণ দিয়ে বিষয়টিকে বোঝানো যেতে পারে। ধরা যাক গণিতে সুদ কষা সম্বন্ধীয় সমস্যার সমাধান শেখানো হবে। এক্ষেত্রে সুদ নির্ণয় করতে হলে শিক্ষার্থীকে মোট অর্থের পরিমাণ (অ), সরল সুদের হার (স), কত সময় ধরে টাকা খাটানো হবে (ব), এগুলি জানতে হবে। শিক্ষার্থী এই তিনটি সম্বন্ধে জানলে

Scanned with CamScanner

বা এই তিনটি অংশকে পৃথক করতে পারলে সে মোট সু (মো. সু) নিম্ন প্রদত্ত সূত্রের সাহায্যে প্রকাশ করতে পারবে :

মো. সু = অ x স x ব/১০০

(খ) **সম্পর্ক নির্ধারণের বিশ্লেষণ** (Analysis of Relationships) : এই স্তরে শিক্ষার্থী পূর্বের বিশ্লেষণ করা অংশগুলির মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণয় করতে পারবে। অংশগুলি সমস্যাটির সঙ্গে কীভাবে যুক্ত শিক্ষার্থীরা তা অনুধাবন করতে পারবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, সরল সুদ নির্ণয় করার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা জানবে যে সরল সুদ, সুদের হার, সময় এবং অর্থের সঙ্গে যুক্ত।

(গ) **সাংগঠনিক নীতির বিশ্লেষণ** (Analysis of Organisational Principles) : সাংগঠনিক নীতির বিশ্লেষণ বলতে বোঝায় সমস্যার সঙ্গে যুক্ত উদ্দেশ্যগুলিকে সংগঠিত করা, তাদের পদ্ধতি অনুসারে সাজানো এবং নীতি নির্ধারণ করা। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে যৌগ সুদ বা চক্রবৃদ্ধি সুদ নির্ধারণের ক্ষেত্রে আসল থেকে প্রাপ্ত সুদকে মূল বা ওই আসল টাকার সঙ্গে যোগ করে পরের বারে ওই মোট টাকার সুদ নির্ণয় করার ধারণা তৈরি করা। এখানে নিয়ম অনুসারে মূল টাকা এবং সুদ উভয়েরই সুদ পাওয়া যাবে।

সূত্রানুসারে—

যৌগসুদ (চক্রবৃদ্ধি সুদ) = [আসল (১+ সুদের হার/১০০) x সময় — আসল]

এই বিশ্লেষণ স্তরে সমস্যামূলক প্রশ্ন, কেস স্টাডি, দলবদ্ধ আলোচনার মাধ্যমে উদ্দেশ্য অর্জন করা যায়।

ebook.dascoaching.in

(৫) **সংশ্লেষণ** (Synthesis) :

সংশ্লেষণ বলতে বোঝায় সমস্ত অংশগুলি সংযুক্ত করে এক সম্পূর্ণ ধারণা তৈরি করার দক্ষতা অর্জন করা। এই প্রসঙ্গে **রবার্ট লিন** এবং **নরম্যান গ্রোনলান্ড** বলেছেন : "This way involve the production of a unique commumication (theme of speach), a plan of operation (research proposal) or a set of abstact relations (scheme for classifying information)." [Linn, R.L. & Gronlund, N.E. 2003]

জ্ঞানমূলক ক্ষেত্রের প্রথম চারটি স্তরের লক্ষ্যমাত্রা সম্পূর্ণ করতে পারলে পঞ্চম স্তরের (সংশ্লেষণ) সাফল্য নিশ্চিত হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার যে, এক্ষেত্রে সৃজনশীলতাও গুরুত্বপূর্ণ; এর কারণ হল, কোনো ধারণার অংশ বা উপাদানগুলি একত্রিত করা, সাজানো বা সংযুক্ত করতে সৃজনশীলতার প্রয়োজনও অনেকখানি।

সংশ্লেষণ চারটি স্তরে সম্পন্ন হয় :

(ক) অনন্য যোগাযোগ তৈরি,

(খ) পরিকল্পনা তৈরি বা কর্মসম্পাদনের প্রকল্প তৈরি,

(গ) বিমূর্ত সম্পর্কের উৎস নির্ধারণ,

(ঘ) নতুন প্রকল্প ও সূত্র গঠন।

স্তরগুলি সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল :

(ক) **অনন্য যোগাযোগ তৈরি** (Production of a unique communication) : এক্ষেত্রে শিক্ষক কিংবা শিক্ষার্থী কোনো ধারণা বা অভিজ্ঞতাকে অন্যের নিকট বলতে পারবে বা উপস্থাপিত করতে পারবে। উদাহরণ—ভারতীয় সংবিধানে বেঁচে থাকার অধিকারের অর্থ বলা।

(খ) **পরিকল্পনা তৈরি বা কর্ম সম্পাদনের প্রকল্প তৈরি** (Production of a plan. or process set of operations) : এই অংশটির দ্বারা শিক্ষার্থী কোনো কাজ বা প্রকল্প তৈরি বা পরিকল্পনা করার দক্ষতা অর্জন করতে পারবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, পরীক্ষাগারে অক্সিজেন বা হাইড্রোজেন উৎপাদন করতে পারা। এক্ষেত্রে যদি কোনো শিক্ষার্থী যন্ত্রপাতি সাজানো, রাসায়নিক দ্রব্যের যথাযথ ব্যবহার এবং সঠিক পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারে তবেই সেই শিক্ষার্থী এই উদ্দেশ্য অর্জন করতে পেরেছে ধরা যাবে।

(গ) **বিমূর্ত সম্পর্কের উৎস নির্ধারণ** (Development of a set of abstract relations) : এই অংশে শিক্ষার্থী কোনো বিমূর্ত সম্পর্ককে ছোটো ছোটো অংশে ভাগ করে বা তাদের সংক্ষেপে চিহ্ন দিয়ে সাজানো অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারবে। উদাহরণ হিসেবে একটি সমস্যার উল্লেখ করা যেতে পারে: পরমাণুর গঠন সংক্রান্ত ও ধারণার ক্ষেত্রে অ্যালুমিনিয়ামে পারমাণবিক গঠনে চিত্ররূপ সংশ্লেষিত করা যেতে পারে—

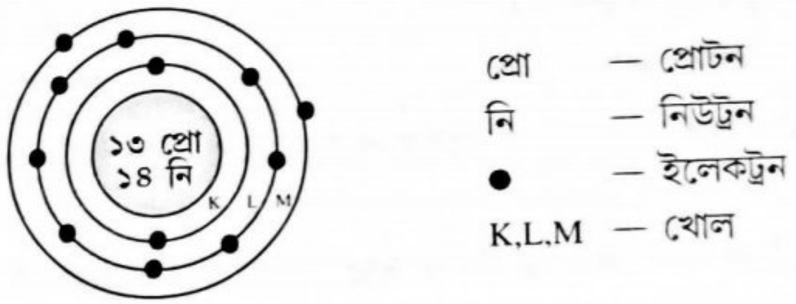

চিত্র- ৫ : অ্যালুমিনিয়ামের পারমানবিক গঠন

(ঘ) **নতুন প্রকল্প ও সূত্র গঠন বা নির্ণয় করা** (Production of new Hypothesis and law) : এক্ষেত্রে শিক্ষার্থী সংশ্লেষণের আরও উন্নত সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছাতে পারে। নতুন কোনো প্রকল্প অনুমান করা, সূত্র গঠন করা এবং এর উপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থী সমস্ত বিষয়বস্তুটি নতুনভাবে সাজাতে পারে।

(৬) **মূল্যায়ন** (Evaluation) :

জ্ঞানমূলক ক্ষেত্রের সর্বোচ্চ স্তর হল মূল্যায়ন। জটিল মানসিক পদ্ধতির বিচারকরণ, একটি নির্দিষ্ট মানের তুলনায় বিষয়টি কতটা উন্নত তা স্থির করা—এই স্তরটির কাজ। এই

Scanned with CamScanner

বিচারকরণ গুণগত বা পরিমাণগত হতে পারে। শিক্ষার্থী মূল্যায়নের উদ্দেশ্য অর্জন করার জন্য লিখিত বা মৌখিক সমালোচনা, পরীক্ষণ বা সংব্যাখ্যান, বিতর্ক ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারবে।

নির্দিষ্টকরণের (Specifications) উপায় সমূহ নিম্নরূপ—

(ক) অভ্যন্তরীণ মাপকাঠিতে বিচার করা।

(খ) বাহ্যিক মাপকাঠিতে বিচার করা।

(গ) উদ্দেশ্যাভিত্তিক মাপকাঠিতে বিচার করা।

(ঘ) বিষয়ভিত্তিক মাপকাঠিতে বিচার করা।

উপরোক্ত উপায়গুলিকে নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল :

(ক) **অভ্যন্তরীণ মাপকাঠিতে বিচার করা :** এক্ষেত্রে যুক্তিসম্মত নির্ভুলতা, ধারাবাহিকতা ইত্যাদি অভ্যন্তরীণ মাপকাঠির দ্বারা মূল্যায়ন হয়। যেমন : কোনো ঐতিহাসিক ঘটনার ব্যাখ্যার যুক্তির অভাব থাকলে অভ্যন্তরীণ মাপকাঠিতে মূল্যায়নে তা বোঝা যাবে এবং মানও নীচে নেমে যাবে।

(খ) **বাহ্যিক মাপ কাঠিতে বিচার করা :** এক্ষেত্রে মূল্যায়ন নির্ভর করে বাহ্যিক বিভিন্ন শর্তের উপর। যেমন—বৈজ্ঞানিক শর্ত, সামাজিক শর্ত বা অর্থনৈতিক শর্ত। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়: কোনো গ্যাসের আয়তন 50 C.C, এখানে কোনো শর্ত না উল্লেখ করে দিলে গ্যাসের ওই আয়তন ব্যাখ্যাই করা যাবে না। নির্দিষ্ট চাপ এবং তাপমাত্রার পরিপ্রেক্ষিতেই ঐ আয়তন বলা দরকার। এখানে চাপ এবং তাপমাত্রা হল বাহ্যিক মাপ কাঠি।

(গ) **উদ্দেশ্যভিত্তিক মাপকাঠিতে বিচার করা :** এক্ষেত্রে মাপকাঠি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ভিত্তিক।

(ঘ) **বিষয়ভিত্তিক মাপ কাঠিতে বিচার করা :** বিষয়ভিত্তিক মাপকাঠি বিভিন্ন রকম হতে পারে, যেমন—গণিতের মূল্যায়ন, সাহিত্যের মূল্যায়ন থেকে পৃথক।

◆ অনুভূতি মূলক ক্ষেত্র (Affective Domain) :

অনুভূতিমূলক ক্ষেত্রের উদ্দেশ্যগুলি প্রধানত দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ, আগ্রহ, কোনো বিষয় বা ঘটনার তাৎপর্য উপলব্ধি করা ইত্যাদি মানসিক অনুভূতিমূলক বিষয়গুলির সঙ্গে যুক্ত। **ব্লুম, ক্রথল** এবং সহযোগী গবেষকগণ অনুভূতিমূলক ক্ষেত্রের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন :

> **"The affective domain includes, those objectives which are concerned with changes in interest, attitudes and values and the development of appreciations and adjustment."**
>
> **[Krawthal, Bloom, Masia, 1964]**

জ্ঞানমূলক ক্ষেত্র এবং অনুভূতিমূলক ক্ষেত্র পরস্পর সম্পর্কিত। কাজেই অনুভূতিমূলক উদ্দেশ্যকে জ্ঞানমূলক ক্ষেত্রের থেকে একবারে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। অনুভূতিমূলক ক্ষেত্রের উদ্দেশ্যগুলিকে **ক্রথল** এবং সহযোগী গবেষকরা (১৯৬৪) ক্রম কাঠিন্য অনুসারে পাঁচ ভাগে ভাগ করেছেন। বিভাগগুলি হল নিম্নরূপ—

(১) গ্রহণ করা (Receiving),

(২) প্রতিক্রিয়া জাগানো (Responding),

(৩) গুরুত্ব নির্ধারণ (Valuing),

(৪) সুসংবদ্ধকরণ (Organisation) এবং

(৫) চরিত্রাঙ্কনকরণ/লক্ষণ নির্দেশকরণ (Characterisation)

উপরোক্ত বিভাগগুলি সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হল—

(১) **গ্রহণ করা** (Receiving) : এই বিভাগটি অনুভূতিমূলক ক্ষেত্রের সর্বনিম্ন স্তর। এটি খুবই প্রাথমিক স্তরের এবং এই স্তরের উদ্দেশ্যগুলিও খুব সাধারণ। এখানে শিক্ষার্থী কোনো উদ্দীপকে সাড়া দিতে পারে মাত্র। এখানে শিক্ষক শিক্ষার্থীর মনোযোগ আকর্ষণ করতে সাহায্য করেন। সচেতনতা, গ্রহণ করার ইচ্ছা এবং কৌতূহল—এই স্তরের প্রধান উদ্দেশ্যগুলির অন্যতম। নির্দিষ্টকরণের উপায়গুলি নিম্নরূপ—

(ক) সচেতনতা,

(খ) গ্রহণ করার ইচ্ছা,

(গ) নিয়ন্ত্রিত প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি।

(২) **প্রতিক্রিয়া জাগানো** (Responding) : এই স্তরের উদ্দেশ্যগুলিতে আরও বেশি প্রেষণা এবং নিয়মিত মনোযোগের উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এই স্তরে আগ্রহ সৃষ্টিতে গুরুত্ব দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে আগ্রহ হল কোনো বস্তু বা উদ্দীপকের জন্য প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হওয়া। এই আগ্রহের প্রভাব তিন স্তরে পরিলক্ষিত হয়।

(ক) প্রত্যাশা অনুসারে সম্মতি দেওয়া। যেমন—বাসে ধূমপান না করা।

(খ) স্বেচ্ছায় সাড়া দেওয়া। যেমন—ব্যক্তি নিজে নিয়ম মানে এবং অন্য ব্যক্তিকেও মানতে সাহায্য করে।

(গ) প্রাক্ষোভিক আনন্দের সঙ্গে সাড়া দেওয়া। যেমন—গরিব মানুষকে সাহায্য করে আনন্দ পাওয়া।

এখানে উদ্দেশ্য নির্দিষ্টকরণের (Specification) উপায়গুলি নিম্নরূপ :

(ক) উত্তর দিতে সম্মত হওয়া,

(খ) উত্তর দিতে আগ্রহ প্রকাশ করা,

(গ) দ্রুত উত্তর দেওয়া,

(ঘ) উত্তরদানে সন্তোষ প্রকাশ করা।

Scanned with CamScanner

(৩) **মূল্য বা গুরুত্ব নির্ধারণ** (Valuing) : অনুভূতিমূলক ক্ষেত্রের তৃতীয় স্তর এটি। পূর্ববর্তী দুটি স্তরের অপেক্ষা এই স্তরটি একটু জটিল। এই স্তরে কোনো আদর্শ বা মূল্যবোধের প্রতি লক্ষ্য স্থির থাকবে। এই স্তরের উদ্দেশ্যগুলি মনোভাব গঠিত হয়েছে কিনা তা পরিমাপ করে। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বৈজ্ঞানিক মনোভাব অর্জন করলে শিক্ষার্থী কোনো বস্তু বা ঘটনার যুক্তিসিদ্ধ এবং বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করবে। জনশ্রুতিকে যাচাই বা পরীক্ষা করে তবেই গ্রহণ করবে, কুসংস্কার বর্জন করতে আগ্রহী হবে ইত্যাদি। এই মনোভাবই ব্যক্তির আচরণের পরিবর্তন ঘটায় এবং নিয়ন্ত্রণ করতেও অভ্যস্ত করে তোলে।

এক্ষেত্রে উদ্দেশ্য নির্দিষ্টকরণের উপায়গুলি নিম্নরূপ :

(ক) কোনো মূল্যবোধ গ্রহণ করা,

(খ) কোনো মূল্যবোধকে অগ্রাধিকার দেওয়া,

(গ) প্রতিশ্রুতি দেওয়া।

(৪) **সুসংবদ্ধকরণ** (Organisation/Organising) : আলোচ্য ক্ষেত্রটির চতুর্থ স্তর হল সুসংবদ্ধকরণ। এই স্তরে শিক্ষার্থী/ব্যক্তির মূল্যবোধ বা মনোভাব আচরণের মধ্যে আরও সুসংবদ্ধ রূপ গ্রহণ করে। বিভিন্ন মূল্যবোধগুলির মধ্যেকার দ্বন্দ্ব বা সংঘাত এখানে দূর হয়, ধারণা সুদৃঢ় হয় এবং বিভিন্ন মূল্যবোধের মধ্যে একটি সহজ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। পূর্বে আলোকিত জ্ঞানমূলকক্ষেত্রের বিশ্লেষণ এবং সংশ্লেষণ এই স্তরের সঙ্গে যুক্ত। কোনো ব্যক্তির নিজস্ব আচরণ বিধি মূল্যবোধের সুসংবদ্ধকরণের উদাহরণ।

(৫) **লক্ষণ নির্দেশকরণ** (Characterisation Characterising) : অনুভূতিমূলক ক্ষেত্রের সর্বোচ্চ স্তর এটি। এই স্তরে উন্নীত হলে ব্যক্তির আচরণ কিছু নির্দিষ্ট মূল্যবোধ, ধারণা বা বিশ্বাসের দ্বারা পরিচালিত হয়। মূল্যবোধ এবং মনোভাব জাগ্রত হওয়ার ফলে ব্যক্তি নিজের আচরণকে জীবনদর্শনের সঙ্গে একাকার করে নিতে পারে।

উদ্দেশ্য নির্দিষ্টকরণের উপায়গুলি হল–

(ক) মূল্যবোধের সামান্যীকরণ, (খ) মূল্যবোধের শ্রেণি নির্ধারণ ইত্যাদি।

◆ মানস-সঞ্চালন মূলক ক্ষেত্র (Psychomotor Domain) :

এই ক্ষেত্রটির অস্তিত্ব সকলে স্বীকার করলেও তার উদ্দেশ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে সকলে একমত হতে পারেননি। এই ক্ষেত্রটির উদ্দেশ্যগুলি মূলত স্নায়ু ও পেশির মধ্যে সংযোগ রক্ষাকারী কাজের দক্ষতা অর্জন করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। যেহেতু কোনো কাজই ব্যক্তির মানসিক দিককে বাদ দিয়ে করা যায় না, তাই এই ক্ষেত্রটিকে সাইকোমোটর ডোমেইন নাম দেওয়া হয়েছে।

দেহের বিভিন্ন অংশের স্নায়ু এবং পেশির মধ্যে সংযোগ এবং ক্রিয়াকলাপ কীভাবে উদ্দেশ্যের মাধ্যমে ধাপে ধাপে উন্নত করা যায় এই ক্ষেত্রটি সেই বিষয়কে গুরুত্ব দেয়। এক্ষেত্রে দৈহিক সক্রিয় দক্ষতার উপর শিখন নির্ভর করে। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, টাইপ করা, পিয়ানো বাজানো ইত্যাদি। স্নায়ু এবং পেশির মধ্যে সমন্বয় যত বৃদ্ধি পায় চেষ্টায় দক্ষতা (motor skill) ততই বৃদ্ধি পায় এবং সাফল্যের চরম পর্যায়ে পৌঁছায়।

সিম্পসন (১৯৬৬), **কিবলার** (১৯৭০) এবং আরও অনেকেই এই ক্ষেত্রটির বর্গীকরণ সূত্র বা ট্যাক্সোনমি প্রস্তুত করেন। NCERT-এর **ড. দাভে** (১৯৬৮) এই ক্ষেত্রটির পাঁচটি স্তরকে সজ্জিত কারণে কাঠিন্য অনুসারে। স্তরগুলি হল নিম্নরূপ :

(ক) অনুসরণ (Imitation),

(খ) কৌশলী হস্তচালনা (Manipulation),

(গ) সূক্ষ্মতা (Precision),

(ঘ) সাবলীল প্রকাশভঙ্গি (Articulation),

(ঙ) স্বাভাবিকীকরণ (Naturalisation)

সিম্পসন, ই. জে. (১৯৭২) কাঠিন্য অনুসারে এই ক্ষেত্রের স্তরকে নিম্নলিখিত ভাবে সজ্জিত করেন :

(ক) সংবেদন (Perception)

(খ) স্থিরকরণ (Setting)

(গ) নিয়ন্ত্রিত প্রতিক্রিয়া (Guided Response)

(ঘ) কৌশল (Mechanism)

(ঙ) জটিল দৃষ্টিগোচর প্রক্রিয়া (Complex Overt Response)

(চ) অভিযোজন (Adaptation)

(ছ) উদ্ভাবন (Origination)

ওই একই সময়ে **হ্যারো, এ. জে.** (১৯৭২) তাঁর লেখা A Taxonomy of the Psychomotor Domain বইতে এই ক্ষেত্রটির নিম্নলিখিত ধাপের কথা উল্লেখ করেন :

(ক) প্রতিবর্তীক্রিয়া (Reflex movements),

(খ) সহজ মৌলিক গতিসংক্রান্ত ক্রিয়া (Basic fundamental movement),

(গ) প্রত্যক্ষণ (Perceptual),

(ঘ) দৈহিক সক্রিয়তা (Physical activities),

(ঘ) যুক্তিনির্ভর যোগাযোগ (Non-discursive Communication)

প্রত্যেক গবেষকই প্রত্যেকটি স্তরে কী কী সক্রিয় ক্রিয়াপদ ব্যবহার করা দরকার তার তালিকাও প্রস্তুত করেছেন। এখানে আমরা **সিম্পসনের** মডেলটি সম্পর্কে আলোচনা করব।

Scanned with CamScanner

(ক) **সংবেদন** (Perception) : **সিম্পসন** বর্ণিত Psychomotor Domain-এর বর্গীকরণের প্রথম ধাপ। কোনো একটি জটিল দক্ষতা অর্জন করাতে গেলে কাজ করার মানসিকতা বা প্রস্তুতি এই ধাপেই শুরু। এখানে কোনো কাজ দেখানো বা ব্যাখ্যা করা হলে তা বারবার অনুসরণ করে সম্পন্ন করার আগ্রহ তৈরি হবে। প্রচেষ্টা এবং ভুল পদ্ধতির সাহায্যে চেষ্টা করে যথাযথ প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন করাও এই ধাপটির অন্তর্গত। সংবেদনশীল উদ্দীপনা থেকে শুরু করে দৃষ্টান্ত নির্বাচন এবং ঐ দৃষ্টান্তকে কার্যে পরিণত করাও এই বিভাগটির অন্তর্গত।

(খ) **স্থিরকরণ** (Setting) : এই বর্গীকরণের দ্বিতীয় ধাপ হল এটি। এটি আরও জটিল কাজের সঙ্গে যুক্ত। এই ধাপটির মূল বক্তব্য হল কোনো কাজ করার জন্য প্রস্তুত হওয়া এবং এই প্রস্তুতির জন্য বিভিন্ন প্রকার পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করতে শেখা। এই বিভাগটির আবার তিনটি অংশ আছে—

(i) মানসিক স্থিরীকরণ,

(ii) দৈহিক স্থিরীকরণ,

(iii) প্রাক্ষোভিক স্থিরীকরণ।

এ ক্ষেত্রে পূর্বশর্ত হিসেবে কাজ করে সংবেদনের দৃষ্টান্ত।

(গ) **নিয়ন্ত্রিত প্রতিক্রিয়া** (Guided Response) : এটি হল এই বর্গের তৃতীয় ধাপ। কাঠিন্য অনুসারে এটি পূর্ববর্তী বিভাগটির তুলনায় আরও জটিল। এই স্তরে ক্রিয়াকলাপ অভিজ্ঞতাকে হাতে কলমে প্রয়োগ করার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। অন্য কোনো ব্যক্তির পরিচালনায় ব্যাহ্যিক আচরণের প্রকাশ এই ধাপে হয়ে থাকে। এই বিভাগটিতে অনুসরণ অথবা প্রচেষ্টা ভুলের পদ্ধতির মাধ্যমে শিখন সম্পন্ন হয়। এক্ষেত্রে উদ্দেশ্য পরিমাপ করা হয় নির্দেশক বা কোনো স্থিরীকৃত শর্তের মাধ্যমে।

(ঘ) **কৌশল** (Mechanism) : এই বর্গের চতুর্থ ধাপ হল এই কৌশল এবং অন্য তিনটি ধাপের তুলনায় এটি জটিল। এই ধাপের উদ্দেশ্যগুলি অর্জন করতে গেলে অন্য তিনটি উদ্দেশ্যের সাহায্য প্রয়োজন হয়। এই স্তরে শিক্ষার্থীদের আত্মনির্ভরতা এবং দক্ষতা গড়ে ওঠে ফলে উদ্দীপনার যথাযথ প্রতিক্রিয়া করতে পারে। বিভিন্ন ধরনের কাজের মাধ্যমে এই স্তরের শিক্ষণ হয়েছে কি না জানা যায়।

(ঙ) **জটিল দৃষ্টিগোচর প্রতিক্রিয়া** (Complex Overt Response) : এই স্তরটি জটিল দৈহিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যুক্ত। কোনো শিক্ষার্থী যখন কোনো কাজ কম শক্তি ব্যয়ে দ্রুত, সহজে এবং নির্ভুলভাবে করতে পারবে তখনই বোঝা যাবে এই স্তরের উদ্দেশ্যগুলি শিক্ষার্থী আয়ত্ত করতে পেরেছে।

(চ) **অভিযোজন** (Adaptation) : অভিযোজন হল এই বিভাগের পঞ্চম স্তর। এই স্তরটির উদ্দেশ্যসমূহ অর্জন করতে পারলে ব্যক্তির দক্ষতা এমন স্তরে উন্নীত হয় যে, সে তার কৌশলকে নিজের প্রয়োজনে এবং বাস্তব পরিবেশের মাধ্যমে বিশেষ দক্ষতা সমূহ প্রকাশ করতে পারে। এই স্তরে ব্যক্তি তার চেষ্টায় দক্ষতাকে (motor skill) আরও উন্নত করে নতুন পরিস্থিতিতে ব্যবহার করতে পারবে।

(ছ) **উদ্ভাবন** (Origination) : আলোচ্য ক্ষেত্রটির সর্বোচ্চ স্তর হল উদ্ভাবন। এই স্তরের উদ্দেশ্যগুলি আয়ত্ত করতে পারলে ব্যক্তি পুরনো দক্ষতাকে পরিবর্তিত করে নতুন দক্ষতা উদ্ভাবন করতে পারবে। এই স্তরের দক্ষতায় সৃজনশীলতাও থাকবে এবং শিক্ষার ফল হিসেবে তা পরিমাপ করাও যাবে।

◆ তিনটি ক্ষেত্রের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক (Interrelation among the three domains) :

নির্দেশনামূলক বা শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যের যে তিনটি ক্ষেত্র সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, সেগুলি কিন্তু কেউ কারও থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। কোনো একটি ক্ষেত্রে উচ্চস্তরের সাফল্য পেতে গেলে অন্য দুটি ক্ষেত্রের সাফল্য উচ্চস্তরের হতে হবে। ধরা যাক কোনো একটি বিষয়ে যথাযথ আগ্রহ সৃষ্টি করতে হবে। সেক্ষেত্রে ওই বিষয়ে উপলব্ধি (understanding) সৃষ্টির প্রয়োজন। আবার আগ্রহ সৃষ্টির জন্য জ্ঞানমূলক ক্ষেত্র এবং মানসিক ক্রিয়ার গতি সংক্রান্ত ক্ষেত্র উভয়েরই প্রয়োজন। উদাহরণ হিসেবে পিয়ানো বাজানোর প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যেতে পারে। পিয়ানো বাজাতে গেলে প্রথমত নিয়ম জানতে হবে। এই নিয়মের জ্ঞান হল জ্ঞানমূলক ক্ষেত্রের উদ্দেশ্যের অন্তর্গত। আবার আগ্রহ না থাকলে ভালো পিয়ানো বাজিয়ে হওয়া যাবে না। এই দিকটি **অনুভূতিমূলক ক্ষেত্র** বা Affective domain এর অন্তর্ভুক্ত। অন্যদিকে পিয়ানো বাজানোর জন্য চেষ্টায় দক্ষতা (motor skill) ও দরকার। এই অংশটি মানস-সঞ্চালন মূলক ক্ষেত্র বা psychomotor domain-এর মধ্যে পড়ে।

বিভিন্ন ক্ষেত্রের নিম্নস্তরের অংশগুলি যেমন—জানা (knowing), গ্রহণ করা (Receiving) এবং সংবেদন (Perception) পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত। একটি উদ্দেশ্য অর্জন করতে অন্যগুলির সাহায্য প্রয়োজন। এইভাবে উচ্চস্তরের একটি ক্ষেত্রের একটি ভাগের উদ্দেশ্য অর্জন করতে গেলে অন্য ক্ষেত্রের উচ্চস্তরের অংশগুলিতেই দক্ষতা অর্জন করতে হয়।

শিক্ষাক্ষেত্রে এই ধরনের সম্পর্কের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য প্রস্তুত করতে এই সম্পর্কের জ্ঞান না থাকলে উচ্চস্তরের সাফল্য অর্জন করানো যাবে না। যেমন—গণিতের 'সমস্যামূলক চিন্তন' যদিও জ্ঞানমূলক ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত তথাপি অনুভূতিমূলক ক্ষেত্রকে গুরুত্ব না দিলে শিক্ষার্থীর কাছে শিখন এবং শিক্ষকের দৃষ্টিভঙ্গিতে

Scanned with CamScanner

শিক্ষণ যান্ত্রিক পর্যায়ে পর্যবসিত হবে এবং এর ফলশ্রুতিতে শেষ পর্যন্ত শিক্ষার্থীর গণিতে ভীতি উৎপাদন করতে পারে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, একটি ক্ষেত্রের সাফল্য অন্য দুটিতে একই প্রভাব নাও ফেলতে পারে; কিন্তু অন্য দুটি ক্ষেত্রকে একেবারে বাদ দেওয়া যাবে না। আবার, বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পার্থক্য থাকবেই। তাই একই নির্দেশনায় বিভিন্ন শিক্ষার্থীর শিখনের হার বিভিন্ন ক্ষেত্রে (domain) একই না হয়ে বিভিন্ন হতেও পারে। তাই শিক্ষককে ব্যক্তিবিশেষের জন্য স্বতন্ত্র নির্দেশনার কথাও ভাবতে হবে।

❖ ১.১.৩.৯ ব্লুমের পরিমার্জিত ও রূপান্তরিত বর্গীকরণ (Bloom's revised and modificd Taxonomy) :

আমেরিকান কমিটি অব্ কলেজ অ্যান্ড ইউনিভার্সিটি পরীক্ষকরা **ব্লুমের** সম্পাদনায় Taxonomy of Educational Objectives (1956) এর প্রথম খণ্ডটি প্রকাশ করেন। এখানে অধ্যাপক ব্লুম এবং তার সহযোগীরা জ্ঞানমূলক ক্ষেত্রের উদ্দেশ্যগুলিকে বর্গীকরণ সূত্রের মাধ্যমে নির্ধারণ এবং ব্যাখ্যা করেন। এই বই-এর দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্লুমের এই বর্গীকরণ আলোচনা করতে গিয়ে দেখেছি জ্ঞানমূলক ক্ষেত্রের উদ্দেশ্যগুলিকে কাঠিন্য অনুসারে ছ-টি অংশে ভাগ করা হয়। ২০০১ খ্রিস্টাব্দে **ব্লুমের** এই বর্গীকরণে কিছু পরিবর্তন ও পরিমার্জন ঘটানো হয়। পরিমার্জিত হয় **Lorin. W. Anderson, David R. Krathwohl, Peter W. Airasian, Kathlean A. Cruikshank** এবং অন্যান্য সহযোগীদের দ্বারা। পরিমার্জিত অংশটির নাম দেওয়া হয় "A Taxonomy for Learning, Teaching and Assessing." **ব্লুমের** জ্ঞানমূলক বর্গীকরণের মূল অংশটিতে ছ-টি স্তর (category) যেমন—জ্ঞান, উপলব্ধি, প্রয়োগ, বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ এবং মূল্যায়নের অবস্থান লক্ষ করা যায়। এগুলি শুরু হয়েছে চিন্তনের সর্বনিম্নস্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত। কিন্তু পরবর্তী কালে পরিমার্জিত বর্গীকরণে এই ছ-টি স্তরের নাম করণের ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটেছে। এছাড়া অবস্থানের ক্ষেত্রে সামান্য পরিবর্তন দেখা যায়। **ব্লুমের** পূর্ববর্তী বর্গীকরণে পঞ্চম স্তরে স্থান ছিল সংশ্লেষণ (synthesis) এবং ষষ্ঠ স্তরে ছিল মূল্যায়ন। কিন্তু পরিমার্জিত বর্গীকরণে পঞ্চম স্থানে রাখা হয়েছে মূল্যায়ন করা (Evaluating)-কে এবং ষষ্ঠ অবস্থানে রাখা হয়েছে সৃষ্টি করার (creating) কে। **অধ্যাপক ব্লুমের মূল বর্গীকরণ এবং পরবর্তীকালে পরিমার্জিত বর্গীকরণকে নিম্নে উপস্থাপিত করা হল—**

Follow Our B.Ed Related Website>>

www.dascoaching.in

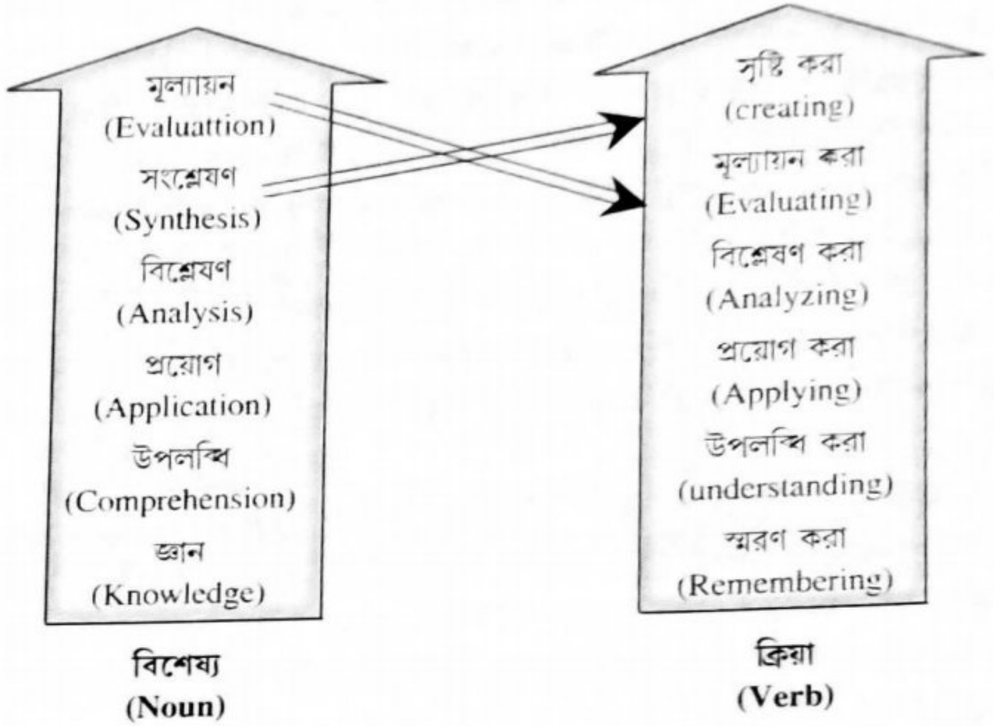

ব্লুমের জ্ঞানমূলক ক্ষেত্রের মূল বর্গীকরণ এবং পরিমার্জিত বর্গীকরণে স্তর সমূহের পুরাতন (মূল) নাম ও পরিমার্জিত সমূহ :

ব্লুমের এই পরিমার্জিত বর্গীকরণে নিম্নলিখিত পরিবর্তনের দিকগুলি লক্ষ করা যায় :

১. পদ উল্লেখ পরিবর্তন (Change in Term)
২. গঠনগত বিন্যাস-এ পরিবর্তন (Change in structure)
৩. গুরুত্বপ্রদানে পরিবর্তন (Change in Emphasis)

১. পদ উল্লেখ পরিবর্তন (Change in Term) :

(ক) বিশেষ্য পদ থেকে ক্রিয়াপদে পরিবর্তন— ব্লুমের প্রস্তুত বর্গীকরণ সূত্রে উদ্দেশ্যগুলি কাঠিন্য অনুসারে যে ছ-টি অংশে শ্রেণিবিন্যস্ত করা হয়েছে তার নামকরণ করা হয়েছে বিশেষ্য পদ দিয়ে। কিন্তু পরিমার্জিত ক্ষেত্রে বিশেষ্য পদকে ক্রিয়া পদে পরিবর্তন করা হয়েছে। চিন্তন এক ধরনের প্রক্রিয়া যা বিশেষ্য পদ দিয়ে বর্ণনা করা যায় না, কিন্তু ক্রিয়াপদ ব্যবহারের দ্বারা সেই প্রক্রিয়াকে সহজেই বর্ণনা করা যায়।

(খ) জ্ঞান হল চিন্তনের ফলশ্রুতি, সুতরাং চিন্তনকে সঠিকভাবে বর্ণনা করতে স্মরণ করা (remembering) ক্রিয়াপদটি যথোপযুক্ত। বোধগম্যতা (comprehension) এই বিশেষ্যপদ (noun)-এর পরিবর্তে এখন স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে উপলব্ধি করা (understanding) ক্রিয়াপদটিতে, সংশ্লেষণ (synthesis) স্বীকৃতি পেয়েছে 'সৃষ্টি করা' (creating) ক্রিয়া পদটিতে। এতে চিন্তনের প্রকৃতি আরও ভালোভাবে প্রতিফলিত হয়।

Scanned with CamScanner

২. **গঠনগত বিন্যাসে পরিবর্তন** (Change in structure) :

(ক) চিন্তনের ফলশ্রুতি হল বর্গীকরণের অংশ।

(খ) জ্ঞানের বিভিন্ন রূপ আছে, সেগুলি হল—(i) তথ্য সংক্রান্ত জ্ঞান (factual knowledge), (ii) ধারণা সংক্রান্ত জ্ঞান (conceptual knowledge), (iii) কার্য প্রণালী সংক্রান্ত জ্ঞান (procedural knowledge) ও অধিজ্ঞান সম্বন্ধীয় জ্ঞান (metacognitive knowledge)।

(গ) অন্য একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হল—সংশ্লেষণ (সৃষ্টি করা) এবং মূল্যায়ন (মূল্যায়ন করা)-এই দুটি অংশের মধ্যে পারস্পরিক অবস্থান পরিবর্তন ঘটেছে। বিচারমূলক চিন্তন (মূল্যায়ন করা)-এর থেকে সৃজনমূলক চিন্তন অনেক বেশি জটিল প্রকৃতি এবং উন্নত প্রকৃতির।

৩. **তাৎপর্য বা গুরুত্বে পরিবর্তন** (Change in Emphasis) :

(ক) পাঠক্রম পরিকল্পনা, নির্দেশনা দান এবং পরিমাপের জন্য অনেক বেশি প্রামাণিক উপকরণ এবং ব্যবহারে জোর দেওয়া হয়েছে।

(খ) বর্গীকরণ সূত্র ধরে নির্দেশনামূলক উদ্দেশ্যের লক্ষ্য হল বিরাট সংখ্যক ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করা।

(গ) সমস্ত স্তরের শিক্ষায় সহজে প্রয়োগ করার উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

(ঘ) ছোটো ছোটো ধারণা (subconcept) গুলির উপর ব্যাখ্যা এবং বর্ণনায় পূণরুল্লেখ-এ জোর দেওয়া হয়েছে।

● **পরিবর্তনের পক্ষে যুক্তি** (Rational behind the changes) :

অধ্যাপক ব্লুমের মূল বর্গীকরণে যে পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে তার পশ্চাতে কিছু যুক্তি আছে অবশ্যই। মূল বর্গীকরণে দেখা যায় যে, ছ-টি স্তরের নাম ছিল বিশেষ্যের আকারে (form of noun) কিন্তু পরিমার্জিত বর্গীকরণে স্তরগুলির নাম বিশেষ্যের পরিবর্তে 'ক্রিয়ার' আকারে (form of verb) উপস্থাপিত হয়েছে। এর পশ্চাতে যুক্তি হল যে, বর্গীকরণের ছ-টি স্তর বিভিন্ন স্তরের চিন্তনকে প্রতিফলিত করে যা প্রকৃতপক্ষে একটি প্রক্রিয়া বিশেষ, সুতরাং নাম প্রদানের ক্ষেত্রে বিশেষ্য-এর পরিবর্তে 'ক্রিয়া' অনেক বেশি সঠিক ও যুক্তিযুক্ত। কিছু স্তরের মূল নামেও পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে, যেমন জ্ঞান হল চিন্তনের একটি ফলশ্রুতি এবং এটিকে জ্ঞান নামে উল্লেখ করা সঠিক নয়। এটি প্রতিস্থাপিত হয়েছে 'স্মরণ করা' (remembering) এই ক্রিয়া বাচক শব্দটি দিয়ে। জ্ঞান হল নিম্ন এবং উচ্চস্তরের চিন্তন এবং স্তর অনুসারে একে ব্যাখ্যা করা যায় না। সেক্ষেত্রে এটিকে 'স্মরণ করা' (remembering) এই শব্দটি দিয়ে সঠিকভাবে চিন্তন স্তরকে চিহ্নিত করা যায় সহজে। কোনো কিছুর উপলব্ধি ছাড়াই আমরা সহজে মনে করতে পারি বা স্মরণ করতে পারি। এইভাবে বোধ (comprehension) উপলব্ধি করা

(understanding) তে এবং সংশ্লেষ (synthesis) প্রতিস্থাপিত হয়েছে সৃষ্টি করা (creating)তে। এগুলি পরিমার্জিত হয়েছে চিন্তনের প্রকৃতি অনুসারে।

● **ব্লুমের বর্গীকরণের গুরুত্ব** (Importance of Bloom's Taxonomy) : শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়তা করার জন্য শিক্ষার সামগ্রিক রূপকে শিক্ষার্থীর নিকট অর্থবহ করে তোলা একটি অত্যন্ত জরুরি বিষয়। এই জরুরি বিষয়টি সম্পন্ন করার জন্য শিক্ষার্থীর নিকট শিক্ষার উদ্দেশ্যকে তুলে ধরতে দক্ষতা ভিত্তিক উদ্দেশ্যের অন্তর্গত জ্ঞানমূলক ক্ষেত্র, অনুভূতিমূলক ক্ষেত্র এবং মানসিক ক্রিয়ার গতি সংক্রান্ত ক্ষেত্র তিনটিকে কেন্দ্রীভূত করে শিক্ষার্থীর বিকাশকে ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে ব্লুমের এই বর্গীকরণ শিক্ষক-শিক্ষাদাতাদের উৎসাহিত করার দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিষয়টি শিক্ষার্থীর নিকট যেমন উপযোগী তেমনি সমাজের দিক থেকে যথেষ্ট কার্যকরী। এই সংগঠিত বর্গীকরণ শ্রেণিকক্ষের পাঠদানের ক্ষেত্রে যেমন অগ্রসর হতে সাহায্য করে তেমনি শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ণের দিকটি যথোপযুক্ত করে তুলতে সহায়তা করে। ব্লুমের বর্গীকরণের উপলব্ধিমূলক স্তর শিক্ষকের দক্ষতা বৃদ্ধিতে তুলনাহীন, যার দ্বারা শিক্ষক তাঁর কার্যকরী শিখন অভিজ্ঞতাকে সার্থকভাবে সংগঠিত করতে সক্ষম হন এবং সেইসঙ্গে বিভিন্নরকম সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলি রূপায়ণে সহায়ক ভূমিকা পালন করেন। এর সার্থক ফলশ্রুতি হল শিশুর ব্যক্তিত্বের সার্থক বিকাশ সাধন।

❖ ১.১.৩.১০ নির্দেশনামূলক উদ্দেশ্যের ধারণা (Concept of Instructional Objectives):

শ্রেণিকক্ষে নির্দেশনা বা পাঠদানের ক্ষেত্রে নতুন একটি বিষয়বস্তু শুরু করার আগে তিন ধরনের উদ্দেশ্যের কথা মাথায় রাখতে হয়, এগুলি হল :

(i) সাধারণ উদ্দেশ্য (general objective)

(ii) নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য (specific objective)

(iii) নির্দেশনামূলক উদ্দেশ্য (instructional objective)

প্রথম প্রকার উদ্দেশ্য : কোনো বিশেষ বিষয় যেমন শিক্ষাবিজ্ঞান শিক্ষণের ক্ষেত্রে শিক্ষক সবসময় মনে রাখেন এবং বিচার করে দেখেন যে, বিষয়বস্তুটি শিক্ষাদানের সময় সঠিক পথে অগ্রসর হচ্ছে কি না। এই ধরনের উদ্দেশ্য হল সাধারণ উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয় প্রকার উদ্দেশ্য : দ্বিতীয়ত, শিক্ষককে সব সময় মাথায় রাখতে হয় শ্রেণিকক্ষের পাঠদানে সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলিকে, যেগুলি পাঠের সঙ্গে প্রাথমিকভাবে সম্পর্কিত। এই ধরনের উদ্দেশ্যগুলিকে বলা হয় নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য।

তৃতীয় প্রকার উদ্দেশ্য : এক্ষেত্রে শিক্ষককে মাথায় রাখতে হয় বিশেষ পাঠদানটির শেষে শিক্ষার্থীদের আচরণগত দিকগুলিতে। পাঠ এককটি সম্পূর্ণ হওয়ার পর শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে এই ধরনের আচরণ পাওয়া যায়। এই ধরনের আচরণগত উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে

Scanned with CamScanner

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের অর্জিত সাফল্যের পরিমাপ করতে পারবেন এগুলি প্রতিফলিত হয় শিক্ষার্থীদের আচরণের মাধ্যমে।

এই তৃতীয় প্রকার উদ্দেশ্যগুলিকে বলা হয় নির্দেশনামূলক উদ্দেশ্য বা আচরণের প্রেক্ষিতে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য (instructional objectives or specific objectives in behavioural terms.)

❖ ১.১.৩.১১ নির্দেশনামূলক উদ্দেশ্য লেখার পদ্ধতি (Way of Writing Instructional Objectives) :

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ার সমাপ্তির পর কার্যকরী ক্রিয়াপদ (action verb) ব্যবহার করে শিক্ষক নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলিকে আচরণের প্রেক্ষিতে লেখার চেষ্টা করেন। এতে শিক্ষক শিক্ষার্থীর আচরণগুলিকে পর্যবেক্ষণ এবং পরিমাপ করতে সমর্থ হন। এই ধরনের মূল্যায়নের সময় শুধুমাত্র শিক্ষার্থীদের অর্জিত সাফল্যই মূল্যায়িত হয় না, সেই সঙ্গে শিক্ষণ পদ্ধতি, শিক্ষকের সক্ষমতা বা পারদর্শিতা, শিক্ষার্থীদের বয়স এবং বৌদ্ধিক ক্ষমতার স্তর অনুসারে পাঠক্রমের বিষয়বস্তুটি সঙ্গতিপূর্ণ কি না সেগুলিও মূল্যায়িত হয়। সুতরাং নির্দেশনামূলক উদ্দেশ্য লেখার বিষয়টি যে গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

শিক্ষণ বা নির্দেশনাদানের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল বিষয়বস্তুর বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ। বিষয়বস্তুর এই বিশ্লেষণ করা এবং এই বিষয়বস্তুর উপর নির্ভর করে নির্দেশনামূলক উদ্দেশ্য নির্ণয় করা একটি অত্যন্ত জরুরি কাজ। এখন প্রশ্ন হল উদ্দেশ্য কীভাবে লেখা হয়? উদ্দেশ্য লেখার বিষয়টি জেনে নেওয়া খুবই দরকারী। এই কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে না পারলে উদ্দেশ্যে পৌঁছানো সম্ভব নয়।

নির্দেশনামূলক উদ্দেশ্য লেখার জন্য যেটি গুরুত্বপূর্ণ সেটি হল প্রত্যেকটি উদ্দেশ্যের পরিষ্কার সংজ্ঞা প্রদান করা আগে দরকার। উদ্দেশ্যের সংজ্ঞা পরিষ্কার না হলে সঠিক লক্ষ্যে পৌঁছানো অর্থাৎ নির্ধারিত আচরণের পরিবর্তন আনা যথেষ্ট কঠিন কাজ। উদ্দেশ্যের সংজ্ঞা যদি স্পষ্ট না হয় তাহলে অন্য কোনো পথেও আচরণের কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনা সম্ভব হয় না। উদ্দেশ্য কীভাবে লেখা হবে সেই বিষয়ে **রবার্ট মাগের** (১৯৬২), **রবার্ট মিলার** (১৯৬২), প্রমুখ পণ্ডিত ব্যক্তি এবং গবেষকগণ বিভিন্নভাবে গবেষণাকার্য সম্পন্ন করেছেন।

রবার্ট মাগেরের (Robert Mager) গবেষণা ছিল প্রধানত জ্ঞানমূলক ক্ষেত্র (Cognitive Domain) এবং অনুভূতিমূলক ক্ষেত্রের (Affective Domain) উপর। অন্যদিকে রবার্ট মিলারের গবেষণা ক্ষেত্র ছিল মানসিক ক্রিয়ার গতি সংক্রান্ত ক্ষেত্রের (Psychomotor Domain) উপর। আমরা এখানে এই বিষয়টির উপর সংক্ষেপে আলোকপাত করার চেষ্টা করছি, যাতে সঠিক পদ্ধতির মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের আচরণে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব হয়। শিক্ষকের গুরুত্বপূর্ণ কাজ এটি।

❖ ১.১.৩.১২ নির্দেশনামূলক উদ্দেশ্য লেখার ক্ষেত্রে মাগেরের দৃষ্টিভঙ্গি :

রবার্ট মাগের যেহেতু ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞানী তাই স্বাভাবিক কারণেই তিনি নির্দেশনামূলক উদ্দেশ্য লেখার ক্ষেত্রে ব্যবহারের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন বেশি। এই জন্য মাগেরের পদ্ধতি ব্যবহারও সহজ। **রবার্ট মাগের নির্দেশনামূলক উদ্দেশ্য লেখার জন্য তিনটি বিষয়ের উপর খুবই গুরুত্ব দিয়েছেন। সেগুলি হল—**

(১) নির্দেশনার সমাপ্তিতে শিক্ষার্থীর অন্তিম আচরণের কী পরিবর্তন চাওয়া হচ্ছে তা নির্ধারণ করা বা স্থির করা।

(২) শিক্ষার্থীর আচরণের পরিবর্তন কোন্ কোন্ শর্তাবলির মাধ্যমে ঘটবে তার সঠিক বর্ণনা বা ব্যাখ্যা প্রদান করা। এবং

(৩) শিক্ষার্থী কতখানি আচরণ পরিবর্তন করতে পারলে তা গ্রহণযোগ্য হবে তা বর্ণনা দেওয়া।

রবার্ট মাগের এই উদ্দেশ্য লেখার জন্য ব্লুমের বর্গীকরণ সূত্রকে অনুসরণ করেছেন। তিনি বিভিন্ন কাজের সঠিক এবং সুনির্দিষ্ট অর্থ বোঝানোর জন্য কার্যকরী ক্রিয়াপদ (Action verb) ব্যবহার করেছেন। জ্ঞানমূলক এবং অনুভূতিমূলক বিভিন্ন উদ্দেশ্যের জন্য মাগের বিভিন্ন ক্রিয়াপদের যে তালিকা প্রস্তুত করেছেন তা পরবর্তী পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে।

রবার্ট মিলার (১৯৬২) ও মানসিক ক্রিয়ার গতি সংক্রান্ত ক্ষেত্র বা Psychomotor Domain-এর উদ্দেশ্য লেখার জন্য কার্যকরী ক্রিয়ার নির্বাচন করেছেন, যদিও এটি বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োগ যথেষ্ট কার্যকরী নয়।

❖ ১.১.৩.১৩ শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রগুলির জন্য শিখন উদ্দেশ্য এবং কার্যকরী ক্রিয়াপদ সমূহ :

ক্ষেত্র	শিখন উদ্দেশ্যাবলি	কার্যকরী ক্রিয়াপদসমূহ
জ্ঞানমূলক (Cognitive)	স্মরণ করা	মনে করা, চিনতে পারা, বর্ণনা দেওয়া, নামকরণ করা, অবস্থান নির্দেশ করা, তালিকাভুক্ত করা, সংজ্ঞা দেওয়া।
	উপলব্ধি করা	ব্যাখ্যা করা, শ্রেণিবিভাগ করা, দৃষ্টান্ত সহ বুঝিয়ে দেওয়া, সারসংক্ষেপ করা, মনে করা।
	প্রয়োগ করা	ব্যবহার করা, বাস্তবে রূপ দেওয়া, কার্যে পরিণত করা, বলবৎ করা, প্রদর্শন করা, অনুমান করা, সংগ্রহ করা।
	বিশ্লেষণ করা	ভাঙা বা বিশ্লেষণ করা, তুলনা করা, বিচ্ছিন্ন করা, সিদ্ধান্ত করা

Scanned with CamScanner

ক্ষেত্র	শিখন উদ্দেশ্যাবলি	কার্যকরী ক্রিয়াপদসমূহ
	মূল্যায়ন করা	বিচার করা, মূল্যায়ন করা, সমালোচনা করা, চিহ্নিত করা, সিদ্ধান্তে আসা।
	সৃষ্টি করা	গঠন করা, নক্‌শা তৈরি করা, পরিকল্পনা করা, যুক্তি দেওয়া, সংগঠিত করা, উৎপাদন করা।
অনুভূতিমূলক (Affective)	গ্রহণ করা	মনোযোগ দেওয়া, শোনা, প্রশ্ন করা, অনুসরণ করা, গ্রহণ করা।
	প্রতিক্রিয়া জানানো	উত্তর দেওয়া, সহযোগিতা করা, আলোচনা করা, প্রতিবেদন লেখা, তালিকা প্রস্তুত করা, লেখা, পারদর্শিতা দেখানো, অনুশীলন করা।
	গুরুত্ব নির্ধারণ করা	মর্যাদা দেওয়া, শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা, তাৎপর্য উপলব্ধি করা, বিশ্বাস করা, কোনো কাজে সাহায্য করা।
	সুসংবদ্ধকরণ	সংগঠিত করা, সম্পর্ক নির্ণয় করা, বিন্যস্ত করা, সংহত করা, তৈরি করা, বিচার করা।
	লক্ষণ নির্দেশনাকরণ	প্রদর্শন করা, প্রভাবিত করা, পরিবর্তন করা, কার্য সম্পাদনে করা।
মানস-সঞ্চালন মূলক (Psycho-motor)	অনুকরণ করা	
	কৌশলী হস্তচালনা	
	সূক্ষ্ম কার্যসম্পাদন করা	
	সাবলীল প্রকাশভঙ্গি করা	
	কার্যে পরিণত করা	

✪ ১.২ পাঠক্রম এবং শিক্ষাবিজ্ঞান শিক্ষণের মূল্য (Curriculum and values of Teaching Education) :

❑ ১.২.১ উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষাবিজ্ঞানের পাঠ্যসূচি (Syllabus of Education in Higher Secondary Level) :

SYLLABUS
CLASS-XI
Full Marks : 100

Theory-80 Marks
Project-20 Marks

GROUP : A (30 MARKS)

◆ CONCEPT AND FACTORS OF EDUCATION ?

1. Concept and Aims of Education :

(a) Definition of Education.
(b) Concept of Education : Narrow and wider. Education is a lifelong process.
(c) Aims of Eudcation.
  (i) Determination of aims of education
  (ii) Different aims (mention only)
  (iii) Individual development ; Social Development and National Development : as aims of education

2. Significant Factors of Education :

(A) Educand : is a psycho-social component is a product of interaction between heredity and environment
(B) Teacher : Role of modern teacher in education
(C) Curriculum :
  (i) Defintion, traditional and modern concept
  (ii) Factors to be considered for curriculum construction with special reference to
    (a) Purpose of Education
    (b) Needs and capacities of the ed icand and
    (c) Available of the resources
(D) Co-curricular activities : Meaning, Types & Significance
(E) Types of environment : Physical and Social

3. Forms of Eudcation :

(a) Informal Education : Characteristics, Limitations

Scanned with CamScanner

(i) Role of family and
(ii) Mass media.

(b) Formal Education : Characteristics, Limitations, role of School.
(c) Non forma] Education : Need and meaning, concept, types, methods!

GROUP : B (30 MARKS

PSYCHOLOGICAL PERSPECTIVES

4. Psychology :

Definition, Relation between Education and Psychology ar importance. Educational psychology : Definition

5. Growth and Development of a child :

(i) Definition of Growth and Development and differences
(ii) Developmental characteristics and needs at different stages of! development : (Physical, Psychological and social)
  (a) Infancy,
  (b) Childhood,
  (c) Adolescence,
  (d) Adulthood.
(iii) Levels of Education related to stages of. development (mention! stages of formal education only)

6. Maturation and learning as process of development :

Definition, characteristics and Inter-relationship

7. Process involved in the acquisition of knowledge :

(a) Sensation-Definition, types, importance of sensation in education; (with reference to Froebel and Montessori)
(b) Perception : Definition, Difference between Perception and sensation, importance of perception in education.
(c) Concept: definition, stages of concept development, importance of concept formation in education and acquisition of knowledge.

GROUP : C (20 MARKS)

HISTORICAL DEVELOPMENT OF INDIAN EDUCATION

8. Ancient period :

(Brahmanic and Buddhistic) characteristics only based on Aims of education, Curriculam rituals, institutions, teacher-pupil relationship. method of teaching, discipline, evaluation)

9. Medieval period :

Charcacteristics only related to the points as referred above

10. Important events leading to the modern system of education : pre-indepenedent period :

Charater Act-1813, Woods Despatch-1854, Hunter Commission-1882, Curzon Policy : an overview on primary, secondary and higher education, Sadler Commission-1917, Sargent Plan-1944 ; Brief Study.

11. Contribution of eminent Indian educators towards the development of modern education in India :

(a) Raja Rammohun Roy—A social reformer and pre-cursor of education in India.
(b) Ishwarchandra Vidyasagar : Social and educational contribution towards mass education, establishment of schools, curriculum reforms, contribution to Bengali Language and literature and: women's education.
(c) Rabindranath Tagore : Educational thought and practice of eudcation (with special refernece to Santiniketan and Srinketan)
(d) Swami Vivekananda : Views on education—man making and character building, mass education, women's education and technical education.
(e) Mahatma Gandhi : Educational views with special emphasis on Basic education.

PROJECT WORK (20 MARKS)

- To study needs of the students of class VI to K (at least 10 students of any two classes belonging to two stages of development, childhood and adolescence
- To organize any activity within school (cultural function, debate, any game, sports, morning assembly etc.) or to study on going co-curricular activities in another secondary/primary school in comparison to your own
- Project or comprehensive study on the view point of Indian educators on women's education, mass education etc.
- Apart from the suggested project or field studies any relevant project based on the syllabus can be undertaken.

Scanned with CamScanner

SYLLABUS
CLASS-XII
Full Marks : 100

Theory-80 Marks
Project-20 Marks

GROUP : A (30 MARKS)

◆ **Psychological and Statistical perspective**

1. learning

(a) Learning-definition and nature, types (as stated by gagne)

(b) Factors of learning

(i) Maturation-Its role in learning

(ii) Motivation-Definition, Role in Learning

(iii) Attention-Definition, Characteristics. Role in Education

(iv) Intciesi-Definition, Characteristics, Role in Education

(v) Mental Abilities-Nature as described by Spearman and Thurston

➢ Intelligence-Definition and Characteristics

➢ Role of mental abilities in learning

2. Mechanisms of Learning

(a) Conditioning

(i) Classical conditioning-experiment and educational implications

(ii) Operant conditioning-experiment and educational implications

(b) Problem Solving

(i) Trial and error mechanism-experiment, major laws educational implications

(ii) Insigtful mechanism-experiment and educational implications

3. Statistics in Education

(i) Tabulation of data

(ii) Frequency distribution

(iii) Graphical representation (frequency Polygon and Histogram)

(iv) Measures of central tendency and their uses

GROUP : B (30 MARKS)

◆ **Historical Development (Post-independent Period)**

4. Educational prorations in Indian constitution related to women's education, equalization of opportunity, education for minority, SC, ST

5. University Education Commission (1948-'49) First Education Commission in free Inula, Aims of higher education and concept of Rural University

6. Secondary Education Commission (1952–'53), aims of secondary education, structure, seven stream system and multipurpose schools

7. The Indian Education Commission or Kothari Commission (1964-'66) and the modern system of education in India

(a) Concept of general education in present India

➢ Stages of General education in present India

(i) Pre-Primary education-Aims and objectives, structure, curriculum and institutions

(ii) Primary education-Aims and objectives, structure, curriculum and institutions

(iii) Secondary education-Aims and objectives, structure, curriculum and institutions

(iv) Higher Secondary-Aims and objectives, structure, curriculum and institutions

(v) Higher education-mention the position of higher education according to Kothari commission

(b) Vocational and Technical education prevailing m India

(i) Vopational and Technical fducation-concept, relation, types of institutions up to secondary level

(ii) Vocational and Technical education-types, curriculum and institutions up to higher secondary level

(c) Opportuiiics of education after higher secondary stage (names of courses)

8. N. E. P. (1986 as reviewed in 1992)-basic features.

GROUP : C (10 MARKS)

◆ **Current Issues in Indian Education**

9. Education for the differently abled children

(i) Visually impaired children-Categories and educational provisions

(ii) Deaf and dumb children-Categories and educational provisions

(iii) Common behavioural problems observed in class room situations and the role of the Parents and teachers to obvecome these problems (general smdy)

Scanned with CamScanner

10. Universaliziation of primary education (U.P.E.)

(i) Concept

(ii) Measures taken to achieve the objectives of U.P.E.-Audit Education programme, Literacy drive programme, S.S.A.

GROUP : D (10 MARKS)

◆ **Education for the 21st Century**

11. Global vision for edacation-Delores commission-4 pillars oflearning-a synoptic view

12. Role of technology in education

PROJECT WORK (20 MARKS)

- Study of interest pattern amon secondary/higher secondary students
- To study the achievement of students at secondary level in any two subjects and analyse scores in terms of mean, median & mode
- To study the behavioural problems observed amongst the adolescents in a school and suggest measures to overcome it
- To study the programmes or activities of S. S. A. in your locality
- To study the curriculum and types of primary schools (at least two in and around your locality). Apart from the suggested project or field studies any relevant project based on the syllabus can be undertaken.

❑ ১.২.২ শিক্ষাবিজ্ঞান শিক্ষণের মূল্য (Values of Teaching Education) :

পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে, **কোঠারি কমিশন** (১৯৬৪-৬৬) সুপারিশ করেন **'শিক্ষা'** বিষয়টিকে **'সমাজ বিজ্ঞান'** হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে এবং এর গুরুত্ব দিতে হবে। স্বাধীনতা লাভের পর বিভিন্ন সময়ে শিক্ষা ব্যবস্থায় নানা পরিবর্তন ঘটিয়ে শিক্ষার উদ্দেশ্য স্থির করার চেষ্টা হয়েছিল। শিক্ষার্থী এবং তার সমাজের চাহিদার কথা মাথায় রেখে সমাজবিজ্ঞানকে শিক্ষার উদ্দেশ্যের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। একবিংশ শতাব্দীতে শিক্ষার এই উদ্দেশ্যপূরণ করার জন্য পাঠ্যক্রমে **সমাজবিজ্ঞান পাঠের উদ্দেশ্যগুলি উল্লেখ করা হয়েছে (NCERT, 1999), এগুলি হল—**

(i) প্রাকৃতিক এবং সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে মানুষের আন্তঃনির্ভরশীলতা বোধ জাগ্রত করা।

(ii) সংসক্তিপ্রবণ সমাজের সঙ্গে ব্যক্তিকে সামাজিক জীবনের উপযোগী করে গড়ে তোলার শিক্ষা প্রদান করা।

(iii) সর্বজনীন সমানাধিকারের নীতি সমন্বিত সমাজ ব্যবস্থার সম্পর্কে উপলব্ধি জাগ্রত করা যেখানে সকল নাগরিক সমান সুযোগের অধিকার লাভ করে।

(iv) জাতীয় পরিচিতি এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সংরক্ষণ, মানবতার প্রতি ভারতের অবদান সম্পর্কে উপলব্ধি ঘটানো।

(v) শিক্ষার্থীদের বিশ্বায়নের যুগের প্রভাব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করা।

(vi) জীবন দক্ষতা, ব্যক্তি সমাজের সম্পর্কের উন্নতি সাধন করা।

(vii) গণতান্ত্রিক আদর্শ এবং সংসদীয় আচরণের দিকগুলি ধীরে ধীরে শিক্ষার্থীদের অন্তরে সঞ্চারিত করা।

এই সমস্ত আদর্শগত উদ্দেশ্যগুলি বস্তুত পক্ষে দীর্ঘ সময়কালীন উদ্দেশ্য, যেগুলি খুব অল্প সময়ের মধ্যে অর্জন করানো সম্ভব নয়। সেজন্য এগুলিকে ভেঙে নির্দিষ্ট কতকগুলি ছোটো ছোটো উদ্দেশ্যগঠন করে শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অর্জন করাতে হবে।

এই পরিপ্রেক্ষিতেই সমাজবিজ্ঞানের অন্যতম অংশীদার হিসেবে শিক্ষাবিজ্ঞান শিক্ষণের লক্ষ্যপূরণের গুরুত্ব বা মূল্য নিম্নলিখিত ভাবে উপস্থাপিত করা যেতে পারে :

(i) বৌদ্ধিক মূল্য (Intellectual Value)

(ii) উপযোগিতামূলক মূল্য (Utiliterian Value)

(iii) সাংস্কৃতিক মূল্য (Cultural Value)

(iv) বৃত্তিগত মূল্য (Vocational Value)

(v) সৌন্দর্য্যবোধের মূল্য (Aesthetic Value)

(vi) বৈজ্ঞানিক মূল্য (Scientific Value)

(vii) নৈতিক মূল্য (Moral Value)

(viii) মনস্তাত্ত্বিক মূল্য (Pshychological Value)

(ix) সমাজতাত্ত্বিক মূল্য (Sociological Value)

ebook.dascoaching.in

(i) **বৌদ্ধিক মূল্য** (Intellectual Value) : মানবশিশুর জন্মের পর থেকে সময় অতিক্রমের সঙ্গে সঙ্গে তার বিভিন্ন দিকের বিকাশ প্রক্রিয়া চলতে থাকে। এই সব বিকাশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হল বৌদ্ধিক বিকাশ বা মানসিক বিকাশ। শিশুর সংবেদন ও প্রত্যক্ষণের বিকাশ, ধারণার বিকাশ, ভাষার বিকাশ, যুক্তিশক্তির বিকাশ, স্মৃতি ও কল্পনাশক্তির বিকাশ, চিন্তনের বিকাশ, বুদ্ধির বিকাশ, প্রভৃতি সামগ্রিক ভাবে **বৌদ্ধিকবিকাশ** নামে পরিচিত। এই বৌদ্ধিক বিকাশের প্রক্রিয়া মানবশিশুর মধ্যে কীভাবে ঘটে তা জানা যায় শিক্ষা বিজ্ঞান পাঠের মাধ্যমে। শিক্ষাবিজ্ঞানের এই বৌদ্ধিক বিকাশের গুরুত্ব দুটি দিক থেকে উল্লেখযোগ্য।

Scanned with CamScanner

একটি হল মানবশিশুর বৌদ্ধিক বিকাশের ধারাকে অনুশীলন করে শিক্ষাকার্য পরিচালনা এবং অন্যটি হল শিক্ষাকার্য দ্বারা শিশুর বৌদ্ধিক বিকাশের ধারাকে ত্বরান্বিত করা। শিক্ষা বিজ্ঞানে বৌদ্ধিক বিকাশ আলোচনার মূল উদ্দেশ্য হল একজন শিক্ষার্থীকে তার মানসিক বা বৌদ্ধিক ক্ষমতার ভিত্তিতে আরও ভালোভাবে জানা। বৌদ্ধিক ক্ষমতার ভিত্তিতে পাঠ নির্দেশনা প্রদান শিক্ষকের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় যেহেতু বৌদ্ধিক ক্ষমতার ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়ে থাকে, তাই সেই বিষয়টি সংশ্লিষ্ট সকলের গুরুত্ব সহকারে উপলব্ধি করা প্রয়োজন। বর্তমান শতাব্দীর জ্ঞান নির্ভর সমাজ ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক ক্ষমতাভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। সুতরাং এই সমস্ত দিক বিচার করলে শিক্ষা বিজ্ঞান শিক্ষণের বৌদ্ধিক মূল্য অপরিসীম তা সহজেই বলা যায়।

(ii) **উপযোগিতামূলক মূল্য** (Utilitarian Value) : দার্শনিক **মিল** এবং **বেন্থাম**-এর পরসুখবাদ অনুযায়ী পরের সুখ বা সকলের সুখ, অন্যভাবে বলা যায় সর্বাধিক লোকের সর্বাধিক সুখই মানুষের কাম্য। বিশ্বের যত অধিক লোকের মঙ্গল সাধিত হয়, ততই শুভ। এই মতবাদকে অনেকে **উপযোগিতাবাদ** বলেছেন। এই উপযোগিতাবাদের মূল বক্তব্য হল, যে কাজ সর্বসাধারণের সুখ উৎপাদনে উপযোগী তাই ভালো, কল্যাণকর কাজ। আর যে কাজ তা পারে না তাই হল মন্দ বা অকল্যাণকর কাজ। শিক্ষার ক্ষেত্রে এই উপযোগিতা বাদ যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। **অধ্যাপক ব্যাগলি** শিক্ষার ক্ষেত্রে সমাজকল্যাণ-এর আদর্শের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেছেন। অধ্যাপক ব্যাগলির নিকট সেটিই হল আদর্শশিক্ষা যা মানুষের সামাজিক কর্মক্ষমতাকে বৃদ্ধি করতে পারে। সেজন্য শিক্ষার লক্ষ্যই হল সমাজকল্যাণ। ব্যক্তিস্বার্থপরতা ও আত্মকেন্দ্রিকতাকে বিসর্জন দিয়ে সমাজের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে সমাজস্থ অন্য মানুষের স্বার্থরক্ষাই হল শিক্ষার যথার্থ সার্থকতা। সেদিক থেকে শিক্ষার লক্ষ্য হবে সমাজসেবা, সমাজকল্যাণ এবং ব্যক্তি মানুষের মধ্যে সমাজের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য জাগ্রত করা। শিক্ষাবিজ্ঞান শিক্ষণের মাধ্যমে এই কাজটি করা হয়। শিক্ষাকে পরার্থপরতার লক্ষ্যে সমাজ অনুকূলে পরিচালিত করে সমাজ কল্যাণের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তি কল্যাণ সাধন সম্ভব করে তোলে শিক্ষাবিজ্ঞান। সেদিক থেকে বলা যায় শিক্ষাবিজ্ঞান শিক্ষণের উপযোগিতামূলক মূল্য অনেকখানি।

(iii) **সাংস্কৃতিক মূল্য** (Cultural Value) : বাংলা **সংস্কৃতি** শব্দটির ইংরেজি **প্রতিশব্দ হল** 'Culture'—এই শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে লাতিন শব্দ 'colere' থেকে, যার অর্থ হল কর্ষণ করা। তাই **সংস্কৃতি বা culture** হল **কর্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত বিষয়**। বাংলায় সংস্কৃতি অর্থে 'কৃষ্টি' শব্দটিও ব্যবহার করা হয়। সুতরাং বুৎপত্তিগত অর্থ বিচারে সংস্কৃতি বলতে বোঝায় সংস্কারের বা মার্জনার মাধ্যমে প্রাপ্ত বিষয়। এই অর্থে সংস্কৃতি হল ব্যক্তি মানুষের

শিক্ষা, দীক্ষা, বিচার-বুদ্ধি, আচার, অনুষ্ঠান, **রীতিনীতি** প্রভৃতির সংস্কৃত বা মার্জিত রূপ। **এডওয়ার্ড টেলার** (Edward Tylor)-এর মতে, সংস্কৃতি হল সেই জটিল সমগ্র অবস্থা যার মধ্যে সমাজের সদস্যরূপে মানুষের অর্জিত সমস্ত জ্ঞান, বিশ্বাস, নৈতিকতা, আইন, প্রথা এবং অন্যান্য সকল প্রকার সামর্থ্য অন্তর্ভুক্ত (that complex whole which includes knowledge, belief, morals, law, custom and any other capabilities acquired by man as a member of society.)

সামাজিক বিচারে জীবনযাত্রা প্রণালীর বা জীবনধারাকে বলা হয় **সংস্কৃতি**। সমাজ ও সমাজের ব্যক্তিবর্গের বিভিন্ন বিষয়ের এক মিশ্র ও জটিল রূপ হল সংস্কৃতি। এই সব বিষয়ের মধ্যে আছে সমাজের সমষ্টিগত জ্ঞান, নীতিবোধ, বিশ্বাস অর্জন, প্রথা প্রভৃতি এবং সমাজবদ্ধ মানুষের যে-কোনো বিষয়ে অর্জিত অভ্যাস ও দক্ষতা। সমাজের সদস্য হিসেবে মানুষ যা কিছু করে সবই হল তার মানসিক বৃত্তির চর্চার ফল, যা তার সংস্কৃতির পরিচায়ক।

ব্যক্তি ও সমাজজীবনে এই সংস্কৃতির গুরুত্ব অপরিসীম, এই কারণে সংস্কৃতির সংরক্ষণ, সঞ্চরণ ও উৎকর্ষণ অতি উল্লেখযোগ্য বিষয়। **শিক্ষা হল এই সংস্কৃতির সংরক্ষণ, সঞ্চরণ ও উৎকর্ষণের একটি উপায়।** সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহ এক প্রজন্ম থেকে আর এক প্রজন্মে প্রবাহিত হয়। সাংস্কৃতিক উপাদান সমূহ সঞ্চারিত হয় বিদ্যালয়, পরিবার ও অন্যান্য সংস্থা সমূহের মাধ্যমে। শিক্ষা প্রথাগত ভাবে বা প্রথাহীন ভাবে সংস্কৃতি সঞ্চারণের ভূমিকা পালন করে আসছে বহুকাল ধরে। শিক্ষাবিজ্ঞানের কাজ হল মানবজাতির সংস্কৃতির ধারাকে সংরক্ষণ ও সঞ্চারণ করা। সুতরাং সেদিক থেকে শিক্ষাবিজ্ঞান শিক্ষণের সাংস্কৃতিক মূল্য যথেষ্ট নিঃসন্দেহে বলা যায়।

(iv) **বৃত্তিগত মূল্য** (Vocational Value) : সমাজ বিবর্তনের ধারায় সমাজপতিগণ এক সময় অনুধাবন করেছিলেন যে, মানবশিশুকে ভবিষ্যৎ জীবনের উপযোগী করে গড়ে তুলতে হলে শিক্ষাকে সুসংগঠিত করা দরকার এবং সেজন্য শিক্ষাকেই সেই গুরুদায়িত্ব পালন করতে হবে। সুসংগঠিত এই শিক্ষার লক্ষ্যই হবে শিশুকে ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় কোনো বৃত্তির জন্য প্রশিক্ষিত করা। আধুনিক উন্নত সমাজ ব্যবস্থায় অনেক শিক্ষাবিদ এই লক্ষ্যটির উপর বিশেষ ভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন। মনীষী **মিলটনের** কথায় "I call a complete and generous education that which fits a man to perform justly, skillfully and magnanimously all the offices both public and private, of peace and war." শিক্ষার এই জাতীয় লক্ষ্যই হল বৃত্তিমূলক লক্ষ্য। অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এই লক্ষ্যের গুরুত্ব হল শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তিকে উপার্জনক্ষম করে তুলতে হবে। শিক্ষার এই বৃত্তিমূলক লক্ষ্যের কতকগুলি সুবিধা পাওয়া যায়, যেমন— বৃত্তিমূলক লক্ষ্য ব্যক্তিজীবনে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য আনতে পারে, শিক্ষাকে অনেকখানি মনোবিজ্ঞান সম্মত করে তোলে, শিক্ষার্থীকে সামাজিক যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিত্বে উপনীত করতে পারে, সমাজ

Scanned with CamScanner

শিক্ষাক্ষেত্রে অর্থনৈতিক বিনিয়োগ উৎসাহী হয়, সর্বোপরি স্বল্পবুদ্ধি সম্পন্ন শিক্ষার্থীসহ সকল স্তরের মানুষকে শিক্ষাবিজ্ঞান অর্থপূর্ণ করে তোলে। সেদিক থেকে বলা যায় শিক্ষাবিজ্ঞান শিক্ষণের বৃত্তিমূলক মূল্য অনেকখানি।

(v) **সৌন্দর্য বোধের মূল্য** (Aesthetic Value) : একথা ঠিক যে মানবজীবনের সার্থকতা প্রকাশ পায় প্রধানত তার অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে অভিযোজন ক্ষমতায়। কিন্তু মানুষ-এর শুধুমাত্র তার জৈবিক চাহিদার নিবৃত্তিতে আর অভিযোজনগত বৈশিষ্টেই শান্তি সম্পূর্ণ হয় না। মানবজীবনের সার্থকতা পূর্ণতা পায় বিশ্ব প্রকৃতিতে রূপ-রস-গন্ধ সম্ভোগের দ্বারা। এই বিশ্ব প্রকৃতির মাঝে যা কিছু বর্তমান, তাকে সুন্দর হিসেবে উপলব্ধি করা, তার নিজের অস্তিত্বের সংগে একাত্মতা অনুভব করা মানব ব্যক্তিসত্তার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। এই বিশ্ব প্রকৃতির সাম্রাজ্যের সর্বত্র যে অপরূপ সৌন্দর্যধারা ছড়িয়ে রয়েছে তাকে আবিষ্কার করা বা তাকে উপলব্ধি করা। সৌন্দর্যের এই উপলব্ধি বা আস্বাদন করতে না পারলে মানুষের ব্যক্তিজীবন অপূর্ণ থেকে যায়। দার্শনিক ও মনোবিজ্ঞানীদের মতে এই সৌন্দর্য উপলব্ধির মূলে আছে এক বিশেষ ধরনের সামাজিক সংগঠন। আবার ভাববাদী দার্শনিক চিন্তায় বলা যায় "আত্মিক দর্শন বলে—জড়বস্তুর চেয়ে আত্মা মহত্তর। এই দর্শন মানুষের স্বভাব ও জগতের স্বভাব দুই সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য প্রকাশ করেছে; যে সত্য মানুষ নিজের পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা নিজেই প্রামাণ্য বলে বুঝতে পারে।"

এই আত্মার মাত্র তিনটিই আকাঙ্ক্ষা এবং তা থেকে তিনটি প্রধান ক্রিয়া আছে সেগুলি হল—**"নৈতিক, বৌদ্ধিক ও নান্দনিক ক্রিয়া। মানুষ এই তিনটি ক্রিয়ার অনুসরণ করবে বলেই বাঁচে, তাঁর জীবনের অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই।"**

কেউ কেউ আবার মনে করেন সত্য, শুভ এবং সুন্দর, মানুষের মনোময় সত্তার ত্রিরূপ প্রকাশ। সত্য মানুষের মনন, সৌন্দর্য তার অনুভূতি ও নৈতিক মূল্যবোধ তার ইচ্ছার প্রকাশ। সৌন্দর্য সম্ভোগের এই সামগ্রিক মূল্যবোধের দুটি আচরণগত দিক আছে। একটি হল ব্যক্তিকে বস্তুজগতের পরিপূর্ণ সৌন্দর্য উপলব্ধিতে সহায়তা এবং অপরটি হল সৌন্দর্যের প্রকাশ ঘটানো বা সুন্দরের সৃষ্টি। শিক্ষা বিজ্ঞান এই দুটি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সেদিক থেকে শিক্ষাবিজ্ঞান শিক্ষণের সৌন্দর্যগত মূল্য অনেকখানি তা সহজেই বলা যায়।

(vi) বৈজ্ঞানিক মূল্য (Scientific Value) : শিক্ষার অন্যতম কাজ হল ব্যক্তি এবং সমাজ জীবনে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গঠন ও প্রসার। অতীত ঐতিহ্যের সংরক্ষণ ও সঞ্চারণের সাঙ্গে সঙ্গে সমাজ জীবনে নানা অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারও সঞ্চারিত হয়। সমাজ জীবনের পক্ষে যেগুলি অত্যন্ত ক্ষতিকর, এই সব ক্ষতিকর অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারগুলি দূরীভূত করার জন্য দরকার একদিকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গঠন এবং অন্যদিকে তার প্রসার। এ ছাড়া বর্তমান শতাব্দীতে যেভাবে বিজ্ঞান, কারিগরিবিদ্যা ও প্রযুক্তিবিজ্ঞানের উন্নতি ঘটছে তার প্রভাব সমাজ জীবনে প্রতিফলিত হচ্ছে। একথা স্বীকার করতেই হয় যে, বর্তমান প্রযুক্তিবিদ্যার

জ্ঞান যতবেশি সমাজ জীবনের সর্বস্তরে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে ততই তার সুফল ব্যক্তি ও সমাজ লাভ করবে। সুতরাং ব্যক্তি এবং সমাজ জীবনে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টভঙ্গির গঠন ও প্রসার অতীব প্রয়োজনীয়। শিক্ষাবিজ্ঞান শিক্ষণের মাধ্যমে এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গঠন ও প্রসার সম্ভব হয়। শিক্ষাবিজ্ঞান শিক্ষণের তাই অন্যতম লক্ষ্য হল অর্জিত জ্ঞানের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গঠন এবং সমাজজীবনে বিজ্ঞান মনস্কতার প্রসার ঘটানো। সুতরাং সেদিক থেকে বলা যায় শিক্ষাবিজ্ঞান শিক্ষণের বৈজ্ঞানিক মূল্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

(vii) নৈতিক মূল্য (Moral Value) : মানুষ গোষ্ঠী বা সমাজজীবনে অভ্যস্থ। মানুষের এই সমাজ জীবনে কতকগুলি আচরণ, কতকগুলি অভ্যাস নিন্দিত ও প্রশংসিত হয়, এদের বলা হয় **নীতি**। আর সমাজ গৃহীত প্রথা-আচার অনুসরণের অভ্যাসের দ্বারা ব্যক্তির যে আচরণ গঠিত হয়, তাই **নৈতিক আচরণ**। মনোবৈজ্ঞানিক অর্থে এই নৈতিক আচরণকে ব্যক্তির স্ব-নির্ধারিত ক্রিয়া (self-determined action) হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অর্থাৎ ব্যক্তি তার নিজস্ব জীবনাদর্শ বা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে যখন কোনো আচরণে ঔচিত্য বিচার করে, তখন সেই আচরণকে বলা হয় নৈতিক আচরণ। মানুষের সমস্ত সামাজিক আচরণই নৈতিক আচরণ না হলেও, সমস্ত নৈতিক আচরণের সঙ্গেই কিন্তু সামাজিক সম্পর্ক আছে। ব্যক্তি যখন তার নিজের আচরণকে উচিত-অনুচিত বোধের দ্বারা নির্ধারণ করতে সক্ষম হয়, তখন তার মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধ জেগে ওঠে। শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হল মানুষের মধ্যে এই নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রত করা বা নৈতিক চরিত্র গঠন। শিক্ষাবিদ **হার্বার্ট**-এর মতে "শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে ব্যক্তির নৈতিক চরিত্র গঠন।" দার্শনিক **জন লক বেং প্লেটোর** শিক্ষা চিন্তার মধ্যে এই ধারণাই প্রতিফলিত হয়। **প্লেটোর** মতে "Nothing should be admitted education which does not conduct to the promotion of virtue." এই নৈতিক মূল্যবোধের শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে আধুনিক প্রয়োগবাদীরা বেশি সচেতন। প্রয়োগবাদীদের মতে শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের যে স্বাধীনতা দেওয়া হবে তা স্বেচ্ছাচারের জন্য ঢালাও অনুমতি নয়। কোনো নৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় শিক্ষক সেখানে বন্ধু ও উপদেষ্টার ভূমিকা গ্রহণ করেন। স্ব-নির্ধারিত কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী আত্ম নিয়ন্ত্রণ করতে শিখবে আর থাকবে নৈতিক শৃঙ্খলা। বিদ্যালয়ের প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য হল মানুষের (শিক্ষার্থীর) নৈতিক ও সামাজিক সত্তার বিকাশে সাহায্য করা এবং সমাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা। তাই বলা যায় শিক্ষাবিজ্ঞান শিক্ষণের ক্ষেত্রে যথেষ্ট নৈতিক মূল্যও বর্তমান।

(viii) **মনস্তাত্ত্বিক মূল্য** (Psychological value) : আধুনিক শিক্ষার মনোবৈজ্ঞানিক বা মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি আজ স্বীকৃত। মনোবিদ্যা আধুনিক শিক্ষার কেন্দ্রস্থলে স্থাপন করেছে শিশুকে। আবার মনোবিদ্যার বিষয়বস্তু হল ব্যক্তির আচরণ। সুতরাং আধুনিক শিক্ষায় শিশুকে কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু হিসেবে স্বীকৃতি এবং তার ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যগুলির বিকাশের উপর গুরুত্ব

Scanned with CamScanner

প্রদান মনোবিদ্যার অন্যতম প্রধান অবদান। আবার মনোবিদ্যায় উল্লেখ করা হয়েছে মানুষের আচরণগুলির অনুশীলন এবং পরিবর্তনের জন্য স্বাভাবিক মনুষ্য সমাজ বা মনুষ্য পরিবেশই প্রয়োজন। মনোবিদ্যার পরীক্ষিত সিদ্ধান্তের প্রভাবেই আজ আধুনিক শিক্ষালয়ের ধারণাও পরিবর্তিত হয়েছে। আধুনিক শিক্ষার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হল আত্মসক্রিয়তার নীতি বা সক্রিয়তা ভিত্তিক নীতি। এই নীতিতে বলা হয়েছে প্রতিটি শিক্ষার্থী তার আত্মসক্রিয়তার দ্বারাই শিক্ষালাভ করবে। আধুনিক শিক্ষায় এই সক্রিয়তার নীতিটিও মনোবৈজ্ঞানিক তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। শুধু তাই নয়, আধুনিক শিক্ষার তাৎপর্যও পরিবর্তিত হয়েছে মনোবিদ্যার প্রভাবেই। শিক্ষা মানুষের জীবন ব্যাপী প্রক্রিয়া তা আজ স্বীকৃত। অন্যদিকে মনোবিজ্ঞানীরা এই ধারণা প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে, শিশু তার আত্মসক্রিয়তার দ্বারা বৈশিষ্ট্যগুলির বিকাশ ঘটায়, তা চলে সারাজীবন ধরে অর্থাৎ শিশুর জীবনবিকাশের প্রক্রিয়া জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত পরিব্যপ্ত। এই চিন্তাধারা প্রতিষ্ঠাতেও মনোবিজ্ঞানের অবদান আজ স্বীকৃত। স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষাবিজ্ঞান বহুলভাবে মনোবিজ্ঞান দ্বারা প্রভাবিত। সেদিক থেকে বলা যেতে পারে শিক্ষাবিজ্ঞান শিক্ষণের মনোবৈজ্ঞানিক মূল্য বা মনস্তাত্ত্বিক মূল্য অনেকখানি।

(ix) **সমাজতাত্ত্বিক মূল্য** (Sociological Value) : আধুনিক শিক্ষা আজ যেভাবে পরিণত লাভ করেছে, আধুনিক চিন্তার দ্বারা পরিব্যপ্ত হয়েছে তাতে সমাজবিজ্ঞানের অবদানও কম নয়। এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি এনে সমাজবিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রকে বহুদিক থেকে পরিশীলিত ও পরিমার্জিত করেছে। সমাজবিজ্ঞানীদের মতে মানবশিশুর জন্মগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক প্রশিক্ষণ শুরু হয় এবং তা অব্যাহত থাকে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত। স্বাভাবিকভাবেই সমগ্র জীবনব্যাপী এই সামাজিক প্রশিক্ষণের ধারা বজায় থাকে। মানবসমাজে অভিজ্ঞতালাভের প্রক্রিয়াই সেই সামাজিক প্রশিক্ষণের অন্যরূপ। তাই সামাজিকীকরণের উপায় হিসেবে শিক্ষাকে উল্লেখ করা হয়। আবার এই সামাজিক প্রক্রিয়া একদিকে যেমন সামাজিক-সাংস্কৃতির সংরক্ষণ করে তেমনি অন্যদিকে সামাজিক-সংস্কৃতির সঞ্চারণের কাজও করে। সেই হিসেবে শিক্ষা হল সংস্কৃতি সঞ্চারণের একটি উপায়। এই নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া চলতে থাকে এক প্রজন্ম থেকে আর এক প্রজন্মে। শিক্ষার এই আধুনিক তাৎপর্য উপলব্ধিতে সমাজবিজ্ঞানের অবদান অনেকখানি।

আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্য শুধুমাত্র ব্যক্তি উন্নয়ন নয়, সমাজ উন্নয়নও। শিক্ষার্থী যাতে শুধুমাত্র বিক্ষিপ্ত কতকগুলি অভিজ্ঞতা অর্জন করে ক্ষান্ত না হয়ে সামাজিক জীব হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে, সেদিকেও লক্ষ্য রাখে। ব্যক্তিকল্যাণের সঙ্গে সঙ্গে সমাজকল্যাণও যে তার অস্তিত্ব রক্ষায় সহায়ক সেই উপলব্ধি সে করতে পারে। আধুনিক শিক্ষার এই চিন্তাধারাও সমাজবিজ্ঞান দ্বারা প্রভাবিত।

শুধু তাই নয়, আধুনিক শিক্ষার পাঠক্রম নির্ধারণে শিক্ষণের মূলনীতির পরিবর্তনে শিক্ষালয়কে 'সমাজের ক্ষুদ্র সংস্করণে' সংগঠিত করার ক্ষেত্রে শিক্ষা পরিচালনার দৃষ্টিভঙ্গি

পরিবর্তনে, শিক্ষকতার বৃত্তিতে সামাজিক রীতি নীতির প্রতি আস্থা রাখা এবং তা শিক্ষার্থীদের মধ্যে সঞ্চারিত করার ক্ষেত্রে সমাজবৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার অবদান অনস্বীকার্য। সেই কারণে আধুনিক শিক্ষার প্রকৃতি অনুধাবনে সমাজবৈজ্ঞানিক উপাদানগুলির বিচার অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং শিক্ষাবিজ্ঞান শিক্ষণের সমাজ বৈজ্ঞানিক মূল্য অপরিসীম।

❑ ১.২.৩ ভারতে স্বতন্ত্র বিষয় হিসাবে শিক্ষাবিজ্ঞানের বিবর্তন (Evolution of Education as a subject in India) :

শিক্ষা (Education)-কে জ্ঞানচর্চার স্বতন্ত্র শাখা বা বিভাগ হিসেবে অথবা শিক্ষাদানের স্বতন্ত্র একটি বিষয় হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের ঘটনাটি সাম্প্রতিক কালের। শিক্ষা বর্তমানে একটি সামাজিক বিজ্ঞান হিসেবে বিবেচিত হয়। Inter disciplinary বিষয় হিসেবে এর গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। দর্শন, মনোবিজ্ঞান, ইতিহাস, অর্থনীতি, জীববিজ্ঞান, নৃবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, গণিত, রাশিবিজ্ঞানের মতো মৌলিক বিষয়গুলি একে পরিপুষ্ট ও সমৃদ্ধ করেছে। সাম্প্রতিক কালে প্রযুক্তি বিজ্ঞানের জ্ঞানও শিক্ষাবিজ্ঞানকে আরও বেশি বিজ্ঞান ধর্মী করে তুলেছে। এই বিষয়টির আলোচনার পরিধি আজ অনেকখানি গভীর ও সুবিস্তৃত। একথা মনে রাখা দরকার যে, বিচ্ছিন্ন কতকগুলি বিষয় বা তথ্যের সমবায়েই শুধুমাত্র শিক্ষাবিজ্ঞান গড়ে ওঠেনি। বরং এটি সুসমন্বিত ভাবে বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞানকে একটি নতুন বিষয় হিসেবে রূপদান করেছে, যার আলোচনার পরিধি বা বিষয়বস্তু অন্যান্য বিষয়গুলির মতোই যথেষ্ট গভীর এবং বিস্তৃত। শিক্ষাবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর আলোচনায় যে সমস্ত দিকগুলি স্থান পেয়েছে সেগুলি হল—শিক্ষাদর্শন, শিক্ষাতত্ত্ব, শিক্ষণপদ্ধতি, শিক্ষাপ্রশাসন, শিক্ষাগত অর্থনীতি, শিক্ষার ইতিহাস, তুলনামূলক শিক্ষা, শিক্ষা প্রযুক্তিবিদ্যা, জনসংখ্যা ও পরিবেশ শিক্ষা ইত্যাদি।

◆ বিভিন্ন কমিশন ও কমিটির ভূমিকা (Different Commisons and Committee) :

(ক) **স্যাডলার কমিশন** : Education বা শিক্ষাকে একটা স্বতন্ত্র বিভাগ হিসেবে দেখার প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন প্রথম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন বা স্যাডলার কমিশন (১৯১৭-১৯)। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ অবসানের দিকে অগ্রসর হলে এবং কিছুটা অনুকূল পরিস্থিতি উপস্থিত হলে ভারত সরকার শিক্ষা সংস্কারের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। ভারত সরকার Leads (লীডস) বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য **স্যার মাইকেল স্যাডলার** (Sir Michael Sadler)-এর সভাপতিত্বে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন গঠন করেন। এটি **স্যাডলার কমিশন নামেও পরিচিত**। কমিশনের অন্যতম সদস্য ছিলেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে কমিশনের সুপারিশ প্রকাশিত হয়—(১) কমিশনের অন্যতম সুপারিশ ছিল মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা দুটি পর্যায়ে হবে। প্রথমটি হবে ম্যাট্রিকুলেশন স্তর, এতে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠের ব্যবস্থা থাকবে। দ্বিতীয় স্তরটি হবে ইন্টারমিডিয়েট স্তর, এটি হবে দুবছরের

Scanned with CamScanner

স্তর। কলেজের উচ্চশিক্ষায় প্রবেশের মাপকাঠি হবে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা। ইন্টারমিডিয়েট স্তরের শিক্ষাদানের জন্য ইন্টারমিডিয়েট কলেজ স্থাপন করতে হবে। (২) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রসঙ্গে সুপারিশ করা হয় যে, স্নাতক ও ইন্টারমিডিয়েট স্তরে 'শিক্ষা' বা 'Education' বিষয়টি পঠন পাঠনের ব্যবস্থা করতে হবে এবং শিক্ষক শিক্ষণের জন্য পৃথকভাবে শিক্ষাবিভাগ স্থাপন করতে হবে। স্যাডলার কমিশনের এই রিপোর্ট বা বিবরণী ভারতের ইতিহাসে এক মূল্যবান দলিল হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে কারণ এর আগে এইরকম কোনো শিক্ষাদলিল প্রকাশিত হয়নি। ভারতে শিক্ষার ক্রমবিকাশের উপর এই দলিলের প্রভাব বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এই দলিলের মাধ্যমে ইন্টারমিডিয়েট ও স্নাতক স্তরে 'শিক্ষা' বা 'Education' বিষয়টির যে উদ্বোধন ঘটেছিল তারই পথ ধরে আধুনিক 'শিক্ষা' বিষয় এবং বিভাগের উত্তরণ ঘটে।

(খ) সার্জেন্ট রিপোর্ট (১৯৪৪) :

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের অবসান কালে ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে **বাটলার আইন** শিক্ষাক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনে। এই ভারতবর্ষে ভারত সরকারের শিক্ষা উপদেষ্টা ছিলেন **স্যার জন সার্জেন্ট**। তৎকালীন ভারতীয় শিক্ষার অবস্থা পর্যালোচনা এবং পরামর্শদানের জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন স্যার জন সার্জেন্ট। ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে জানুয়ারি মাসে **'সার্জেন্ট রিপোর্ট'** হিসেবে সেটি প্রকাশিত হয়। এই রিপোর্টে বহুসংখ্যক শিক্ষকের প্রশিক্ষণের সুপারিশ করা হয়। স্নাতক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য বিশ্ববিদালয়ে শিক্ষক-শিক্ষণ বিভাগ এবং নতুন শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের স্থাপনের কথা বলা হয়। অন্যদিকে স্নাতক নন এমন সব শিক্ষকদের জন্য তিন ধরনের শিক্ষক-শিক্ষণের বিদ্যালয় স্থাপনের সুপারিশ করা হয়। প্রাক্ প্রাথমিক বিদ্যালয়; বুনিয়াদি বিদ্যালয় এবং হাইস্কুলের স্নাতক নন এমন শিক্ষকদের এগুলিতে প্রশিক্ষণ দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়।

(গ) রাধাকৃষ্ণন কমিশনের রিপোর্ট (১৯৪৮-৪৯) :

সদ্য স্বাধীন ভারতে শিক্ষা সম্পর্কে ব্যাপকভাবে অনুসন্ধান, সমস্যার প্রকৃতি অনুধাবন এবং সমাধান ও শিক্ষার উন্নতিবিধানকল্পে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন গঠিত হয় ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে। এই কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন **ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন**। এজন্য এই কমিশন **রাধাকৃষ্ণন কমিশন নামেও পরিচিত। শিক্ষাতত্ত্ব (Education) সম্পর্কে কমিশনের সুপারিশ ছিল নিম্নরূপ—**

(১) শিক্ষাতত্ত্বের পাঠ্যক্রমের বিষয়টিকে নতুন করে রচনা করতে হবে। শিক্ষার তাত্ত্বিক বিষয়গুলি হবে নমনীয় এবং তা হবে স্থানীয় আঞ্চলিক পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। বিদ্যালয়ে হাতে কলমে কাজ করার জন্য সময় বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে। শিক্ষার্থীদের কাজের মূল্যায়ন করার সময় তার উপর বেশি গুরুত্ব দিতে হবে।

(২) ব্যবহারিক শিক্ষা নেওয়ার জন্য উপযুক্ত বিদ্যালয়ের সাহায্য নিতে হবে।

(৩) স্নাতকোত্তর বা মাস্টার্স ডিগ্রি লাভ করার পূর্বে শিক্ষার্থীরা যাতে শিক্ষাদান কার্যে কয়েক বছরের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।

(৪) শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়নের জন্য শিক্ষক-শিক্ষণ কর্মসূচির পুনর্বিন্যাস ঘটিয়ে ব্যবহারিক দিকের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। শিক্ষাবিজ্ঞানের গবেষণালব্ধ ফলাফলকে কাজে লাগিয়ে শিক্ষক-শিক্ষণ কর্মসূচিতে আধুনিক চিন্তার ধারা অনুসরণ করতে হবে।

(ঘ) মুদালিয়র শিক্ষা কমিশন (১৯৫২-৫৩) :

প্রধানত মাধ্যমিক শিক্ষার পুনর্গঠন প্রসঙ্গে মুদালিয়র শিক্ষা কমিশন গঠিত হলে শিক্ষক শিক্ষণ সম্পর্কে কমিশন উদাসীন থাকেননি। কমিশন সে সম্পর্কে কতকগুলি সুপারিশ করেন—

(১) শিক্ষক-শিক্ষণের জন্য দুই ধরনের প্রতিষ্ঠানের কথা বলা হয়।
উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষা উত্তীর্ণ শিক্ষকদের জন্য শিক্ষণকাল হবে দুই বছর আর স্নাতক শিক্ষকদের জন্য আপাতত একবছর হলেও ভবিষ্যতে দুই বছরের শিক্ষণকাল হবে।

(২) স্নাতকদের জন্য নির্দিষ্ট শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত হবে। বিশ্ববিদ্যালয় এইসব শিক্ষকগণকে ডিগ্রি প্রদান করবে।

(৩) ট্রেনিং কলেজগুলিতে রিফ্রেসার কোর্স, বিশেষ বিশেষ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা থাকবে আর থাকবে ওয়ার্কশপ ট্রেনিং ও প্রফেশনাল ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা।

(৪) শিক্ষাবিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক প্রসঙ্গে কলেজগুলিতে গবেষণাগারের ব্যবস্থা করতে হবে এবং কলেজগুলির অধীনে ডেমস্ট্রেশন স্কুল থাকবে।

(৫) শিক্ষণপ্রাপ্ত স্নাতকদের মধ্যে যারা শিক্ষায় (Education) স্নাতকোত্তর স্তরে ভর্তি হতে চাইবেন, তাঁদের কমপক্ষে ৩ বছর শিক্ষাদানের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

(ঙ) কোঠারি কমিশনের রিপোর্ট (১৯৬৪-৬৬) :

স্বাধীনভারতে শিক্ষার সামগ্রিক মূল্যায়ন, সংস্কার ও পুনর্গঠনের জন্য ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে যে শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয় তার সভাপতি নিযুক্ত হন ইউনিভারসিটি গ্র্যান্টস্ কমিশনের চেয়ারম্যান **অধ্যাপক ডি.এস.কোঠারি**। কোঠারি কমিশন 'শিক্ষা' বা Education-কে একটা separate academic discipline হিসেবে গড়ে তোলার পক্ষে জোরালো সওয়াল করেন। কমিশনের মতে স্বাধীনতা লাভের পরেও দেশে শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থার কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়নি। শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থার উন্নতি করতে হলে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যে বিচ্ছিন্নতা (isolation) রয়েছে তা দূর করতে হবে। কমিশন তিন প্রকার বিচ্ছিন্নতার উল্লেখ করেছেন, যেমন—

dascoaching.in

Scanned with CamScanner

(১) বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষাধারা থেকে বিচ্ছিন্নতা,

(২) বিদ্যালয় থেকে বিচ্ছিন্নতা এবং

(৩) শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে বিচ্ছিন্নতা।

(১) প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষণের প্রচলিত ব্যবস্থার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষকদের শিক্ষণ ব্যবস্থা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষাধারা (Main stream) থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, সেইসঙ্গে অবহেলিত।

এই ধরনের বিচ্ছিন্নতা দূরীকরণ প্রসঙ্গে কমিশন 'শিক্ষা' (Education)-কে সমাজবিজ্ঞান হিসেবে স্বীকৃতি দানের জন্য সুপারিশ করেন। কমিশন বলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে মূল শিক্ষা ধারাতে 'শিক্ষা'কে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ভারতবর্ষে একটি সাধারণ প্রবণতা হল 'শিক্ষা'কে শিক্ষণপদ্ধতির সঙ্গে যুক্ত করে দেখা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শিক্ষক—শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বা ট্রেনিং কলেজগুলিতে পড়ানো সীমাবদ্ধ থাকে এবং একমাত্র যে সমস্ত ব্যক্তি শিক্ষকতার পেশায় আসেন তাঁরাই পেশাগত কারণে বিষয়টি নিয়ে পড়াশোনা করেন। কিন্তু আধুনিক যুগে এই চিন্তাধারায় বদল ঘটেছে। শিক্ষা হল মানব জীবনের বিভিন্ন দিকে পরিবর্তন ঘটানোর মূল অস্ত্র। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, নৈতিক পরিবর্তনের মধ্যেই এর গুরুত্ব শেষ হয়ে যায় না। **শিক্ষা শুধুমাত্র বৌদ্ধিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটায় না, মানবজীবনের সর্বক্ষেত্রে শিক্ষা পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম।** শিক্ষাব্যবস্থার মূলধারার প্রায় প্রতিটি বিষয়-এর সঙ্গে এর সম্পর্ক রয়েছে। এই কারণে **ভারতীয় শিক্ষা কমিশন** (১৯৬৪-১৯৬৬) শিক্ষার ক্রমবর্ধমান পরিধি এবং গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে 'শিক্ষা' (Education)-কে সমাজবিজ্ঞানের একটি অঙ্গ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে একটি পৃথক স্বতন্ত্র স্বাধীন বিভাগ (independent discipline) হিসেবে বিবেচনা করার সুপারিশ করেছেন। কমিশন 'শিক্ষা'-কে শিক্ষণ পদ্ধতি হিসেবে বিবেচনা করার পাশাপাশি একটি স্বাধীন স্বতন্ত্র বিভাগে উন্নীত করার উপর জোর দিয়েছেন। এছাড়াও শিক্ষাবিজ্ঞানে দু-বছরের এম.এ. (স্নাতকোত্তর) ডিগ্রির প্রবর্তন এবং স্নাতক ও স্নাতকোত্তর উভয় স্তরেই শিক্ষাদানের অনুশীলনকে বাধ্যতামূলক করার কথা বলেছেন। নির্বাচিত কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষণ, গবেষণাকার্য প্রভৃতি পরিচালনা করার জন্য শিক্ষাবিভাগ স্থাপন করার কথা উল্লেখ করেন।

❑ ১.২.৪ বিদ্যালয় স্তরের পাঠক্রমে শিক্ষাবিজ্ঞানের স্থান (Place of Education in School curriculum) :

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় '**পাঠ্যক্রম**' এবং '**পাঠ্যসূচি**' দুটি উল্লেখযোগ্য ধারণা। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে পাঠ্যসূচিটি হল সামগ্রিক পাঠ্যক্রমের একটি অংশমাত্র এবং ধারণা দুটির একটি অন্যটির সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পর্কিত ও সমন্বিত। **ট্যানার এবং ট্যানার** (১৯৮০) পাঠ্যক্রমের একটি কার্যকরী সংজ্ঞাদান করতে গিয়ে বলেছেন :

> Curriculum is that construction of knowledge and experience systematically developed under the auspices of the school (or university), to enable the learner to increase his or her control of knowledge and experience. [Tanner, D and tanner, K (1989)]

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার কোনো একটি বিশেষ স্তরের (প্রাথমিক/মাধ্যমিক/উচ্চমাধ্যমিক ইত্যাদি) শিক্ষণীয় বিষয়গুলির সম্পষ্টিগত অবস্থা বা পূর্ণাঙ্গ রূপরেখাই হল তার **পাঠ্যক্রম**। সেখানে অন্তর্ভুক্ত হয় শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু (পাঠ্যসূচি), শিক্ষাদান প্রস্থতি, মূল্যায়ন কৌশল, বিভিন্ন উপকরণ ও শিক্ষা সংক্রান্ত বিদ্যালয়ের অন্যান্য কর্মসূচি সবকিছুই। **পাঠ্যক্রম** হল বিদ্যালয়ের সামগ্রিক কার্যক্রমের পরিকল্পনা আর **পাঠ্যসূচি** হল সামগ্রিক পাঠ্যক্রমটির অংশ বিশেষ। স্বাভাবিকভাবেই বিদ্যালয় স্তরে অন্তর্ভুক্ত কোনো একটি বিষয়ের (subject) পাঠ্যবিষয় বস্তু (content) বিদ্যালয়ের সামগ্রিক পাঠক্রমে একটি প্রভাব ফেলবেই, পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য বিষয়গুলির তার সম্পর্ক থাকবেই, এবং একটি সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টাতেও তার ভূমিকা অবশ্যই থাকবে। সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে যদি শিক্ষাবিজ্ঞানকে দেখি তাহলে তার ভূমিকা সামগ্রিক পাঠ্যক্রমে কতখানি তা আলোচনা করার প্রয়োজন আছে। **শিক্ষাবিজ্ঞানের সেই ভূমিকার বিভিন্ন দিকগুলির কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হল :**

(১) প্রথাগত শিক্ষা ও শিক্ষাবিজ্ঞানের প্রাসঙ্গিকতা,

(২) শিক্ষার্থীর জ্ঞানমূলক বিকাশ ও শিক্ষাবিজ্ঞান,

(৩) শিক্ষার্থীর ভাব ও ভাষামূলক বিকাশ ও শিক্ষাবিজ্ঞান,

(৪) গণিত ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মূল তাৎপর্য উপলব্ধিতে শিক্ষাবিজ্ঞান,

(৫) বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞানের তাৎপর্য উপলব্ধিতে শিক্ষাবিজ্ঞান,

(৬) শিক্ষার্থীর জীবনাদর্শ ও জীবন গঠনে শিক্ষাবিজ্ঞানের প্রাসঙ্গিকতা,

(৭) শিক্ষাব্যবস্থার ব্যবহারিক দিকের কার্যকারিতা প্রসঙ্গে শিক্ষাবিজ্ঞান ইত্যাদি।

উপরোক্ত দিকগুলি সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল :

(১) প্রথাগত শিক্ষা ও শিক্ষাবিজ্ঞানের প্রাসঙ্গিকতা :

প্রথাগত শিক্ষা ব্যবস্থায় যখন শিক্ষার্থীর প্রবেশ ঘটে তখন তার সামনে একটি লক্ষ্য অবশ্যই থাকে। শিক্ষার্থী নিজে সেই অপরিণত অবস্থায় সেই বিষয়টি সম্পর্কে অবগত না হলেও, পরবর্তী সময়ে ধীরে ধীরে তার উপলব্ধির স্তরে স্থান পেতে থাকে কিন্তু তখনও পর্যন্ত স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় না। শিক্ষার লক্ষ্য যে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের সম্পূর্ণ বিকাশসাধন, মস্তিষ্ক, হৃদয় ও কর্মের দক্ষতার বিকাশ ঘটানো সেই ব্যাপারটি শিক্ষার্থী উপলব্ধি করতে পারে না। ফলে যে সমস্ত বিষয়গুলির বিদ্যালয় শিক্ষাজীবনে সে মুখোমুখি হয়, যে

Scanned with CamScanner

অভিজ্ঞতাগুলি সে অর্জন করতে থাকে সেগুলির সাথে তার যথার্থ সম্পর্ক স্থাপিত হয় না। কিন্তু যদি সে বিষয়গুলিকে (subject) সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারে, অন্যান্য বিষয়গুলির সঙ্গে ওই নির্দিষ্ট বিষয়ের সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে তাহলে তার সেই সমস্যা থাকে না। শিক্ষাবিজ্ঞানের অন্তর্গত পাঠ্যসূচির বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক দিকগুলি শিক্ষার্থীর সামগ্রিক পাঠ্যক্রমিক বিষয়গুলির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করতে এবং বিষয়গুলির প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধিতে সাহায্য করে। আবার বাস্তব অভিজ্ঞতার বৃদ্ধি ও তাত্ত্বিক জ্ঞান বৃদ্ধির সাথে সাথে শিক্ষার্থীর নিজস্ব চরিত্রগঠন, মূল্যবোধ সৃষ্টি, ভবিষ্যৎ জীবন ও কর্ম সম্পর্কে সজাগ বা সচেতন করে তোলার বিভিন্ন দিকগুলিকে শিক্ষাবিজ্ঞান শিক্ষার্থীর নিকট স্পষ্ট করে তোলে। মানবজীবনে শিক্ষার বিভিন্ন লক্ষ্যগুলির যেমন জ্ঞানমূলক লক্ষ্য, কৃষ্টিমূলক লক্ষ্য, চরিত্রগঠনের লক্ষ্য, আধ্যাত্মিক লক্ষ্য, অভিযোজনমূলক লক্ষ্য, বৃত্তিমূলক লক্ষ্য, নাগরিকতার লক্ষ্য, নৈতিক ও মূল্যবোধগত লক্ষ্য, অবসরযাপনের লক্ষ্য, সম্পূর্ণ জীবন যাপনের লক্ষ্য সামগ্রিকভাবে বলা যায় সর্বাঙ্গীণ বিকাশের লক্ষ্য সম্পর্কে শিক্ষার্থীর নিকট আলোকবর্তিকার ভূমিকা পালন করে শিক্ষাবিজ্ঞান। অর্থাৎ শিক্ষাবিজ্ঞান প্রথাগত শিক্ষার অন্তর্গত বিভিন্ন বিষয়গুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় ও সমন্বয়-সাধন করে শিক্ষার্থীর নিকট প্রথাগত শিক্ষার তাৎপর্যকে নির্দিষ্ট ও স্পষ্ট করে তোলে।

(২) শিক্ষার্থীর জ্ঞানমূলক বিকাশ ও শিক্ষাবিজ্ঞান :

যখন কোনো বিষয় (subject) পাঠ্যক্রমে (curriculum) স্থান পায় তখন তার জ্ঞানমূলক দিকটি বিশেষভাবে গুরুত্ব পায়। শিক্ষার্থীর মানসিক ক্ষমতার বিকাশ ঘটিয়ে কীভাবে প্রাসঙ্গিক বিষয়ের জ্ঞানগুলিকে শিক্ষার্থীর মধ্যে আত্মস্থ করা যায়, তার একটা চিন্তা বিষয় শিক্ষক (subject teacher) তথা প্রাসঙ্গিক বিষয়টির একটি দায়বদ্ধতা থাকে। শিক্ষার্থীর মানসিক ক্ষমতার স্বরূপ, বৈশিষ্ট্য, কোনো কোনো বিষয়ের বা অবস্থার উপর মানসিক ক্ষমতার বিকাশ নির্ভরশীল, এককথায় শিক্ষার্থীর মানসিক বিকাশের নানান দিক সম্পর্কে যে ধারণা থাকা দরকার সেই বিষয়ে বিষয় শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয়ের নিকট গুরুত্বপূর্ণ। মানসিক বিকাশের বিভিন্ন দিকগুলি সম্পর্কে সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে সহায়তা করে থাকে শিক্ষাবিজ্ঞান। বিদ্যালয় শিক্ষাস্তরে শিক্ষাবিজ্ঞানের জ্ঞান মানসিক বিকাশের বিশেষ করে জ্ঞান-মূলক বিকাশের নানা দিকের ব্যাপারে শিক্ষক, শিক্ষা-প্রশাসক ও শিক্ষার্থী সকলকে সমৃদ্ধ করে। সেই কারণে বর্তমান উচ্চমাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যক্রমে শিক্ষাবিজ্ঞান একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করেছে।

(৩) শিক্ষার্থীর ভাব ও ভাষামূলক বিকাশ ও শিক্ষাবিজ্ঞান :

মানব জীবনে ভাষার বিকাশ একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। ভাষা মানুষের মনের ভাব প্রকাশে সহায়তা করে, সেই সঙ্গে তা চিন্তন, ধারণা ইত্যাদির বিকাশে সহায়তা করে। অন্য মানুষের ব্যক্তিত্ব ও চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রেও ভাষার গুরুত্ব অনেকখানি।

স্বাভাবিকভাবেই ভাষা একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেয়েছে মানুষের শিক্ষাজীবনেও। এই ভাষার সৃষ্টি, বিবর্তন, কার্যধারা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দান করে শিক্ষাবিজ্ঞানের জ্ঞান। ভাষার মনোবৈজ্ঞানিক, সামাজিক ও ঐতিহাসিক গুরুত্বকে শিক্ষার্থীর নিকট তুলে ধরে শিক্ষাবিজ্ঞানের ধারণা।

ভাষা বিকাশ শুরু হয় ব্যক্তির নাম দিয়ে। পরে ধীরে ধীরে অন্যান্য শব্দগুলি শেখে। শিশু যে পরিবেশে অবস্থান করে, সেখানকার পরিচিত ও ব্যবহৃত শব্দের সাহায্যে সে তার কথায় মনের ভাব প্রকাশ করে। সাধারণত দুই থেকে তিন বছরের মধ্যে শিশু তার প্রয়োজন মতো কাজ চালানোর ভাষা শিখতে পারে।

শিশুর ভাষার বিকাশ তার আর্থ-সামাজিক পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। আবার অন্যের ভাষার মধ্যেকার ভাবকে বোঝবার ক্ষমতা চর্চা বা অনুশীলনের উপর নির্ভর করে। শিশুর সঙ্গী-সাথীর বয়সের উপরও নির্ভর করে শিশুর ভাষার বিকাশ।

ভাষা বিকাশের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল বাক্য প্রকাশের ক্ষমতার বিকাশ। মনের ভাবকে ভাষায় প্রকাশ করার ক্ষমতা প্রায় ছয় বছরের মধ্যে বিকশিত হয়। সার্থকভাবে শব্দ উচ্চারণের ক্ষমতার বিকাশ এই সময়কালের মধ্যেই হয়।

এই সমস্ত দিকগুলি সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা দিতে সক্ষম শিক্ষাবিজ্ঞান। যার ফলশ্রুতি ভোগ করে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয়েই।

ভাষা সংক্রান্ত একটি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত ও গুরুত্বপূর্ণ স্থান নিয়ে আছে ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাসে। **কোঠারি কমিশন (1964-66) এর সিদ্ধান্ত বেশ স্পষ্ট।** (১) মাতৃভাষা অবশ্যই শিক্ষার মাধ্যম হবে। মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তর পর্যন্ত অবিলম্বে মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করতে হবে। (২) যে সকল বিদ্যালয়ে সর্বভারতীয় ছাত্রছাত্রীদের পড়াবার ব্যবস্থা আছে, সেই সকল বিদ্যালয়ে সাময়িকভাবে ইংরেজিকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে রাখতে হবে। ধীরে ধীরে এই সকল বিদ্যালয়েও হিন্দিকে শিক্ষার মাধ্যম করা সম্ভব হবে। (৩) 'Link Language' হিসেবে আন্তর্জাতিক ভাব বিনিময়ের ক্ষেত্রে ইংরেজির প্রাধান্য রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন।

NCF-2005-এ ভাষামূলক দক্ষতার বিকাশ অর্থাৎ কথন ও শ্রবণ, পঠন এবং লিখনকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শিক্ষার্থীর জ্ঞানলাভের ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকাকে বিশেষভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। আবার ত্রিভাষা সূত্রকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে বলা হয়েছে শিশুর শিক্ষার ক্ষেত্রে মাতৃভাষাই শিক্ষার শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। সেই সঙ্গে ভারতবর্ষের মতো বহু ভাষাভাষী চরিত্র সম্পন্ন ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থাকে বিদ্যালয় শিক্ষার সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করার কথা বলা হয়েছে। ভাষা সংক্রান্ত এই যে বিস্তৃত ধারণা, তা পাওয়া সম্ভব শিক্ষাবিজ্ঞানের ধারণা থেকেই। সেই দিক থেকে বিদ্যালয় শিক্ষাক্ষেত্রে পাঠ্যক্রম একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান নিয়েছে শিক্ষাবিজ্ঞান।

Scanned with CamScanner

(৪) গণিত ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলির তাৎপর্য উপলব্ধিতে শিক্ষাবিজ্ঞান :

N.C.F-2005 অনুসারে গণিত শিক্ষার ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, গণিতের বিভিন্ন ফর্মুলা বা সূত্র এবং যান্ত্রিক প্রক্রিয়া (mechanical process) গুলির তুলনায় অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল গাণিতিকরণ (Mathematization) অর্থাৎ যুক্তি সম্মত চিন্তা করা, গণিতের ফর্মুলা বা সূত্রগুলির উপলব্ধি এবং বিমূর্ত চিন্তায় (abstract thinking) প্রয়োগ করতে পারার ক্ষমতার বিকাশ সাধন। গণিত বিষয়ের শিক্ষণ শিক্ষার্থীর যুক্তি ক্ষমতার বিকাশ এবং বিমূর্ত সমস্যার সমাধান ঘটাতে ফর্মুলা বা সূত্রের প্রয়োগ ক্ষমতার বৃদ্ধিতে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করা উচিত। শিক্ষাবিজ্ঞানের অন্তর্গত পাঠ্যসূচির শিখন তত্ত্বগুলি এই ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের উল্লেখযোগ্য ভাবে সহায়তা দিতে সক্ষম। উন্নত গুণমানের গণিত শিক্ষার অধিকার প্রতিটি শিশু শিক্ষার্থীর ন্যায্য অধিকার। শিক্ষাবিজ্ঞান শিক্ষার্থীকে সেই সম্পর্কে সচেতন করে তোলে।

অনুরূপভাবে বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যাপারে বলা হয়েছে বিজ্ঞানের **শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু** (content) **পদ্ধতি** (process) এবং **বিজ্ঞান শিক্ষার ভাষা** (language of science teaching) অবশ্যই শিক্ষার্থীদের বয়স এবং মানসিক ক্ষমতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। বিজ্ঞানশিক্ষা শিক্ষার্থীকে বিজ্ঞানের পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার সঙ্গে এমনভাবে পরিচিতি ঘটাবে যাতে শিক্ষার্থীর কৌতূহল, পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা এবং সৃজনীশক্তি ও আবিষ্কারের প্রেরণাকে বিশেষভাবে পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে জাগ্রত করতে পারে। সর্বোপরি বিজ্ঞানচেতনা ও বিজ্ঞান মনস্কতার সামগ্রিক দিকটি শিশুকে তার পরিবেশ সম্পর্কে আগ্রহী ও সচেতন করে তুলবে। বিজ্ঞান শিক্ষণের এই দৃষ্টিভঙ্গি যেমন শিক্ষক শিক্ষাবিজ্ঞান থেকে লাভ করতে পারেন তেমনি শিক্ষার্থী শিক্ষাবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত বিষয়-বস্তুর অধীত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে বিজ্ঞান শিখনের মূল তাৎপর্য উপলব্ধি করতে সহায়তা করে।

(৫) বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞানের তাৎপর্য উপলব্ধিতে শিক্ষাবিজ্ঞান :

শিক্ষাবিজ্ঞানকে একটি সামাজিক বিজ্ঞান হিসেবে বিবেচনা করা হলেও, এটি এককভাবে কোনো মৌলিক বিষয় নয়। এটি একটি Interdisciplinary বা Multi-disciplinary বিষয়। অন্যান্য, সামাজিক বিজ্ঞানগুলির সাথে শিক্ষাবিজ্ঞান গভীরভাবে সম্পর্কিত। দর্শন, মনোবিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতির মতো মৌলিক বিষয় শিক্ষাবিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ ও পরিপুষ্ট করেছে। শুধু তাই-ই নয়, জীববিজ্ঞান তথা শারীর বিজ্ঞান, রাশিবিজ্ঞানের মতো বিষয় শিক্ষাবিজ্ঞানকে প্রভাবিত করেছে অনেকখানি।

মানবজীবনে মানুষের দুটি প্রধান সত্তা বা অস্তিত্ব হল ব্যক্তিসত্তা এবং সমাজসত্তা। শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তি বা শিক্ষার্থী তার এই ব্যক্তিসত্তা ও সমাজসত্তার বিকাশ ঘটায়। শিক্ষার্থীর সামাজিক অস্তিত্বরক্ষার জন্য যে সামাজিক বিকাশ সংঘটিত হয় তাতে সহায়তা করে সামাজিক

বিজ্ঞানের অন্তর্গত বিভিন্ন বিষয়গুলি, যেমন—ইতিহাস, ভূগোল, রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমাজতত্ত্ব অর্থনীতি ইত্যাদি। মানবজাতির সামগ্রিক সংস্কৃতিকে উপলব্ধি এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বিষয়গুলি মানবশিশু যেহেতু বংশগত বস্তু হিসেবে পূর্বপুরুষ থেকে অর্জন করতে পারে না, তাই তাকে তার নিজের জীবনে নিজস্ব প্রচেষ্টায় সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকগুলি অর্জন করতে হয় শিক্ষার মাধ্যমে। শিক্ষার্থী তার শিক্ষাজীবনকালে বিভিন্ন, সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়গুলির মাধ্যমে তা অর্জন করে। নতুন নতুন জ্ঞান অর্জন, দক্ষতালাভ, দৃষ্টিভঙ্গি গঠন, চরিত্রগঠন, নৈতিক মূল্যবোধ গঠন, সৃজনী ক্ষমতার বিকাশ ও সৌন্দর্যবোধের উপলব্ধি সবই ঘটে উপরোক্ত বিষয়গুলি অধ্যয়নে। কিন্তু কীভাবে তা অর্জন করা যায়; তার কৌশল, তত্ত্বগত ধারণা দান প্রভৃতি সম্ভব হয় শিক্ষা বিজ্ঞানের দ্বারা। সামাজিক বিজ্ঞানগুলির সঙ্গে শিক্ষাবিজ্ঞানের গভীর সম্পর্ক এক্ষেত্রে সহায়কের ভূমিকা পালন করে। আর এইভাবেই শিক্ষার্থীকে সমাজ জীবনের উপযোগী করে গড়ে তোলার কাজে শিক্ষাবিজ্ঞানের ভূমিকা অনেকখানি। উচ্চমাধ্যমিক স্তরে শিক্ষাবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্তি এজন্য ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

(৬) শিক্ষার্থীর জীবনাদর্শ ও জীবনগঠনে শিক্ষাবজ্ঞানের প্রাসঙ্গিকতা :

বহুপ্রচলিত কথা **"যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি"** প্রকৃত অর্থেই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ শিক্ষা এবং জীবন সমার্থক। মানুষ সারাজীবনই শিক্ষালাভের সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু প্রথাগত শিক্ষার একটি বিশেষ স্তরে শিক্ষার্থী কীভাবে তার জীবনকে গড়ে তুলবে, তার জীবনের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যই বা কী হবে তা নির্ণয় করা অত্যন্ত জরুরি। বিদ্যালয় পাঠক্রমে যে সমস্ত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত, সেগুলির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা যদি উপলব্ধি করতে হয় তবে অবশ্যই বিভিন্ন পণ্ডিত ও দার্শনিকদের নির্দেশিত পথকে অবলম্বন করতেই হয়। দার্শনিকগণ মানুষের জীবনের সঠিক পথ নির্দেশ করতে সহায়তা করেন। দার্শনিকদের এই কাজটি অত্যন্ত দায়িত্বের সঙ্গে পালন করেন শিক্ষাবিজ্ঞানী তথা শিক্ষাবিজ্ঞানের মূলসূত্রগুলি বা দিকগুলি।

UNESCO নিযুক্ত আন্তর্জাতিক শিক্ষণ কমিশনের মূল বক্তব্যই হল যে, শিক্ষা হল মানুষের অধিকার এবং একটি অতিগুরুত্বপূর্ণ উপকরণ যার দ্বারা ব্যক্তি সাম্য, বিকাশ ও শান্তির লক্ষ্যে পৌঁছতে সমর্থ হয়। কমিশনের সভাপতি **জ্যাকস্ ডেলর** ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের গভীর চিন্তনের প্রতিফলন হল এই প্রতিবেদনটি।

প্রতিবেদনের মতে সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থাটি গড়ে উঠবে চারটি স্তম্ভকে অবলম্বন বা ভিত্তি করে। সেগুলি হল—

(ক) জানার জন্য শিক্ষা

(খ) কর্ম সাধনের জন্য শিক্ষা

(গ) একসাথে বেঁচে থাকার জন্য শিক্ষা

(ঘ) পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে ওঠার জন্য শিক্ষা।

ebook.dascoaching.in

Scanned with CamScanner

এই উদ্দেশ্যগুলিকে ভিত্তি করে শিক্ষার্থীর জীবন বিকাশের জন্য বিদ্যালয় পাঠক্রমে যে সমস্ত বিষয়গুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, সেগুলির প্রকৃত উপলব্ধি, তাৎপর্য নির্ণয় এবং সর্বোপরি সাফল্য লাভের জন্য শিক্ষাবিজ্ঞানের মতো বিষয়টি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিকভাবে সহায়তা করে। বলা যায় শিক্ষাবিজ্ঞান উপরোক্ত দায়িত্ব পালনে দায়বদ্ধ। স্বাভাবিকভাবেই উচ্চমাধ্যমিক স্তরে বিদ্যালয় পাঠক্রমে শিক্ষাবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্তি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। বয়ঃসন্ধিকালে শিক্ষার্থীদের কাছে শিক্ষার যথার্থ উপলব্ধি ও বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি গঠনে যা তুলনাহীন।

(৭) **শিক্ষাব্যবস্থার ব্যবহারিক দিকের কার্যকারিতা প্রসঙ্গে শিক্ষাবিজ্ঞান :** শিক্ষাব্যবস্থায় তাত্ত্বিক দিকগুলির মতো ব্যবহারিক বা প্রয়োগমূলক দিকগুলিও গুরুত্বপূর্ণ। এই সমস্ত ব্যবহারিক দিকগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য পাঠক্রম নির্বাচন, সময়তালিকা প্রস্তুতকরণ, শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন প্রসঙ্গ, বিদ্যালয় প্রশাসনিক বিষয়, বিদ্যালয় শৃঙ্খলা স্থাপন ইত্যাদি। এগুলি প্রতিটি ক্ষেত্রে শিক্ষাবিজ্ঞানে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে।

পাঠক্রম নির্ধারণের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর গ্রহণ ক্ষমতা, আগ্রহ, রুচি, শিখন ক্ষমতা, মনোযোগের বিষয়, বয়স ইত্যাদির কথা মাথায় রাখার প্রয়োজন হয়। শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন প্রসঙ্গে বলা যায় গতানুগতিক পরীক্ষা ব্যবস্থা যেমন গুরুত্বহীন হয়েছে তেমনি আধুনিক মূল্যায়নের ধারণা গুরুত্ব পেয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন মূল্যায়ন ব্যবস্থা যেমন Formative Evaluation, Summative Evaluation প্রভৃতি স্থান পেয়েছে। মূল্যায়নের এই দৃষ্টিভঙ্গি গঠনে শিক্ষাবিজ্ঞানের জ্ঞান অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। এছাড়া বিদ্যালয়ের সময় তালিকা প্রস্তুতের ক্ষেত্রেও শিক্ষবিজ্ঞানের অভিজ্ঞতা ভীষণভাবে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে। দিনের প্রথম ভাগে কোন্ বিষয়গুলিকে দাম দেওয়া উচিত, দিনের শেষভাগেই বা কোন্ বিষয়গুলিকে রাখা উচিত সময় তালিকায়, কোন্ সময়ে বিরতি দেওয়া উচিত ইত্যাদি বিষয়গুলি সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক অভিজ্ঞতা দানে সমৃদ্ধ করে শিক্ষা বিজ্ঞান।

বিদ্যালয় শিক্ষাব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল বিদ্যালয় প্রশাসন। এই বিদ্যালয় প্রশাসন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানের অন্তর্গত শিক্ষা-মনোবিদ্যার দিক নতুন পথের সন্ধান দিয়েছে। বিদ্যালয় পরিচালনার ব্যাপারে প্রধানশিক্ষকের করণীয় কী, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে তিনি কীভাবে সম্পর্ক স্থাপন করে সার্থকভাবে অভিযোজন সম্পন্ন করে শিক্ষাক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে প্রশাসনও পরিচালন ব্যবস্থা সুসম্পন্ন করবেন তার পথ নির্দেশ পেতে পারেন। শিক্ষার্থীরা নিজেরাও প্রশাসনিক ও বিদ্যালয় পরিচালনার বিষয়গুলি সম্পর্কে কিছুটা অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়ে তার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারে। যেগুলি পরবর্তীকালে কর্মজীবনেও তার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

বিদ্যালয় শিক্ষার একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল **শৃঙ্খলা** (Discipline) স্থাপনের প্রসঙ্গ। আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শৃঙ্খলার গতানুগতিক ধারণা পরিবর্তিত হয়েছে। শৃঙ্খলা কোনো বাধনের বিষয় নয়, শিক্ষার্থীর ওপর জোর করে এটি আরোপ করে সুফল পাওয়া

যায় না। শৃঙ্খলা হল ব্যক্তির অন্তরের উপলব্ধ বিষয়। এটির প্রকাশ হবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। শিক্ষার্থী স্বতঃস্ফূর্তভাবে যখন শৃঙ্খলা রক্ষা করে চলে তখন সেটিই হল প্রকৃত শৃঙ্খলা। শিক্ষাবিজ্ঞানের জ্ঞান শৃঙ্খলারক্ষার এই উপলব্ধিকে যথার্থভাবে ফলপ্রসূ করতে সহায়তা করে।

উপরোক্ত ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার প্রসঙ্গগুলিকে শিক্ষার্থীদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলতে সাহায্য করে। স্বাভাবিকভাবে উচ্চমাধ্যমিক স্তরের মতো শিক্ষাস্তরে শিক্ষাবিজ্ঞানকে অন্তর্ভুক্ত করা যথার্থভাবে যুক্তিযুক্ত এবং প্রাসঙ্গিক।

উপরোক্ত ক্ষেত্রগুলি ছাড়াও শিক্ষাবিজ্ঞান শিক্ষার্থীকে শিক্ষার একটি ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গি গঠন করতে সক্ষম। নিম্নে সেই বিষয়টি উল্লেখ করা হল—

(i) জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে শিক্ষার্থীর ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গঠন।
(ii) বাস্তব জীবনে শিক্ষার্থীর দক্ষতা ও প্রয়োগ ক্ষমতার বিকাশ-সাধন।
(iii) সামাজিক, নৈতিক ও চারিত্রিক মূল্যবোধ গঠনের মাধ্যমে সঙ্গতিবিধানে সহায়তা।
(iv) উৎপাদনশীল দৃষ্টিভঙ্গি গঠনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর ঘটানো।
(v) দেশপ্রেম, গণতান্ত্রিক চেতনার উন্মেষ ও ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা গঠন।
(vi) দেশ ও জাতির উন্নতিতে শিক্ষার্থীর নিজেকে যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিতে পরিণত হতে সহায়তা দান।
(vii) স্বদেশের সংস্কৃতিকে জানতে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে উপলব্ধি ও অংশগ্রহণ করতে সহায়তা দান।
(viii) সর্বজনীন স্বাক্ষরতার প্রাসঙ্গিকতা এবং শিক্ষার অধিকারের ব্যাপারে সচেতনতা প্রদান।
(ix) রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীর নিজের অবস্থানকে চিহ্নিত করতে সাহায্য দান।
(x) জীবন ও পরিবেশ এক অবিচ্ছেদ্য বন্ধন ও সম্পর্কে আবদ্ধ সেই উপলব্ধিতে সহায়তা দান।

১.৩ সমাজবিজ্ঞানের (শিক্ষাবিজ্ঞান) বিভিন্ন শাখার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক [Inter relationship of various branches of Social Science (Education)] :

আজকের আধুনিক যুগে 'শিক্ষা' বিষয়টিকে একটি স্বতন্ত্র মর্যাদা দেওয়া হলেও প্রকৃতপক্ষে 'শিক্ষা' বলতে বোঝায় এমন একটি বিষয় যা ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্র থেকে তত্ত্ব ও তথ্য আহরণ করে সামগ্রিকভাবে মানব জীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়। এতে যেমন শিক্ষার সংজ্ঞা বদলেছে তেমনি বিস্তার লাভ করেছে তার পরিধি। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়বস্তু ভিন্ন ভিন্ন ভাবে

Scanned with CamScanner

শিক্ষাকে সমৃদ্ধ করে তাকে সুসংহত রূপদান করেছে। বিভিন্ন বিষয়ের ভিন্ন ভিন্ন বিষয়বস্তু বৈচিত্র্য নিয়ে শিক্ষার অঙ্গিনাকে করেছে পরিপুষ্ট। শিক্ষার এই নিজস্ব অস্তিত্বের প্রকৃতিকে আজ অস্বীকার করার উপায় নেই। খণ্ড খণ্ড বিষয় ও অভিজ্ঞতা আজ অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে শিক্ষার মাধ্যমে। এজন্যই শিক্ষাকে ইংরেজিতে বলা হয় **'Inter-disciplinary approach'** বা **'Multi-disciplinary approach'**। তবে এই দৃষ্টিভঙ্গিতে শিক্ষার মধ্যে বিভিন্ন বিষয়গুলির সম্বন্ধ ঘটেছে এমন নয়, আবার এর মধ্যে আছে সাঙ্গীকরণ। স্বাভাবিক ভাবেই শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়গুলির সামান্য ধারণা এবং শিক্ষাবিজ্ঞানের সঙ্গে তাদের সম্পর্কও আলোচনার যেমন প্রয়োজনও আছে, তেমনি শিক্ষাবিজ্ঞান শিক্ষকের গুণাবলী কেমন হওয়া দরকার এবং আধুনিক শিক্ষায় তাঁর ভূমিকা কতখানি যে সম্পর্কে এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

❑ ১.৩.১ শিক্ষাবিজ্ঞানের সঙ্গে অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের পারস্পরিক সম্পর্ক (Interrelationship of various social science subjects with Education) :

❖ ১.৩.১.১ দর্শনশাস্ত্র ও শিক্ষাবিজ্ঞানের পারস্পরিক সম্পর্ক (Interrelationship of philosophy with Education) :

বাংলা **'দর্শন'** শব্দটি দৃশ্ ধাতু থেকে উৎপন্ন, এর অর্থ হল 'দেখা'। অর্থাৎ এই বিশ্ব জগৎকে দেখা বা বিশ্বজগৎ সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা। আবার **ইংরেজি 'Philosophy'** শব্দটি গড়ে উঠেছে দুটি গ্রিক শব্দ **'Philos'** এবং **'sophia'**-এর সমন্বয়ে। 'Philos' শব্দের অর্থ হল ভালোবাসা বা আকর্ষণ আর 'sophia' শব্দের অর্থ হল 'জ্ঞান'। সুতরাং Philosphy শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ দাঁড়ায় জ্ঞানের প্রতি ভালোবাসা বা আকর্ষণ, গ্রিক দার্শনিক প্লেটোর কথায় "He who has a taste for every sort of knowledge and is anxious to learn and is never satisfied may be just termed as philospher." আবার জ্ঞানের প্রতি ভালোবাসার উদ্দেশ্য হল চিরন্তন সত্যের অনুসন্ধান করা। শিক্ষাবিদ **রেমন্টের** মতে "Philosophy is an unceasing effort to discover the general truth that lies behind the particular facts, to discover also the realities that lies behind appearance."

আবার, আধুনিক অর্থে শিক্ষা হল শিশুর জন্মগত সম্ভাবনার বিকাশে সহায়তা করার প্রক্রিয়া। সুতরাং শিক্ষা ও দর্শন উভয়ই মানব জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, এই কারণে বলা যেতে পারে শিক্ষা ও দর্শন পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত। দর্শনের সঙ্গে শিক্ষা বা শিক্ষাবিজ্ঞানের এই সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করা হল।

(১) জীবনের গতি নির্ধারণে শিক্ষা ও দর্শন :

শিক্ষার উদ্দেশ্য হল শিশুকে তার জন্মগত সম্ভাবনার বিকাশ ঘটিয়ে আচরণ ধারার

পরিবর্তন ও পরিবর্ধনে সহায়তা করা। কিন্তু প্রশ্ন হল এই আচরণ ধারার পরিবর্তন তথা পরিবর্ধনের গতি কোন্ দিকে পরিচালিত বা অগ্রসর হবে, সেই বিষয়ে প্রকৃত দিক নির্দেশ পেতে শিক্ষাবিজ্ঞানকে দর্শন শাস্ত্রের উপর নির্ভরশীল হতে হয়। কোন্ কোন্ জীবনাদর্শ অবলম্বন করে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করে তাদের নিজেদের জীবনাদর্শ গঠন করা হবে, কোন্ পদ্ধতির হাত ধরে সেই উদ্দেশ্য পূরণ সম্ভব হবে, শিক্ষার্থীর জীবনের মূল অনুপ্রেরণাই বা কী অর্থাৎ এককথায় শিক্ষার্থীর সামগ্রিক জীবনবোধ কোন্ পথে নির্দেশিত হবে তার দায়িত্ব পালন করে দর্শন। সে দিক থেকে বলা যেতে পারে শিক্ষাবিজ্ঞান দর্শন কর্তৃক নির্ধারিত পথেই অগ্রসর হয়। **জন ডিউই**-এর ভাষায় "Education is laboratory in which philosophic distinctions becomes concrete and are tested." সুতরাং বলা যায় দর্শন মানব ব্যক্তি জীবনের বিকাশের দিক নির্ণয় করে আর শিক্ষাবিজ্ঞান সেই বিকাশের গতিকে নিয়ন্ত্রিত করে।

(২) দর্শন ও শিক্ষাবিজ্ঞানের আলোচনার বিষয়ে সাদৃশ্য :

যে আদর্শের ভিত্তিতে দার্শনিকগণ ব্যক্তিকে জীবন-যাপনের পরামর্শ দিয়ে থাকেন, সেই আদর্শের নির্ধারিত পথে ব্যক্তি তথা সমাজ অনুসরণ করুন এই প্রত্যাশা তাঁদের থাকে। অথচ এই নির্ধারিত জীবনাদর্শ ও মূল্যবোধ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে শিক্ষার ভূমিকা একান্তভাবে প্রয়োজন। উপযুক্ত শিক্ষার মাধ্যমেই ব্যক্তির জীবনাদর্শ ও মুল্যবোধ পরিণতি লাভ করে। সুতরাং সেদিক থেকে দর্শন ও শিক্ষার মধ্যে সাদৃশ্য অনেকখানি। এই প্রসঙ্গে রস (Ross)। এর বক্তব্য হল— "Philosophy and Education are two sides of a coin : the former is contemplative while the later is the active side." অর্থাৎ দর্শন শাস্ত্র আদর্শগত দিক হলে শিক্ষাবিজ্ঞান হল সেই আদর্শগত দিকের প্রয়োগমূলক দিক।

(৩) বিখ্যাত দার্শনিকগণ বিখ্যাত শিক্ষাবিদও :

সেই সুপ্রাচীন কাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত বিভিন্ন মনীষী যাঁরা বিখ্যাত দার্শনিক হিসেবে পরিচিতি পেয়েছিলেন, তাঁদের প্রত্যেকেই বিখ্যাত শিক্ষাবিদও। **পাশ্চাত্যের বিখ্যাত দার্শনিক যেমন সক্রেটিস, প্লেটো, জন লক, রুশো, হার্বার্ট স্পেনসার, ফ্রোয়েবল, জন ডিউই, এইচ. জি. ওয়েলস, বর্ট্রান্ড রাসেল, এন. এন. হোয়াটে হেড, অ্যারিস্টটল, কমেনিয়াস এঁরা প্রত্যেকে শিক্ষাবিদও ছিলেন। ভারতীয় দার্শনিক মহাত্মাগান্ধি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দ, অরবিন্দ ঘোষ, দয়ানন্দ সরস্বতী, সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান, ডঃ জাকির হোসেন অন্যদিকে শিক্ষাবিদও ছিলেন।** এই সমস্ত দার্শনিকগণ প্রত্যেকেই তাঁদের সমকালীন যুগের শিক্ষার আদর্শ, শিক্ষার বিষয়বস্তু, শিক্ষাপদ্ধতি প্রভৃতি শিক্ষার বিভিন্ন দিককে প্রভাবিত করেছিলেন। **জে. এস. রস** (J.S. Ross)-এর ভাষায় "The great philosophers have also been the great educators." স্বাভাবিকভাবেই দর্শন ও শিক্ষাবিজ্ঞানের সম্পর্ককে অস্বীকার করা যায় না।

Scanned with CamScanner

(৪) **রাজনৈতিক দর্শন শিক্ষাবিজ্ঞানের দিক নির্দেশক :**

শিক্ষাবিজ্ঞানের সঙ্গে রাজনৈতিক দর্শনের এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বর্তমান। এর অর্থ হল যে, দর্শন সকল সময় রাজনীতির পশ্চাতে কাজ করে। **কে. ক্ষত্রিয়** (K. Kshatriya)-এর কথায় "If education is a philosophy in action, so also is politics. Political systems are the last resort to the outcome of philosophical positions."

যেমন, ভারতের মতো একটি গণতান্ত্রিক দেশ গণতান্ত্রিক চিন্তার অনুসারী। চিন্তা ভাবনার এই অনুসরণ বা পথ প্রভাবিত করেছে তার শিক্ষার ক্ষেত্রকেও। আবার স্পার্টার সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক চিন্তাধারা তার শিক্ষার ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করে সমাজতান্ত্রিক শিক্ষাধারাকে অনুসরণ করেছিল। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক দর্শন তাদের দেশের শিক্ষার ধারাকে এইভাবেই প্রভাবিত করতে দেখা যায়।

(৫) **শিক্ষার বিভিন্ন দিকে দর্শনের প্রভাব :**

সমস্যার প্রকৃতিতেও দর্শনের সঙ্গে শিক্ষার সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যা আসলে দর্শনেরই সমস্যা। **Gentile**-এর কথায়, "Education without philosophy would mean a failure to understand the precise nature of education." জীবনের লক্ষ্য নির্ণয়ে যেমন দর্শনের প্রভাব তেমনি তার প্রভাব আছে শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয়ে। শুধু তাই নয়, শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যক্তি এবং সমাজের চাহিদা পূরণে দর্শন শিক্ষার পাঠক্রম নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। দর্শনের প্রভাব শিক্ষার আর অন্যান্য যেসব ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয় সেগুলি হল শিক্ষণপদ্ধতি, শৃঙ্খলা স্থাপন, পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, বিদ্যালয় প্রশাসন, মূল্যায়ন ব্যবস্থা, শিক্ষকের ভূমিকা, শিক্ষার্থীর ভূমিকা ইত্যাদি। এজন্য **J.S. Ross** মন্তব্য করেছেন—"From every angle of the educational problems comes the demand for philosophical basis of life and education."

❖ ১.৩.১.২ মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষাবিজ্ঞানের পারস্পরিক সম্পর্ক (Relation of Education with Psychology) :

মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে শিক্ষার্থীবিজ্ঞানের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। মানুষকে কেন্দ্র করে উভয়েই একে অন্যের পরিপূরক হিসেবে আলোচনা করে। মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে শিক্ষাবিজ্ঞানের এই সম্পর্ক উপলব্ধি করতে হলে দুটি দিক থেকে বিবেচনা করতে হবে। এই দুটি দিক হল তাত্ত্বিক দিক এবং ব্যবহারিক দিক। তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক দিক থেকে মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষাবিজ্ঞানের সম্পর্ক নিম্নে আলোচনা করা হল:

তাত্ত্বিক দিক থেকে সম্পর্ক :

(১) **শিক্ষার লক্ষ্য ও মনোবিজ্ঞান :** দর্শনই শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে, কিন্তু সেই লক্ষ্য অর্জন করা শিক্ষার্থীর পক্ষে কতটা সম্ভব তা নির্ধারণ করা

মনোবিজ্ঞানের কাজ। লক্ষ্য যতই আদর্শযুক্ত হোক না কেন, যদি তা শিক্ষার্থীর পক্ষে অর্জন করা সম্ভব না হয় তাহলে শিক্ষার সার্থকতা আসে না। সুতরাং শিক্ষাবিজ্ঞানের সঙ্গে মনোবিজ্ঞানের যে একটা সম্পর্ক আছে তা সহজেই উপলব্ধি করা যায়।

(২) **শিক্ষার উদ্দেশ্য ও মনোবিজ্ঞান :** একবিংশ শতকের শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আন্তর্জাতিক শিক্ষা কমিশন চারটি দিকের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এই চারটি দিক হল—(i) জানার জন্য শিক্ষা, (ii) কর্মের জন্য শিক্ষা, (iii) একত্রে বসবাসের জন্য শিক্ষা এবং (iv) মানুষ হয়ে ওঠার শিক্ষা। সুতরাং **শিক্ষার উদ্দেশ্য বলা যেতে পারে ব্যক্তির মনের বিকাশসাধন, যার মাধ্যমে মানবশিশু পরিণত মানুষ হয়ে ওঠে। আবার মনোবিজ্ঞানের কাজ হল মানব জীবনবিকাশের ধারা অনুশীলন।** সুতরাং সেদিক থেকে শিক্ষাবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের উভয়ের আলোচনার মূল বিষয়বস্তু মানব জীবনের বিকাশের অনুশীলন।

(৩) **আধুনিক শিক্ষার তাৎপর্য ও মনোবিজ্ঞান :** আধুনিক শিক্ষার মূল তাৎপর্য হল **শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা।** অর্থাৎ শিক্ষার কেন্দ্রিয় চরিত্র হল **'শিশু'**। এই ধরনের শিক্ষার মূল বক্তব্য হল, শিশুর নিজস্ব ক্ষমতা, চাহিদা, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, প্রবণতা অনুযায়ী তার শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। আবার প্রতিটি শিশুই অন্য শিশুর থেকে আলাদা। সুতরাং ব্যক্তি বৈষম্যের নীতি মেনে শিশুর শিক্ষার ব্যবস্থা থাকতে হবে। আধুনিক শিক্ষার এই তাৎপর্যের উপলব্ধিতে সহায়তা করেছে মনোবিজ্ঞান। বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে অনুশীলনের মাধ্যমে শিশু শিক্ষার ব্যবস্থাপনায় মনোবিজ্ঞান নিয়োজিত।

(৪) **সক্রিয়তাভিত্তিক শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞান :** আধুনিক শিক্ষার একটি অন্যতম দৃষ্টিভঙ্গি হল সক্রিয়তাভিত্তিক শিক্ষা। আধুনিক শিক্ষাবিদদের মতে, আত্মসক্রিয়তাই হল শিক্ষার উপযুক্ত পদ্ধতি। শিশুকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে নিজের সক্রিয়তার দ্বারাই অর্থাৎ কাজের মাধ্যমেই। এর উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে খেলা ভিত্তিক শিক্ষা। এ প্রসঙ্গে **জন ডিউই** বলেছেন—"Life is byproduct of activities and education is born out of these activities."

(৫) **শিক্ষাবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা :** শিক্ষাবিজ্ঞানের কাজ হল মানবশিশুকে সার্থক আচরণে অভ্যস্ত করে অভিযোজনে সহায়তা করা, এজন্য আচরণের মৌলিক জ্ঞান শিক্ষাতত্ত্ব মনোবিজ্ঞান থেকে গ্রহণ করে। নতুন আচরণ সৃষ্টিতে বা আচরণে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনতে শিক্ষাতত্ত্ব তা প্রয়োগ করে। এদিক থেকে শিক্ষাবিজ্ঞান মনোবিজ্ঞানের আচরণ সম্পর্কিত সূত্রগুলিকে বাস্তবে প্রয়োগ করে সেগুলির যথার্থতা বিচার করে। সেদিক থেকে বলা যায় **মনোবিজ্ঞান শিক্ষাবিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল।** সুতরাং তাদের **উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক আছে** তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

Scanned with CamScanner

শিক্ষাবিজ্ঞানের সঙ্গে মনোবিজ্ঞানের ব্যবহারিক দিক থেকে সম্পর্ক : তাত্ত্বিক দিকের ন্যায় ব্যবহারিক দিক থেকে মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে শিক্ষাবিজ্ঞানের সম্পর্ক বর্তমান।

(১) **পাঠ্যক্রম ও মনোবিজ্ঞান :** পাঠ্যক্রম হল শিক্ষার লক্ষ্যে পৌঁছানোর উপায়। শিক্ষার পাঠ্যক্রম নির্ধারিত হয় লক্ষ্যের পরিপ্রেক্ষিতে যা দর্শন শাস্ত্র দ্বারা প্রভাবিত। কিন্তু শিক্ষার বিষয়বস্তু সংগঠনের ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের ভূমিকা অনেকখানি। আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশ-সাধন এবং পাঠ্যক্রম হল সেই লক্ষ্য পূরণের উপায় মাত্র। পাঠ্যক্রমে তাই ব্যক্তির সমগ্র ব্যক্তি সত্তার বিকাশের উপযোগী উপাদান থাকা দরকার। পাঠ্যক্রমের এই আধুনিক বহুমুখীতা মনোবিজ্ঞান দ্বারা প্রভাবিত।

(২) **শিক্ষাপদ্ধতি ও মনোবিজ্ঞান :** বর্তমানে আধুনিক মনোবিজ্ঞানের প্রভাবে নতুন নতুন আধুনিক শিক্ষণ পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে, যাদের কয়েকটি হল **কিন্ডারগার্টেন শিক্ষণ পদ্ধতি, মন্তেসারি শিক্ষণ পদ্ধতি, প্রত্যেকই পদ্ধতি, ডালটন পরিকল্পনা** প্রভৃতি। শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদান কালে কোনো কোনো মানসিক প্রক্রিয়ার দিকে লক্ষ রাখতে হবে, কীভাবে অনুকূল শিখন পরিস্থিতি তৈরি করতে হবে, অগ্রসর এবং অনগ্রসর সবরকমের শিশুর শিক্ষাদানের উপযুক্ত কৌশলগুলি কীরূপ হবে; তা নির্ণয় করা মনোবিজ্ঞানের দায়িত্ব। এক্ষেত্রে শিক্ষাবিজ্ঞান মনোবিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল।

(৩) **মূল্যায়ন ব্যবস্থা ও মনোবিজ্ঞান :** শিক্ষার্থী তার শিক্ষার লক্ষ্য পূরণে কতদূর সাফল্য পেয়েছে তার পরিমাপ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই উদ্দেশ্যে আধুনিক মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করে প্রস্তুত করা হয়েছে নানা ধরনের অভীক্ষা। এই ধরনের অভীক্ষা প্রস্তুতির বিষয় মনোবিজ্ঞানেরই অবদান। শিক্ষার্থীর অর্জিত অভিজ্ঞতার মূল্যায়নে তাই মনোবিজ্ঞানের ভূমিকা অনেকখানি। সেদিক থেকে শিক্ষাবিজ্ঞান মনোবিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল।

(৪) **শৃঙ্খলা স্থাপনে মনোবিজ্ঞানের অবদান :** আধুনিক শিক্ষায় শৃঙ্খলার ধারণা আমূল বদলেছে। শৃঙ্খলা বাইরে থেকে আরোপিত বিষয় নয়, জোর করে শৃঙ্খলা স্থাপন কখনোই কার্যকরী নয়। শৃঙ্খলা হল ব্যক্তির স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। শিক্ষার্থী নিজেই নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করবে। আত্মনিয়ন্ত্রনই প্রকৃত শৃঙ্খলা স্থাপন করতে পারে। শৃঙ্খলার এই আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি মনোবিজ্ঞানেরই অবদান।

(৫) **শিক্ষা প্রশাসন ও মনোবিজ্ঞান :** শিক্ষালয় পরিচালনা ও প্রশাসনের ক্ষেত্রেও মনোবিজ্ঞান নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দান করেছে। সহকারী শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষকের কোন্ কোন্ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার সে সম্পর্ক মনোবিজ্ঞান স্পষ্ট নির্দেশ দান করেছে। শিক্ষালয়ের সামগ্রিক পরিবেশ কীভাবে সুনিয়ন্ত্রিত রাখা যায়, শিক্ষার সামগ্রিক পরিস্থিতিতে নানান সমস্যাকে কীভাবে সমাধান করা যায় তার পথ নির্দেশ দেয় মনোবিজ্ঞান। শিক্ষার সাথে যুক্ত সমস্ত মানুষের আচরণগত সমস্যা সমাধানেও

মনোবিজ্ঞান তার সঠিক দিক নির্দেশ করে। সুতরাং সেদিক থেকেও শিক্ষাবিজ্ঞান মনোবিজ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল।

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে যে, শিক্ষাবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান উভয়েই নিবিড় সম্পর্কে আবদ্ধ।

❖ ১.৩.১.৩ সমাজতত্ত্ব ও শিক্ষাবিজ্ঞানের পারস্পরিক সম্পর্ক (Relation of Education with Sociology) :

শিক্ষার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হল মানুষের সুপ্ত ক্ষমতার বিকাশসাধন। এজন্য শিক্ষা একটি প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচিত হয়। আবার এই বিকাশের ক্ষেত্রটি হল তার সমাজ। যে জন্য শিক্ষাতত্ত্বকে আবার অনেকে ফলিত সমাজতত্ত্ব হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। স্বাভাবিক ভাবেই সমাজতন্ত্রের সঙ্গে শিক্ষাতত্ত্ব বা শিক্ষাবিজ্ঞানের সম্পর্কটির আলোচনা প্রসঙ্গ এসে পড়ে। সমাজতত্ত্বের সঙ্গে শিক্ষাবিজ্ঞানের সম্পর্ক নিম্নে উল্লেখ করা হল :

(১) **সমাজতত্ত্ব ও শিক্ষার আধুনিক তাৎপর্য :** আধুনিক শিক্ষা বিজ্ঞানীদের মতে শিক্ষা হল ব্যক্তির জীবনব্যাপী অভিজ্ঞতা অর্জনের প্রক্রিয়া। এই অভিজ্ঞতা অর্জনের প্রক্রিয়াটি সংঘটিত হয় সমাজ পরিবেশেই। সমাজবিজ্ঞানী **নিউম্যান**-এর অভিমত অনুযায়ী শিক্ষার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ বা ব্যবহারিক উদ্দেশ্য হল সামাজিকভাবে দায়িত্বশীল মানুষ তৈরি করা। সুতরাং সেদিক থেকে শিক্ষা হল এক ধরনের সামাজিক প্রক্রিয়া। এই সামাজিক প্রক্রিয়া যেমন সামাজিক সংস্কৃতিকে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে, তেমনি অন্যদিকে সামাজিক বিবর্তন তথা সামাজিক অগ্রগতির ধারাকে বজায় রাখে। সুতরাং সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে শিক্ষার আধুনিক তাৎপর্য সমাজতত্ত্বের দ্বারা ভীষণভাবে প্রভাবিত বলা যায়।

(২) **সমাজতত্ত্ব ও শিক্ষার লক্ষ্য :** আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রেও সমাজতত্ত্বের প্রভাব স্পষ্ট লক্ষ করা যায়। ব্যক্তি এবং সমাজ পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন এবং অস্তিত্ব রক্ষার ক্ষেত্রে একে অন্যের উপর নির্ভরশীল। ব্যক্তি ছাড়া যেমন সমাজ গড়ে ওঠে না তেমনি সামাজিক পরিবেশ ছাড়া ব্যক্তির অস্তিত্ব ও বিকাশ সম্ভব নয়। সমাজতত্ত্বের এই চিন্তাধারা থেকেই আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারিত হয়েছে। শিক্ষার লক্ষ্য যেমন শিক্ষার্থীকে জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করা তেমনি ভবিষ্যতের সামাজিক মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা। শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে এই যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি তা সমাজতত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই উৎসারিত।

(৩) **সমাজতত্ত্ব ও পাঠ্যক্রম :** প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় পাঠক্রম ছিল অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের দ্বারা আরোপিত, জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার বিষয়। সেখানে ব্যক্তি এবং সমাজের চাহিদার স্বীকৃতি ছিল গৌণ।

Scanned with CamScanner

কিন্তু বর্তমান আধুনিক শিক্ষার পাঠক্রম হল ব্যক্তি এবং সামাজিক চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন অভিজ্ঞতার বিজ্ঞানসম্মতভাবে গড়ে তোলা সমন্বায়িত রূপ। আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্যকে সার্থক করে তোলার জন্য এগুলি নির্ধারিত পাঠক্রম নির্ধারণের ক্ষেত্রে ঐ নীতি শিক্ষার সামাজিক উপযোগিতাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। সুতরাং সেদিক থেকে ঐ দৃষ্টিভঙ্গি সমাজতত্ত্বের সঙ্গে শিক্ষাবিজ্ঞানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ককেই সূচিত করে।

(৪) **সমাজতত্ত্ব ও শিক্ষণপদ্ধতি :** আধুনিক শিক্ষণ পদ্ধতিতে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল সক্রিয়তাভিত্তিক শিক্ষা অর্থাৎ আত্মসক্রিয়তার মাধ্যমে শিক্ষালাভ। এই আত্মসক্রিয়তা আসবে সামাজিক পরিবেশে মিথষ্ক্রিয়া বা পারস্পরিক ক্রিয়ার প্রভাবে। কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা হল এই ধরনের আত্ম সক্রিয়তার পরিপূরক দিক। কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার মূল তাৎপর্য হল সামাজিক উপযোগিতা সম্পন্ন কার্যাবলিতে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মধ্যে সক্রিয়তা আনয়ন। এই ধরনের শিক্ষা সমাজের মধ্যে মানুষে মানুষে সামাজিক বন্ধনকে সুদৃঢ় করে সামাজিক কাঠামো মজবুত করে। ব্যক্তি আর সমাজের মধ্যে যত বন্ধন সুদৃঢ় হবে, ততই ব্যক্তি ও সমাজের পারস্পরিক প্রভাব বৃদ্ধি পাবে, ব্যক্তি পাবে সামাজিক মর্যাদা ও স্বীকৃতি আর সমাজ পাবে ব্যক্তির শ্রদ্ধা ও সুদূর প্রসারী অস্তিত্বের আশ্বাস। সুতরাং আধুনিক শিক্ষণ পদ্ধতিও সমাজতত্ত্ব দ্বারা বিশেষ প্রভাবে প্রভাবিত ও সম্পর্কিত বিষয়।

(৫) **সমাজতত্ত্ব ও শিক্ষালয় :** আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষালয় শুধু জ্ঞান অর্জনের স্থান নয়। শিক্ষালয় হল একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান, যেখানে শিক্ষার্থীর সামাজিকরণের কার্য সংঘটিত হয়। দৈনন্দিন জীবন-যাপনের মধ্য দিয়ে জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় কৌশল ও অভিজ্ঞতাকে অর্জন করে। এ প্রসঙ্গে **জন ডিউই** বলেছেন, "School is a purified, simplified and better balanced society." আধুনিক শিক্ষায় দেখা যায় শিক্ষালয়গুলির একান্তভাবে সামাজিক দায়িত্ব পালন করার কথা। সুতরাং আধুনিক শিক্ষালয়গুলিকে সাংগঠনিক দিক থেকে সমাজের ক্ষুদ্র সংস্করণে রূপান্তরিতকরণ এবং তাদের কর্মসূচির উপর সমাজিক তাৎপর্য অর্জন-এই সবই ঘটেছে সমাজতত্ত্বের প্রভাবেই।

(৬) **সমাজতত্ত্ব ও শিক্ষালয় পরিচালনা :** আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষালাভের ধারণার মতো শিক্ষালয় পরিচালনার ধারণারও পরিবর্তন ঘটেছে। প্রচলিত সামাজিক পরিচালনার রীতিনীতিকে অনুসরণ করে শিক্ষালয়গুলির পরিচালনার বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যেতে পারে গণতান্ত্রিক মতাদর্শের নীতির দ্বারা পরিচালিত সমাজের শিক্ষালয়গুলিও গণতান্ত্রিক মতাদর্শকে অনুসরণ করেই পরিচালিত হওয়ার কথা। পরিচালনার দায়িত্ব পাবে শিক্ষার্থীরা তবে তা নিয়ন্ত্রিতভাবে। সমাজজীবনের বিভিন্ন দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির মতো শিক্ষার্থীরাও বিভিন্ন দায়িত্বপালন করবে ধীরে ধীরে।

এর ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বৃদ্ধি পাবে গণতান্ত্রিক চেতনা, তারা হয়ে উঠবে গণতন্ত্রের রক্ষাকারী। শিক্ষালয় পরিচালনার এই আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি এসেছে সমাজতত্ত্বের চিন্তাধারা থেকেই।

(৭) **সমাজতত্ত্ব ও শিক্ষক :** আধুনিক **শিক্ষায় শিক্ষক হলেন শিক্ষার্থীর বন্ধু, দার্শনিক এবং নির্দেশক** (Friend, philosopher and Guide)। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মেলামেশা করবেন, স্বতঃস্ফূর্তভাবে, মধুর সম্পর্কের ভিত্তিতে। শিক্ষক যেমন একদিকে সামাজিক রীতিনীতির প্রতি আস্থাবান হবেন, তেমনি ওই সামাজিক রীতিনীতিগুলিকে সামাজিক পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সঞ্চালিত করার কৌশল সম্পর্কেও অবহিত হবেন। **সমাজতাত্ত্বিক ব্রাউন**-এর মতে "(He) must know and evaluate the cultural heritage of students, (he) must record and guide behaviour in social interaction" সুতরাং আধুনিক শিক্ষায় একজন শিক্ষক হবেন সামাজিক দায়িত্ব পালনের উপযোগী সমাজ সচেতন ব্যক্তিত্ব। শিক্ষকের এই দায়িত্ব পালনের দৃষ্টিভঙ্গিও সমাজতত্ত্বের দ্বারা অনুপ্রাণিত ও প্রভাবিত।

(৮) **সমাজতত্ত্ব ও মানবীয় সম্পর্ক স্থাপন :** আধুনিক শিক্ষায় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল মানবীয় সম্পর্ক স্থাপন। এই মানবীয় সম্পর্কের ওপর নির্ভর করে ব্যক্তি তার সামাজিক পরিবেশে কত বেশি এবং কী ধরনের অভিজ্ঞতা অর্জন করবে। কার্যত শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়া এই মানবীয় সম্পর্কের ভিত্তিতেই সম্পন্ন হয়ে থাকে। এই মানবীয় সম্পর্ক হল ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, ব্যক্তি ও সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে এবং গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে পারস্পরিক ক্রিয়া মিথষ্ক্রিয়ার মাধ্যমে। সমাজতাত্ত্বিকগণের মতে এই মিথষ্ক্রিয়া প্রকৃতপক্ষে সামাজিক মিথষ্ক্রিয়া যা সমাজ জীবনের প্রেক্ষাপটেই গড়ে ওঠে। এই সামাজিক মিথষ্ক্রিয়া নির্ধারণ করে ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক তথা সামাজিক বন্ধন। শিক্ষালয়ের মতো সামাজিক প্রতিষ্ঠানেও এই সামাজিক সম্পর্কের বন্ধনই শিক্ষার মূল ভিত্তি। সমাজতত্ত্বের কাজ হল এই মানবীয় সম্পর্কের প্রকৃতি পর্যালোচনা করা, যা কার্যত শিক্ষাকার্যকে সহায়তা করে। স্বাভাবিকভাবেই সমাজতত্ত্ব ও শিক্ষাবিজ্ঞানের মধ্যে একটি সম্পর্কের অস্তিত্ব বর্তমান।

❖ ১.৩.১.৪ অর্থশাস্ত্র ও শিক্ষাবিজ্ঞানের পারস্পরিক সম্পর্ক (Relation of Education with Economics) :

মানব সভ্যতার বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এক সময় মানুষের প্রয়োজনে এসেছিল অর্থনীতির ধ্যান-ধারণা। মানবজীবনে শিক্ষা যেমন অবশ্যম্ভাবী ধারা হিসেবে উদ্ভব ঘটেছে অর্থনীতির বিকাশও ঘটেছে অনুরূপভাবে। সুতরাং অর্থনীতি বা অর্থশাস্ত্রের সঙ্গে শিক্ষাবিজ্ঞানের ঘনিষ্ট সম্পর্ক থাকা স্বাভাবিক। **অর্থশাস্ত্রের সঙ্গে শিক্ষাবিজ্ঞানের সেই সম্পর্কের কয়েকটি দিক নিম্নে উল্লেখ করা হল:**

Scanned with CamScanner

(১) শিক্ষাবিজ্ঞান যেমন কোনো দেশ বা রাষ্ট্রের সমাজবদ্ধ মানুষের শিক্ষার ও সংস্কৃতির গতি-প্রকৃতি নির্ধারণ করে, অর্থশাস্ত্রের আলোচনার বিষয়বস্তু হল সমাজবদ্ধ মানুষের অর্থনৈতিক কর্ম প্রচেষ্টার বিচার বিশ্লেষণ করা।

(২) শিক্ষাবিজ্ঞানের আলোচনার মূল বিষয় হিসেবে স্থান পায় মানুষ ও তার শিক্ষা। 'মানুষ' নিজেই এখানে সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হয়, কারণ শিক্ষার কাজ হল মানুষকে সম্পদে পরিণত করা। কিন্তু অর্থশাস্ত্রের মূল আলোচনার বিষয় হল উৎপাদন, বিনিময়, ভোগ ও বণ্টন। মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের আলোচনাই হল অর্থশাস্ত্র।

(৩) শিক্ষাবিজ্ঞানীরা মানব সমাজের নানা দিকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সমস্যাকে নিয়ে সামগ্রিকভাবে চিন্তা-ভাবনা করেন কিন্তু অর্থবিজ্ঞানীরা শুধুমাত্র অর্থনৈতিক সূত্রাদি নির্দেশ দান করেন এবং বিভিন্ন অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে সূত্রগুলির কার্যকারিতা বিচার বিশ্লেষণ করে থাকেন।

উপরিউক্ত তিনটি ক্ষেত্রে শিক্ষাবিজ্ঞানের সঙ্গে অর্থশাস্ত্রের বৈসাদৃশ্যমূলক সম্পর্ক আমরা দেখতে পেলেও তাদের মধ্যে পারস্পারিক সাদৃশ্যমূলক সম্পর্কও বর্তমান। যেমন—

(১) শিক্ষাবিজ্ঞান ও অর্থনীতি উভয়শাস্ত্রই সমাজবদ্ধ মানুষের কার্যকলাপ নিয়ে আলোচনা করে। বস্তুত সমাজবদ্ধ মানুষের সার্বিক কল্যাণসাধনই উভয় বিষয়ের লক্ষ্য। মানুষের সমাজ-জীবনের উন্নয়নের গতিকে অব্যাহত রাখতে উভয় শাস্ত্রই আগ্রহী।

(২) শিক্ষাবিজ্ঞানের আলোচনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে মানুষ ও তার সমাজের চাহিদা। মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক চাহিদাগুলি যখন শিক্ষার দ্বারা অর্জিত হয়, তখন শিক্ষার মাধ্যমেই তার পরিতৃপ্তির উপায় খোঁজার চেষ্টা হয়। অনুরূপভাবে অর্থশাস্ত্রেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু হল মানুষের চাহিদা, অর্থনৈতিক চাহিদা হিসেবে যা পরিগণিত হয়।

(৩) ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনের বিকাশ তথা অগ্রগতিতে চাহিদার উৎপত্তি ও নিবৃত্তি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য বিষয় কারণ দু'টির সামঞ্জস্যতার উপরই নির্ভর করে মানুষের সাংস্কৃতিক অভিযোজন। শিক্ষার মাধ্যমে গড়ে ওঠা এই অভিযোজনমূলক আচরণগুলিই তার জীবনকে সুরক্ষা দেয়। অন্যদিকে অর্থনীতির কাজ হল ব্যক্তি ও সমাজের জীবনকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা অর্থনৈতিক চাহিদা। আচরণগুলির সামঞ্জস্যতার উপরই মানুষ ও সমাজের অর্থনৈতিক জীবন সুরক্ষা পেয়ে থাকে।

(৪) শিক্ষাবিজ্ঞানের জ্ঞান যেমন মানুষের অর্থনৈতিক চিন্তাভাবনায় স্বচ্ছতা আনতে সাহায্য করে, তেমনি অর্থনীতির পাঠের মাধ্যমে মানুষের অর্থনৈতিক জ্ঞান, উন্নয়ন, বণ্টন ব্যবস্থা মানুষের শিক্ষা দুটি একে অন্যের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে।

(৫) গণতান্ত্রিক শিক্ষার চেতনা গড়ে তুলতে যেমন শিক্ষাবিজ্ঞান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যার ফলে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পায় তেমনি অর্থনীতির অধ্যায়নের দ্বারা গড়ে ওঠা গণতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা গণতান্ত্রিক শিক্ষার প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে। সেক্ষেত্রে উভয় বিষয়ের পারস্পারিক নির্ভরশীলতা তাদের সম্পর্ককে প্রতিষ্ঠিত করে।

❖ ১.৩.১.৫ নৃ-বিজ্ঞান ও শিক্ষাবিজ্ঞানের পারস্পরিক সম্পর্ক (Relation of Education with Anthropology) :

মানবজীবনের বিচিত্র ধারার অন্বেষণে নৃ-বিজ্ঞান নিয়োজিত। আবির্ভাবকাল থেকে শুরু করে আজকের আধুনিক মানুষের সমস্ত বিষয়ই তার আলোচনার বিষয়। মানব অভিজ্ঞতা অর্জনের ধারাও তার অন্তর্গত। অন্যদিকে মানব অভিজ্ঞতার ধরন, বিবর্তন এবং শৈশব অবস্থা হতে পরিণত অবস্থা মানুষ তার পরিবেশ থেকে কীভাবে অভিজ্ঞতা অর্জন করে তার বিচার, বিশ্লেষণ ও প্রকৃতি শিক্ষাবিজ্ঞানের অন্যতম প্রধান বিষয়। স্বাভাবিকভাবেই নৃ-বিজ্ঞানের সঙ্গে শিক্ষাবিজ্ঞানের সম্পর্ক সহজেই অনুমান করা যায়। নিম্নে সেগুলি উল্লেখ করা হল :

(১) **মানুষ ও সংস্কৃতি :** নৃ-বিজ্ঞান ও শিক্ষাবিজ্ঞানের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু মানুষ ও তার সংস্কৃতি। হাজার হাজার বছর অগে মানুষের মতো একধরনের প্রাণী যখন প্রথম অস্ত্র তৈরি করে জীবন রক্ষার উপায় খুঁজে বের করে সেই প্রাণীই একদিন মানুষ হয়ে ওঠে। **প্লিসটোসিন যুগের** শুরুতে মানুষ তার নিজের অস্তিত্ব অন্যের গোচরে আনে। এই অস্ত্র বা আয়ুধ নির্মাণের মধ্য দিয়েই প্রাণী জগতে মানুষের সংস্কৃতির উন্মেষ ঘটে। ক্রমে এই সংস্কৃতির ক্রমোন্নতির ফলেই মানুষ আজ শ্রেষ্ঠ জীব। নৃ-বিজ্ঞান মানুষের এই সংস্কৃতির বিবর্তনের প্রকৃতি আলোচনা করে। আবার এই সংস্কৃতির জন্ম, বিবর্তন, ক্রমোন্নতি সবই অভিজ্ঞতা লাভের মধ্যেই ঘটেছে। শিক্ষাবিজ্ঞানের কাজ হল এই অভিজ্ঞতা অর্জনের ধারা আলোচনা করা অর্থাৎ মানব সংস্কৃতিও শিক্ষাবিজ্ঞানের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু।

(২) **বহুমুখী জ্ঞানের সমন্বয় :** নৃ-বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর সীমাহীন পরিধি এক বিশাল পরিমণ্ডল রচনা করেছে। মানবজীবনের সকল দিকে এই বিজ্ঞানের আলোচনা প্রসারিত। মানুষের সামাজিক মান নির্ণয়—শিল্প ও জীবনদর্শন আলোচনায়, নন্দনতত্ত্ব ও লোকরীতির মুল্যায়নেও অংশগ্রহণ করে। এ জন্য নৃ-বিজ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা যেমন— জীববিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, শারীরবিদ্যা, মনোবিদ্যা, সমাজবিদ্যা, মানবিক ভূগোল, ইতিহাস, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রভৃতির সমন্বয়ে সমৃদ্ধ হয়েছে। এজন্য একে **Multidisciplinary subject** বলা হয়। অন্যদিকে শিক্ষাবিজ্ঞানও একটি Multidisciplinary subject । গণিত, রাশিবিজ্ঞান জীবনবিজ্ঞান, ভৌতবিজ্ঞান,

Scanned with CamScanner

ইতিহাস, মানবিক ভূগোল, অর্থনৈতিক ভূগোল, অর্থনীতি, মনোবিজ্ঞান, দর্শন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়গুলির জ্ঞানের সমন্বয়ে এক পরিপূর্ণ বিষয় হিসেবে গড়ে উঠেছে।

(৩) **পরিবেশ ও মানুষের সম্পর্ক নির্ণয়ে :** মানুষের উৎপত্তি ও সাংস্কৃতিক বিবর্তন আলোচনা করতে গিয়ে স্বাভাবিকভাবে নৃ-বিজ্ঞান মানুষের পরিবেশ নিয়েও ভেবেছে। কীভাবে পৃথিবীর উৎপত্তি, কীভাবে জীব সৃষ্টির অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হল, কীভাবে সেই পরিবেশে প্রাণের মান প্রকাশ ঘটল এবং কীভাবেই বা সেই পরিবেশ মানুষের অস্তিত্ব রক্ষা ও ক্রমিক বিবর্তনের পথকে প্রশস্ত করল তার ধারাবাহিক আলোচনাও করে। পরিবেশ ও মানুষের এই ঘনিষ্ঠ এবং আত্মিক সম্পর্ককে বিশ্লেষণ করা তার কাজ। শিক্ষাবিজ্ঞানের কাজও হল মানুষের অস্তিত্ব রক্ষায় অভিযোজনে প্রক্রিয়ার ধারা বিশ্লেষণ করা এবং পরিবেশের সঙ্গে পারস্পরিকক্রিয়া বা মিথষ্ক্রিয়ার বিষয় পর্যালোচনা করা।

(৪) **মানব বিকাশমূলক নানা দিক পর্যালোচনা :** নৃ-বিজ্ঞানের একটি বিশেষ শাখা মানবগোষ্ঠীর নানা সমস্যার মূল উদ্‌ঘাটন করে সেগুলির সমাধানের মধ্য দিয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এবং সামগ্রিকভাবে সম্প্রদায়টির সার্বিক উন্নয়নের কার্যকরী প্রচেষ্টা গ্রহণ করে যা **বিকাশমূলক নৃ-বিজ্ঞান** নামে পরিচিত। এই বিকাশমূলক বৈশিষ্ট্য প্রকৃতপক্ষে মানুষের কর্মধারা, চিন্তাধারা এবং জীবনদর্শনের ধারাকে মিলিত করে একটি সুসংহত পরিস্থিতি তৈরি করে মানবজীবনের ভবিষ্যৎ-এর পথে অগ্রসর হয়। শিক্ষাবিজ্ঞানের কাজ হল মানবজীবনের শুরু থেকে বিকাশের বিভিন্ন দিককে পর্যালোচনা করে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে সুসংহত পরিস্থিতি সৃষ্টি করা যাতে মানুষ তার ভবিষ্যতের পথে অগ্রসর হয়ে মানুষ হয়ে ওঠে।

(৫) **সামাজিক মানুষ ও সামাজিকীকরণ :** মানব সভ্যতায় প্রতিটি সমাজ ব্যবস্থায় নিজস্ব ভাবধারা এবং তার মূলগত বৈশিষ্ট্য থাকে। বিভিন্ন ধরনের সামাজিক রীতিনীতি বিশ্বাস ও সংস্কার এবং আচার আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিটি সমাজ একটি নির্দিষ্ট রূপ লাভ করে। নৃ-বিজ্ঞানীরা এই সব বিভিন্ন বৈচিত্র্যপূর্ণ সমাজগুলির মধ্যে একটা ঐক্যের সন্ধান খুঁজে পান। বিভিন্ন ধরনের সামাজিক রীতিনীতি, প্রথা, বিশ্বাস ও সংস্কারের মাধ্যমে সমাজগুলি বিকশিত হলেও সামাজিক সাংস্কৃতিক নৃ-বিজ্ঞানের শাখাটি নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে তাদের মধ্যে ঐক্যের সুরটি অন্বেষণ করে। অন্যদিকে শিক্ষাবিজ্ঞানের কাজ হল মানবগোষ্ঠীর সামাজিক চেতনা, সামাজিক সংস্থা, সামাজিক গতি-প্রকৃতির বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা করে মানুষের সামাজিকীকরণের ধারার মূল সূত্রটি ধরে মানুষ ও গোষ্ঠীকে সামাজিকীকরণের পথে চালিত করে একটি নির্দিষ্ট

লক্ষ্যে পৌঁছে দেয় যাতে ব্যক্তিমানুষ ও গোষ্ঠী সমগ্র সমাজজীবনের সঙ্গে সার্থক অভিযোজন করতে সক্ষম হয়।

(৬) **মানবকল্যাণ ও বিকাশে নৃ-বিজ্ঞান ও শিক্ষাবিজ্ঞান :** মানবকল্যাণ তথা মানব সম্প্রদায়ের বিকাশমূলক কর্মকাণ্ডে নৃ-বিজ্ঞনীরা বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন। নৃ-বিজ্ঞানীগণ কোনো মানব গোষ্ঠীকে সুনিপুণ দক্ষতায় বিচার বিশ্লেষণ করেন। গভীর ও বিস্তারিতভাবে মানুষের ইতিহাস, সমাজধারা এবং সভ্যতাকে অধ্যয়ন ও উপলব্ধি করেন। এই ধরনের কাজে নৃবিজ্ঞানীরা বহু এবং বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীকে খুব নিকট থেকে পর্যবেক্ষণ করেন। এর ফলে বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর মানসিকতার সঙ্গে এঁরা পরিচিত হওয়ার সুযোগ পান। স্বাভাবিকভাবে নৃ-বিজ্ঞানীরা প্রকল্প রূপকারদের সঠিক পথ নির্দেশ করতে সক্ষম হন। আবার শিক্ষাবিজ্ঞানীদের কাজ হল মানবগোষ্ঠীর প্রতিটি মানব শিশুকে সম্পদে পরিণত করা। এই ধরনের মানব সম্পদ সৃষ্টি তথা বিকাশে গোষ্ঠীর স্বতন্ত্র সংস্কৃতিকে উপলব্ধি করে উপযুক্ত শিক্ষাদান বা অভিজ্ঞতার সম্মুখীন করে শিক্ষাবিজ্ঞান নৃ-বিজ্ঞানীর কাজকে সার্থকতা দান করতে সহায়তা করেন। সুতরাং মানবকল্যাণে ও তার বিকাশে নৃ-বিজ্ঞান ও শিক্ষাবিজ্ঞান উভয়ই যত্নশীল, দায়িত্বশীল। নৃবিজ্ঞান মানবকল্যাণ ও বিকাশ প্রসঙ্গে যে পথ নির্দেশ করে শিক্ষাবিজ্ঞান সেই পথ নির্দেশকে সার্থকতা দান করতে সহায়তা করে।

(৭) **নারীশিক্ষা ও নারীস্বাস্থ্য প্রসঙ্গে নৃ-বিজ্ঞান ও শিক্ষাবিজ্ঞানের অবদান :** ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দের জাতীয় শিক্ষা কার্যক্রম এবং ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দের গৃহীত কর্মসূচি শিক্ষাক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্যের দূরীকরণে সর্বব্যাপী দৃষ্টি নিক্ষেপের জন্য সুপারিশ করে। **ভারতের জাতীয় শিক্ষা নীতি** (National Policy on Education) শুধুমাত্র নারীদের শিক্ষা গ্রহণের সুযোগকে বিস্তৃত করতে মত দান করেননি, নারীশিক্ষার ধারা এমনভাবে ব্যাপ্ত হওয়া দরকার যাতে শিক্ষার মাধমেই নারীদের সমঅধিকার এবং সক্ষমতা অর্জন কার্যকরীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতীয় সংবিধান শুধুমাত্র নারীদের সমান অধিকারের অর্জনই মান্য করেনি, নারীদের সামাজিক অবলম্বন উন্নয়নে যাতে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাও নির্দেশ করে। স্বাধীন ভারতে নারী পুরষের সমানাধিকারের নীতিকে যে স্বীকৃতিদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে তার ভিত্তি ভূমিও সামাজিক সাংস্কৃতিক নৃ-বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিত। সেদিক থেকে বলা যায় শিক্ষাবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য অর্জনের পথ নির্দেশ দিয়েছে নৃ-বিজ্ঞানেরই একটি বিশেষ শাখা।

(৮) **জাতি সচেতনতা বিষয়ক সমস্যা ও তার সমাধান :** বৈচিত্র্যপূর্ণ বহু সংস্কৃতি সম্পন্ন বৃহৎ একটি দেশের (যথা ভারত) বিশাল, বিভিন্ন রূপী জনগোষ্ঠী, অসম জীবনযাত্রার ধারা এবং স্বতন্ত্র পৃথক পৃথক ঐতিহ্যভিত্তিক জাতি সচেতনতার ধারণা এবং কর্ম

Scanned with CamScanner

ধারা বহু ক্ষেত্রে অশুভ পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। এই ধরনের পরিস্থিতি জাতীয় জীবনে অশান্তির বাতাবরণকে ক্রমশ বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে পর্যবসিত করে। এই ধরনের সমস্যার সমাধান প্রসঙ্গে প্রথমেই সমস্যার প্রকৃতি, উৎস, কারণগুলিকে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে নৃ-বিজ্ঞান সহায়তা করে। আর এই ধরনের পরিস্থিতির সমাধানের জন্য তখন এগিয়ে আসে শিক্ষাবিজ্ঞান। যথার্থ ইতিবাচক শিক্ষাদানের মাধ্যমে জনগোষ্ঠীর মধ্যে রাষ্ট্রীয় একতার চেতনাকে জাগ্রত করে পরিস্থিতি মোকাবিলা করে দেশের ও জাতির অস্তিত্বকে সুরক্ষিত করে।

উপরোক্ত ক্ষেত্রগুলি ছাড়াও দেশের বিকাশমূলক পরিকল্পনা রূপায়ণ ও তার কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ, গ্রামীণ বিকাশে, আদিবাসীকল্যাণ ও বিকাশে জনবিজ্ঞানকে প্রচারিত ও প্রসারিত করার ক্ষেত্রে সর্বোপরি জনস্বাস্থ্যচেতনা প্রসঙ্গে নৃ-বিজ্ঞান ও শিক্ষাবিজ্ঞান পরস্পর একের অন্যের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে। সুতরাং নৃ-বিজ্ঞান ও শিক্ষাবিজ্ঞানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে অস্বীকার করা যায় না।

❖ ১.৩.১.৬ ইতিহাস ও শিক্ষাবিজ্ঞানের পারস্পরিক সম্পর্ক (Relation of Education with History) :

ইতিহাস বলতে কী বোঝায়? এ সম্পর্কে নানা পণ্ডিত নানা কথা বলেছেন। সেই বিতর্কে না গিয়ে অতি সন্তর্পণে বলা যায়, এই বিশ্ব সৃষ্টির পর থেকে আজ পর্যন্ত যা ঘটে চলেছে তার ধারাবাহিক বিবর্তনের কথাই হল **ইতিহাস**। ঐতিহাসিক বলতে কাকে বোঝায়? তাঁর কাজ কী? এখানেও সংক্ষেপে বলা যায় নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নানা ঘটনার স্রোত থেকে অসত্য আর অতিরঞ্জনকে বাদ দিয়ে তিনি হলেন সত্য সন্ধানী তথ্য উপস্থাপক। কিন্তু এই বক্তব্যও সম্পূর্ণ ঠিক নয় কারণ ঐতিহাসিক চিরন্তন বা অখণ্ড সত্যের সন্ধানী নন, বিশ্বজনীন তত্ত্ব নির্মাতা দার্শনিক অধিকার নিয়ে তিনি জন্মাননি। তথাপি বলতে হয় সামাজিক মানুষের বিশাল কর্মকাণ্ডের একটুখানি লক্ষ করেন ঐতিহাসিক। আবার সমস্ত ঘটনাই ইতিহাসের বিষয় হয় না। ঘটনাকে **'Historical fact'** হতে হবে; আবার "Historical facts are, in essence psychological facts" ঐতিহাসিক গ্রহণের চেয়ে বর্জন করেন বেশি। কিন্তু কোনো পদ্ধতিতে তিনি গ্রহন বর্জন করেন? সেই পদ্ধতি কি দেশে দেশে যুগে যুগে বদলায়? গ্রহণ-বর্জনের পদ্ধতিতে কি কোনো প্লবণতা কাজ করে—এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে মানতে হয় ইতিহাস আর ঐতিহাসিককের অতীত নিয়ে ইতিহাসের কারবার হলেও ঐতিহাসিকের বর্তমান প্রেক্ষাপট অতীত ব্যাখ্যাকে প্রভাবিত করে। আবার, ইতিহাস পাঠের সার্থকতাই হচ্ছে অতীতের প্রেক্ষাপটে বর্তমানকে জানা আর ভবিষ্যতের নির্মাণ করা। **Lecky**-এর মতে "বাস্তব জীবনে যে সমস্ত বিচার-বুদ্ধির প্রয়োজন হয়, ইতিহাস তার মধ্যে শিক্ষার সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র।" সুতরাং অতীতকে জেনে বুঝে তার বিচার-বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি

ebook.dascoaching.in

করে বর্তমান ও তার সমস্যাকে উপলব্ধি করা এবং সেই নিরিখে ভবিষ্যতের সৌধ নির্মাণই হচ্ছে ইতিহাস পাঠের যথার্থ সার্থকতা। স্বাভাবিকভাবেই মানুষের শিক্ষার ইতিহাসের প্রাসঙ্গিকতা অনেক বেশি।

এখন দেখা যাক, ইতিহাসের সঙ্গে শিক্ষাবিজ্ঞানের সম্পর্ক কতখানি বিস্তৃত ও গভীর। নিম্নে সেই সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল :

(১) মানবসভ্যতার ধারা উপলব্ধিতে ইতিহাস ও শিক্ষাবিজ্ঞান :

এই পৃথিবীতে মানুষ একদিন সংগঠিত হয়েছিল অস্তিত্বরক্ষার তাগিদে। অরণ্যচারী ও গুহাজীবী আদিম মানুষ দল বাঁধতে বাধ্য হয়েছিল বন্য জীব-জন্তুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য। প্রতিনিয়ত নানা ধরনের প্রতিকূলতার মধ্যে জীবন রক্ষার তাগিদে এসে অপরের সহযোগিতার ভিত্তিতে সমবেত হয়েছিল গোষ্ঠীতে। এইভাবে ধীরে ধীরে সৃষ্টি হয়েছিল মানুষের সমাজ। সমগ্র গোষ্ঠীর জীবনধারাই ছিল তার সংস্কৃতি। সমাজবদ্ধ মানুষ সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রূপান্তর ঘটিয়েছিল তার সংস্কৃতির। মানব সমাজে আর সংস্কৃতির নানা দিক ও বিবর্তন সম্পর্কে উপলব্ধি করাই হল ইতিহাস পাঠের লক্ষ্য।

অন্যদিকে সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যেভাবে ঘটেছে যুগ পরিবর্তন, বদলেছে মানুষের সামাজিক জীবনধারা, তেমনভাবেই বদলেছে তার জীবনের বেঁচে থাকার জন্য অভিজ্ঞতা লাভের ধরন ও প্রকৃতি। স্বাভাবিকভাবেই বদলেছে মানুষের শিক্ষালাভের ধারাও। কীভাবে আদিম অরণ্যচারী মানুষের দল আত্মরক্ষার জন্য, জীবনধারণের জন্য, সমস্যা সমাধানের জন্য ক্রমশ অগ্রবর্তী হয়েছে, যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কীভাবে মানুষের অভিজ্ঞতালাভের ধরন ও প্রকৃতি বদলেছে—তার সঙ্গে পরিচিত ঘটনোই হল শিক্ষার ইতিহাস বা শিক্ষাবিজ্ঞানের অন্যতম লক্ষ্য। অর্থাৎ মানবসভ্যতার ধারা উপলব্ধিতে ইতিহাস ও শিক্ষাবিজ্ঞান সমান্তরালভাবে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে।

(২) ঘটনার কার্য-কারণ বিশ্লেষণ করে সম্পর্ক নির্ধারণে ইতিহাস ও শিক্ষাবিজ্ঞান :

ইতিহাস পাঠের অন্যতম উদ্দেশ্য হল অতীতের ঘটনার কার্য-কারণ বিশ্লেষণ করে তার সম্পর্ক নির্ধারণ। ঐতিহাসিক ঘটনার পশ্চাতে যে কারণগুলি নিহিত থাকে সেগুলির সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক নির্ধারকগুলির উপস্থিতিকে খুঁজে বের করা এবং প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটনের দ্বারা বর্তমান মানবসভ্যতাকে সেই অনুসারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে ভবিষ্যতের পথ প্রস্তুত করা ইতিহাস পাঠের লক্ষ্য। কোনো মনস্তাত্ত্বিক ও গোষ্ঠীগত আচরণ ঐতিহাসিক ঘটনাকে কতখানি প্রভাবিত করেছে সেই বিষয়টি সহজেই অনুধাবন করা সম্ভব ইতিহাস পাঠের দ্বারা।

অনুরূপভাবে শিক্ষাবিজ্ঞানের কাজ হল সভ্যতার বিভিন্ন স্তরে মানবজীবন যে সমস্ত অভিজ্ঞতাগুলির মধ্য দিয়ে, তার প্রতিকূলতাকে জয় করে অনুকূল পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে রক্ষা করতে পেরেছে তার জীবন ও সংস্কৃতিকে—তার কার্য-কারণ বিশ্লেষণ করা।

Scanned with CamScanner

জীবনের কল্যাণময় অগ্রগতিতে সহায়তা করার জন্য শিক্ষাবিজ্ঞান ব্যক্তি মানসে সামাজিক চেতনার সঞ্চার ঘটিয়ে সমাজকল্যাণের পথে অগ্রবর্তী হয়ে যাতে মানবজীবন উন্নয়নের ধারাকে বজায় রাখতে পারে তার ব্যবস্থা করে। শিক্ষার এই প্রয়োগমূলক কার্যে সহায়তা করে ইতিহাসের কার্যধারা।

(৩) **বিষয়বস্তুর উপাদানগত সাদৃশ্য :**

ইতিহাসের মধ্যে যেমন থাকে ঘটনা তেমনি তার ব্যাখ্যা। ঘটনা বা তথ্য ইতিহাসের কাঁচামাল বা উপাদান, যার উপর ভিত্তি করে ইতিহাসের সৌধ নির্মিত হয়। ইতিহাসের মধ্যে তিনটি বিষয়ের সমাবেশ দেখা যায়। স্থান (দেশ), কাল (সময় বা যুগ) ও পাত্র (মানুষ বা মানবগোষ্ঠী)। কোনো একটি দেশের কোনো বিশেষ সময়ের জনগোষ্ঠীর ক্রিয়াকলাপ ইতিহাসের মর্মবস্তু। সুতরাং ইতিহাস আলোচনা করে মানুষ ও তার সমাজের কথা। কোনো ঐতিহাসিক ঘটনা 'historical fact'-এর মধ্যে এই তিনটি উপাদানকেই খুঁজে তাদের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করা হয়।

শিক্ষাবিজ্ঞানের মধ্যেও আছে মানুষের শিক্ষা। কোনো একটি স্থানের কোনো বিশেষ সময়কালের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট মানবগোষ্ঠী বা সমাজের অভিজ্ঞতালাভের কথা, তার পুনর্গঠন ও পুনঃসৃজনের কথা। প্রাকৃতিক বা কোনো সামাজিক পরিবেশে অভিজ্ঞতা লাভের ঘটনাই হল শিক্ষাবিজ্ঞানের কাঁচামাল। ইতিহাসের মতো শিক্ষাবিজ্ঞানের প্রধান উপাদানগুলি হল—স্থান (পরিবেশ), কাল (সময় বা যুগ) ও পাত্র (মানুষ বা মানবগোষ্ঠী)। ইতিহাসের মতো এক্ষেত্রেও বলা যায় কোনো একটি দেশের বা স্থানের (পরিবেশ) কোনো বিশেষ সময়ের মানুষ বা মানবগোষ্ঠীর ক্রিয়াকলাপের ঘটনা বা অভিজ্ঞতালাভের গঠন ও পুনর্গঠনের ঘটনাই হল শিক্ষাবিজ্ঞানের আলোচনার অন্যতম প্রধান বিষয়বস্তু।

(৪) **ইতিহাস ও শিক্ষাবিজ্ঞান উভয় ক্ষেত্রে সৃষ্টি ও স্রষ্টা একে অন্যের পরিপূরক :**

ইতিহাস যেমন মানুষকে তৈরি করছে 'মানুষ ও তেমনি তৈরি করছে ইতিহাস। পরিবেশের পরিবর্তন, কৃৎকৌশলের পরিবর্তন, জন সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক বিপর্যয়, দ্রব্যমূল্যের বিপ্লব, সমাজ পরিবর্তনের ধাক্কা তথা বিপ্লব, প্রাকৃতিক ভারসাম্যের বিনাশ বারবার মানুষের জীবনে এনেছে সমস্যা, বিপন্ন করে তুলেছে তার অস্তিত্বকে, তবু তারই সঙ্গে তাল মেলাবার, জীবনের ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টাই হয়েছে মানুষের স্বভাব আর চরিত্রে। সেটাই হল মানুষের ইতিহাস। মাঝে মাঝে তাল কাটলেও মানুষ বারে বারে তার অধিকার ফিরে পেতে চেয়েছে, সুরক্ষিত করার চেষ্টা করেছে তার আপন জীবন আর সংস্কৃতির অস্তিত্বকে। ইতিহাসের সৃষ্টি মানুষ নিজেই তৈরি করেছে তার ইতিহাসকে।

শিক্ষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে স্রষ্টা ও সৃষ্টির এই কার্যধারার বৈশিষ্ট্যটি লক্ষ করা যায়। শিক্ষার্থী তথা মানুষের চরিত্র গঠন করা মানুষকে মানুষ হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠা করা যেমন

শিক্ষাবিজ্ঞানের কাজ তেমনি শিক্ষিত মানবসম্প্রদায় বা মানুষের কাজ হল শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রিত করে তার নিজের অস্তিত্ব রক্ষার উপযোগী শিক্ষার প্রবর্তন করা। শিক্ষা মানুষের অন্তর্নিহিত পরস্পর বিরোধী প্রবণতাগুলিকে উন্নত জীবনাদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে সুসমন্বিত, সুসংবদ্ধ করে তোলে। মানুষের ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবনের মন্দ বৈশিষ্ট্যগুলিকে আদর্শ গুণাবলিতে রূপান্তরিত করার ক্ষমতা শিক্ষার আছে। আবার একথাও সত্য যে, বিশেষ সমাজে শিক্ষা ব্যবস্থা এই দায়িত্ব কতখানি পালন করতে পারবে তা নির্ভর করে যে সমস্ত ব্যক্তি শিক্ষা কার্য পরিচালনা করেন তাঁদের ব্যক্তিগত সক্ষমতা, প্রচেষ্টা ও দূরদর্শিতার ওপর। অর্থাৎ শিক্ষা সমাজ ও ব্যক্তিজীবনে কী ভূমিকা গ্রহণ করবে, কতখানি করবে, এবং কীভাবে করবে তা নির্ধারণ করে দেয় শিক্ষক, শিক্ষাবিদ, তথা শিক্ষাবিজ্ঞানী। সুতরাং এখানেও শিক্ষা যেমন মানুষকে দেশ আর কালের গন্ডিতে নির্মাণ করে, মানুষও তেমনি তার আপন চিন্তা চেতনা, দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রয়োজনের নিরিখে দেশ আর যুগের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষাকে পুনর্নির্মাণ কিংবা নতুন করে সৃষ্টি করে নেয়।

(৫) **সংস্কৃতির সংরক্ষণ আর সঞ্চালনে ইতিহাস ও শিক্ষাবিজ্ঞানের ভূমিকা সমান্তরালভাবে কার্যকরী :**

সভ্যতার এক সুপ্রাচীনকাল থেকে আপনগতিতে প্রবহমান মানবগোষ্ঠীর ভাবের আদান-প্রদানের মাধ্যমে সঞ্চিত হয়েছে বিশ্বমানবের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। স্বাভাবিকভাবেই নবীন প্রজন্ম তার উত্তরাধিকারের সূত্র ধরে গ্রহণ করেছে সেই ঐতিহ্যকে। ইতিহাসের দায়িত্ব ও কর্তব্য হল সাংস্কৃতিক এই উত্তরাধিকারের প্রশ্নে নবীন প্রজন্মকে পরিচিত করানো। ইতিহাসেই থাকে মানব সংস্কৃতির বিবর্তনের ধারাবাহিক চিত্র। সেই সাংস্কৃতিক বিবর্তনের চিত্রকে তুলে ধরাই হল ইতিহাসের একটি বিশেষ কাজ। ঐতিহাসিক **Jones**-এর মতে–"History is a veritable mine of life experiences and the youth of today studies history that they may profit by the experiences of this races."

আবার, অন্যদিকে প্রত্যেক মনুষ্য সমাজেই নিজস্ব কিছু আচার রীতিনীতি, সংস্কার, প্রথা ইত্যাদি বর্তমান। এইসব আচার, রীতিনীতিগুলিকে সমাজের স্বার্থেই মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্নে সংরক্ষণ ও সঞ্চালন করা প্রয়োজন। এজন্য প্রতিটি মানব সমাজে এমন কিছু প্রতিষ্ঠান থাকে যাদের কাজ হল মানুষের গোষ্ঠীবদ্ধ আচার রীতিনীতি, সামাজিক সংস্কার ও প্রথাগুলিকে একদিকে সংরক্ষিত করে রাখা আর অন্যদিকে সেগুলিকে সঞ্চালিত করা। শিক্ষাবিদ **ব্রাউনের** মতে যুগ যুগ ধরে মানুষের সমাজ যে সমস্ত অভিজ্ঞতার অধিকারী হয়েছে, সেই সমাজে টিকে থাকতে গিয়ে মানুষকে তার যোগ্য অধিকারী হতে হবে এবং তার সংস্কৃতির ও ঐতিহ্যকে সংরক্ষিত ও সঞ্চালিত করতে হবে। আর এই উদ্দেশ্যেই গঠিত হয়েছে প্রথাগত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা শিক্ষালয়। শিক্ষাবিজ্ঞানী **ব্রাউনের** কথায় "The preservation of

Scanned with CamScanner

cultural heritage is the primary function of education carried through the informal agencies of society; it still is and must remain a major function of modern school." এই কারণেই শিক্ষাক্ষেত্রে মানব সমাজের পুরাতন দিনের বা অতীত অভিজ্ঞতাগুলিকে একদিকে যেমন বিভিন্ন কৌশলে সংরক্ষিত করে রাখা হয়, তেমনি অন্যদিকে অভিজ্ঞতাগুলিকে সমাজের উত্তরসূরীদের মধ্যে সঞ্চালিত করার বিভিন্ন ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

(৬) জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি এবং আন্তর্জাতিকতাবোধের উন্মেষে ইতিহাস ও শিক্ষাবিজ্ঞান :

যে-কোনো দেশের জাতীয় গৌরবের কাহিনি, নানা উত্থান-পতনের ঘটনার অনুশীলন ও অনুধাবনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির জাগরণ ঘটানো ইতিহাস পাঠের অন্যতম লক্ষ্য। আর এই লক্ষ্যে পৌঁছাতে গেলে শিক্ষার্থীদের বৃহত্তর স্বার্থের কারণে ক্ষুদ্র স্বার্থগুলির জলাঞ্জলির মাধ্যমে নিজেদের প্রস্তুত করতে হয়। তাতেই জাতীয় সংহতির গুরুত্ব উপলব্ধিতে সচেতন হওয়ার সুযোগ হয়। এই সুযোগ করে দেয় ইতিহাস। আবার সেই সঙ্গে সংকীর্ণ জাতীয়তাবোধের দৃষ্টিভঙ্গি যাতে শিক্ষার্থীদের আন্তর্জাতিকতাবোধের উপলব্ধিতে বাধা হয়ে না দাঁড়ায় সেদিকে লক্ষ রাখতে হয়। ইতিহাস পাঠের লক্ষ্যই হল প্রকৃত মানবতাবাদ-এর প্রতিষ্ঠা, বিশ্ব সৌভ্রাতৃত্ব গঠন এবং আন্তর্জাতিকতাবোধের উন্মেষ সাধন। ইতিহাস সেই দায়িত্ব পালন করে থাকে।

অন্যদিকে শিক্ষাবিদগণ মনে করেন, **শিক্ষাই হল যথার্থ কৌশল যার মধ্য দিয়ে জাতীয় সংহতি স্থাপন করা সম্ভব।** ঐক্য বা সংহতি ছাড়া কখনও কোনো দেশ বা রাষ্ট্র তার কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের পথে অগ্রসর হতে পারে না, মানব সম্পদের উন্নয়ন সংঘটিত করতে পারে না। শিক্ষার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজই হল একটি রাষ্ট্রের প্রতিটি মানুষের মধ্যেই তার কর্ম, চিন্তা, চেতনা, ভাবধারা ও মূল্যবোধের মধ্যে একটি একত্ববোধ, সংহতিবোধ জাগ্রত করা, যার মাধ্যমে অনায়াসেই রাষ্ট্রীয় ঐক্যকে ধরে রাখা সম্ভব হয়। আবার সংকীর্ণ রাষ্ট্রের ঐক্যের দ্বারা শিক্ষার্থী যাতে বন্দি হয়ে না যায়, তার জন্য মুক্ত চিন্তা নিয়ে সমগ্র বিশ্বমানবতার মধ্যে ঐক্যের ধারণা জাগ্রত করে, আন্তর্জাতিক ভাবধারার অনুসারী করে গড়ে তোলাই হল শিক্ষার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কার্য, সেদিক থেকে ইতিহাস শিক্ষাবিজ্ঞানের কাজকে অনেকখানি সহজ করে তোলে। এদিক থেকে ইতিহাস আর শিক্ষাবিজ্ঞান একে অন্যের পরিপূরক হিসেবেও কাজ করে।

(৭) ইতিহাস ও শিক্ষাবিজ্ঞান উভয় বিষয়েই বহু বিষয়ের সুসমন্বিতরূপ :

ইতিহাস ও শিক্ষাবিজ্ঞান উভয় বিষয়েই অনেকগুলি মৌলিক বিষয়ের সুসমন্বিত রূপ বলা যায়। মানুষের উৎপত্তি, জীবনবিকাশ, সমাজ ও সংস্কৃতির ক্রমবিকাশের প্রেক্ষাপটই হল আধুনিক ইতিহাসের আলোচ্য বিষয়। ঐতিহাসিক **Maitland**-এর মতে "What men have done and said, and above all what they have thought, that is history."

ঐতিহাসিক **রমেশচন্দ্র মজুমদারের** মতে "মানব সমাজের অতীত কার্যাবলীর বিবরণই হল ইতিহাস।" এই কারণে ইতিহাসকে অনুধাবন করার জন্য জানতে হয় মনস্তত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, ভূগোল, প্রাকৃতিকবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, গণিতের মতো সব বিষয়ও। ঐতিহাসিককে জানতে হবে লৌকিক ক্রিয়াকলাপ ও সাহিত্য, বুঝতে হবে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের প্রতীকমূল্য, উপলব্ধি করতে হবে নরনারীর গভীর সম্পর্ক সমাজচেতনা। রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস না জানলে কোনো অর্থনৈতিক ইতিহাস জানা যায় না। তেমনি ধনতন্ত্র ছাড়া অনেক সময় সমাজ ও ধর্মকে জানা সম্ভব হয় না। একইভাবে ধর্মছাড়াও অনেক ক্ষেত্রে ধনতন্ত্রকে বোঝা যায় না। ইতিহাসের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়গুলির তাৎপর্য না জানলে ইতিহাসকে যথার্থভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না। এজন্য ঐতিহাসিক **Trevelyan** বলেছেন–"History is not a subject at all but a house in which all subjects dwell."

ইতিহাসের মতো শিক্ষাবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুকে বা আলোচনার পরিধিকে প্রভাবিত করেছে বহু বিষয়। দর্শন, মনস্তত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, রাষ্ট্রতত্ত্ব, অর্থনীতি, জীববিদ্যা, ভূগোল, পরিবেশবিদ্যা, গণিত, রাশি-বিজ্ঞান ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিষয়গুলি। এই সমস্ত বিষয়গুলির মর্মার্থ না উপলব্ধি করলে শিক্ষাবিজ্ঞানের যথার্থ গুরুত্বকে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। উপরোক্ত বিষয়গুলির সুসমন্বয়িত রূপই শিক্ষাবিজ্ঞানকে অনেক বেশি আধুনিক করে তুলেছে। শিক্ষাবিজ্ঞানকে সেই অর্থে বলা হয় **Multidisciplinary subject**। শিক্ষাবিজ্ঞানের কার্যধারাকে সার্থক করে তুলতে হলে ওই সমস্ত বিষয়গুলির সহায়তা নিতেই হবে। সেদিক থেকে ইতিহাস ও শিক্ষাবিজ্ঞানের গঠন কাঠামো এবং কার্যধারার মধ্যে অনেকখানি সাদৃশ্য বর্তমান।

❖ ১.৩.১.৭ ভূগোল ও শিক্ষাবিজ্ঞানের পারস্পরিক সম্পর্ক (Relation of Education with Geography) :

শিক্ষাবিজ্ঞান ও ভূগোল শাস্ত্র ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। মানব সভ্যতার বিকাশে শিক্ষাবিজ্ঞান যেমন প্রভাবিত করেছে, তেমনই ভূগোল শাস্ত্রও সমানভাবে প্রভাব বিস্তারকারী বিষয়। শিক্ষাবিজ্ঞান ও ভূগোল শাস্ত্রের পারস্পরিক সম্পর্কের দিকগুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল।

(১) ভূগোল নামে বিষয়টি একটি স্বতন্ত্র বিষয় হলেও শিক্ষাবিজ্ঞানের মতোই সামগ্রিকভাবে তার বিষয়বস্তু এক নয় বহু। দর্শনশাস্ত্র, মনোবিদ্যা, সমাজতন্ত্র, ইতিহাস, জীবনবিজ্ঞান, ভৌতবিজ্ঞান, গণিত, রাশিবিজ্ঞান, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি এমনকি প্রযুক্তি বিজ্ঞানের মতো বিষয় ও ভূগোল শাস্ত্র এবং শিক্ষাবিজ্ঞান উভয়কেই যথেষ্ট প্রভাবিত করেছে।

(২) ভূগোল ও শিক্ষাবিজ্ঞান উভয় বিষয়ের অন্তর্গত বহু বিষয়বস্তুর মধ্যে কিছু বিষয় যেমন—প্রাকৃতিক উপাদান সম্বন্ধীয়, তেমনই কিছু বিষয় মানুষের জীবন বা সামাজিক জীবন সম্বন্ধীয়।

Scanned with CamScanner

(৩) ভূগোল ও শিক্ষাবিজ্ঞান উভয় শাস্ত্রের পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক ও গভীর। দুটি বিষয়ই বহু শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত। প্রতিটি শাখাই মানুষের জীবনকে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ প্রভাবের মাধ্যমে বিকশিত করে তুলেছে।

(৪) ভূগোল শাস্ত্রের কেন্দ্রে যেমন অবস্থান করে মানুষ ও সমাজ-জীবন। তেমনই শিক্ষাবিজ্ঞানের কেন্দ্রেও অবস্থান করে মানুষ ও তার সমাজ-জীবন। উভয় বিষয়েই আলোচিত হয় মানুষ ও সমাজ-জীবনের নানা আচরণগত দিক তথা ক্রিয়া-কর্মের বিষয়।

(৫) ভূগোল শাস্ত্র এবং শিক্ষাবিজ্ঞান উভয়ের লক্ষ্য হল মানবকল্যাণ। বিভিন্ন সরকারি নীতি সম্পর্কের কল্যাণে কী ধরনের প্রভাব ফেলেছে তার ভৌগোলিক ব্যাখ্যা নিয়ে গড়ে উঠেছে কল্যাণমূলক ভূগোল। অন্যদিকে শিক্ষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত হয়েছে মানুষ ও তার সামাজিক ক্ষেত্রের কল্যাণমূলক দিকগুলিতে।

(৬) ভূগোল শাস্ত্র এবং শিক্ষাবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার ক্ষেত্র হল মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণ, ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক নির্ধারণ, মানুষ ও তার অর্থনৈতিক ক্রিয়া-কলাপ ইত্যাদি।

(৭) ভূগোল শাস্ত্রে প্রাকৃতিক পরিবেশ ও মানবগোষ্ঠীর পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সমীক্ষা করা হয়। এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফল হিসেবে যে ভূ-দৃশ্য দেখা যায় তাকে জানা এবং মানব জীবনে কাজে লাগানোই ভূগোল শাস্ত্রের কাজ। অনুরূপভাবে শিক্ষাবিজ্ঞানেও পরিবেশ ও মানুষের গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সমীক্ষা করে এবং তার ফলশ্রুতিকে জানা ও মানবজীবনে কাজে লাগানোই শিক্ষাবিজ্ঞানের কাজ।

❑ ১.৩.২ শিক্ষাবিজ্ঞানের সঙ্গে অন্যান্য বিজ্ঞানের সম্পর্ক (Interrelation of Education and other Science Subjects) :

❖ ১.৩.২.১ ভৌতবিজ্ঞান ও শিক্ষাবিজ্ঞানের পারস্পরিক সম্পর্ক (Relation of Education with Physical Science) :

জীবনবিজ্ঞানের মতো ভৌতবিজ্ঞানের সঙ্গেও শিক্ষাবিজ্ঞান ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। ভৌতবিজ্ঞানের সঙ্গে শিক্ষাবিজ্ঞানের দুটি দিক সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল:

(১) শিক্ষাবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হল এই বিশ্বপ্রকৃতির বা বিশ্বের অন্তর্গত বস্তুর সম্পর্কে বিশুদ্ধ অভিজ্ঞতা অর্জনের প্রক্রিয়াকে আরও করানো। অভিজ্ঞতা অর্জন ও জ্ঞানার্জনের মূলসূত্রগুলি অনুধাবন করতে পারলে মানুষ তার নিজের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক, মিথস্ক্রিয়া, পারস্পরিক প্রভাব উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। ভৌতবিজ্ঞান শিক্ষাবিজ্ঞানের উদ্দেশ্যকে সফল করতেই সহায়তা করে। ভৌতবিজ্ঞান পাঠের মাধ্যমে মানুষ এই বিশ্বের জড় প্রকৃতি, জড় বস্তুর গঠন, শক্তি

ও তার রূপান্তরের বিষয়গুলি শিক্ষার্থী অনুধাবন করতে পারে। সুতরাং সেদিক থেকে ভৌতবিজ্ঞান শিক্ষাবিজ্ঞানের উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করে।

(২) শিক্ষাবিজ্ঞানে শিক্ষার্থীকে নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তার দেহ, মন ইত্যাদির গঠন, কার্য, পারস্পারিক সম্পর্ক বিকাশের বিভিন্ন দিক, সৃজনী শক্তির প্রকাশ আলোচনা করে। শিক্ষাবিজ্ঞানের উপরোক্ত বিষয়বস্তুগুলিকে যথার্থভাবে অনুধাবন করার জন্য দরকার হয় শিক্ষার্থীর চিন্তন কর্ম, যুক্তি, বিজ্ঞান ইত্যাদি। শিক্ষার্থীর এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলি গড়ে তোলে ভৌতবিজ্ঞানের মতো বিষয়ের সাহায্যে।

(৩) প্রকৃতিগত দিক থেকে শিক্ষাবিজ্ঞান যেমন বহু বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত। ভৌত বিজ্ঞানও তেমনই প্রকৃতিগত দিক থেকে বহু বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত। শিক্ষাবিজ্ঞানের মতো ভৌতবিজ্ঞানও নানা শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত। শিক্ষাবিজ্ঞানের যেমন তত্ত্বগত এবং প্রয়োগমূলক দিক বর্তমান তেমনি ভৌতবিজ্ঞানেরও তত্ত্বগত ও প্রয়োগমূলক দিক বর্তমান।

(৪) শিক্ষাবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হল মানব জীবনের দৃষ্টিভঙ্গিকে স্বচ্ছ, উদার ও যুক্তিগ্রাহ্য করে তোলা, কুসংস্কার দূর করে বিজ্ঞান চেতনা ও বিকশ মনস্কতাকে প্রতিষ্ঠা করা, সমাজের নানা ক্ষেত্রে বিদ্যমান কুসংস্কারগুলিকে দূরীভূত করে মানুষের জীবনকে মুক্তির পথ দেখানো। ভৌতবিজ্ঞানের পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মধ্যে সেই স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি গঠন, যুক্তিবাদী বিজ্ঞান চেতনার বিকাশ, যান্ত্রিক উপায় উদ্ভাবনের দ্বারা প্রকৃত সত্যকে উদ্ঘাটিত করতে সহায়তা করে।

(৫) শিক্ষাবিজ্ঞানের মূল তাৎপর্য নিহিত আছে মানবকল্যাণের ধারাকে বজায় রাখার মাধ্যমে সামাজিক প্রগতিকে চালিত করা। ভৌতবিজ্ঞানের অন্তর্গত বিভিন্ন বিষয়বস্তুর তত্ত্ব ও প্রয়োগমূলক দিক মানবকল্যাণের সেই ধারাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

(৬) মানুষ যে আজ সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রাণী হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, তাতে শিক্ষা বিজ্ঞান এবং ভৌতবিজ্ঞানের সমান্তরালভাবে অবদান রয়েছে।

❖ ১.৩.২.২ জীবনবিজ্ঞান ও শিক্ষাবিজ্ঞানের পারস্পরিক সম্পর্ক (Relation of Education with Life Science) :

অন্যান্য বিষয়ের মতো জীবনবিজ্ঞান বিষয়ের সাথেও শিক্ষাবিজ্ঞান ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্পর্কিত। জীবনবিজ্ঞানের আলোচনার মূল বিষয়বস্তু অনুধাবন করলে দেখা যাবে যে, এর নানা দিক শিক্ষাবিজ্ঞানকে প্রভাবিত করেছে নানাভাবে। আবার জীবনবিজ্ঞান ও শিক্ষাবিজ্ঞানের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে নানাদিক থেকে। স্বাভাবিকভাবে শিক্ষাবিজ্ঞান ও জীবনবিজ্ঞানের মধ্যে

Scanned with CamScanner

ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের সূত্রগুলিকে অনুসন্ধান করতে পারা যায়। এই দুই বিষয়ের মধ্যে সম্পর্কের রূপটি সংক্ষেপে নিম্নে উল্লেখ করা হল :

(১) শিক্ষাবিজ্ঞানের আলোচনার কেন্দ্রে অবস্থান করে **মানুষ ও শিক্ষা**। মানুষ তার সৃষ্টির পর থেকে কীভাবে ধীরে ধীরে অভিজ্ঞতা অর্জন তথা জ্ঞানলাভের দ্বারা বর্তমান অবস্থায় এসে পৌঁছাল, কীভাবে তার সামাজিক সংগঠন গড়ে উঠল, সামাজিক সংগঠনের একক হিসেবে মানুষের ভূমিকা কী তাই নিয়ে গড়ে উঠল শিক্ষাবিজ্ঞান। অন্যদিকে একইভাবে জীবনবিজ্ঞানের কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু একদিকে যেমন জীব, তেমনই জীবের দেহসংগঠন ও তার কার্যাবলি। জীবনবিজ্ঞানের আলোচনার কেন্দ্রে জীবনের একক (কোশ), জীবের দৈহিক সংগঠন (কোশ, কলা, অঙ্গ, অঙ্গতন্ত্র) এবং এগুলির কার্যগত দিক। এই জীবনবিজ্ঞানেরই অন্তর্গত একটি বিশেষ অংশ আবার মানুষকে নিয়েই আলোচনাতে ব্যাস্ত।

(২) সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে যেমন মানুষ তার সমাজ ও সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়েছে, সমাজ জীবনেও তার অবস্থানকে নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করেছে। একটি সামাজিক বিজ্ঞান হিসেবে এই আলোচনাগুলি করে শিক্ষাবিজ্ঞান। অনুরূপভাবে জীবনবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল জীবের **বিবর্তনের ধারা** সম্পর্কে আলোচনা করা। বিবর্তনের এই ধারণা থেকেই মানুষ জানতে পেরেছে সর্বোচ্চ স্তরের মানুষের উত্তরণের কাহিনি। সুতরাং মানুষের জীবন, তার গঠন ও কার্যের বিবর্তন সম্পর্কে আলোচনা করে জীবনবিজ্ঞান শিক্ষাবিজ্ঞান সেই মানুষের সাংস্কৃতিক বিবর্তনের সম্পর্কে আলোচনায় রত।

(৩) শিক্ষাবিজ্ঞানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয়বস্তু হল সঙ্গতি স্থাপন প্রক্রিয়া এবং সঙ্গতি স্থাপনের দ্বারা অর্জিত বৈশিষ্ট্যসমূহ যেগুলি মানুষের সংস্কৃতির জগৎকে সুরক্ষিত করেছে। অনুরূপ ভাবে জীবনবিজ্ঞানেরও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয় হল **অভিযোজন**। জীব তথা মানুষের অভিযোজন প্রক্রিয়া, অভিযোজনগত বৈশিষ্ট্য এবং তার ফলশ্রুতি জীবের জীবনরক্ষার প্রাসঙ্গিক বিষয়।

(৪) মানুষ ও তার **পরিবেশের** সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। উভয়দিকই একে অন্যকে প্রভাবিত করে। এক্ষেত্রে তাদের পারস্পারিক নির্ভরতার দিকটিকে অস্বীকার করা যায় না। অনুরূপভাবে জীব ও তার পরিবেশের পারস্পারিক নির্ভরতা, সম্পর্ক, উপাদান, কার্যগত বৈশিষ্ট্য জীবনবিজ্ঞানের আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু।

(৫) শিক্ষা বিজ্ঞানের আরও একটি দিকের আলোচনার বিষয় হল মানুষের **চিন্তা, কর্মপ্রচেষ্টা, তার বুদ্ধি ও সৃজনশীলতার** দিক। শিখনের মূল ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে তার মস্তিষ্কের গঠন ও ক্রিয়াশীলতার ভিত্তিতে। একইভাবে জীবনবিজ্ঞানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে মানুষের স্নায়ুতন্ত্র-এর গঠন, কার্যগত দিক ইত্যাদি।

(৬) শিক্ষাবিজ্ঞানের মূল বিষয় হিসেবে যদি অভিজ্ঞতালাভকে গুরুত্ব দিই তাহলে **জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অনুশীলনই** হল তার প্রকৃত উপায়, যেগুলির মাধ্যমেই অভিজ্ঞতা সমূহ অর্জিত হয়। জীবনবিজ্ঞানের আলোচনার বিষয়ও হল জ্ঞানেন্দ্রিয়ের গঠন ও কার্য, যার বিস্তৃত আলোচনা করে জীবনবিজ্ঞানের অন্তর্গত শারীরবিজ্ঞান নামক শাখাটি।

(৭) শিক্ষাবিজ্ঞান যেমন মানবকল্যাণে নিয়োজিত। অনুরূপভাবে জীবনবিজ্ঞানেরও গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল নিজেকে **মানবকল্যাণে** নিয়োজিত রাখা।

❖ ১.৩.২.৩ রাশিবিজ্ঞান ও শিক্ষাবিজ্ঞানের পারস্পরিক সম্পর্ক (Relation of Education with Statistics) :

লাতিন 'status', ইতালীয় 'statista' বা জার্মান statistick থেকে **ইংরেজি statistics শব্দটির উৎপত্তি**, যার বাংলা প্রতিশব্দ হল **'পরিসংখ্যান'**, এর অর্থ হল সংখ্যা নিয়ে গবেষণার বিজ্ঞান। **লোভিট** (Lovit)-এর মতে, "পরিসংখ্যান হল এক ধরনের বিজ্ঞান যা ঘটনাবলির সংজ্ঞা, বর্ণনা এবং তুলনা করার জন্য আবশ্যিক সংজ্ঞামূলক তথ্যাবলি সংগ্রহ, শ্রেণিবিন্যাস ও সারণিকরণ করে।"

শিক্ষাবিজ্ঞানের একটি বড় অংশ জুড়ে যে রাশিবিজ্ঞান প্রভাব বিস্তার করে, তাতে সহজেই **শিক্ষাবিজ্ঞান এবং রাশিবিজ্ঞানের সম্পর্ককে** উপলব্ধি করা যায়। নিম্নে সেগুলি উল্লেখ করা হল—

(১) শিক্ষাবিজ্ঞানের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করে মানুষ ও তার সমাজ। শিক্ষাবিজ্ঞান এই মানুষ ও তার সমাজের নানা সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজতে নিয়োজিত। পরিসংখ্যান শিক্ষার নানা সমস্যা, মানুষের সমাজ জীবনে বেকার সমস্যা, খাদ্য সমস্যা, স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের পথে শিক্ষাবিজ্ঞানের সঙ্গে হাত ধরে চলে।

(২) শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীদের অগ্রগতির ধারাকে পরিমাপ করে শিক্ষার্থীর উন্নতির পথকে প্রশস্ত করা। এই ধরনের কাজের উপর শিক্ষার সাফল্য অনেকখানি নির্ভর করে। রাশিবিজ্ঞান এই কাজকে সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন করতে সহায়তা করে।

(৩) বহুক্ষেত্রে শিক্ষার নানা দিক থেকে প্রাপ্ত তথ্যগুলির মধ্যে তুলনামূলক বিচার করার প্রয়োজন হয়। রাশিবিজ্ঞানের সাহায্যে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাপ্ত তথ্যগুলির মধ্যে তুলনা করা সহজ হয়। সেদিক থেকে বলা যায় রাশিবিজ্ঞান শিক্ষার তাৎপর্য নির্ণয়ে সহায়কের ভূমিকা পালন করে শিক্ষাবিজ্ঞানকে পরিপুষ্ট করে।

Scanned with CamScanner

(৪) সমাজ, রাষ্ট্র তথা জাতীয় পরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ অধিকার করে শিক্ষা পরিকল্পনা। রাশিবিজ্ঞান শিক্ষাপরিকল্পনা সমেত জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন, নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনায় সহায়কের ভূমিকা পালন করে।

(৫) জাতীয় সম্পদের বিকাশ, সংরক্ষণ, বণ্টন ও যথার্থ প্রয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষাবিজ্ঞান যেমন মানুষের কার্যকারিতাকে উপযোগী করে তোলার ক্ষেত্রে দিক নির্দেশের চেষ্টা করে, রাশিবিজ্ঞান সমানভাবে সেই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করতে প্রচেষ্টায় রত।

(৬) শিক্ষাবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হল শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতার পরিমাপ, তুলনামূলক বিচার ও মূল্যায়ন করা। শিক্ষাবিজ্ঞানের এই কার্য সম্পাদনে দেখা যায় নানারকম অভীক্ষা প্রস্তুত করতে। অক্ষীক্ষার পদগুলিকে অপেক্ষাকৃত নির্ভুল ভাবে তৈরি করতে সাহায্য করে রাশিবিজ্ঞান। অভীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে রাশিবিজ্ঞানের অবদান অবিস্মরণীয়।

❖ ১.৩.২.৪ প্রযুক্তিবিজ্ঞান ও শিক্ষাবিজ্ঞানের পারস্পরিক সম্পর্ক (Relation of Education with Technology) :

বিকাশ আর প্রযুক্তির উপর নির্ভর করে এগিয়ে চলেছে আধুনিক মানুষ। সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রাণী হিসেবে মানুষ যে আজ শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার তাতে রয়েছে যেমন শিক্ষাবিজ্ঞানের অবকাশ তেমনি প্রযুক্তিবিজ্ঞানের আধুনিক নীতি ও তত্ত্বের প্রয়োগ। মানুষের জীবনযাত্রার শিক্ষা ক্ষেত্রেও প্রযুক্তিবিজ্ঞানের সেই প্রভাব স্বাভাবিক ভাবেই কার্যকরী ভূমিকায় রয়েছে। সুতরাং শিক্ষাবিজ্ঞানের সঙ্গে প্রযুক্তি বিজ্ঞানের সম্পর্ককে সহজেই উপলব্ধি করা যায়। সেই সম্পর্কের ক্ষেত্রটি কেমন তা আমরা নিম্নে উল্লেখ করলাম—

(১) শিক্ষাবিজ্ঞানের পথ ধরে একদিন মানুষ তার সর্বোচ্চ স্থানে পৌঁছেছে। শিক্ষাবিবর্তনের সেই ধারা লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় একটি পর্যায়ে প্রযুক্তিবিজ্ঞানের জন্ম, বিকাশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আবার প্রযুক্তিবিজ্ঞানও অন্যদিকে শিক্ষাবিজ্ঞানের নানা দিক যেমন শিক্ষণ, শিখন, পাঠ্যক্রম ইত্যাদিকে আধুনিক রূপ দান করে অগ্রবর্তী করে তুলেছে। সুতরাং শিক্ষাবিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিজ্ঞান একে অন্যের উপর যেমন নির্ভরশীল তেমনই পরিপূরক।

(২) শিক্ষাবিজ্ঞানে প্রযুক্তিবিজ্ঞানের প্রভাব এসেছে দু-ভাবে—Hardware Approach এবং Software Approach-এর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। শিক্ষাবিজ্ঞানের সঙ্গে সমন্বয় ঘটিয়ে প্রযুক্তিবিজ্ঞান এই ভাবে জন্ম দিয়েছে নতুন এক ধারার বিষয়বস্তু যা **শিক্ষা প্রযুক্তিবিজ্ঞান** নামে পরিচিত। শিক্ষাক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক সব নীতি সমূহের প্রয়োগই হল যার মূল কথা।

ebook.dascoaching.in

(৩) শিক্ষাবিজ্ঞানের আলোচনার মূল বিষয়বস্তুই হল **শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়া সম্পাদন**। শিক্ষাবিজ্ঞানের এই শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়াকে কার্যকরী করার ক্ষেত্রে প্রযুক্তিবিদ্যা শিখন সহায়ক পদ্ধতি ও কৌশলগুলিকে উন্নত রূপ দেওয়ার চেষ্টা করে।

(৪) শিক্ষার্থীর শিখন পরিবেশকে যথার্থভাবে গড়ে তোলার বিষয়টি শিক্ষাবিজ্ঞানের অন্যতম আলোচনার বিষয়বস্তু। প্রযুক্তিবিদ্যার নানাদিক শিখনের উপযুক্ত পরিবেশ রচনার উপর বেশি গুরুত্ব প্রদান করে। এতে শিক্ষার লক্ষ্যগুলি যথার্থভাবে বাস্তবায়িত হওয়ার সুযোগ পায়।

(৫) শিক্ষার্থীর শিখনকে কীভাবে সহায়তা করা যায় সে বিষয়ে গভীরভাবে আলোচনা করার চেষ্টা করে শিক্ষাবিজ্ঞান। আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার জ্ঞান শিখনের সেই পরিবেশ, মাধ্যম এবং শিখন পদ্ধতিকে নিয়ন্ত্রিত করে শিক্ষার্থীর উপযোগী করে তোলার চেষ্টা করে প্রযুক্তিবিজ্ঞান।

(৬) শিক্ষাবিজ্ঞানের অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু হল যোগাযোগ প্রক্রিয়া। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর এই যোগাযোগের প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে কাজ করে প্রযুক্তিবিজ্ঞানের দ্বারা উদ্ভাবিত বিভিন্ন যন্ত্র বা যান্ত্রিক কৌশল।

(৭) শিক্ষাবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীর নিকট শিক্ষার বিষয়-বস্তুকে যথার্থভাবে উপলব্ধিতে সহায়তা করা। এই ব্যাপারে সহায়তা করে শিক্ষাসহায়ক প্রদীপনগুলি। এই প্রদীপনগুলির ব্যবহার বা প্রয়োগ পদ্ধতিতে আধুনিক প্রযুক্তিবিজ্ঞান প্রদীপনগুলিকে বিজ্ঞান সহজভাবে উপস্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষণ কার্যকে যথার্থভাবে প্রতিপন্ন করে।

(৮) শিক্ষাবিজ্ঞানের একটি অন্যতম কাজ হল শিক্ষার্থীর দক্ষতার বিকাশ ঘটানো। দক্ষতার মূলে আছে অনুশীলন। যা শিক্ষার্থীকে পরিপূর্ণতা দান করে। এক্ষেত্রে কম্পিউটারের মতো যান্ত্রিক ব্যবস্থা শিক্ষার্থীদেরকে বিশেষ বিষয়ে অনুশীলনের সুযোগ করে দেওয়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করে থাকে।

(৯) আগেই উল্লেখ করা হয়েছে **প্রযুক্তিবিজ্ঞানের নবতম উদ্ভাবন হল কম্পিউটার**। শ্রেণিকক্ষে এই কম্পিউটারকে যদি যথার্থভাবে প্রয়োগ বা ব্যবহার করা যায় তবে শিক্ষার্থী সহজেই অনেক বেশি অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে। এর ফলে একদিকে যেমন পরিশ্রম কমে, তেমনি অন্যদিকে অনেক সহজেই শিক্ষার্থীদের জ্ঞানভাণ্ডার বৃদ্ধি করা সম্ভব।

(১০) Simulated Learning-এর ক্ষেত্রেও কম্পিউটার কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে শিক্ষা বিজ্ঞানকে আধুনিক রূপ দান করেছে। বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মূল বিষয়বস্তুকে সংক্ষেপিত করে প্রতিকল্পের আকার উপস্থাপিত করার যে উপায় শিখনের

Scanned with CamScanner

ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় তাতে শিক্ষাবিজ্ঞান অনেকখানি প্রযুক্তিবিজ্ঞান নির্ভর হয়ে পড়েছে, যা কার্যত শিক্ষাবিজ্ঞানকে আধুনিকতাই দান করেছে।

✪ ১.৪ শিক্ষাবিজ্ঞান শিক্ষণে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি (Innovations in teaching Education):

❑ ১.৪.১ নির্মিতিবাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে শিক্ষণ (Constructivist Approach of Teaching) :

আধুনিক শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ায় নির্মিতিবাদ (Constrictivism) একটি নতুন মতবাদ। নতুন এই মতবাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে আজ ভারতসহ বিভিন্ন দেশ শিক্ষাক্ষেত্রে সাদরে গ্রহণ করেছে। ভারতে সাম্প্রতিক কালে প্রকাশিত দুটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে এই মতবাদটি স্থান পেয়েছে। National Curriculum Frame Work 2005 এবং National Curriculum Frame Work for Teacher Education 2009-তে নির্মিতিবাদকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শুধুমাত্র শিখন প্রক্রিয়াতেই নয়, পাঠ্যক্রম নির্বাচন, শিক্ষণ পদ্ধতি, শ্রেণি কক্ষের পরিবেশ গঠনে নির্মিতিবাদের গুরুত্বকে প্রাধান্য দেওয়ার প্রয়াস লক্ষ্য করা গেছে।

❖ ১.৪.১.১ নির্মিতিবাদের অর্থ (Meaning of Constructivism) :

নির্মিতিবাদের অর্থ উপলব্ধি করতে হলে তার মূল বক্তব্যকে উপলব্ধি করা দরকার প্রথম। নির্মিতিবাদের মূল বক্তব্য হল ব্যক্তি বা শিক্ষার্থী যে জ্ঞান লাভ করে তার কোনো স্বাধীন অর্থ বা সত্তা নেই। শিক্ষার্থী জ্ঞান অর্জনের পরিবর্তে জ্ঞান নির্মাণ করে। ব্যক্তি বা শিক্ষার্থী যখন পরিবেশ থেকে জ্ঞান লাভের উপাদান হিসেবে তথ্য সংগ্রহ করে তখন তার প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ নিজস্ব। অর্থাৎ ব্যক্তি তার সম্পূর্ণ নিজস্ব প্রক্রিয়ায় তথ্য সংগ্রহের পর জ্ঞানের নির্মাণ করে। কিন্তু ব্যক্তি কখনোই তার পরিবেশ থেকে গৃহীত তথ্যকে হুবহু একই রকম বা প্রতিকৃতি হিসেবে গ্রহণ করে না। যে প্রক্রিয়ায় ব্যক্তি অভিজ্ঞতা বা জ্ঞানের উপাদান সংগ্রহ করে তাকে বলা হয় প্রজ্ঞা (Cognition)। প্রত্যক্ষণ, স্মরণ যুক্তিকরণ, বিক্ষণ, সিদ্ধান্তগ্রহণ ইত্যাদি মানসিক প্রক্রিয়া এই প্রজ্ঞার অন্তর্গত। প্রতিটি ব্যক্তির তার নিজস্ব প্রজ্ঞা আছে। যে-কোনো পরিবেশে একজন ব্যক্তি বা শিক্ষার্থী যখন অভিজ্ঞতা লাভ করতে গিয়ে তথ্য প্রক্রিয়াকরণের কাজটি করে তখন সে তার সম্পূর্ণ নিজের মতো করে অভিজ্ঞতাকে গঠন বা নির্মাণ করে নেয়। এখানে একদিকে যেমন ব্যক্তির পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতা, তার বৌদ্ধিক ক্ষমতা, সৃজনীক্ষমতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে তেমনই সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। স্বাভাবিকভাবেই একই পরিবেশে একই ঘটনার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন ব্যক্তি বা শিক্ষার্থী তাদের নিজেদের মতো করে অর্থ উপলব্ধি করে। জ্ঞানের বিষয়বস্তু নির্মাণ বা গঠনের ক্ষেত্রে কোনো নৈর্ব্যক্তিক (Objective) শর্ত নেই, বরং আছে প্রত্যেক ব্যক্তির

আলাদা আলাদা ব্যক্তিগত (Subjective) প্রভাব। এই জগতের যে-কোনো দুজন শিক্ষার্থী হুবহু একইরকম প্রক্রিয়ায় জ্ঞান নির্মাণের কার্য করে না, অর্থাৎ জ্ঞান নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ভিন্ন ভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়া কাজ করে। **Jonasson** (১৯৯১)-এর ভাবায় নির্মিতিবাদীরা বিশ্বাস করেন যে, "Learners construct their own reality or at least interpret it based upon their perceptions of experiences, so one's knowledge is a function of one's prior experiences, metal structures, and beliefs that are used to interpret objects and events."

❖ ১.৪.১.২ নির্মিতিবাদের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of constructivism) :

নির্মিতিবাদের কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে, সেগুলি নিম্নে উল্লেখ করা হল—

(১) ব্যক্তি বা শিক্ষার্থী নিজেই তার জ্ঞানের নির্মাণকর্তা। এই জ্ঞান সে নির্মাণ করে সম্পূর্ণ সক্রিয়ভাবে।

(২) ব্যক্তি বা শিক্ষার্থী তার জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় এবং স্নায়বিক সংবেদনকে সক্রিয়ভাবে কাজে লাগিয়ে বস্তু বা ঘটনার অর্থ উপলব্ধি করে।

(৩) শিক্ষার্থী তার জ্ঞানকে নিজের মতো করে সংগঠিত বা নির্মাণ করে। এই জ্ঞান নির্মিত হয় শিক্ষার্থীর পূর্ব অভিজ্ঞতা, মানসিক ক্ষমতা, চাহিদা, সৃজনী ক্ষমতা, উলম্ব ও সমান্তরাল চিন্তন এবং সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে।

(৪) শিক্ষার্থীর সংগঠিত বা নির্মিত জ্ঞান কখনোই নৈর্ব্যক্তিক (Objective) নয়, তা ব্যক্তিকেন্দ্রিক (Subjective)। এই কারণে প্রতিটি শিক্ষার্থীর জ্ঞানের অর্থ ভিন্ন ভিন্ন।

(৫) শিক্ষার্থীর শিখন পরিবেশ ও পরিস্থিতি ভিত্তিক। তার অভিযোজন বা সঙ্গতি বিধানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে জ্ঞানের নির্মাণ ঘটে। শিক্ষার্থীর যা জানা আছে তার থেকে অন্যরকম কিছু বা অতিরিক্ত কিছু ঘটলে শিক্ষার্থীর মানসিক ক্ষেত্রে জানা এবং অজানা (অন্য রকম বা অতিরিক্ত) বিষয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব বা বিরোধ ঘটে। এই দ্বন্দ্বকে বলা হয় প্রস্তাব দ্বন্দ্ব (cognitive conflict)। এর ফলশ্রুতিতে শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতার পুনর্গঠন ঘটে এবং নতুন অভিজ্ঞতার স্থান পায়। এই বিষয়টিই শিক্ষার্থীর নিকট অভিযোজন নামে পরিচিত।

(৬) শিক্ষার্থীর জ্ঞানের নির্মাণ ঘটে বাস্তব সামাজিক বা প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর নির্ভর করে। **Malone** এবং **Taylor** (১৯৯৩)-এর মতানুসারে, "Human knowledge is a process of Personal cognitive construction, or invention undertaken by the individual who is trying to make sense of his social or natural environment."

Scanned with CamScanner

❖ ১.৪.১.৩ নির্মিতিবাদের প্রকারভেদ (Type of constructivism) :

নির্মিতিবাদকে প্রধানত দু-ভাগে বিভক্ত করা যায়– একটি হল প্রজ্ঞামূলক নির্মিতিবাদ (cognitive constructivism) এবং অপরটি হল সামাজিক নির্মিতিবাদ (social constructivism)।

(ক) **প্রজ্ঞামূলক নির্মিতিবাদ** (cognitive constructivism) : এই মতবাদটির প্রবক্তা হলেন **জ্যা পিয়াজে** (Piaget)। পিয়াজের মতে মানুষের চিন্তন প্রক্রিয়ার মৌলিক উপাদান হল **স্কিমা** (schema)। এই স্কিমা হল এমন এক ধরনের মানসিক সংগঠন যা দিয়ে পরিবেশ থেকে আগত তথ্য বা অভিজ্ঞতার উপাদান সঞ্চিত হয়। এই স্কিমার সাহায্যেই মানুষ তার পরিবেশের উদ্দীপক পরিস্থিতিকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করে। ব্যক্তি যখন কোনো উদ্দীপক পরিস্থিতির নতুন তথ্যকে বর্তমানে তার মধ্যে বিদ্যমান স্কিমাতে অঙ্গীভূত বা অন্তর্ভুক্তিকরণের কাজটি করে তখন তাকে বলা হয় আত্তীকরণ (Assimilation)। কিন্তু ব্যক্তি যখন কোনো সম্পূর্ণ নতুন তথ্যকে বর্তমানে তার মধ্যে বিদ্যমান স্কিমা দিয়ে অন্তর্ভুক্তিকরণ না করে নতুন স্কিমা গঠন করে অথবা পূর্ববর্তী স্কিমার রূপান্তর ঘটায় তখন তাকে বলা হয় সহযোজন। এই আত্তীকরণ এবং সহযোজনের ফলশ্রুতিতে যে অভিযোজন ঘটে তার দ্বারা ব্যক্তি পরিবেশের সঙ্গে ভারসাম্য আনার চেষ্টা করে। এই অভিযোজনের ধরন প্রত্যেক ব্যক্তির তার নিজস্ব ব্যাপার। এজন্য ব্যক্তি তার নিজের মতো করে পরিবেশ থেকে জ্ঞানের উপাদান সংগ্রহ করে জ্ঞানের নির্মাণ করে।

(খ) **সামাজিক নির্মিতিবাদ** (social constructivism) : সামাজিক নির্মিতিবাদের প্রবক্তা হলেন রুশ মনোবিজ্ঞানী **ভাইগটস্কি** (Vygotsky)। পিয়াজের মতো ভাইগটস্কিও মানব শিশুর জ্ঞানলাভের প্রক্রিয়াকে বর্ণনা করেছেন। ভাইগটস্কির নির্মিতিবাদের মূল বক্তব্য হল মানুষ তার জ্ঞানের নির্মাণ করে পরিবেশ থেকে জ্ঞানের উপকরণ বা সংশ্লিষ্ট তথ্য সংগ্রহ করে, কিন্তু সেই পরিবেশ হিসেবে তিনি সামাজিক পরিবেশকে গুরুত্ব দিয়েছেন বেশি। এই ব্যাপারে তিনি মানুষের সমাজ, সংস্কৃতি ও ভাষার প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ভাইগটস্কির নির্মিতিবাদ শিশু এবং তার আরো উন্নত সংস্কৃতিসম্পন্ন মানুষের মধ্যে সাংস্কৃতিক বা কৃষ্টিমূলক মিথস্ক্রিয়াকে গুরুত্ব দিয়ে মানবশিশুর জ্ঞানের নির্মাণ প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করেছেন। সামাজিক নির্মিতিবাদ অনুসারে শিক্ষার্থী তার জ্ঞানের সংগঠিতকরণ বা নির্মাণ করে তার বন্ধু-বান্ধব, সহপাঠী, শিক্ষক, বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি এবং তার সামাজিক প্রেক্ষাপটের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের সান্নিধ্যে।

প্রতিটি ব্যক্তি বা শিক্ষার্থী তার সান্নিধ্যে থাকা ব্যক্তিদের সঙ্গে সামাজিক সাংস্কৃতিক মিথস্ক্রিয়ায় যুক্ত থেকে যে সব অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয় সেগুলির ভিত্তিতে সে তার নিজের মতো করে জ্ঞানের নির্মাণ করে থাকে। শিক্ষক এখানে তার পরিচালক ও সহায়কের ভূমিকা পালন করলেও কখনোই সরাসরি জ্ঞানকে শিক্ষার্থীর মধ্যে সঞ্চারিত করেন না।

❖ ১.৪.১.৪ নির্মিতিবাদী শিখনের নকশা (Constructivist Learning Design) :

নির্মিতিবাদী শিখনের নকশায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর জোর দিয়ে সেগুলি অনুসরণ করার দরকার হয়–

(১) **পরিস্থিতি গঠন** (Developing a situation) : শিক্ষার্থীরা যাতে স্বাধীনভাবে তাদের মতো করে শিখন প্রক্রিয়াকে সংগঠিত করতে পারে সেই উপযোগী একটি অনুকূল পরিস্থিতি গঠন করতে হয় শিক্ষককে।

(২) **শিক্ষার্থীদের দলবদ্ধকরণ** (Grouping the students) : প্রত্যেক শিক্ষার্থী তার মতো করে জ্ঞানের নির্মাণ করে। সেই কারণে শিক্ষককে জোর দিতে হয় ব্যক্তি বৈষম্যের নীতিকে। সেই কথা মাথায় রেখে কখনোই তিনি বড়ো আকারে শ্রেণি বা দল গঠন না করে খুব ছোটো ছোটো দল তৈরি করে শেখার সুযোগ করে দেবেন। দলগুলি ভিন্নধর্মী (heterogenous group) হলে ভালো হয়।

(৩) **সংযোগ রক্ষা বা সেতু বন্ধন** (Bridging) : শিক্ষার্থীরা যা জানে এবং যা তারা জানবে, এই দুই-এর মধ্যে শিক্ষক সেতুবন্ধনের কাজ করবেন। এজন্য তিনি শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাই করে সেই অনুসারে শিখনে অগ্রসরতা ঘটাবেন।

(৪) **প্রশ্নকরণ** (Questioning) : শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান এবং যে জ্ঞানের সঙ্গে পরিচিতি ঘটাবেন সেই জ্ঞানের মধ্যে সংযোগ রক্ষা বা সেতুবন্ধনের জন্য শিক্ষক প্রশ্নকরণের কৌশল অবলম্বন করবেন। সেজন্য তিনি শ্রেণিকক্ষে নিজেকে সেইভাবে প্রস্তুত করে আনবেন। প্রশ্নকরণের দক্ষতাকে এই ব্যাপারে কাজে লাগাবেন।

(৫) **শিক্ষার্থীদের প্রেষণা সঞ্চার** (Motivating) : শিক্ষার্থীরা যাতে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে, মিথস্ক্রিয়াধর্মী শিখনে অংশগ্রহণ করে তার জন্য তাদের প্রেষণা সঞ্চার করতে হবে।

❖ ১.৪.১.৫ নির্মিতিবাদের পঞ্চ 'E' (Finve Es of Constructivism) :

নির্মিতিবাদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী শিক্ষণকার্য পরিচালিত করার জন্য একটি নির্দেশনামূলক মডেল (instructional model) প্রস্তুত করেন **Roger Bybee**। এই মডেলে পাঁচটি E-এর ধারণায় পাঁচটি ধাপের মাধ্যমে নির্দেশনা দানের কথা বলা হয়েছে, এগুলিকে পঞ্চ E (Five Es)-এর ধাপ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। **মূলত পাঁচটি ধাপকে পাঁচটি কথা দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে, এই পাঁচটি কথা হল–**

(i) নিয়োজিত করা (Engage)
(ii) অনুসন্ধান করা (Explore)
(iii) ব্যাখ্যা করা (Explain)
(iv) বিশদ বর্ণনা দেওয়া (Elaborate)

Scanned with CamScanner

(v) মূল্যায়ন করা (Evaluate)

উপরোক্ত পাঁচটি ধাপের মাধ্যমে কীভাবে শিক্ষণ-শিখন কার্যটি পরিচালিত হয় তা নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল—

(i) **নিয়োজিত করা** (Engage) :

নির্দেশনামূলক উদ্দেশ্যকে ভিত্তি করে পাঠের বিষয়বস্তুকে চিহ্নিত করা এবং সেই অনুসারে শিখনের কার্যে অগ্রসর হওয়া শিক্ষার্থীর প্রাথমিক কার্য। শিক্ষার্থী যা জানে (পূর্বজ্ঞান) এবং যা সে জানবে (যে জ্ঞান সংগঠিত করবে) তাদের মধ্যে সংযোগ রক্ষা বা সেতু বন্ধনের কার্যটি শিক্ষার্থী সঠিকভাবে সম্পন্ন করার চেষ্টা করবে। শিখনের এই প্রথম ধাপটিতে এই পূর্বজ্ঞান ও সংগঠিতব্য জ্ঞানের মধ্যে সংযোগ সাধনের কার্যে নিয়োজিত করাই হল শিক্ষার্থীর মূল উদ্দেশ্য। এই ধরনের উদ্দেশ্য পূরণের ভিত্তি হল গঠনমূলক বিভিন্ন কার্যাবলি সম্পাদন। শিক্ষার্থীদের এই ধরনের কার্যাবলিতে অংশগ্রহণ করতে যথেষ্ট উদ্দীপিত হওয়া দরকার। এ জন্য শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ, শিখন কার্যাবলিতে প্রেরণা সঞ্চার করার প্রয়োজন। এই কার্য সম্পাদন সম্ভব হয়— প্রশ্নকরণ, সমস্যার সৃষ্টিকরণ, সমস্যার ব্যাখ্যাকরণ, ঘটনায় আকস্মিকতা প্রদর্শন এবং সর্বোপরি একটি সমস্যাবহুল পরিস্থিতির উদ্ভবের দ্বারা।

(ii) **অনুসন্ধান করা** (Explore) :

এই পর্যায়ে শিক্ষার্থী সরাসরি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ঘটনা ও বস্তুসামগ্রীর সঙ্গে নিজেকে নিযুক্ত করে নেয়। এইভাবে অংশগ্রহণের ফলশ্রুতি হিসেবে ঘটনার প্রেক্ষিত অনুযায়ী শিক্ষার্থীরা অভিজ্ঞতা ভিত্তি রচনা করে। নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক অংশগ্রহণ, মত বিনিময় ও যোগাযোগ রক্ষার ফলে শিক্ষার্থী দলের প্রতিটি সদস্য সাধারণ অভিজ্ঞতার ভিত্তি নির্মাণ করতে সমর্থ হয়। এই সমগ্র কার্য প্রক্রিয়াটিতে শিক্ষক তাঁর ভূমিকা পালন করেন একজন সহায়ক, পরিচালক, শিক্ষা সামগ্রী সরবরাহকারক হিসেবে। শিক্ষার্থীদের অনুসন্ধানমূলক প্রক্রিয়াটি কার্যত নির্দেশনার সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সহায়তা করে।

(iii) **ব্যাখ্যা করা** (Explain) :

এই পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের বহুমুখী ব্যাখ্যাকরণের কার্যটি চলে। শিক্ষার্থীরা যা উপলব্ধি করতে পেরেছে সেটি তারা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে। শিক্ষার্থীরা কখনো ব্যক্তিগত স্তরে কখনো দুজন শিক্ষার্থীর মধ্যে অথবা একটি দলের মধ্যে ব্যাখ্যাদানের কার্যটি চালাতে পারে। শেষপর্যন্ত শিক্ষার্থীদের এই ব্যাখ্যা দিতে হয় তাদের শিক্ষক তথা সহায়কের নিকট। শিক্ষক তখন তাঁর মতো করে বিষয়বস্তু বা ঘটনাকে শিক্ষার্থীদের সামনে ব্যাখ্যা করে আরো ভালোভাবে বোঝানোর চেষ্টা করেন। যে সমস্ত উল্লেখযোগ্য 'ধারণা'গুলি বিশেষ বিশেষ 'শব্দ'-এর দ্বারা ব্যবহৃত হয় সেগুলির যথাযথ ব্যাখ্যাও তিনি দিয়ে দেন এবং বিষয়বস্তুকে আরো উন্নত স্তরে, আরো বেশি আকর্ষণীয় করে তোলার চেষ্টা করেন।

(iv) **বিশদ বর্ণনা দেওয়া** (Elaborate) :

বিশদভাবে বর্ণনাদানের এই পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা তাদের জানা বিভিন্ন ধারণাগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করে তাদের চারপাশের জাগতিক পরিবেশের ঘটনা ও বস্তুসামগ্রীকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করে। এ জন্য তারা ধারণাগুলিকে পূর্বে যতটুকু জেনেছে সেগুলিকে বিস্তৃতভাবে বোঝার চেষ্টা করে এবং বিশদে বর্ণনা দেওয়ার চেষ্টা করে। এই উপলব্ধি তাদের পরবর্তী অনুসন্ধানমূলক দৃষ্টিভঙ্গি এবং নতুন ধরনের উপলব্ধিতে অগ্রসর হতে সাহায্য করে।

(v) **মূল্যায়ন করা** (Evaluate) :

নির্দেশনামূলক যে উদ্দেশ্যগুলির ভিত্তিতে জ্ঞানসমূহ শিক্ষার্থীদের অর্জন করার কথা ছিল এবং যেগুলি তাদের উপলব্ধি করা দরকার সেগুলির যথাযথ অর্জন এবং উপলব্ধি সম্ভব হয়েছে কি না এবং সেই সঙ্গে সেগুলির অর্জনের স্তর নির্ধারণের জন্য শিক্ষকের যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করার প্রয়োজন হয়। এই উদ্দেশ্যেই শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করার দায়িত্ব বর্তায় শিক্ষকের উপর। নির্দেশনার প্রক্রিয়ায় ধারাবাহিকতা বজায় রেখেই এই মূল্যায়নের কার্য সম্পাদনের জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে যন্ত্র বা কৌশল ব্যবহার করা হয়। পাঠ-পরিকল্পনার নক্‌শা, পর্যবেক্ষণ তালিকা, চেক্‌লিস্ট, সাক্ষাৎকার প্রভৃতির মাধ্যমে তা করা যায়। এ ছাড়াও বিভিন্ন প্রজেক্ট বা সমস্যাভিত্তিক কার্যাবলিও অন্তর্ভুক্ত করা যায়। মূল্যায়ন একদিকে যেমন শিক্ষার্থীদের শিখনকে প্রভাবিত করে তেমনি শিক্ষককে পরবর্তী পাঠদানের পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে সচেতন করে। পাঠ-পরিকল্পনায় প্রয়োজনমতো সংশোধন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধনের সুযোগও তৈরি হয় এই মূল্যায়নের ফলে। এইভাবে শিক্ষক ক্রমশ শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও প্রেষণা সঞ্চারের মাধ্যমে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যকে সার্থক করে তোলার চেষ্টা করেন।

❖ ১.৪.১.৬ নির্মিতিবাদী শ্রেণিকক্ষের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Constructivist classroom) :

নির্মিতিবাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে শিক্ষণ কার্য পরিচালিত করতে হলে শিক্ষককে শ্রেণিকক্ষে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলিকে গড়ে তোলার চেষ্টা করতে হবে। **নির্মিতিবাদী শ্রেণিকক্ষের এই বৈশিষ্ট্যগুলি হল—**

(১) শ্রেণিকক্ষ হবে ভীষণভাবে মিথষ্ক্রিয়া ভিত্তিক। এই মিথষ্ক্রিয়া ঘটবে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে, দুই দল শিক্ষার্থীদের মধ্যে এবং বিভিন্ন শিক্ষার্থীদের মধ্যে। এই মিথষ্ক্রিয়া সম্পন্ন হবে শ্রেণিকক্ষের একটি স্বাস্থ্যকর পরিবেশে এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায়।

Scanned with CamScanner

(২) শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের সক্রিয়তার মধ্যে ভারসাম্য থাকা দরকার। এমন হওয়া ঠিক নয় যে, শিক্ষক খুব বেশি সক্রিয় কিন্তু শিক্ষার্থীরা তুলনায় নিষ্ক্রিয় অথবা শিক্ষার্থীরা খুব সক্রিয় কিন্তু শিক্ষক নিষ্ক্রিয়।

(৩) শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মধ্যে জ্ঞানের সঞ্চরণ ঘটাবেন বরং শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে জ্ঞানের আদান প্রদানের দ্বারা এমন পরিস্থিতি তৈরি হবে যাতে শিক্ষার্থীরা তাদের জ্ঞান সংগঠিত বা নির্মাণ করার প্রক্রিয়াকে কাজে লাগাতে উৎসাহিত বোধ করে। এজন্য শ্রেণিকক্ষে আগ্রহ সঞ্চার করতে পারে এমন সব বস্তু উপস্থাপিত করা দরকার।

(৪) শ্রেণিকক্ষের সামগ্রিক পরিচালনা, আগ্রহের জন্য আকর্ষণীয় বস্তু প্রদর্শন ইত্যাদির দায়িত্বপূর্ণ বিষয়গুলি শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পারিক অংশ গ্রহণের দ্বারা সম্পন্ন হবে। শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ হবে সম্পূর্ণ উদ্দীপনা সঞ্চারকারী, জটীলতাপূর্ণ। সেজন্য চিত্তাকর্ষক ও প্রাসঙ্গিক বই, জীবজন্তু, যন্ত্রসঙ্গীতের উপকরণ, উপস্থাপনের ব্যবস্থা থাকবে।

(৫) শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা থাকবে নিয়ন্ত্রিত এবং ছোটো ছোটো দলে বিভক্ত। শিখনমূলক কার্যাবলির পরিকল্পনা তৈরির সময় শিক্ষক ব্যক্তি শিক্ষার্থীদের গুরুত্ব দেবেন বেশি, শ্রেণিকক্ষে সমগ্র শিক্ষার্থীদের প্রতি গুরুত্ব দেবার দরকার নেই।

(৬) শ্রেণিকক্ষে এমন বাস্তব পরিবেশের সৃষ্টি করা উচিত যাতে শিক্ষার্থীদের শিখনের সঙ্গে তার প্রাসঙ্গিকতা থাকে।

(৭) শিক্ষার্থীদের নতুন জ্ঞান পূনর্গঠন বা নির্মাণ এর জন্য আন্তরিক তাগিদ, প্রেষণা অবশ্যই থাকা দরকার। এ জন্য শিক্ষার্থীরা সমস্যার সমাধান প্রসঙ্গে প্রশ্ন করার মানসিকতা এবং সেই সঙ্গে উত্তর দেওয়ার প্রচেষ্টামূলক প্রবণতা থাকা উচিত। শিক্ষক-এর সঙ্গে মত বিনিময় অথবা সহপাঠীদের সঙ্গে মত বিনিময়ের জন্য শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস থাকতে হবে।

(৮) শ্রেণিকক্ষে শিখনের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত বাস্তব সমস্যা সমাধান করার জন্য বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির উপর ভিত্তি করে শিখনে অগ্রসর হওয়া। সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর আবিষ্কার ধর্মী শিখনে উৎসাহিত হওয়া দরকার

(৯) শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থী তার চিন্তনের যাচাই-এর জন্য অন্যান্য সহপাঠীদের সঙ্গে মিথষ্ক্রিয়া সম্পাদন করা ও আত্মমূল্যায়নের কৌশলকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

(১০) সর্বোপরি শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ এমন হবে যাতে শিক্ষার্থী বিশ্বের বহুমুখী দিককে ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা লাভ করতে পারে। প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের হাতে-কলমে কাজের সুযোগ দেওয়া দরকার।

❖ ১.৪.১.৭ নির্মিতিবাদী শিক্ষণে শিক্ষকের ভূমিকা (Role of Teacher in constructivist approach of Teaching) :

নির্মিতিবাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে শিক্ষণকার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে শিক্ষককে নিম্নলিখিত ভূমিকা পালন করা উচিত।

(১) নির্মিতিবাদী শিক্ষককে তাঁর নিজের বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞানের অধিকারী হওয়া দরকার। বিষয় জ্ঞানের গভীরতা এবং প্রসারতা উভয়ই থাকা উচিত।

(২) শুধুমাত্র নিজের বিষয় জ্ঞানেই শিক্ষককে দক্ষ হলে চলবে না, নিজের বিষয়টির সঙ্গে সম্পর্কিত অন্যান্য সমস্ত বিষয়ের জ্ঞানও তাঁর থাকা জরুরি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় একজন শিক্ষাবিজ্ঞানের শিক্ষকের শিক্ষাবিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয় যেমন— দর্শন, মনোবিজ্ঞান, নৃ-বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, ভৌতবিজ্ঞান, রাশিবিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিজ্ঞান, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, ভূগোল, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতির জ্ঞানও থাকা আবশ্যক।

(৩) অন্যান্য বিষয়গুলির সঙ্গে শিক্ষককে তাঁর নিজের বিষয়ের সম্পর্ক স্থাপন করে তা শিক্ষার্থীদের নিকট তুলে ধরতে হবে।

(৪) প্রকৃত বাস্তব পরিবেশ, প্রকৃতি এবং সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে শিক্ষণের বিষয়বস্তুকে উপস্থাপিত করা দরকার, যেগুলি শিক্ষার্থী তার দৈনন্দিন জীবনে পর্যবেক্ষণের সুযোগ পায়। শ্রেণিকক্ষ এবং বিদ্যালয়ের গণ্ডির বাইরেও তার শিখনের পরিবেশ এইভাবে ক্রমশ বিস্তৃতি লাভ করে।

(৫) শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞানকে যাচাই করে তার ভিত্তিতে শিক্ষক তাঁর নির্দেশনার ক্ষেত্রে পরিচালক এবং সহায়ক-এর ভূমিকা পালন করবেন।

(৬) নির্মিতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে শিক্ষণের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর পূর্বজ্ঞানের গভীরতা এবং ব্যপ্তি জানার অত্যন্ত প্রয়োজন আছে। শিক্ষার্থীকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করার জন্য এই পূর্বজ্ঞান যাচাই-এর বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে শিক্ষককে সম্পন্ন করা উচিত। শিক্ষার্থীরা এই পূর্বজ্ঞানকে অবলম্বন করেই নতুন জ্ঞানের নির্মাণ করে। শিক্ষার্থীর চিন্তনে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে এটি বিশেষভাবে সহায়তা করে। সুতরাং শিক্ষার্থীর পূর্বজ্ঞান যাচাই করা, চিন্তন প্রক্রিয়াকে জাগিয়ে তোলা এবং তাদের ভুল ধারণাগুলির দূরীকরণে শিক্ষককে যথেষ্ট দক্ষ ও যত্নবান হতে হবে।

(৭) নির্মিতিবাদী শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিকট তথ্য সরবরাহের শুধুমাত্র প্রাথমিক উৎস নয়, তাঁকে হতে হবে মুখ্য শিখন সম্পদ কেন্দ্র।

(৮) শিক্ষক শিক্ষার্থীদের এমনভাবে অভিজ্ঞতার মুখোমুখি করে দেবেন যাতে শিক্ষার্থীরা তার মোকাবিলা করতে বর্তমানের জ্ঞানকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করে। এতে তাদের মধ্যে গড়ে ওঠা ভুল ধারণাগুলি উপলব্ধি করার সুযোগ পায়।

Scanned with CamScanner

(৯) শ্রেণিকক্ষে প্রতিটি শিক্ষার্থীকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে মনোযোগ দেবেন। তিনি শিক্ষার্থীদের কোনোরকম ইতস্তত: ছাড়াই প্রতিক্রিয়া সম্পাদনের সুযোগ দেবেন যাতে শিক্ষার্থীরা পাঠের মধ্যে নিজেদের মনোনিবেশ করার চেষ্টা করে।

(১০) শিক্ষার্থীরা এমনভাবে শিখনে অগ্রসর হবে যাতে সেই শিখন-এর ফলশ্রুতি হিসেবে তারা আরো উন্নত ও অগ্রবর্তী শিখনে আগ্রহী হয়ে ওঠে। শিক্ষার্থীরা যাতে স্বাধীনভাবে, খোলামনে প্রশ্ন করতে পারে, চিন্তাশীল হতে পারে— তার জন্য প্রয়োজনীয় উৎসাহ প্রদানের কাজটি শিক্ষককে দক্ষতার সঙ্গে করা উচিত।

❑ ১.৪.২ চিন্তায় আলোড়ন বা মস্তিষ্ক ঝঞ্ঝা কৌশল (Brain Storming Strategy) :

চিন্তার আলোড়ন শব্দ গুচ্ছটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হল 'Brain Storming', যার অর্থ মস্তিষ্কের আলোড়ন অন্যভাবে বলা যায় ব্যক্তির স্বাধীনভাবনার মন্থনা। চিন্তার-আলোড়ন হল একটি শিক্ষণ কৌশল (teaching strategy)। এই শিক্ষণ কৌশলটির মাধ্যমে ব্যক্তির চিন্তা ভাবনার একটি ইতিবাচক পরিবেশ সৃষ্টি এবং অতি অল্প সময়ে তাৎক্ষণিক ভাবে অধিক ধারণা লাভ করাই হল মূল উদ্দেশ্য। মুক্তচিন্তার দ্বারা কোনো সমস্যার সমাধান অথবা নতুন কোনো ধারণা নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত ঘটানোর একটি উপায় হল এই 'চিন্তার আলোড়ন' বা 'Brain Storming'। শিক্ষণ কৌশল হিসেবে এটিকে জনপ্রিয় করে তোলেন A.F. Osborn (1963) তাঁর লেখা 'Applied Imagination'-এর মাধ্যমে। তাঁর মতে কোনো রকম বিচারকরণ বা বিরুদ্ধ সমালোচনা ছাড়াই কোনো পরিস্থিতির সমস্যা সমাধান করা বা তার সঙ্গে সম্পর্কিত ধারণার অনুসন্ধান করার জন্য এই শিক্ষণ কৌশলটিকে একজন শিক্ষার্থীর উপর ব্যবহার করা যেতে পারে। বিশেষ করে প্রতিভাবান বা উন্নত বৌদ্ধিক ক্ষমতা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের বৌদ্ধিক ক্ষমতার বিকাশে কার্যকরী। কারণ এখানে শিক্ষার্থীদের চিন্তার স্তরে শিখন সম্পন্ন হতে পারে, সৃজনধর্মী কল্পনার উদ্ভব হয় এবং সমস্যা সমাধানের ঘটনা ঘটে। চিন্তার আলোড়ন শুধুমাত্র শিক্ষার্থীর Cognitive domain-কেই প্রভাবিত করে না, তার Affective domain-এর সঙ্গে সম্পর্কিত ধারণাগুলিকেও প্রভাবিত করে যথেষ্ট।

❖ ১.৪.২.১ মস্তিষ্ক ঝঞ্ঝার অর্থ (Meaning of Brain Storming) :

চিন্তার আলোড়ন শব্দ গুচ্ছটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হল 'Brain Storming', যার অর্থ মস্তিষ্কের আলোড়ন অন্যভাবে বলা যায় ব্যক্তির স্বাধীনভাবনার মন্থনা। চিন্তার-আলোড়ন হল একটি শিক্ষণ কৌশল (teaching strategy)। এই শিক্ষণ কৌশলটির মাধ্যমে ব্যক্তির চিন্তা ভাবনার একটি ইতিবাচক পরিবেশ সৃষ্টি এবং অতি অল্প সময়ে তাৎক্ষণিক ভাবে অধিক ধারণা লাভ করাই হল মূল উদ্দেশ্য। মুক্তচিন্তার দ্বারা কোনো সমস্যার সমাধান অথবা নতুন কোনো ধারণা নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত ঘটানোর একটি উপায় হল এই 'চিন্তার আলোড়ন' বা 'Brain Storming'। শিক্ষণ কৌশল হিসেবে এটিকে জনপ্রিয় করে তোলেন A.F. Osborn (1963) তাঁর লেখা 'Applied Imagination'-এর মাধ্যমে। তাঁর মতে কোনো রকম বিচারকরণ বা বিরুদ্ধ সমালোচনা ছাড়াই কোনো পরিস্থিতির সমস্যা সমাধান করা বা তার সঙ্গে সম্পর্কিত ধারণার অনুসন্ধান করার জন্য এই শিক্ষণ কৌশলটিকে একজন শিক্ষার্থীর উপর ব্যবহার করা যেতে পারে। বিশেষ করে প্রতিভাবান বা উন্নত বৌদ্ধিক ক্ষমতা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের বৌদ্ধিক ক্ষমতার বিকাশে কার্যকরী। কারণ এখানে শিক্ষার্থীদের চিন্তার স্তরে শিখন সম্পন্ন হতে পারে, সৃজনধর্মী কল্পনার উদ্ভব হয় এবং সমস্যা সমাধানের ঘটনা ঘটে। চিন্তার আলোড়ন শুধুমাত্র শিক্ষার্থীর Cognitive domain-কেই প্রভাবিত করে না, তার Affective domain-এর সঙ্গে সম্পর্কিত ধারণাগুলিকেও প্রভাবিত করে যথেষ্ট।

❖ ১.৪.২.২ চিন্তার আলোড়ন বা মস্তিষ্ক ঝঞ্ঝা সংগঠিত করার পদ্ধতি (Brain Storming Method) :

শিক্ষণ কৌশল হিসেবে 'চিন্তার আলোড়ন' বা 'Brain Storming'-কে সংগঠিত করার জন্য নিম্নলিখিত ভাবে অগ্রসর হওয়া দরকার—

(১) শুরুতে শিক্ষার্থীদের ১০-১৫ জনকে নিয়ে একটি দল গঠন করা হয় এবং এই দলের নেতা হল স্বাভাবিকভাবে একজন শিক্ষক। শিক্ষার্থীদের দলবদ্ধভাবে একটি কাজ বা সমস্যার কেন্দ্রবিন্দুতে স্থাপন করা হয়। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, বিশেষ কোনো একটি সমস্যা তাদের সামনে তুলে ধরা, যেমন— 'ছাত্রবিক্ষোভ', 'পশ্চিমবঙ্গে কর্মহীনতার বৃদ্ধি' অথবা 'বিদ্যালয়ের বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি' ইত্যাদি।

(২) দলের নেতা হিসেবে শিক্ষক তাঁর শিক্ষার্থীদলের সদস্যদের সামনে সমস্যাটি তুলে ধরে তার সমাধানের সম্ভাব্য পথ নির্দেশ করার জন্য বলেন। শিক্ষার্থীরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একে একে তাদের নিজেদের সমাধান সংক্রান্ত ধারণাগুলি দিতে থাকে। শিক্ষার্থীদেরকে সমস্যাটিকে সবদিক থেকে চিন্তাভাবনা করার পরামর্শ দেওয়া হয়। সম্ভাব্য সমস্ত সমাধানের পথগুলি ক্রমে ক্রমে উপস্থাপিত হয়। এজন্য শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কতকগুলি নির্দেশ বা পরামর্শ দেন যেমন—

(i) শিক্ষার্থীরা কোনো সমস্যার মুখোমুখি হয়ে সমাধানের পথ বা উপায় নির্ধারণ করে।

(ii) সম্ভাব্য সমস্তরকম সমাধানের পথকে চিহ্নিত করার কথা বলা হয় এবং শিক্ষার্থীরা যেন সমালোচনাকে গুরুত্ব না দেয়। কোনোরকম ইতস্তত ভাব ছাড়াই শিক্ষার্থীরা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে পরস্পরকে পরামর্শ দেয়।

(iii) অন্যের মতামতকে বা সমাধানের বিষয়টিকে সমালোচনা না করে যেন বিকল্প উপায় উল্লেখ করতে পারে উপায়কে পরিবর্তিত করতে পারে অথবা পরিমার্জিত করতে পারে।

Scanned with CamScanner

(iv) শিক্ষার্থীরা যাতে তাদের নিজেদের ধারণা দেওয়া কিংবা সমাধানের পথ নির্দেশ করার ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে সম্পন্ন করে, সে কথাও শিক্ষক উল্লেখ করে দেন।

(৩) এইভাবে তৃতীয় পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা তাদের সমস্যাটির সমাধানের পথ নির্দেশ করার ব্যাপারে উৎসাহিত এবং অনুপ্রাণিত হয়। দলের সদস্যরা এবং দলের নেতা সম্ভাব্য সমস্ত সমাধানের পথগুলিকে নিয়ে চিন্তাভাবনা করেন। সমাধান-সংক্রান্ত সমস্ত বিকল্প ধারণাগুলিকে উপযুক্তভাবে লিখে রাখা বা রেকর্ড করা হয়।

(৪) চিন্তার আলোড়নের শেষ পর্যায়ে সমাধানগুলি স্বাধীন ও খোলামেলা গণতান্ত্রিক পরিবেশ আলোচিত হয় সবচেয়ে উপযুক্ত এবং গুরুত্বপূর্ণ সমাধানের পথটিকে গ্রহণ করা হয়।

এই প্রক্রিয়া পরিচালনার সময় প্রশিক্ষককে গুরুত্বপূর্ণ দুটি নীতি মেনে কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়। প্রথম নীতিটি হল প্রশিক্ষক দলের সকলের মতামত না পাওয়া পর্যন্ত প্রশিক্ষক সিদ্ধান্ত প্রদানে বিরত থাকবেন; দ্বিতীয় নীতিটি হল দল থেকে যত বেশি ধারণা বের করে আনা যাবে তত বেশি সঠিক এবং পূর্ণ কার্যক্রমের তালিকা ও ধারণা চিহ্নিত করা সম্ভব হবে।

❖ ১.৪.২.৩ চিন্তার আলোড়ন কৌশলের সুবিধা (Advantages of Brain Storming Strategy) :

চিন্তার আলোড়ন প্রক্রিয়ার সুবিধাগুলি হল নিম্নরূপ—

(i) শিক্ষক এখানে শিক্ষার্থীকে শুধুমাত্র তথ্য প্রদান করে, শাসন করে পরনির্ভরশীল ব্যক্তিতে পরিণত করেন না, পরিবর্তে শিক্ষার্থীকে সক্রিয়, স্বনির্ভরশীল, স্বাধীন চিন্তনের অনুসারী এবং আবিষ্কারকে দৃষ্টিভঙ্গি গঠন করতে সাহায্য করেন। জ্ঞান সংগ্রহের পরিবর্তে বরং নতুন জ্ঞানের উদ্ভাবন অনুপ্রাণিত করেন।

(ii) এই শিক্ষণ কৌশল শিক্ষার্থীদের মধ্যে উচ্চ বৌদ্ধিক ক্ষমতার বিকাশে সহায়তা করে। এই শিক্ষণ কৌশল শিক্ষার্থীরা চিন্তাশীল, যুক্তিবাদী, বিশ্লেষক যেমন হতে পারে তেমনি জ্ঞানের আত্তীকরণের বিষয়গুলিকেও আয়ত্ত করতে পারে।

(iii) শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল ক্ষমতার বিকাশ সাধন, গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি, মৌলিক ধারণালাভের জন্য বহির্মুখী চিন্তন এবং সমস্যা সমাধান এর ক্ষেত্রে এই শিক্ষণ কৌশল বিশেষভাবে সহায়তা করে।

(iv) একটি সাধারণ উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে দলগত ভাবে সমস্যা সমাধানের দৃষ্টিভঙ্গিকে শিক্ষার্থীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রহণ করতে শেখে। এর ফলে শিক্ষার্থীরা যেমন একে অপরের সহযোগিতা করে তেমনি অন্যের মতামতকে সাদরে শ্রদ্ধার সঙ্গে মান্যতা দিতে শেখে।

(v) শিক্ষার্থীদের মধ্যে গণতান্ত্রিক চেতনার বিকাশ, তাৎক্ষণিকভাবে সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা অর্জন, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি গঠন করতে উৎসাহিত হয়।

❖ ১.৪.২.৪ চিন্তার আলোড়ন কৌশলের অসুবিধা (Disadvantages of Brain Storming Strategy) :

চিন্তার আলোড়ন কৌশলের কতকগুলি অসুবিধাও আছে। সেগুলি হল—

(i) সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে দলের সমস্ত সদস্য সমানভাবে আগ্রহী নাও হতে পারে।

(ii) দলের সমস্ত সদস্যের প্রত্যেকের মানসিক ক্ষমতা, জ্ঞান ও দক্ষতা সমান নাও হতে পারে অর্থাৎ দলটি সমধর্মী (Homogenious) নাও হতে পারে।

(iii) দলের প্রতিটি সদস্য সমান উৎসাহী, আগ্রহী, বুদ্ধিমান, সৃজনশীল না হলে কৌশলটি অনেক ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়।

(iv) সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় উপযুক্ত ফলাফল বা সমস্যাটির উপযুক্ত সমাধান নাও পাওয়া যেতে পারে।

(v) সমস্যা সমাধান ও আবিষ্কারের প্রেরণা নিয়ে শিক্ষার্থীরা অগ্রবর্তী হতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে সময় ও শক্তির অপচয় ঘটে।

(vi) উন্নতমানের শিক্ষক না হলে দলের নেতৃত্বে দেওয়া সহজ হয় না, সেক্ষেত্রে শিক্ষণ কৌশল ব্যর্থ হয়।

❑ ১.৪.৩ চিন্তনমূলক শিক্ষণ (Reflective Teaching) :

❖ ১.৪.৩.১ চিন্তনমূলক শিক্ষণের অর্থ ও সংজ্ঞা (Meaning and defination of Reflective teaching) :

শিক্ষার্থী যখন দূরদৃষ্টি সম্পন্ন হয়ে মৌলিক চিন্তা করে এবং সমালোচনামূলক বিষয়ে গভীরভাবে নিমগ্ন হয়ে চিন্তা করে তখন সেই স্তরই চিন্তনমূলক স্তর হিসেবে পরিগণিত হয়। এই চিন্তনমূলক স্তরের শিক্ষণের মধ্যেও স্মৃতিমূলক এবং বোধমূলক শিক্ষণ অন্তর্গত। অর্থাৎ এই স্তরের শিক্ষণেও প্রথম দুটি শিক্ষণ স্তর—স্মৃতিমূলক ও বোধমূলক শিক্ষণ ব্যবহার করা যায়, তবে এই স্তরটি অন্য দুটির তুলনায় উচ্চ স্তরের হয়ে থাকে। অত্যাবশ্যকীয় ভাবে চিন্তনমূলক শিক্ষণ বলতে বোঝায় 'সমস্যা কেন্দ্রিক' শিক্ষণ।

Reflection শব্দটির অর্থ হল প্রতিফলন-মূলক কার্য অর্থাৎ ফিরিয়ে দেওয়া, মনশ্চক্ষে দর্শন করা বা গভীরভাবে চিন্তা করা। ফলশ্রুতিতে, চিন্তনমূলক শিক্ষণে থাকতেই হবে প্রতিফলনের পদ্ধতি বা যে বর্তমান জ্ঞান বা ধারণা আছে তাকে অত্যন্ত যত্নের সাথে ফিরিয়ে দেওয়ার বিষয়টি।

Scanned with CamScanner

Morris L. Bigge একে সংজ্ঞায়িত করেছেন এইভাবে, "as careful, critical examination of an idea or supposed article of knowledge in the light of the testable evidence which supports it and the further conclusions towards which it points."

উপরোক্ত সংজ্ঞাটির সযত্নে পরীক্ষা করলে চিন্তনমূলক শিক্ষণের প্রকৃতি সম্পর্কে নিম্নলিখিত ধারণা দেয়।

(১) এটি শিক্ষার্থীর মধ্যে বর্তমান ঘটনা, ধারণা, অন্তর্দর্শন এবং সামান্যীকরণের অন্তরঙ্গ সযত্ন এবং সূক্ষ্ম পরীক্ষণের সুযোগ করে দেয়।

(২) প্রাসঙ্গিক সাক্ষ্য-প্রমাণের আলোকে শিক্ষার্থীরা পূর্বোক্ত ঘটনা, ধারণা প্রভৃতি বিষয়গুলির পরীক্ষা করতে চেষ্টা করে।

(৩) শিক্ষার্থীরা স্বাধীন প্রকল্পগুলিকে মুক্তভাবে বেছে নিতে পারে। সেগুলিকে পরীক্ষা করে নিজস্ব সিদ্ধান্ত উপনীত হতে পারে, যাতে নতুন কোনো ঘটনা শিখতে অথবা নতুন অন্তর্দৃষ্টি লাভ করতে পারে।

উপরোক্ত প্রকৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করে বলা যায় যে, চিন্তনমূলক শিক্ষণ কিছু উচ্চস্তরে সংগঠিত হওয়া উচিত, যাতে সেটি শিক্ষার্থীদের বৌদ্ধিক ক্ষমতা ব্যবহারের ক্ষেত্রে সুযোগ দান করতে পারে।

এই সুযোগদান সর্বোচ্চ স্তরে হতে পারে যদি শিক্ষণ-শিখন পরিস্থিতি সমস্যামূলক পরিস্থিতিতে রূপান্তরিত হয় এবং শিক্ষার্থীরা যদি এ সমস্যাকে তাদের চিন্তন এবং স্বাধীন জ্ঞান সঞ্চারণের দ্বারা সমাধানের পথটি আবিষ্কার করতে পারে। সুতরাং প্রকৃত অর্থে চিন্তন মূলক স্তরে শিক্ষণ আর কিছুই না, এটি হল সমস্যা সমাধান অথবা আবিষ্কারের দৃষ্টিভঙ্গি গঠন।

এই চিন্তনমূলক শিক্ষণ-এর মূল বা উৎস নিহিত আছে শিখনের Cognitive field theory-এর মধ্যে। অন্য দিকে এই তত্ত্বকে বলা হয় লক্ষ্য অভিমুখী অন্তর্দর্শন তত্ত্ব (goal insight theory)। প্রচলিত বা গতানুগতিক যান্ত্রিক মুখস্থ করার অর্থহীন বোধগম্যতার ঘটনার বিরোধিতা করে। এই ধরনের শিক্ষণ উদ্দেশ্যপূর্ণ লক্ষ্য অভিমুখী, অন্তর্দৃষ্টিমূলক শিখনের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি জোর দেয়। এটি শিক্ষার্থীর সমস্যা সমাধানমূলক আচরণের শিল্প এবং দক্ষতাকে প্রস্তুত করে। চিন্তনমূলক শিক্ষণে সবিশেষ গুরুত্ব দেওয়া অন্তর্দৃষ্টিমূলক শিখনের সামান্যীকরণে, ঘটনার অবিষ্কারে উপায় অনুসন্ধানে এবং সমস্যা সমাধানে দক্ষতা অর্জনে।

সুতরাং শিক্ষণ পদ্ধতি এখানে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক আবিষ্কারকের পদ্ধতি, সমস্যা সমাধান পদ্ধতি, বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি ইত্যাদি। মূল্যায়নের ক্ষেত্রে টেস্ট ব্যবহার করে শিক্ষার্থীর সমস্যা সমাধানে দক্ষতা, সৃজনশীলতা ইত্যাদির পরিমাপ করা হয়।

❖ ১.৪.৩.২ চিন্তনমূলক শিক্ষণের বৈশিষ্ট্যসমূহ (Characteristics of Reflective Teaching) :

(i) এই শিক্ষণ পদ্ধতিতে স্মৃতিমূলক ও ধারণামূলক স্তরের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীরা তাদের স্বাধীন চিন্তন ক্ষমতার বিকাশ ঘটে, মুক্তচিন্তার অধিকারী হতে সমর্থ হয়।

(ii) চিন্তনমূলক শিক্ষণের একটি বিশেষ দিক হল সমস্যা সমাধানের বিষয়। সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা অন্তর্দৃষ্টিমূলক চিন্তন ক্ষমতার প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়।

(iii) চিন্তনমূলক শিখনের ক্ষেত্রে বা উৎস যেহেতু বিভিন্নভাবে বিস্তৃত থাকে, তাই শুধুমাত্র নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু, পাঠ্যপুস্তককে কেন্দ্র করে এই শিক্ষণ ঘটে না। অর্থাৎ শুধুমাত্র পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যক্রমের মধ্যে এই শিক্ষণ সীমাবদ্ধ থাকে না।

(iv) এই শিক্ষণ পদ্ধতি কোনো ভাবে শিক্ষক কেন্দ্রিক বা বিষয়কেন্দ্রিক নয়। কার্যত শিক্ষক এখানে প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় থাকে না। তিনি এখানে পরিচালকের ভূমিকা পালন করেন মাত্র, তিনি হলেন শিক্ষার্থীদের সহায়ক।

(v) চিন্তনমূলক শিক্ষণ পদ্ধতি যেহেতু শিক্ষার্থীর চিন্তাশীল স্তরের উপর নির্ভরশীল তাই শিক্ষণ পদ্ধতিসম্পূর্ণ শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক হয়।

(vi) সমস্যা সমাধান করা কিংবা আবিষ্কারের মাধ্যমে নিজের চিন্তন প্রক্রিয়াকে অগ্রবর্তী করতে হয় বলে, শিক্ষার্থীর তাগিদ থাকে চিন্তার আশ্রয় নিতে, স্বাভাবিকভাবে তার প্রেষণাও অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে অর্থাৎ প্রেষণা শিক্ষার্থীর অন্তর্জাত সুতরাং তা যথেষ্ট আন্তরিক।

(vii) চিন্তার উন্নত স্তরে নিজেকে উন্নীত করে তুলতে হয় বলে শিক্ষার্থীর চিন্তনশীল প্রক্রিয়া সব সময় ক্রিয়াশীল। অর্থাৎ শিক্ষার্থী এখানে সর্বদা সক্রিয় ও স্বতঃস্ফূর্ত অবস্থায় অবস্থান করে।

(viii) চিন্তনমূলক শিক্ষণে শ্রেণির পরিবেশ হবে যথেষ্ট অন্তরঙ্গ ও খোলামেলা। এই পরিবেশ হয় গণতান্ত্রিক এবং শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক। শিক্ষণ কার্য চলাকালে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে আলোচনা করার সুযোগ দেওয়া হয়।

❖ ১.৪.৩.৩ চিন্তনমূলক শিক্ষণের উদ্দেশ্যসমূহ (Objectives of Reflective Teaching) :

চিন্তনমূলক শিক্ষণ শিক্ষার্থীদের নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অর্জনে সহায়তা করে।

(i) শেখা ঘটনা এবং অর্জিত বোধগম্যতা অথবা অন্তর্দৃষ্টিমূলক শিখনে শিক্ষার্থীকে চিন্তার স্তরে নিয়ে যাওয়া।

ebook.dascoaching.in

Scanned with CamScanner

(ii) অন্তর্দৃষ্টির পরীক্ষিত সামান্যীকরণ চরিত্রকে শিক্ষার্থীর জ্ঞানের ভাণ্ডারে সঞ্চিত করতে সহায়তা করা এবং সৃজনীশক্তির বিকাশ ঘটানো।

(iii) শিক্ষার্থী যাতে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে এগিয়ে আসে সেজন্য তার ক্ষমতার বিকাশ ঘটানো।

(iv) স্বাধীন ও মৌলিক চিন্তন ক্ষমতার বিকাশ-সাধন করা।

❖ ১.৪.৩.৪ চিন্তনমূলক শিক্ষণে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর ভূমিকা (Role of teacher & learner in Reflective Teaching) :

স্মৃতিমূলক শিক্ষণে শিক্ষক যেমন অনেকটাই এক নায়কতন্ত্র সুলভ আচরণ করেন এবং ধারণামূলক বা বোধমূলক শিক্ষণে যেমন নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করেন তেমন করে চিন্তনমূলক শিক্ষণে শিক্ষক মুখ্য ভূমিকা পালন করেন না। শিক্ষক এখানে পরিচালকের ভূমিকায় থাকেন। তিনি কোনো ঘটনা বা সামান্যীকরণের বর্ণনাদানের পরিবর্তে শিক্ষার্থীদের আবিষ্কারের প্রেরণা দান করেন। তিনি তাদের এমন শিখনে সহায়ক করেন যেখানে শিক্ষার্থীরা সমস্যা গঠন করে আবিষ্কারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়, মিথষ্ক্রিয়ার মাধ্যমে পারস্পরিক আলোচনার সূত্রপাত করে, সমালোচনামূলক চিন্তন প্রক্রিয়াকে স্বাগত জানায়, সত্যকে আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠা করতে অগ্রসর হয় এবং যতখানি সম্ভব নিজেদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় সমস্যা সমাধান করতে পারে। এদিক থেকে শিক্ষার্থীদের এই সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গী গঠনে শিক্ষকের দায়িত্ব অনেকখানি। কোনো তথ্য-প্রদান করা বা বলে দেওয়ার চেয়ে শিক্ষার্থীদেরকে সেই তথ্যের প্রয়োজন ও গুরুত্ব সম্পর্ক উপলব্ধি করতে এবং নিজেদের প্রচেষ্টায় সেই সমস্ত তথ্যগুলি বিভিন্ন উৎস থেকে অনুসন্ধান করতে সহায়তা করা শিক্ষকের কেটি বড়ো দায়িত্ব। সুতরাং তথ্যের গুরুত্ব উপলব্ধি, কার্য-কারণ-সম্পর্ক বিশ্লেষণের দৃষ্টিভঙ্গি এবং সর্বোপরি আবিষ্কারের পর্যায়ে উন্নীত করার লক্ষ্যে শিক্ষার্থীর চিন্তার স্তরকে প্রেষিত করাই শিক্ষকের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব।

শিক্ষার্থী এই ধরনের শিখনে নির্বাক শ্রোতা হিসেবে অবস্থান করে না, বরঞ্চ সে একজন সক্রিয় আবিষ্কারক এবং শিক্ষার্থী তার বোধ বা ধারণামূলক ক্ষমতার পূর্ণব্যবহার করতে শেখে। সমস্যা সমাধানমূলক পরিস্থিতিতে অনেক বেশি করে তার বৌদ্ধিক ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে নিজেকে নিয়োজিত করে।

চিন্তনমূলক শিক্ষণ-এর ক্ষেত্রে শিক্ষক কী ভূমিকা গ্রহণ করবেন সেই ব্যাপারে তাঁর মডেল (হ্যান্টের শিক্ষণ মডেল) এ যে নির্দেশিকা বা guide line দিয়েছেন বা সুপারিশ করেছেন সেগুলিকে নিম্নে উপস্থাপন করা যেতে পারে। এগুলি হল—

(i) চিন্তনমূলক শিক্ষণকার্য পরিচালনা করার আগে অবশ্যই শিক্ষার্থীদের স্মৃতিমূলক ও ধারণামূলক শিক্ষণকে সফল করে তুলতে হবে। এই দুটি শিক্ষণস্তর সফল হলেই চিন্তনমূলক শিক্ষণ কার্য পরিচালনা করা যাবে।

(ii) শিক্ষার্থীদের কাঙ্ক্ষিত বা প্রত্যাশার মাত্রাকে একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় উচ্চতায় স্থাপন করতে হবে বা তুলে ধরতে হবে।

(iii) শিক্ষার্থীদের দুর্বলতা বা ত্রুটির ক্ষেত্রগুলিকে খুঁজে বের করে বা চিহ্নিত করে সেগুলির দূরীকরণে যথাযথভাবে শিক্ষামূলক মনোবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে।

(iv) সমস্যামূলক পরিস্থিতিকে শিক্ষার্থীদের নিকট এমনভাবে উপস্থাপিত করা দরকার যাতে শিক্ষার্থীরা উচ্চ ক্ষমতা ও সৃজনীশীল ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষমতাগুলির বিকাশ ঘটাতে সমর্থ হয়।

(v) শ্রেণিকক্ষের শিক্ষণ পরিবেশকে মুক্ত, অন্তরঙ্গ, খোলামেলাভাবে গড়ে তোলার জন্য আন্তরিকভাবে শিক্ষককে সচেষ্ট হতে হবে। শিক্ষণ পরিবেশ হবে গণতান্ত্রিক।

(vi) সমস্যার সমাধান শিক্ষক করে দেবেন না, সমাধান করতে হবে শিক্ষার্থীকে কিন্তু সেক্ষেত্রে সমস্যা উপস্থাপনের ভঙ্গি এমন হবে, যাতে শিক্ষার্থীরা নিজেদের চেষ্টায় সমস্যার প্রকৃতি ও চরিত্র বুঝতে সমর্থ হয় এবং সমাধানের সূত্র বা উপায়গুলিকে খুঁজে পায়।

❖ ১.৪.৩.৫ চিন্তনমূলক শিক্ষণের সুবিধাসমূহ (Advantages of Reflective Teaching) :

চিন্তনমূলক শিক্ষণের সুবিধাগুলি হল নিম্নরূপ—

(১) **শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিষ্ঠা :** চিন্তনমূলক শিক্ষণ গতানুগতিক বা প্রচলিত বিষয়কেন্দ্রিক অথবা শিক্ষককেন্দ্রিক শিক্ষার পরিবর্তে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রতিষ্ঠিত এই ধরনের শিক্ষণ এর ফলশ্রুতিতে শিক্ষার্থীরা নিজেরাই নিজেদের লক্ষ্য স্থির করে এবং সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর উপায় উদ্ভাবন করে।

(২) **শিক্ষার্থীদের বৌদ্ধিক ক্ষমতার যথার্থ বিকাশ :** স্মৃতিমূলক ও ধারণামূলক শিক্ষণস্তরের তুলনায় এটি অনেক বেশি উচ্চস্তরের শিক্ষণ। এই ধরনের শিক্ষণ তথ্য সংগ্রহ, সামান্যীকৃত অন্তর্দর্শন এবং সমস্যা সমাধানের দক্ষতা বৃদ্ধি করে বলে শিক্ষার্থীদের বৌদ্ধিক ক্ষমতার যথার্থ বিকাশ সম্ভব হয়।

(৩) **বৃহত্তর জগতে সমস্যা সমাধানের দৃষ্টিভঙ্গি গঠন :** শিক্ষার্থীদের জীবনে সমস্যা শুধু বিদ্যালয় পরিস্থিতিতে অর্থাৎ পাঠ্যপুস্তক, পাঠ্যবিষয় বা পাঠ্যক্রমেই সীমাবদ্ধ থাকে না। শিক্ষার্থীকে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় বিদ্যালয় পরিস্থিতির বাইরের বৃহত্তর জীবনেও। এই বাইরের বাস্তব জীবনে সমস্যা মুখোমুখি হতে এবং সমাধানের উপায় খুঁজে বের করতে উৎসাহিত করে এই চিন্তনমূলক শিক্ষণ পদ্ধতি।

Scanned with CamScanner

(৪) **শ্রেণিকক্ষে গণতান্ত্রিক পরিবেশ গঠন :** আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় জোর দেওয়া হয়েছে শ্রেণিকক্ষের মুক্ত ও গণতান্ত্রিক পরিবেশ-এর ওপর। চিন্তনমূলক শিক্ষণ এই দৃষ্টিভঙ্গিকে গুরুত্ব দিয়ে শ্রেণিকক্ষের পরিবেশকে গণতান্ত্রিক, স্বাস্থ্যকর, জীবনমুখী এবং উদ্দীপনা ধর্মী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে শিক্ষার্থীরা স্বাধীনভাবে প্রয়োজনীয় মিথষ্ক্রিয়ায় তাদের নিজেদের মধ্যে এবং শিক্ষকের সঙ্গে আবদ্ধ হতে পারে। এর ফলশ্রুতিতে প্রকৃত চিন্তনশীল, আবিষ্কারের দৃষ্টিভঙ্গি গঠন এবং সমস্যা সমাধান করার মতো মানসিকতা গঠন করতে পারে শিক্ষার্থীরা।

(৫) **বিভিন্ন ধারণা, নীতি, সম্পর্ক, নিয়ম ও তত্ত্বের উপলব্ধি :** শিক্ষার্থীরা এই ধরনের শিক্ষণে বিভিন্ন রকম ধারণা নীতি, সম্পর্কস্থাপন, সামান্যীকরণ, নিয়ম ও তত্ত্বের উপলব্ধিতে সক্ষম হয়। এ ছাড়াও শিক্ষার্থীরা নিজেদের সমস্যাগুলিকে সমাধান করতে শেখে।

(৬) **জ্ঞানার্জন, বিশ্লেষণ ও আবিষ্কারের প্রেরণা দান :** আজকের এই আধুনিক প্রযুক্তির যুগে গড়ে উঠেছে জ্ঞানের বিশাল ভাণ্ডার এবং এর কোনো একটি মাত্র অংশ একজন শিক্ষার্থী তার জীবনে সংগ্রহ করতে প্রচণ্ড সমস্যায় পড়ে। স্বাভাবিকভাবে খুব যুক্তিসম্মত দিক হল শিক্ষার্থীকে তথ্যভাণ্ডার থেকে শুধু জ্ঞান নয়, বরঞ্চ কীভাবে তথ্যকে অর্জন বা সংগ্রহ করে, তাকে বিশ্লেষণ করে এবং উদ্ভাবনী শক্তি দিয়ে কাজে লাগাতে হয় তাই শেখানো দরকার। চিন্তনমূলক শিক্ষণ সেই কাজটি করে। সমস্যা সঙ্কুল এই জগতে শিক্ষার্থীরা কীভাবে সমস্যাকে সমাধান করতে পারবে, সৃজনী শক্তির বিকাশ ঘটাতে পারবে, আবিষ্কারকের দৃষ্টিভঙ্গি গঠড় করতে পারবে তাই-ই চিন্তনমূলক শিক্ষণে সম্ভব হয়।

(৭) **শিখন সঞ্চালনের ক্ষেত্রপ্রস্তুত :** কোনো একটি পাঠ্যবিষয় তার নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। প্রতিটি বিষয় কার্যত আরও অন্যান্য বহু বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত। এজন্য interdisciplinary approach আজ সর্বত্র গৃহীত হয়েছে। এরই প্রেক্ষিতে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে শিখন সঞ্চালন। চিন্তনমূলক শিক্ষণ শিক্ষার্থীদের এই শিখন সঞ্চালনের ক্ষমতাকে বিকশিত করে সর্বোচ্চ পর্যায়ে। এর ফলে বাস্তব পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীরা তাদের শিখনকে কাজে লাগিয়ে তাদের শিক্ষা সংক্রান্ত, বৃত্তিসংক্রান্ত এবং ব্যক্তিগত চরিত্র গঠন করতে পারে।

❖ ১.৪.৩.৬ চিন্তনমূলক শিক্ষণের অসুবিধা বা ত্রুটি (Disadvantages of Reflective Teaching) :

চিন্তনমূলক শিক্ষণের বেশ কতকগুলি অসুবিধা বা ত্রুটি লক্ষ করা যায়। সেগুলি হল—

(১) এই ধরনের শিক্ষণ সব রকম শিক্ষার্থীদের জন্য উপযোগী নয়। যে সব শিক্ষার্থীরা অপরিণত, যাদের বৌদ্ধিক ক্ষমতার বিকাশ পর্যাপ্ত হয়নি তাদের জন্য এই শিক্ষণ

পদ্ধতি খুব বেশি কার্যকরী নয়। আবার এই চিন্তনমূলক শিক্ষণ উন্নত মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে উপযোগী হলেও ধীরগতি সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের এমনকি সাধারণ মানের মাঝারিবুদ্ধি সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে বিশেষ উপযোগী নয়।

(২) চিন্তনমূলক শিক্ষণ সংগঠিত হয় একটি নমনীয় পথে। এই নমনীয় পথে অগ্রসর হয়ে শিক্ষার প্রথাগত পাঠ্যক্রম ছাড়াই বা পাঠ্যবিষয়বস্তুর অভাবে শিক্ষার্থীরা নির্দিষ্ট ব্যবস্থায় বিদ্যালয়ের পাঠ্যবিষয়বস্তু জ্ঞানার্জনে এবং উপলব্ধিতে সক্ষম হয় না।

(৩) সুগঠিত পরিকল্পিত শিক্ষণ শিখন ব্যবস্থাপনা ছাড়াই শিক্ষার্থীরা যেভাবে স্বাধীনতা নিয়ে এবং নমনীয় পথে অগ্রসর হয় তাতে বহুক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীদের শিখনের মূল পথ থেকে বিচ্যুত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ঘটনা বা তথ্যের আবিষ্কার, ক্রমাগত অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্নের অবতারণা এবং অর্থহীন অনুসন্ধান অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীদের সময় ও শক্তি ব্যয়ের নামান্তরে পর্যবসিত হয়।

(৪) বিদ্যালয়ের সবধরনের বিষয়গত শিখনের ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ দাবি করা হলেও প্রকৃতপক্ষে ব্যবহারিক দিক থেকে এই ধরনের শিক্ষণের ক্ষেত্রটির সীমাবদ্ধতা আছে। যে সব বিষয়ে আবিষ্কার এবং সমস্যা সমাধানমূলক দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগ করা যায় সেই সমস্ত বিষয়গুলি ছাড়া অন্যান্য বিষয়গুলিতে তা সম্ভব নয়। আবার বিদ্যালয়ের সময় তালিকা মেনে এই শিক্ষণ কর্মসূচি অনুসরণ বা পরিচলনা ও যথেষ্ট অসুবিধাজনক।

(৫) চিন্তনমূলক শিক্ষণ সংগঠিত করার জন্য যে ধরনের উন্নত মেধাসম্পন্ন, দায়িত্বসচেতন এবং কর্তব্যপরায়ণ শিক্ষকের প্রয়োজন তার যথেষ্ট অভাব আছে। বিশেষ দক্ষতা সম্পন্ন এবং অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ শিক্ষক ছাড়া কখনোই এই ধরনের শিক্ষণ পরিচালনা সম্ভব নয়।

❑ ১.৪.৪ নিরাময়কারী শিক্ষণ (Remedial Teaching) :

পিতামাতা, শিক্ষক-শিক্ষিকা, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং সামগ্রিকভাবে গোষ্ঠীজীবনের নিকট একটি বড় সমস্যা হল বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পারদর্শীতায় ব্যর্থতা। এই সমস্যা কম-বেশি প্রায় সর্বত্র। পিতা মাতারা বুঝে উঠতেই পারছেন না যে, কেন তাদের সন্তানরা বিদ্যালয়ে পারদর্শিতায় সফল হতে পারছে না। এই ব্যর্থতার কারণ খুঁজে পেতে তারা ব্যর্থ। পিতামাতারা যেমন এই সমস্যার কারণ খুঁজে পাচ্ছে না, তেমনই শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও যথাসম্ভব চেষ্টা করে যাচ্ছেন সেই ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান করতে। কিন্তু কার্যত এই সমস্যার সমাধান করার ক্ষেত্রে কেউই সেইভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নন।

অন্যদিকে বেচারা শিশুটি বাক্‌রুদ্ধ। সে জানে না, কেন তার পিতা মাতা এতটা উদ্বিগ্ন আর হতাশাগ্রস্ত। এই শিশুটির নিকট পরিস্থিতির সম্পূর্ণটাই নিয়ন্ত্রণের বাইরে। এই পরিস্থিতিতে পিতা মাতা সাহায্যের প্রত্যাশায় প্রায় দিশাহারা, কখনো তারা পরিবর্তন করছেন নির্দেশনার মাধ্যম যেমন ইংরেজি থেকে বাংলা কিংবা বাংলা থেকে ইংরেজিতে, কখনো

Scanned with CamScanner

পরিবর্তন করছেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আবার কখনো বা বাসস্থান। এমনটি অতিরিক্ত টিউশন কিংবা পড়ার সময় বাড়ানোর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করছেন। কিন্তু, প্রকৃত পক্ষে এগুলি কোন সমাধান নয়। বস্তুত বেশিরভাগ শিক্ষক শিক্ষিকার মত হল যে, শিক্ষার্থীরা সকলেই এক নয়। যাই হোক, শিক্ষক- শিক্ষিকারা শিক্ষার্থীদের নিম্নলিখিত ভাগে বিভক্ত করেছেন :

(i) শিক্ষার্থীর জন্য নির্ধারিত পাঠ্যবিষয় বস্তুর দিক থেকে।
(ii) ব্যবহৃত মূল্যায়ন কৌশল বা যন্ত্রের প্রকৃতির দিক থেকে।
(iii) নির্ধারিত পারদর্শিতার দিকগুলির দিক থেকে।
(iv) ব্যবহৃত নির্দেশনার কৌশলগত দিক থেকে।

প্রকৃত পক্ষে একজন শিক্ষার্থীর পোশাক যেমন অন্যজনের ক্ষেত্র গ্রহণযোগ্য হয় না, তেমনি শ্রেণিকক্ষে একটিমাত্র উপায় বা ব্যবস্থা সকলের নিকট সমানভাবে গ্রহণযোগ্য হয় না কারণ বেশ কিছু শিক্ষার্থীর বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে শিখন সমস্যা থেকেই যায়।

❖ ১.৪.৪.১ শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট কিছু সমস্যা (Specific Problems of Learners) :

আমাদের নিকট গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি ছিল শিক্ষার্থীদের জীবনে সাফল্যের বিষয়টি শিক্ষার্থীদের শিখনে যে সমস্ত দিকগুলিতে দুর্বলতা লক্ষ্য করা যায় সেগুলি হল— পঠন (reading), লিখন (Writing) এবং গণিত (mathematics) বিষয়ে। মাঝারি থেকে উন্নত বুদ্ধি সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও দেখা যায় এই সব শিক্ষার্থীরা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তাদের পারদর্শিতা যথেষ্ট কম বা ধীরগতি সম্পন্ন। এক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি সদস্যকে দায়ী করা যেতে পারে। একই শ্রেণিকক্ষে একই শিক্ষকের চিহ্নিত করেছেন—

যেমন— (i) নিম্নস্তরের বৌদ্ধিক ক্রিয়া এবং বিলম্বিত বিকাশ।
(ii) দৃষ্টিশক্তি জনিত বা দেখার সমস্যা,
(iii) শোনা এবং কথা বলাতে সমস্যা।
(iv) গমন অঙ্গের সমস্যা।
(v) মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়ায় সমস্যা,
যেমন- প্রত্যক্ষণ, মনোযোগ, স্মৃতি, চেষ্টীয়-দর্শন সংক্রান্ত সমস্যা।

উপরোক্ত সমস্যামূলক দিকগুলির ফলশ্রুতি হিসেবে দেখা দেয় পঠনে সমস্যা, লিখনে সমস্যা, বানানে সমস্যা এবং গণিত বিষয়ে সমস্যা। এই অধ্যায়ে আমরা শিক্ষার্থীদের শিক্ষা বা শিখন ক্ষেত্রে পঠন, লিখন এবং গণিতের সমস্যাগুলিকে আলোচনা করবো। শিক্ষার্থীদের শিখনে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে একদিকে গৃহপরিবেশ বা পরিবার এবং অন্যদিকে প্রতিষ্ঠান গত পরিবেশ বা বিদ্যালয় সংক্রান্ত দিকগুলি দায়ী। এই সমস্ত দিকগুলি হল নিম্নরূপ–

গৃহপরিবেশগত দিকগুলি হল—

(i) পিতামাতার স্নেহ ভালবাসা এবং যত্নের অভাব।

(ii) পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের নিকট গ্রহণ যোগ্যতার অভাব।
(iv) শিখনের জন্য সুযোগ অভাব (বিশেষত, প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থী),
(v) শিশু পরিচর্যার ক্ষেত্রে ভ্রান্তনীতি ও উপায় সমূহ ইত্যাদি।

বিদ্যালয় সংক্রান্ত দিকগুলি হল—

(i) শিক্ষার্থীদের নিকট শিক্ষকের গ্রহণ যোগ্যতার অভাব এবং শিক্ষার্থীদের শিখন পারদর্শিতা নিয়ে স্বল্প প্রত্যাশা।
(ii) শ্রেণিকক্ষের প্রতিকূল পরিবেশ, আর্থ সামাজিক এবং শিক্ষকদের স্বল্প মিথস্ক্রিয়া।
(iii) সহপাঠীদের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতার অভাব।
(iv) শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত চাহিদা এবং সমস্যা পূরণে উন্নত গুণমানের শিক্ষণ পদ্ধতির অভাব।
(v) শ্রেণিতে সঙ্গতি বিধানের সমস্যা এবং ব্যক্তিগত সুযোগ সুবিধার অভাব ইত্যাদি।

এটা দেখা গেছে যে, শতকরা চার ভাগ শিক্ষার্থীর কিছু শিখন সমস্যা বিভিন্নভাবে আসে। কিন্তু যদি বিশেষধর্মী ক্ষমতা সম্পন্ন বা ভিন্ন ধর্মী ক্ষমতা সম্পন্ন (Specially challenged children / differntly abled children) শিশুদের অন্তর্ভুক্ত করা হলে এই শতকরা হার বৃদ্ধি পেয়ে হবে শতকরা কুড়ি ভাগ (২০%)। পারদর্শিতার একটি বিশেষ স্তর পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের সাধারণ স্তরের শিক্ষার্থী ধরা হয়, কিন্তু তার নীচের স্তরের শিক্ষার্থীদের ধরা হয় প্রতিবন্ধী বা অক্ষম হিসাবে। গড় পারদর্শিতার নীচের স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য সংশোধনমূলক শিখনের প্রয়োজন হয়।

নির্দিষ্ট শিখন সমস্যার প্রকারভেদ (Types of specific learning problems) : সাধারণত শ্রেণিতে নির্দিষ্ট শিখন সমস্যাপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা নিম্নমানের পারদর্শিতা প্রদর্শন করে। এদের বলা হয় নিম্ন পারদর্শি শিক্ষার্থী (under achiever)। এদের বুদ্ধ্যঙ্ক সাধারণ মানের অথবা মাঝারিদের তুলনায় উচ্চমানের হয়। এই সমস্ত শিক্ষার্থীদের ছয়টি ভাগে ভাগ করা যায় (otto. et al. ১৯৭৩)। এরা হল নিম্নরূপ—

(i) মাঝারি বা গড় মানের ক্ষমতা সম্পন্ন এবং নিম্নপারদর্শিতা সম্পন্ন
(ii) ধীরগতি শিখন সম্পন্ন
(iii) উজ্জ্বল কিন্তু নিম্ন পারদর্শিতা সম্পন্ন
(iv) অনিচ্ছুক বা অনাগ্রহী শিক্ষার্থী
(v) সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন শিক্ষার্থী
(vi) স্বল্প ভাষা বিকাশ সম্পন্ন শিশু।

(i) মাঝারি মানের বুদ্ধিসম্পন্ন শিশুদের বয়স অনুসারে তাদের কাছ থেকে মাঝারি মানের পারদর্শিতা প্রত্যাশা করা হয়, কিন্তু যারা তা পারে না তাদের বলা হয় নিম্ন পারদর্শিতা সম্পন্ন। ব্যর্থতার কারণে এই স্তরের শিশুরা ক্রমশ হতাশায় ভুগতে ভুগতে প্রাক্ষোভিক

Scanned with CamScanner

সমস্যার শিকার হয় যা তাদের শিখনে সমস্যা তৈরি করে এবং পরিবর্তে ব্যর্থ
ডেকে আনে।

(ii) যে সমস্ত শিক্ষার্থীদের বুদ্ধ্যঙ্ক ৮০ থেকে ৯০ এর মধ্যে, সাধারণত তারা ধীর
শিখন সম্পন্ন হিসাবে পরিচিতি পায়। কিন্তু কখনো কখনো ৯০ থেকে ১১০ বু
সম্পন্ন শিশুরা ৮০ থেকে ৯০ বুদ্ধ্যঙ্ক বিশিষ্ট শিশুদের মত আচরণ করে।
ধরনের শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ মনোযোগ দেওয়া দরকার।

(iii) উজ্জ্বল কিন্তু নিম্ন পারদর্শিতা সম্পন্ন শিক্ষার্থীরা উচ্চ বিশিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও মাঝারি
হিসাবে বিবেচিত হয় এবং এরা পারদর্শিতা প্রদর্শনের ক্ষেত্রেও নিম্নমানের হয়। এ
প্রতিও শিক্ষকের বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত।

(iv) কিছু শিক্ষার্থী থাকে যারা বিদ্যালয়ে পড়াশোনায় খুব একটা ইচ্ছুক হয় না। পড়াশো
অনাগ্রাহী এই সব শিশুরা অন্যান্য অভীক্ষায় ঠিক ঠিক সাড়া দিলেও বিদ্যালয়ে অভী
পারদর্শিতা দেখাতে পারে না। এই ধরনের শিক্ষার্থীদের সাধারণত প্রেষণার অ
থাকে। এদের প্রেষণা বাড়ানোর দরকার।

(v) কখনো কখনো এমন সব শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে আসে যাদের বাড়ীর পরিবেশ অ
সাধারণমানের এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশও খুব সীমিত স্তরে অবস্থান করে। শ্রেণিকক্ষে
পরিবেশকে তারা অনেক সময় মানিয়ে নিতে পারে না। সাধারণ প্রথম প্রজন্মে
শিক্ষার্থী দের ক্ষেত্রে এই বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। এদের প্রতিও বিশেষ যত্ন নে
দরকার।

(vi) এমন কিছু শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে আসে যাদের পারিবারিক বা সামাজিক পরিবেশ অ
সাধারণ মানের জন্মগত বয়স বেশি হওয়া সত্ত্বেও তাদের ভাষাবিকাশ থাকে সীমি
ফলে যে সমস্ত বিষয়ে ভাষার দখল থাকা দরকার সেই সমস্ত বিষয়গুলিতে পারদর্শি
দেখাতে পারে না। শ্রেণিকক্ষের ভিতর এবং বাইরেও এই ধরনের শিশুদের প্রতি য
নেওয়া দরকার।

সাধারণত, শিখন অক্ষমতাকে দুইটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়। যেমন— তথ্য সংগ্রহে
অক্ষমতা অথবা সংগ্রহের অভাবজনিত কারণে বিশেষ অক্ষমতা। সেদিক থেকে অক্ষম
নিম্নলিখিত ভাগে বিভক্ত—

(i) তথ্য সংগ্রহে অভাব বা দুর্বলতা (Information Processing Deficiencies)
(ii) মনোযোগের অভাব অথবা অতি চঞ্চলতা (Attention Deficit or Hyperactivity Disorder)
(iii) গণিতে অক্ষমতা (Discalculia)
(iv) লিখনে অক্ষমতা (Disgraphia)

(v) পঠনে অক্ষমতা (Dyslexia)
(vi) চিন্তনে অক্ষমতা (Dyspraxia)
(vii) আত্মমগ্নতা (Autism)

(i) **তথ্য সংগ্রহে অভাব বা দুর্বলতা :** তথ্য সংগ্রহের কাজটি সম্পূর্ণ হয় চারটি পর্যায়ে যেমন— ইনপুট বা প্রবেশ, ইনটেগ্রেশান বা সমন্বয় বা সংহতিকরণ, স্টোরেজ বা সঞ্চয় এবং আউটপুট বা প্রকাশ বা ফলাফল প্রাপ্তি। সংবেদনের মাধ্যমে তথ্যের ইনপুট বা প্রবেশ সম্পন্ন হয়। ইনপুটের ক্ষেত্রে দর্শন প্রত্যক্ষণে অসুবিধা ঘটলে বস্তুর আকার, অবস্থান এবং আয়তনগত সমস্যাগুলির সৃষ্টি হয় আবার শ্রবণ প্রত্যক্ষণের অসুবিধার কারণে শব্দের সম্পূর্ণ শ্রবণ সম্ভব হয় না বা শোনার ক্ষেত্রে ব্যাঘাত ঘটে। স্বাভাবিকভাবে যেসব শিক্ষার্থীদের এইভাবে তথ্য সংগ্রহের অসুবিধার ফলে অনুভূতি সংক্রান্ত সমস্যাগুলির উদ্ভব ঘটে।

তথ্যের সংহতিকরণ বা integration এর ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের সমস্যা থাকলে সঠিকভাবে কোনো বক্তব্য বা গল্পকে সুজ্ঞিত করে, উপস্থাপন করতে সমর্থ হয় না, বিভিন্ন তথ্যকে ঠিক ঠিক স্মরম করতে সমর্থ হয় না। নতুন কোনো বিষয়কে উপলব্ধি করতে পারলেও শিখনে সামান্যীকরণ করতে সমর্থ হয় না।

তথ্য সঞ্চয় বা storage এর ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর দুর্বলতা থাকলে দেখা যায় শিক্ষার্থীরা সংক্ষিপ্ত সময়কালীন স্মৃতি, কার্যকরী স্মৃতি অথবা দীর্ঘমেয়াদী স্মৃতিতে সমস্যা ঘটে। বেশিরভাগ স্মৃতির সমস্যা সংক্ষিপ্ত সময়কালীন স্মৃতিতে ব্যাঘাত ঘটায়। তথ্যের ফলাফল প্রাপ্তি বা প্রকাশের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা সমস্যায় পড়ে যখন ভাব প্রকাশ বা ভাষাগত প্রকাশ ঠিকমত হয় না। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের কথাবলার ভাষায়, লেখার ভাষায় অথবা চেষ্টায় ক্ষমতায় সমস্যার সৃষ্টি হয়।

(ii) **মনোযোগের অভাব :** এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের স্নায়ুশরীর বৃত্তীয় কিছু বিশৃঙ্খলার মস্তিষ্কের কার্যাবলিকে প্রভাবিত করে যেগুলি উদ্দীপনার নিয়ন্ত্রণ এবং মনোযোগকে পরিচালিত করে।

(iii) **গণিতে অক্ষমতা :** এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের গণিতে দক্ষতার অভাব ঘটে যার ফলে গণিতে অক্ষমতা প্রকাশ পায়।

(iv) **লিখনে অক্ষমতা :** লিখনে অক্ষমতা হল শিক্ষার্থীদের অন্যতম স্নায়বিক বিশৃঙ্খলা যা লিখনেকে প্রভাবিত করে এবং লেখার ক্ষেত্রে শারীরিক দিককে অসুবিধায় ফেলে। এদের লিখন ক্ষমতার বৈশিষ্ট্য হল অপরিনত অক্ষরের প্রকাশ, বাঁকা লাইনে লেখা, অসম্পূর্ণ শব্দ বা বাক্য ব্যবহার করা এবং হাতের লেখা পঠন যোগ্য না হওয়া। লেখার ক্ষেত্রে এরা অনীহা প্রকাশ করে।

Scanned with CamScanner

(v) **পঠনে অক্ষমতা :** এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পঠনে অক্ষমতা পরিলক্ষিত হয়। মুদ্রিত ভাষা পাঠ করার ক্ষেত্রে বেশ সমস্যায় পড়ে এরা। ভুল উচ্চারণ করে, কিংবা ধীরে ধীরে পড়া, অথবা ত্রুটিপূর্ণ পড়া বা ঠেকে ঠেকে পড়ার মাধ্যমে এদের অক্ষমতার প্রকাশ ঘটে।

(vi) **চিন্তনে অক্ষমতা :** এই ধরনের সমস্যাটি মূলত মস্তিষ্কের স্বল্প বা অপরিণত বিকাশের ফলশ্রুতি। এই সমস্যার কারণে শিক্ষার্থীদের শারীরিক এবং বৌদ্ধিক ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের সুনিয়ন্ত্রিত প্রভাব থাকে না। স্বাভাবিক ভাবেই শিক্ষার্থীদের বেশি কিছু সমস্যায় পড়তে হয়, যেমন— দাঁত ব্রাশ করা, পোশাক পরিচ্ছদ পরিধান করা ইত্যাদি।

(vii) **আত্মমগ্নতা :** এই সমস্যাটি ঠিক কোনো রোগ নয়, কিন্তু মস্তিষ্কের কাঠাবলির বিকাশগত বিশৃঙ্খলা। শৈশবের প্রথম তিন বছর মধ্যেই এর প্রকাশ ঘটে এবং সারা জীবনে ধরে তা এগিয়ে চলে। মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের মধ্যে এর প্রকাশ ঘটে প্রায় চারগুণ। পৃথিবীর প্রায় সব জাতির মানুষ এবং সবরকম সামাজিক পটভূমিকায় একে ঘটতে দেখা যায়।

❖ ১.৪.৪.২ নিরাময়কারী শিক্ষার অর্থ (Meaning of Remedial Education) :

Merriam - Webster's Medical Dictionary (2002 Merriam - Webster Inc) এর মতানুসারে 'Remedial' এর অর্থ হল নিরাময়ের উদ্দেশ্যে বা নিরাময় প্রদানের জন্য, নিরাময়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। মন্দ বিষয় বা বস্তু দূরীকরণ অথবা একটি বিশেষ ক্ষেত্রে একজন এর দক্ষতার উন্নয়ন ঘটানো।

Webster's Revised Unbri dged Dictionary (1998, MICRA Inc) Remedial Education কে ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে : "Programms that are designed to develop specific cognitive skills, usually in the languages arts and mathematics from a dificient level to one that is appropriate to the educational level and aspirations of a particulare students Diagnostic testing to determine. The nature and extent of the problem may also be included.

কিন্তু 'Merriam Webster's Medical Dictionary' (2002 Merriam Webster, Inc.) শব্দটিকে ব্যাখ্যা করছেন একটু অন্যরকম ভাবে—

"As for as Remedial Education is concerned, the learning difficulties or disabilities could be categorized so as children are streamed and taught in these remedial classes in order to help them overcome their difficultiess and improve the educational output. আবার Merraiam - Webster's Dictionary of Law (1996 Merriam - webster, Inc) Remedial Education প্রসঙ্গে মত দিয়েছেন এইভাবে : "Education helping to improve skills : designed to help people with lear ning difficulties to improve their skills or knowledge, or relating to education designed to do this."

Farrant (1994) এর মতানুসারে, : "Remedial Education is any programme of teaching which has reasonable chance of restoring to normal the educational performance of children whole progress has been adversely affected by environmental factors" (Farrant, J.S. 1994).

Farrant, চিকিৎসক এবং নিরাময় কারী শিক্ষকের কাজের মধ্যে তুলনা করে বলেছেন, শিক্ষক চিকিৎসকের মতই একইভাবে শিক্ষার্থীর শিক্ষাগত আঘাতকে খুঁজে বের করতে চেষ্টা করেন নিম্নলিখিত ভাবে—

(i) শিক্ষার্থী তার শিক্ষার সর্বক্ষেত্রে নাকি শুধুমাত্র কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে পশ্চাদপদ, তার বিস্তার এবং গভীরতাকে চিহ্নিত করেন।

(ii) শিক্ষার্থীর বাড়ীর পরিবেশ, তার স্বাস্থ্য, বিদ্যালয়ে উপস্থিতি, বুদ্ধিমত্তা এবং মানসিক ক্ষমতাকে খুব যত্নের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ এবং শিক্ষার্থীর সমস্ত রেকর্ড অনুসন্ধান করে সমস্যার কারণগুলি আবিষ্কার করার চেষ্টা করেন।

(iii) কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর দুর্বলতার প্রকৃতি এবং পশ্চাদপদতার মাত্রাকে নিশ্চিতভাবে চিহ্নিত করে তুলে ধরতে আদর্শায়িত দুর্বলতা নির্ণায়ক অভীক্ষা (Standing ardised diagnostic test) এবং পারদর্শিতার অভীক্ষা (achievement test) গুলি ব্যবহার করেন।

(iv) শিক্ষার্থীর পশ্চাদপদতা ঘটানোর জন্য দায়ী বিষয়গুলি যাতে তার ক্ষেত্রে পরবর্তীকালে পুনরায় প্রভাব বিস্তার করতে না পারে, তারজন্য সংশোধন মূলক কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণে করার চেষ্টা করেন।

(v) দুর্বল শিক্ষার্থীকে সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় যত তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে আনা সম্ভব তার জন্য চেষ্টা করা হয়।

সুতরাং Remedial Education কে বলা যেতে পারে, বিশেষ ধনের শ্রেণিশিক্ষা বা শিক্ষণ কৌশল যার লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীর শিখনে অসুবিধাগুলিকে দূর করে। নিরাময়ের ব্যবস্থা করা, যাতে তারা স্বাভাবিক দক্ষতা সম্পন্ন শিশুদের সমকক্ষ হতে পারে।

শিক্ষণ-শিখন পরিস্থিতিতে নিরাময়কারী শিক্ষা (Remedial Education) এবং শিখন অক্ষমতা (Learning Disability) দু'টি শব্দ একে অন্যের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। কিছু বিশেষজ্ঞের মতে শিখন অক্ষমতা (Learning Disability) বলতে বোঝায় একটি দলবদ্ধ বিশৃঙ্খল অবস্থা যা একটি বিস্মৃত শিক্ষাগত দিক এবং যা শিক্ষার্থীর কথা বলা, শোনা, পড়া, লেখা, বানান, যুক্তি প্রদান এবং সংগঠিত তথ্যসহ কার্যকরী দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রকে নেতিবাচক প্রভাবিত করে। সুতরাং শিক্ষক শিক্ষিকাদের এই ব্যাপারে সচেতন থাকা দরকার যে, শিখন অক্ষমতা নিম্নস্তরের বুদ্ধিমত্তাকে নির্দেশ করে না। শিক্ষার্থীদের শিখন

Scanned with CamScanner

অক্ষমতার মধ্যে বিশেষ কিছু অসুবিধা থাকে যা তাদের বুদ্ধির স্তর অনুযায়ী দক্ষতা অর্জনে বাধা সৃষ্টি করে।

❖ ১.৪.৪.৩ শিখন অক্ষমতা এবং নিরাময়কারী শিক্ষা (Learning Disabilities and Remedial Education) :

সংশোধনীমূলক শিক্ষা প্রসঙ্গে আলোচনা করার পূর্বে আমাদের জানা দরকার যে কাদের জন্য এই শিক্ষার প্রয়োজন, কেননা অনেকের ধারনা বিশেষ প্রতিবন্ধী শিশুদের বা শিক্ষার্থীদের জন্যই এই শিক্ষা। এমন অনেক ব্যক্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায় যারা পরবর্তীকালে বিখ্যাত হলেও শিক্ষার প্রথম জীবনে শিখন অক্ষমতার শিকার ছিলেন। সংশোধনীমূলক শিক্ষার প্রয়োজন হয় সেইসব শিক্ষার্থীদের যাদের শিখনের ক্ষেত্রে বিশেষ অক্ষমতা থাকে। বিশেষ ভাবে শিক্ষাগত সাহায্য দিয়ে শিক্ষায় পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের সংশোধনের ব্যবস্থা করা দরকার কখনো কখনো দেখা যায় যে, নিরাময়কারী শিক্ষণ (Remedial Teaching) এবং বিকাশমূলক অথবা সংশোধনমূলক শিক্ষণ (Developmental or Corrective Teaching) এর মধ্যে পৃথক করতে পারেন না অনেকেই। অথচ এই শব্দ দুটির অর্থ সম্পূর্ণ আলাদা এবং শিক্ষার্থীরাও দুটি ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ আলাদা প্রকৃতির।

১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে শিখন অক্ষমতার একটি সংজ্ঞায় বলা হয়েছে : "The term 'spec ific learning disability' means a disorder in one or more of the basic psychological processes involved in understanding or in using language, spoken or written, that may manifest itself in an imperfect ability to listen, think, speak, read, write, spell or to do mathematical calculations. The term includes such conditions as perceptual disabilities, brain injury, minimal brain dysfunction, dyslexia and developmental aphasia. The term does not apply to children who have learning problems that are primar ity the result of visual, hearing or motor disabilities of mental retardation, of emotional disturbance, or of environmental, cultural, or economic disadvantages."

কিন্তু ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে Federal Register শিখন অক্ষমতার যে পরিবর্তিত সংজ্ঞার সুপারিশ করেছেন তা হল, এই রকম : ".....a severe discrepacy between achievement and intellectual ability in one or more of the areas : 1) oral expression; 2) listening comprehension; 3) written expression; 4) basic reading skill; 5) reading comprehension; 6) mathematics calculation; or 7) mathematics reasoning. The child may not be identified as having a specific learning disability if the discrepancy between ability and achievement is primarily the result of : 1) a visual, hearing, or motor handicap; 2) mental retendation, 3) emotional disturbance, or 4) environmental, cultural, or economic disadvantages." (USOE, 1977)

উপরোক্ত সংজ্ঞা ও আলোচনাতে পরিষ্কার উপলব্ধি করা যায় যে, 'Remedial Education' এর সঙ্গে 'Learning Disability' ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কিত। ২০০১ খ্রিস্টাব্দে Us Department of education office of special Education Programme (OSEP) একটা সংজ্ঞা প্রদান করে। সেটি হল : "The central concept of specific learning Disability involves disorders of learning and cognition that are intrinsoc to the individual. Specific learning Disability are specific in the sense that these disorders are significantly affect a relatively narrow range of academic and performance outcomes. Specific Learning Disability may occur in combination with disabling conditions, but they are not due pri marrity to other conditions, such as mental retardation, behavioural disturbance, lack of opportunitics to learn, or primary sensory defects."

ব্যক্তিগত প্রভাবে পশ্চাদপদতার জন্য দুই ধরনের নিরাময়কারী শিক্ষা (Remedial Education) হতে পারে :

(১) যে সমস্ত শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট বিষয়ে শিখন অক্ষমতা আছে, তাদের জন্য নির্দিষ্ট দক্ষতার উন্নয়ন ঘটানো বা বিকাশ সাধন করা।

(২) যে সমস্ত শিক্ষার্থীদের এক বা একাধিক মেটালিক মানসিক ক্রিয়াগুলি যেমন প্রত্যক্ষণ, মনোযোগ, স্মরণক্রিয়া এবং অন্যান্য বৌদ্ধিক ক্রিয়ার (পঠন, লিখন, গণিত) ক্ষেত্রে অসুবিধা আছে তাদের মৌলিক মানসিক প্রক্রিয়ায় নিরাময় সাধন।

❖ ১.৪.৪.৪ নির্দিষ্ট পশ্চাদপদতা এবং শিখন অক্ষমতার বিভিন্ন লক্ষণ (Specific Backward ness and different warning signs of learning disabilities) :

শিখনে অক্ষম শিক্ষার্থীদের যে, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে দুর্বলতা থাকে যে কথা আমরা পূর্বেই জেনেছি। এই অংশে তিনটি বিশেষ দিকে শিক্ষার্থীদের পশ্চাদপদতার সম্পর্কে আলোচনা করার চেষ্টা করবো। পঠন, লিখন এবং গণিত সংক্রান্ত বিষয়ে শিক্ষার্থীদের অক্ষমতার কারণগুলিকে জানার চেষ্টা করবো। এই কারণগুলি জানতে পারলে শিক্ষার্থীদের জন্য কী ধরনের নিরাময় মূলক। শিক্ষণের ব্যবস্থা ককরা যেতে পারে সে সম্পর্কে আলোচনাও করা থাকে।

শিখন অক্ষমতার কারণগুলিকে এখনো পর্যন্ত সম্পূর্ণ রূপে জানা সম্ভব হয়নি, যদিও এটা মনে করা হয় যে, শিক্ষার্থীরা মৌলিক শিখনের ভ্রান্ত প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতি (Cohen, 2007)। যদি একে প্রারম্ভিক পর্যায়ে এই সব শিক্ষার্থীদের নিরাময়কামী শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায় তবে যথেষ্ট সন্তোষজনক ফল পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে শিখন অক্ষমতার নিম্নলিখিত দশটি দিক সম্পর্কে শিক্ষক বা শিক্ষিকাকে সচেতন থাকতে হবে। সেগুলি হল—

(১) শিক্ষার্থীর পঠনে অসুবিধা থাকে।

(২) শ্রেণি শিক্ষকের নিকট শিক্ষার্থী সামনাসামনি পঠনে অনিচ্ছুক থাকে বা অনীহা দেখায়।

ebook.dascoaching.in

Scanned with CamScanner

(৩) শিক্ষকে মৌখিক অথবা লিখিত নির্দেশ উপলব্ধিতে শিক্ষার্থীর অসুবিধা থাকে।

(৪) পঠন অথবা লিখনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী প্রায়শই অক্ষর বাদ দিয়ে যায়।

(৫) বোর্ডের কোনো লিখিত বিষয়কে নিজের খাতায় লিখতে অসুবিধাবোধ করে।

(৬) গনিতে বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হয়।

(৭) এমন অনেক সময় প্রশ্ন করে যেগুলির উত্তর পূর্বেই শ্রেনিকক্ষে আলোচিত হয়েছে।

(৮) নিজে নিজে কোনা কাজ করতে প্রচন্ড অসুবিধা বোধ করে এবং পরনির্ভরশীলতার বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে।

(৯) শ্রেণিতে সচরাচর কোনো সহযোগিতা করে না এবং কোনো প্রশ্নের ঠিক উত্তর দিতে পারে না।

(১০) কোনো বস্তুর নাম বলতে বা কোনো শব্দ খুঁজতে ভীষণ অসুবিধায় পড়ে।

● **(ক) পঠনে অক্ষমতা (Reading Disability) :**

অনেক মনোবিজ্ঞানী পঠন অক্ষমতা বা Reading Disability কে 'Dyslexa' শব্দটি ব্যবহার করেন। প্রকৃত পক্ষে Dyslexia শব্দটির দ্বারা মারাত্মক রকমের পঠন অক্ষমতাকে বোঝায়। কিন্তু সমস্ত শিক্ষার্থীই যাদের শিখন অক্ষমতা আছে, তাদের সকলেই মারাত্মক পঠন অক্ষমতায় আক্রান্ত নয়। এটি কোনো শারীরিক অক্ষমতা নয়, শারীরিক সমস্যার কারনে এটির উৎপত্তি হয় না। এই ধরনের সমস্যায় থাকে মস্তিষ্কে তথ্য সংগ্রহও প্রক্রিয়া করনের ব্যক্তিগত সমস্যা।

পঠন অক্ষমতাকে Robinovitch (১৯৬২) এবং Kolson ও তাঁর সহযোগিরা (১৯৬৩) দুটি ভাগে ভাগ করেছেন— (১) মারাত্মক অক্ষমতা এবং (২) স্বল্প অক্ষমতা otto (১৯৭৩) পঠন অক্ষমতাকে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন : (১) প্রাথমিক অক্ষমতা (Primary disability) এবং গৌন অক্ষমতা (Secondary disability)।

প্রাথমিক অক্ষমতা যুক্ত শিক্ষার্থীদের বৈশিষ্ট্য হল—

(১) শিক্ষার্থীদের পর্যাপ্ত বুদ্ধি থাকে,

(২) বানান, পঠন এবং গণিতে দক্ষতা খুব কম।

(৩) শোনা ও দেখার ক্ষেত্রে পার্থক্য নির্ণয়ের ক্ষমতা খুব কম।

(৪) দর্শন সংক্রান্ত স্মৃতি খুব দুর্বল এবং শব্দগুলির পঠনে ভীষণ দুর্বল।

(৫) পড়া ও লেখার ক্ষেত্রে শব্দের অন্তর্গত অক্ষরগুলির বিন্যাস অদল-বদল ঘটায় যেমন— was এর স্থানে saw, on এর স্থানে no; d এর স্থানে b ইত্যাদি।

(৬) প্রাক্ষোভিক সমস্যা থাকে,

(৭) কোনো শারীরিক বা দৃষ্টিশক্তি জনিত দুর্বলতা থাকে না,

(৮) জন্মগত ট্রমা (birth trauma) অথবা মস্তিষ্কে আঘাত জনিত ইতিহাস থাকে।

Oli মাধ্যমিক অক্ষমতা যুক্ত শিক্ষার্থীদের নিম্নলিখিত কতকগুলি দিক উল্লেখ করেছেন :

(১) পরিবেশগত, শিক্ষাগত, প্রাক্ষোভিক এবং সামাজিক সমস্যা থাকে।

(২) প্রেষণার যথেষ্ট অভাব থাকে।

(৩) বৌদ্ধিক ক্ষমতার থাকে সীমাবদ্ধ।

(৪) বিভিন্ন প্রাক্ষোভিক সমস্যা থাকে, যেমন– উদ্বেগ (anxiety), বিষন্নতা (depression) ইত্যাদি।

পঠনে অক্ষমতার কারণ (Causes of Reading Disability) :

পঠন অক্ষমতার বৃদ্ধি পত্রায় কতকগুলি কারনে। মৌলিক পঠন ক্ষমতার অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীকে অবশ্যই বেশি কিছু দক্ষতা অর্জন করতে হয়। এগুলিকে সম্মিলিত ভাবে বলা হয় পঠন প্রস্তুতি। পঠন অক্ষমতার কয়েকটি দিক নিম্নে উল্লেখ করা হল :

(১) **প্রাক্ পঠন দক্ষতার অভাব :** পঠনের জন্য যদি কিছু পুর্ব প্রস্তুতি না থাকে, তবে পঠন অক্ষমতার সব সময় সম্ভাবনা থেকে যায়। পঠন অক্ষমতার জন্য কিছু গবেষক শিক্ষার্থীর দেখা, শোনা অনুভূতি এবং বয়সকে দায়ী করেছেন। যেহেতু শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতা অর্জনের সঙ্গে চক্ষু ও কর্ণ নামক জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং সংশ্লিষ্ট অনুভূতির ঘনিষ্ট সম্পর্ক আছে তাই এগুলি পঠনে প্রস্তুতিতে সহায়তা করে থাকে। ফলে সেই অনুভূতি ঠিক ঠিক না হলে পঠন অক্ষমতার সৃষ্টি হয়। শিক্ষার্থীর বয়সও শিক্ষার্থীর চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানেন্দ্রিয় কাজের সমন্বয় ও পরিনতিতে সহায়তা করে থাকে এজন্য উপযুক্ত বয়স ছাড়া পঠন দক্ষতা সম্ভব নয়। Venezky (১৯৮০) এবং Spachi (১৯৮১) প্রাক্ পঠন দক্ষতার অভাবকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন।

(২) **শিক্ষার্থীর বয়স :** কিছু গবেষক শিক্ষার্থীর বয়সকে পঠন প্রস্তুতির বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হিসেবে আরোপ করেছেন। Morphett এবং Wash burne বলেছেন বেশিরভাগ শিক্ষার্থীর ৬.৫ বছর বয়সে পঠনে অগ্রগতি দেখায়।

(৩) **পঠনে প্রয়োজনীয় দক্ষতার অভাব :** পঠনের জন্য যে সমস্ত দক্ষতার দরকার সেগুলি যদি শ্রেণিশিক্ষন, নিরাময়কারী শিক্ষণ অথবা বিশেষ ব্যক্তিগত শিক্ষনে অর্জিত না হয় তাহলে শিক্ষার্থীদের পঠন দক্ষতার অভাব দুর হয় না।

(৪) **পঠন সংক্রান্ত শিখনে পূর্ববতী ক্ষমতার অভাব :** পঠন সংক্রান্ত বিষয়ে শিক্ষালাভের আগে শিক্ষার্থীদের কিছু বিশেষ ক্ষমতা থাকা দরকার। যেহেতু সেগুলি পঠন দক্ষতার তুলনায় একদিকে যেমন অনেক বেশি মৌলিক তেমনি অন্যদিকে পঠন দক্ষতা বৃদ্ধি করতে সহায়তাও করে থাকে। এই সমস্ত পূর্ববতী ক্ষমতার অভাবে পঠন দক্ষতা গড়ে উঠতে পারে না।

Scanned with CamScanner

(৫) **পঠন সংক্রান্ত নির্দেশনায় সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি :** অনেক শিক্ষার্থী বাচনিক ক্ষমতা, পঠনে সাংকেতিক ক্ষমতা যথেষ্ট না হওয়ায় তারা পঠনে অক্ষম হয়ে পড়ে।

(৬) **সংবেদন ও প্রত্যক্ষণ সংক্রান্ত চেষ্টীয় দক্ষতার অভাব :** শিখন বা অভিজ্ঞতা অর্জনে সংবেদন ও প্রত্যক্ষন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহন করে। এগুলির অভাবে স্বাভাবিকভাবেই পঠনে অক্ষমতা দেখা যায়।

পঠন অক্ষমতার নির্ণয় বা চিহ্নিতকরণ (Diagnosis of Reading Disability) : বিভিন্ন শিক্ষার্থীর মধ্যে বিভিন্ন রকমের পঠন অক্ষমতার দেখা যায়। পঠন অক্ষমতা এই বৈচিত্র্যের কারণে নির্ণায়ক দৃষ্টিভঙ্গী (diagnostic - prescriptive approach) কে বিবেচনা করে শিক্ষার্থীকে একেবারে ব্যক্তিগত স্তরে গুরুত্ব দেওয়া দরকার। নিম্নলিখিত নির্ণায়ক দিকগুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল :

(১) সমীক্ষা স্তরে নির্ণয় (Survey Level of Diagnosis)
(২) নির্দিষ্ট স্তরে নির্ণয় (Specific Level of Diagnosis)
(৩) নিবিড় স্তরে নির্ণয় (Intensive Level of Diagnosis)

নিম্নে এইসমস্ত স্তরের নির্ণয় সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল :

(১) **সমীক্ষা স্তরে নির্ণয় :** শিক্ষার্থীর পঠন অক্ষমতার নির্ণয় এই স্তরে শিক্ষক শিক্ষার্থীর উপস্থিতিকে পরীক্ষা করেন এইজন্য—

(ক) শিক্ষণ প্রোগ্রামএর সাফল্য পরীক্ষা করার জন্য

(খ) যেখানে শিক্ষার্থীর মনোযোগ (একক/দলগত) দরকার, সেই ক্ষেত্রকে স্থির করার জন্য;

(গ) ব্যক্তি শিক্ষার্থী যার সমস্যা নির্ণয় করার দক্ষর হয় তাকে চিহ্নিত করার জন্য পঠন অক্ষমতা নির্ণয় এর জন্য যে সমস্ত তথ্য ও তাদের উৎস সংগ্রহ করতে হয় তার জন্য পঠন অক্ষমতা সমীক্ষাধর্মী অভীক্ষা প্রয়োগ করা হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পঠন অক্ষমতা নির্ণয় এর জন্য নির্ণায়ক অভীক্ষার প্রয়োগ হয়। যেমন—

(i) The Primary - I Battery (Grade - I)
(ii) The Primary - II Battery (Grade - II),
(iii) The elementary Rediny (Grade - 3 & 4)
(iv) Intermediate Reading (Grade - 5 & 6)
(v) Advance Reading (Grade - 7 & 8)
(vi) Diagnostic Reading Test)
(viii) Surveny section, the stanford Reading Test (Reviseded)

(২) **নির্দিষ্ট স্তরে নির্ণয় :** এই স্তরের নির্ণয়ের ক্ষেত্রে যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য এবং যথার্থ অভীক্ষার দ্বারা শিক্ষার্থীর মানসিক ক্ষমতাকে জানার প্রয়োজন হয়। এইভাবে মানসিক ক্ষমতাকে জানার জন্য ব্যবহার করা হয় নিম্নলিখিত অভীক্ষাসমূহ—

(i) Stanford - Binet Intelligence Scale (New Edition),
(ii) The Wechsler Intelligence Scale for Children,
(iii) Full Range of Picture Vocabulary Test,
(iv) The Quick Test ইত্যাদি। এছাড়াও আছে—

Standardised reading test যেমন—

(i) The Silent Reading Diagnostic Tests,
(ii) Word Recognition Tests,
(iii) General Word Elements ইত্যাদি।

(৩) **নিবিড় স্তরে নির্ণয় :** এই স্তরের এর প্রয়োগ দেখা যায় নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে যখন শিক্ষার্থীরা শারীরিক, মনস্তাত্ত্বিক সমস্যায় অথবা উভয়েই সমষ্টিগত সমস্যার কারণে শিক্ষার্থীদের মধ্যে মারাত্মক রকমের পঠন সমস্যা বা পঠন অক্ষমতা দেখা দেয়। যখন সব রকম নিরাময়কারী শিক্ষা বা প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় তখন নিরাময়কারী শিক্ষক সমস্ত রকম অভীক্ষা প্রয়োগ করেন। সেখানেও ব্যর্থ হলে তিনি বাধ্য হয়ে এই ক্ষেত্রের বা field এর বিশেষজ্ঞের সমস্যার কারণগুলির গভীরতা জানার প্রয়োজন হয়।

পঠন অক্ষমতায় নিরাময়কারী শিক্ষণে শিক্ষকের কার্যাবলী (Functions of the Teacher in Remedial Teaching) : শিক্ষার্থীর পঠন অক্ষমতা নির্ণয় বা নির্ধারণ করার পর শিক্ষকের কাজ হল শিক্ষার্থীর যথাযথ নিরাময়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা। শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত সমস্যা ও চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নিরাময়কারী শিক্ষককে উপযুক্ত ব্যবস্থাগ্রহণ করতে হয়। নিম্নলিখিত কার্যাবলীর দ্বারা নিরাময়কারী শিক্ষক তার দায়িত্ব পালন করতে পারেন :

(১) পঠনের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্তরকম সামগ্রী সরবরাহ করা,
(২) পঠনের পূর্ববর্তী কিছু কৌশল প্রয়োগ করা,
(৩) বড় হরফের ছাপানো সামগ্রী ব্যবহার করা,
(৪) বহুমূখী আধুনিক সুযোগ-সুবিধা পূর্ণ ব্যবস্থা নিয়োজিত করা।
(৫) গুরুত্বপূর্ণ শব্দ সম্ভার শেখানো।

উপরোক্ত বিষয়গুলি নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল—

(১) **পঠনের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্তরকম সামগ্রী সরবরাহ করা :** পর্যাপ্ত এবং উপযুক্ত মানের পাঠ্যপুস্তক, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, তথ্যের প্রাথমিক উৎস, সহায়ক পুস্তক, প্রোগ্রাম লার্নিং ম্যাটেরিয়াল, আধুনিক on line উৎসও ব্যবহার করা যেতে পারে।

(২) **পঠনের পূর্ববর্তী কিছু কৌশল প্রয়োগ করা :** পঠনের পূর্বে শিক্ষার্থীকে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর গঠন শেখানো দরকার। সাধারণ, পাঠ্যপুস্তকের প্রথম অনুচ্ছেদে প্রধান বিষয়-এর উল্লেখ থাকে, পরের অধ্যায়-এর বাক্যগুলিতে থাকে বিস্তৃত বর্ণনা, এবং

Scanned with CamScanner

সবশেষে থাকে সংক্ষিপ্ত সার। শিক্ষার্থীকে পাঠ করতে বলার আগে কিছু প্রথমিক জ্ঞান দেওয়া দরকার। তাছাড়া পঠন সংক্রান্ত কিছু প্রশ্ন, নির্দেশ ও পরামর্শদানের প্রয়োজন। চূড়ান্ত পর্যায়ে শিক্ষার্থীকে পঠনের বিষয়বস্তুর ফটোগ্রাফ, স্থূলাক্ষর বিশিষ্ট শব্দার্থ, শিরোনাম, উল্লেখযোগ্য শব্দ পরীক্ষা করার মাধ্যমে পঠনের উপযোগী প্রস্তুতিতে উৎসাহিত করা দরকার।

(৩) **বড় হরফের ছাপানো সামগ্রী ব্যবহার করা :** শিক্ষার্থীদের যেখানে যতখানি সম্ভব বড়ো বড়ো ছাপানো সামগ্রী ব্যবহার করা দরকার।

(৪) **বহুমুখী আধুনিক সুযোগ-সুবিধা পূর্ণ ব্যবস্থা নিয়োজিত করা :** আধুনিক প্রযুক্তিবিজ্ঞানের যুগে অন্যান্য দিকগুলির মত শিখনকেও প্রভাবিত করেছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিজ্ঞানের বিভিন্ন ধারনা। এইসমস্ত বহুমুখী আধুনিক সুযোগ-সুবিধাপূর্ণ বেশ কিছু ব্যবস্থা নিয়োজিত করা দরকার।

(৫) **গুরুত্ব শব্দভাণ্ডার শেখানো :** নিরাময়কামী শিক্ষার্থীরা যখন পাঠ করে তখন হীনমন্যতার শিখার থাকে প্রায় প্রত্যেকেই। যেহেতু তাদের পূর্ণবর্তী সেই অভিজ্ঞতা থাকে। শিক্ষার্থীরা একই শব্দকে বার বার ব্যবহার না করলে সেই হীনমন্যতা বা হতাশার কিছুটা দূর হয়। সেজন্য পঠনের কাজে তাদের অতি প্রয়োজনীয় শব্দ সম্ভার শেখানো দরকার।

উপরোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ ছাড়াও নিরাময়কারী শিক্ষক অন্যান্য আরো কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন, সেগুলি হল :

(i) দর্শন ও শ্রবণ সমস্যা আছে এমন শিক্ষার্থীকে খুঁজে বের করা,

(ii) পঠনে শিক্ষার্থীদের ইতিবাচক মনোভাব গড়ে তুলতে সাহায্য করা,

(iii) দর্শন, শ্রবণ ইত্যাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অনুশীলনের মাধ্যমে বিভিন্ন অনুভূতি গ্রহণ তথা অভিজ্ঞতা অর্জনের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা,

(iv) শিক্ষার্থীকে পঠনে মনোভাব বৃদ্ধিতে সহায়তা করা। ইত্যাদি।

(খ) লিখন অক্ষমতা (Writing Disability) : কথা বলার মত লেখার মাধ্যমেও ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যোগাযোগ রক্ষিত হয়। সুতরাং লেখার ক্ষেত্রে যাদের অক্ষমতা বা দুর্বলতা দেখা যায়, সেই সব শিক্ষার্থীরা অন্যের সাথে লেখার মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করতে সক্ষম হয় না।

লিখন অক্ষমতার কারণসমূহ (Causes Writing Disability) : লিখন একটি উচ্চস্তরের জটিল স্নায়বিক বিকাশের প্রক্রিয়াকে প্রতিনিধিত্ব করে যার মধ্যে অনেকগুলি মস্তিষ্কের ক্রিয়ামূলক দিককে অন্তর্ভুক্ত করে। এর জন্য দরকার হয় যোগাযোগ, বহুমুখী তথা প্রক্রিয়াকরম, স্মৃতি, কর্মেন্দ্রিয়ের দক্ষতা, ভাষাগত দক্ষতা, বিকাশমূলক প্রক্রিয়ার উপরোক্ত

পর্যায়ক্রমিক সংহতি রক্ষিত না হয় বা কার্যকরী লিখনের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট দক্ষতাগুলি যখন শিক্ষার্থী অনুশীলনের দ্বারা অর্জন করতে ব্যর্থ হয় তখন স্বাভাবিকভাবে লিখন অক্ষমতার প্রকাশ ঘটে। Boss এবং Vanghan (২০০২)-এর মতানুসারে মাঝারি স্তরের বুদ্ধি সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের লিখন অক্ষমতা, তাদের লিখন দক্ষতার অভাবে প্রকাশ পায়। সাধারণত এইসব শিক্ষার্থীদের কোনো নির্দিষ্ট স্নায়বিক ক্ষমতা সংক্রান্ত সমস্যা অথবা অতিরিক্ত উপলব্ধিমূলক চেষ্টায় প্রতিবন্ধকতা দেখা যায় না।

লিখন অক্ষমতার নির্দেশক বা চিহ্ন (Indicators of Writing Disability) : লিখন অক্ষমতা যুক্ত শিক্ষার্থীদের লেখায় কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় যেগুলির দ্বারা লিখন অক্ষমতা বোঝা যায়। এগুলিকে বলা হয় লিখন অক্ষমতার নির্দেশক বা চিহ্ন। লিখন অক্ষমতার এই নির্দেশকগুলির কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হল :

(১) হাতের লেখায় অস্পষ্টতা বর্তমান,

(২) অনুলিখন এবং শিখনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর ধীর গতি এবং কষ্টসাধ্য অবস্থা বোঝা যায়।

(৩) লেখার সময় শিক্ষার্থীর হাতের অস্বাচ্ছান্দ্য অবস্থা, অনুপযুক্ত দেহভঙ্গি এবং উদ্বেগপূর্ণ অবস্থা লক্ষ করা যায়।

(৪) লেখার লাইন বাঁকা, হরফে অসামঞ্জস্য দেখা যায়, ফলে লেখা অনেক ক্ষেত্রে বোধগম্যতার অভাব পরিলক্ষিত হয়।

(৫) লেখায় দুটি হরফের মাঝ, দুটি শব্দের মাঝে এবং পৃষ্ঠায় অবসস্থান ইত্যাদি ক্ষেত্রে সঠিক ভঅবে ফাঁক না রাখা এবং ধারাবাহিকতার অভাব থাকে।

(৬) অক্ষর, শব্দ এবং বাক্যে অসম্পূর্ণতার প্রকাশ ঘটে,

(৭) শব্দ সম্ভারে এবং বাক্যের গঠনে সরলতা,

(৮) লেখার বিষয়বস্তুতে ভাষাগত দক্ষতার প্রতিফলন না হওয়া,

(৯) লেখায় সামগ্রিক সৌন্দর্যবোধের যথেষ্ট অভাব এবং বিরক্তি ছাপ স্পষ্ট।

লিখন অক্ষমতার প্রকারভেদ (Types of Writing Disability) : লিখন অক্ষমতাকে সাধারণ দুইভাগে ভাগ করা যায় :

(১) নির্দিষ্ট লিখন অক্ষমতা (Specific dysgraphia) :

(২) অনির্দিষ্ট লিখন অক্ষমতা (Non-specific dysgraphia)

(১) **নির্দিষ্ট লিখন অক্ষমতা :** এই ধরনের অক্ষমতার সৃষ্টির পেছনে আছে বানান সংক্রান্ত অক্ষমতা, কর্মেন্দ্রিয়ের সমন্বয়মূলক সমস্যা, ভাষাগত দক্ষতার অভাব ইত্যাদি কারণ। কর্মেন্দ্রিয়ের সমন্বয়মূলক সমস্যার সঙ্গে অনেক সময় সম্পর্কিত বিষয়গুলি হল শারীরিক গঠনগত সমস্যা, পরিচালন ক্রিয়া, হীনতা, কর্মেন্দ্রিয়ের পরিকল্পনার অভাব, দর্শন ও প্রত্যক্ষণ সংক্রান্ত সমস্যা ইত্যাদি।

Scanned with CamScanner

(২) **অনির্দিষ্ট লিখন অক্ষমতা :** অনির্দিষ্ট লিখন অক্ষমতা সৃষ্টি হয় সাধারণত মানসিক ব্যাহত বুদ্ধি; মনস্তাত্ত্বিক বঞ্চনা অথবা বিদ্যালয়ের স্বল্প উপস্থিতির কারনে। কিছু শিক্ষার্থী পর্যাপ্ত লিখন দক্ষতা অর্জন করতে পারে না কারণ তাদের যথেষ্ট পরিমান লিখিত ভাষার প্রত্যক্ষ নির্দেশ থাকে না।

Deuel (১৯৯৪) লিখন অক্ষমতাকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন :

(১) পঠন অক্ষমতার কারনে লিখন অক্ষমতা (Dyslexic dysgraphia)

(২) চেষ্টীয় আনাড়িপনার কারনে লিখন অক্ষমতা (Dysgraphia due to motor clumsiness)

(৩) স্থান সংক্রান্ত উপলব্ধির ত্রুটির কারনে অক্ষমতা (dysgraphia due to defect in inderstanding of space)

লিখন অক্ষমতা নির্ণয় (Diagnosis of Writing Disability) : লিখন অক্ষমতা নির্ণয়ে বিভিন্ন ধরণের কৌশল বা যন্ত্র কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে। এগুরি মধ্যে আছে–

(১) প্রসেসিং স্পিড ইনডেকস স্কোরস্ ফ্রম দ্য WISC - IV

(২) ডেভেলপমেন্টল টেস্ট অর্ব ভিসুয়াল-মোটর-ইনটিগ্রেশান,

(৩) বেনেডার - গেস্টাল্ট্।

(৪) জর্ডন লেপট্ রাইট রিভার্সাল টেস্ট ইত্যাদি।

এগুলি ছাড়াও বেশু কিছু ভাষামূলক পারদর্শিতা পরিমাপক ব্যবহার করা যায় :

(১) দ্য টেস্ট্ অব্ রিটন্ ল্যাঙ্গুয়েজ,

(২) উডকক্ জনশন সাইকো - এডুকেশনাল ব্যাটারি (থার্ড এডিশন)

(৩) ডায়াগনোস্টিক অ্যাচিভমেন্ট ব্যাটারী থার্ড এডিশান ইত্যাদি।

উপরোক্ত কৌশলগুলি ছাড়াও নিম্নলিখিত বিভিন্নরকম বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নির্দেশনা যেগুলি জ্ঞানমূলক ভিত্তি প্রদান করে এবং শিক্ষার্থীর জীবন ইতিহাসকে অন্তর্ভূক্ত করে সেগুলিকেও ব্যবহার করা যেতে পারে লিখন অক্ষমতা নির্ণয়ে। যেমন :

(১) পেন ম্যানশিপ্ ইনস্ট্রাকশন

(২) কিভাবে চিন্তাকে বিন্যস্ত এবং সংগঠিত করা যায় তার জন্য ইনস্ট্রাকশন,

(৩) ভাষা লিখনের নিয়ম কানুন যার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত আছে বড় হাতের অক্ষর লেখার ধরন, যার চিহ্ন ব্যবহার, ব্যাকরণ, বানান এবং বাক্যের গঠন রীতি শিখন।

লিখন অক্ষমতাযুক্ত শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়কারী শিক্ষণ পদ্ধতি (Remedial Teaching of Writing Disabled Learners) : ভাষামূলক লিখন বিশৃঙ্খলায় নিরাময় নির্ভর করে শিক্ষার্থীর নির্দিষ্ট অভাবজনিত লক্ষণগুলির সঠিক অবস্থান এবং পরিমাপ জানার উপর। যখন শিক্ষার্থীর অসুবিধাগুলি তাদের বয়স বা জীবন স্তরের সঙ্গে সম্পর্কিত

তখন সেই অনুসারে বয়সভিত্তিক নিরাময়কারী শিক্ষার দ্বারা দক্ষতার অভাব পূরণের সুপারিশ করা হয়। কিন্তু যখন লিখন অক্ষমতা বহুমুখী অভাব জনিত কারণে উদ্ভূত হয়, তখন নিরাময়কারী কার্য সমস্যার bypass বেশ কঠিন হয়। যদি শিক্ষার্থী কর্মেন্দ্রিয়ের নিয়ন্ত্রণজনিত সমস্যার কারণে ভোগে তাহলে নিরাময়কারী শিক্ষক নিম্নলিখিত উপায় অনুসরণের মাধ্যমে ব্যবহার করতে পারেন—

(১) হাতের পেশীর ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষার্থীকে অনুশীলনে অভ্যস্ত করা। শিক্ষক এমন ব্যবস্থাও গ্রহন করতে পারেন যেখানে শিক্ষার্থীকে বালিতে, নরম মাটিতে, চক বোর্ডের উপর লেখার পরামর্শ দেওয়া যায়।

(২) কাগজ, কলম, পেনসিল ইত্যাদি লিখন সামগ্রী, কাগজ সঠিক অবস্থানে রাখার জন্য শিক্ষার্থীদের অভ্যাস করানো উচিত।

(৩) লেখার হরফগুলিকে সঠিকভাবে লেখায় অভ্যস্ত করার জন্য সঠিকভাবে পরিচালনা করা।

(৪) শিক্ষার্থীকে লেখার জন্য পর্যাপ্ত সময় ব্যয় করা দরকার; এজন্য শিক্ষক তাকে পর্যাপ্ত সময় দেবেন এবং লাইন টানা কাগজ ব্যবহার করতে পরামর্শ দেবেন।

(৫) স্পষ্ট ও সহজপাঠ্য অক্ষর সংযোগ; দুটি শব্দের মধ্যবর্তী স্থানে এবং লেখার লাইনের মধ্যে প্রয়োজন মত ফাঁক রাখার বিষয়টি শিক্ষার্থীকে শেখানো দরকার।

(৬) লেখার উপর লেখা, যথেচ্ছ কাটাকাটি, পরিচ্ছন্নতা, এলোমেলো অবস্থা পরিহার করতে শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত পরামর্শ দেওয়া উচিত।

(গ) **পাটীগণিতে অক্ষমতা (Arithmetic Disability) :** বিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল পাঠীগণিত। শিক্ষায় এই বিষয়টিতে যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া দরকার। শিক্ষার্থীদের একটি বড় অংশ এই বিষয়টিতে উদ্বেগপূর্ণ অবস্থায় থাকে। এই বিষটিতে বহু শিক্ষার্থী সাফল্যের নিম্নস্তরে অবস্থান করে। কখনো কখনো পাটীগণিতের এই অক্ষমতাকে Dyscalculia বলা হয়, যার ফলে পাটীগণিত ধারণা লাভ করতে, পাটীগণিতের ঘটনা স্মরণ করতে, সংখ্যা সংগঠিত করতে এবং সমস্যা সংগঠনের ক্ষেত্রে বহু অসুবিধার সম্মুখীন হয় শিক্ষার্থীরা।

● **পাটীগণিতে অক্ষমতার কারণসমূহ** (Causes of Disalitity in Arithmetic) : পাটীগণিত শিখনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পাঁচটি বড় দিক হল : বৌদ্ধিক ক্ষমতা (cognitive abilities), যোগ প্রক্রিয়া (addition), বিয়োগ প্রক্রিয়া (subtraction) গুণ প্রক্রিয়া (multiplication) এবং ভাগ প্রক্রিয়া এছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে সাধারণ জ্ঞান। 'ঠিক' একই রকমভাবে পাটীগণিতের অক্ষমতার প্রধান দিকগুলি হল : হাতে রাখা (carrying), ধার করা (Borrowing), ভগ্নাংশ যোগ করা (add fraction),

Scanned with CamScanner

অজানা সংখ্যাকে বার করা (solving the unknown) এবং সংখ্যাগত সমস্যা প্রস্তুত করা (setting up word problems) [Rothstein, P. R, 2005]। বস্তুত পাটীগণিতে অক্ষমতার উদ্ভব হয় শারীরিক, সংবেদনগত, ব্যক্তিগত, সামাজিক এবং অবশ্যই বুদ্ধিগত উপাদানে পরিপ্রেক্ষিতে। এই সমস্ত উপাদানগুলির মধ্যে কতকগুলি শিক্ষাগত এবং কতকগুলি হল প্রেষণাগত। অবশ্য আরো কিছু উপাদান আছে।

(ক) **শিক্ষাগত কারণ বা উপাদান–**

(১) **অপর্যাপ্ত নির্দেশনা :** অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন পাটীগণিতের অক্ষমতার কারণ হল পাটীগণিত শিক্ষণের জন্য শিক্ষকের যথেষ্ট প্রস্তুতি না থাকা।

(২) **অতিরিক্ত অনুশীলন এবং স্মরণক্রিয়া :** পুনরাবৃত্তি শিক্ষার্থীর প্রেষণা সঞ্চারে অনেক ক্ষেত্রেই বাধা দেয়। একই কাজ বা সমস্যা বার বার করতে গিয়ে পাটীগণিত শিখনে বিরূপ প্রভাব পড়ে, বিশেষ করে যখন শিক্ষার্থী তার সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে পুনরাবৃত্তির ফলে ব্যর্থ হয়।

(৩) **সামাজিক এবং আবেগমূলক প্রস্তুতির অভাব :** পাটীগণিত শিখনের জন্য শিক্ষার্থীর সবরকম প্রস্তুতি থাকা দরকার। শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয়ের ক্ষেত্রেই একথা প্রযোজ্য। এজন্য শিক্ষকের জোর দেওয়া উচিত শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত বৈষম্যের উপর। সামাজিক ভাবে অনুকূল পরিস্থিতি এবং শিক্ষার্থীর প্রকৃতিকে গুরুত্ব দিয়ে স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিতে পাটীগণিত শিক্ষণের জন্য প্রস্তুতির গ্রহণ করা দরকার।

(৪) **পাটীগণিতের শব্দ সম্ভারে অপর্যাপ্ত মনোযোগ :** অনেক সময় দেখা যায় শিক্ষার্থী পাটীগণিতের শব্দকে সনাক্ত করতে অথবা উপলব্ধি করতে পারে না। এমনকি তারা শব্দের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করতে পারে না এবং শেষ পর্যন্ত সমস্যার সমাধান করতে ব্যর্থ হয়।

(খ) **প্রেষণামূলক উপাদান সমূহ** (Motivational fuctors of Arithmetic disability) :

বিদ্যালয় শিক্ষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল আগ্রহ এবং প্রেষণা, এই আগ্রহ আর প্রেষণার উপর অনেকটাই নির্ভর করে শিক্ষার্থীদের সাফল্য। বিশেষ করে বৌদ্ধিক ক্ষেত্রে এটি বিশেষভাবে প্রয়োজ্য। অনেক সময় বাড়ীর পরিবেশে পিতা মাতার বা বড়দের অপ্রেষণা মূলক আচরণের কারণে এবং বিদ্যালয়ে অপ্রশিক্ষিত এবং অপরিণত শিক্ষকদের অপ্রেষণামূলক আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার্থী পারদর্শিতা দেখাতে পারে না ফলে ব্যর্থতা এসে যায়।

● **পাটীগণিতে অক্ষমতার সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য** (Identifying characteristics of Arithmetic Disabled Learncrs) :

যে সব শিক্ষার্থীরা পাটীগণিতে অক্ষমতা তাদের কিছু লক্ষণ দেখা যার। এই লক্ষণগুলি দেখে সহজেই তাদের চিহ্নিত করা যায় নিম্নে সেরকম কিছু উল্লেখ করা হল :

(১) সংখ্যাগত এবং পাটীগণিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রতীকগুলি শিক্ষার্থী সঠিক ভাবে লিখতে পারে না।

(২) পাটীগণিতের সাধারণ চিহ্ন বা প্রতীকগুলির অর্থ মনে করতে পারে না এবং মৌলিক ঘটনা ও তথ্যের সঠিক উত্তর দিতে ব্যর্থ হয়।

(৩) তারা পাটীগণিতের সমস্যাগুলির বর্ণনা, হিসাব এবং সমাধান করতে প্রচণ্ড অসুবিধার সম্মুখীন হয়।

(৪) সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে সঠিক পর্যায়গুলি অনুসরণ এবং উপলব্ধি করতে ভীষণ অসুবিধার সম্মুখীন হয়।

(৫) পাটীগণিতের মৌলিক সমস্যাগুলি যেমন স্থানিক মান পরিচালিত সংখ্যা।

● **পাটীগণিতে অক্ষমতা নির্ণয়** (Diagnosis of Arithmetic Disability) :

পাটীগণিতে অক্ষমতা নির্ণয় এর কাজ তিনটি পর্যায়ে হতে পারে (OHO, ১৯৭৩) এই তিনটি পর্যায় হল : (ক) সমীক্ষা স্তরে নির্ণয়, (খ) নির্দিষ্ট স্তরে নির্ণয় এবং (গ) নিবিড় স্তরে নির্ণয়।

উপরোক্ত স্তরগুলি সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল–

(ক) **সমীক্ষা স্তরে নির্ণয় :** এই স্তরে সাধারণবুদ্ধির অভীক্ষা (general Intelligence Test) ব্যবহার করা হয়। এর ফলাফল সমস্যা স্তরের অভিমুখ বুঝতে সাহায্য করে। এই ধরনের কিছু অভীক্ষা হল Lowr Test of Basic Skills, California Achievement Test, co-ordinated scales of Achievement, Stanford Achievement Test.। এছাড়া বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের প্রতিদিনের কাজ পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করে পাটীগণিতে অক্ষমতাকে সনাক্ত করা যেতে পারে।

(খ) **নির্দিষ্ট স্তরে নির্ণয় :** এই স্তরে শিক্ষার্থীদের অক্ষমতা নির্ণয়ের জন্য বেশ কিছু অভীক্ষা ব্যবহার করা হয়। এই ধরনের কাজে শিক্ষার্থীদের প্রাপ্ত নিয়মিত পরীক্ষার নম্বর সাহায্য করে। এই পর্যায়ে নিরাময়কারী পদ্ধতি, ওয়ার্কবুক, নিরাময়কারী উপকরণ ইত্যাদিত সহায়তা করে। নির্দিষ্ট করে নির্ণয় এর ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত উপায়গুলি অনুসরণ করা যেতে পারে–

১। মাঝারি মানের নম্বর প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের বয়স এবং গ্রেড লেভেল এর সঙ্গে সঙ্গতি পূর্ণ হওয়া দরকার।

২। বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের সমস্তদিককে অবলম্বন করে অভীক্ষণ চালানো দরকার।

৩। যাতে সঠিক স্তরে ব্যবহার করা যায় সেজন্য অভীক্ষাটি উপযুক্তভাবে আদর্শায়িত হওয়া দরকার।

Scanned with CamScanner

(গ) **নিবিড় স্তরে নির্ণয় :** পাটীগণিতে অক্ষমতা নির্ণয় এর ক্ষেত্রে তৃতীয় বা নিবিড় স্তরের নির্ণয়ের বিষয়টি সাধারনত খুব কম ব্যবহৃত হয়। যখন প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের নির্ণয় সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় তখন এই নিবিড় স্তর এর নির্ণয়কে কাজে লাগানো হয়। যেখানে পাটীগণিতে শিক্ষার্থীদের বহুরকমের সমস্যার কারণে অক্ষমতা আসে সেক্ষেত্রে এই নিবিড় স্তরের নির্ণয় কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে।

● **পাটীগণিতে নিরাময়কারী শিক্ষণ** (Remedial Teaching in Arithmetid) :

পাটীগণিতে নিরাময়কারী শিক্ষণ কার্য পরিচালনার জন্য নিরাময়কারী শিক্ষককে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়। সেগুলি নিম্নে আলোচনা করা হল—

(১) **শিক্ষার্থীদের সহযোগিতাকে নিশ্চিত করা :** শিক্ষার্থীদের মানের নিরিখে দেখতে হবে। শিক্ষার্থীদের এই ধরনের শিক্ষণের প্রয়োজন আছে কি না এবং তা শিক্ষার্থীদের সমস্যার সমাধান করবে কিনা। তাহলে সেক্ষেত্রে নিরাময়কামী শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের সঙ্গে সহযোগিতা করবে। শিক্ষার্থীদের এই সহযোগিতা করার মানসিকতাকে নিশ্চিত করতে হবে নিরাময়কারী শিক্ষককে।

(২) **দক্ষ নিরাময়কারী পদ্ধতি ব্যবহার :** পাটীগণিতে অক্ষমতা নির্ণয়ের উদ্দেশ্য হল কার্যকরী এবং দক্ষ নিরাময়কারী নির্দেশনাকে নির্দেশ করা বা স্থির করা। সুতরাং নিরাময়কারী কর্মপ্রচেষ্টা নির্দিষ্ট এবং উদ্দেশ্যভিত্তিক হওয়া দরকার।

(৩) **সঠিক ও কার্যকরী পদ্ধতি এবং সামগ্রীর ব্যবহার :** পাটীগণিত অক্ষমতার বেশীরভাগ কারণ সমূহ অকার্যকরী প্রারম্ভিক শিখনের মধ্যেই খুঁজতে হবে। যখন পূর্ববর্তী ধাপগুলিতে শিক্ষার্থী পারদর্শী হয়ে ওঠে একমাত্র তখনই নতুন কোন পাটীগণিতের জ্ঞান দেওয়া যেতে পারে। সেজন্য একমাত্র কার্যকরী পদ্ধতি এবং সামগ্রী ব্যবহার করা উচিত। এই ব্যাপারে শিক্ষককে যথেষ্ট সচেতন ও সতর্ক থাকতে হবে।

(৪) **সম্পর্কযুক্ত উপাদানগুলিকে অনুসন্ধান এবং সংশোধন করা :** শিক্ষার্থীদের পাটীগণিতে অক্ষমতার পশ্চাতে শুধুমাত্র অকার্যকরী শিক্ষণপদ্ধতিই দায়ী নয়, এর পশ্চাতে দায়ী আছে বেশ কিছু অন্যান্য ব্যর্থতাও। সেগুলি হল প্রক্ষোভগত, শারীরিক এবং পরিবেশগত উপাদান। নিরাময়কারী শিক্ষককে সেই সমস্ত উপাদানগুলিকে সনাক্ত করা দরকার। এই সনাক্তকরণের পর শিক্ষক নিরাময়কারী শিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।

● নিরাময়কারী শিক্ষণ চলাকালীন শিক্ষক নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করে তাঁর কার্য সম্পাদন করতে পারেন—

(ক) শিক্ষার্থী যাতে তার সমস্যাকে উপলব্ধি করতে পারে তার জন্য তাতে উযুক্তভাবে শেখানো উচিত। এতে শিক্ষার্থী তার অযত্নের কারণে উদ্ভূত ভুলগুলিকে চিহ্নিত করতে পারবে।

(খ) সমস্যা সমাধান মূলত ভুল আছে কিনা তা ভেবে দেখতে হবে। শিক্ষককে শিক্ষার্থীর পাটীগণিত সংক্রান্ত পূর্বজ্ঞান, সমস্যা সমাধান পদ্ধতি সম্বন্ধে নিশ্চিত করে জানতে হবে।

(গ) ভুলের বিশ্লেষণ করে স্থির করতে হবে শিক্ষার্থীর গননা সংক্রান্ত কোনো সমস্যা আছে কিনা।

(খ) শিক্ষার্থী যাতে বিভিন্ন সমস্যাগুলি সম্পর্কে উপলব্ধি করতে পারে তারজন্য শিক্ষার্থীকে সহযোগিতা করা দরকার। শিক্ষার্থীর পারিবারিক ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা আছে কিনা তাও ভেবে দেখতে হবে।

(ঙ) শিক্ষার্থীকে তার সমস্যার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক দিকগুলি সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া উচিত।

(চ) দক্ষতার মৌলিক দিকগুলি যেমন—যোগ প্রক্রিয়া, গুণপ্রক্রিয়া ইত্যাদি উপযুক্ত স্তর অনুযায়ী ঘটনা সমূহ সম্পর্কে শিক্ষার্থীর মধ্যে কতকখানি বর্তমান সেই সম্পর্কে শিক্ষককে নিশ্চিতভাবে জানতে হবে।

(ছ) পাটীগণিতের বিভিন্ন কৌশলগুলি ব্যবহার করে শিক্ষার্থীকে পরিমাপ করতে হবে।

(জ) সুপরিকল্পিতভাবে গঠিত প্রোগ্রাম লার্নিং সামগ্রীগুলিকে এবং নিরাময়কারী কর্মপ্রক্রিয়াকে গড়ে তুলতে হবে।

(ঝ) দরকার হলে, সম্ভবমত কম্পিউটারের সহায়তা নেওয়া যেতে পারে।

❑ ১.৪.৫ শিক্ষণ কৌশলে নতুন প্রযুক্তি (New Technology in Teaching Stratigies) :

আজকের আধুনিক জীবনে প্রযুক্তিগত কৌশল বৃদ্ধি পেয়েছে দুর্বার গতিতে। সমগ্র বিশ্বজুড়ে আজ তার প্রভাব অনস্বীকার্য। প্রযুক্তির প্রভাব পড়েছে শিক্ষাক্ষেত্রে, এমনকি তার চাপ শেষপর্যন্ত এসে পড়েছে বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে অভ্যন্তরেও।

প্রযুক্তি তার প্রভাব ফেলেছে শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে। প্রযুক্তি বিপ্লবে পরিবর্তন ঘটে চলেছে শিক্ষার বিষয়বস্তু, শিক্ষার তত্ত্ব, শিক্ষা পদ্ধতি, শিক্ষা সহায়ক উপকরণ, মূল্যায়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে। শিক্ষার্থীদের আগ্রহ, মনোযোগ, প্রেষণা ইত্যাদি বৃদ্ধির লক্ষ্যে নানা কৌশল আবিষ্কৃত হয়েছে এবং হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রযুক্তির প্রয়োগ হচ্ছে ব্যাপকভাবে। বেশকিছু দিন পূর্বেই ভারতীয় শিক্ষাকমিশন (১৯৬৪-৬৬) তাঁদের প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছিলেন "The destiny of Indian is now being shaped in her classrooms. In a world based on science and technology, it is education that determines the level of prosperity, welfare and security of people..." [The Education Commission 1964-66)। **এরিক অ্যাসবি** (Ashby, E, 1967) শিক্ষার চারটি বিপ্লবের কথা বলতে গিয়ে চতুর্থ বিপ্লবকে উল্লেখ করেছেন 'ইলেকট্রনিক্সের বিপ্লব' বলে। এই

Scanned with CamScanner

প্রসঙ্গে তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন—"any technology which increases rate of learning would enable the teacher to teach less and the learner to pearn more." আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর পূর্বে অ্যাসবি যে কথা বলেছিলেন একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে আজ তা সত্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইলেকট্রনিক্স বলতে তিনি মূলত রেডিয়ো, টিভি, টেপরেকর্ডারকেই বুঝিয়েছেন।

শিক্ষাক্ষেত্রে প্রযুক্তিকে ব্যবহারের ইতিহাস খুব নতুন নয়। চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমে শিক্ষা দেওয়া হত মুখে, পরবর্তীকালে লেখার আবিষ্কারের ফলে শিক্ষক হাতে লেখা বিষয়বস্তু ব্যবহার করতেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে ছাপাখানা আবিষ্কার শিক্ষাক্ষেত্রে এক অভাবনীয় পরিবর্তন এনে দেয়। যদিও প্রথম দিকে বই ছাপানো হত মূলত ধর্ম অথবা ব্যাকরণ বিষয়ে। এরপর ষোড়শ শতাব্দীতে পিটার রেমাস উচ্চশিক্ষায় পাঠ্যপুস্তকের ব্যবহার করেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে শিক্ষণের ক্ষেত্রে আসে নতুন যুগ। জন কমেনিয়াস ১৬৫৭ খ্রিস্টাব্দে শিশুদের জন্য লেখেন 'Orbus Picture' নামে বইটি। শতাধিক বই লিখলেও কমেনিয়াসের সেই প্রচার ছিল না।

পরবর্তীকালে শিক্ষণে ধারণাটাকেই বদলে দেন রুশো, **হার্টার্টম্পন সাব, ফ্রয়েবেল, পেসতালৎসি** প্রমুখ শিক্ষাবিদগণ। আর এই সময়ের মধ্যে উন্নতি ঘটেছে ছাপাখানার কাজ, অগ্রগতি ঘটেছে মনোবিজ্ঞানে, পরিবর্তন ঘটেছে শিক্ষণ পদ্ধতিতেও। শিক্ষণ পদ্ধতিকে অনেকখানি বিজ্ঞানসম্মত করে তোলেন **জন ডিউই**।

বিংশ শতাব্দীতে প্রযুক্তিবিদ্যার অভূতপূর্ব অগ্রগতি শিক্ষায় যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় শিক্ষায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়। এক্ষেত্রে অগ্রবর্তী ভূমিকা পালন করেন **বিনেৎ**। ১৯২৫-এ **সিডনি, এল. প্রেসি** আমেরিকান সাইকোলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন-এর সভায় 'টিটিং মেশিনের' ব্যবহার প্রদর্শন করেন এবং শুরু হয় 'প্রোগ্রাম নির্দেশনার' সূত্রপাত। ১৯৩৮ এবং ১৯৪০-এ শিক্ষার দৃশ্য সহায়ক (Visual aid) ব্যবহার শুরু হয়। সেই সঙ্গে সূত্রপাত ঘটে দর্শন এবং শ্রবণ নির্ভর শিক্ষা সহায়ক উপকরণের প্রয়োগ। ১৯৫৪-তে **এডগার ডালে** তাঁর বিখ্যাত 'Cone of Experience' প্রকাশ করেন। প্রায় ওই একই সময়ে অপারেন্ট অনুবর্তন ব্যবহার করে 'টিটিং মেশিন' প্রস্তুত করেন **বি.এফ. স্কিনার**। এতে তিনি ফিডব্যাক পদ্ধতি ব্যবহার করেন। এর ঠিক কিছুদিন পূর্বে ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে **ক্রাউডার** আমেরিকার বিমান বাহিনীর জন্য শাখা পদ্ধতিতে প্রোগ্রাম নির্দেশনার নক্‌শা প্রস্তুত করেন।

শিক্ষার আর এক নতুন যুগের সূত্রপাত ঘটে বিগত শতাব্দীর সত্তর দশক থেকে। শিক্ষাক্ষেত্রে কম্পিউটার প্রযুক্তির দ্রুত উন্নতি তার ব্যবহার ক্ষেত্রকে দ্রুত হারে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। শিক্ষায় CAI (Computer Assisted Instruction), CMI (Computer Managed Instruction), CAL (Computer Assisted Learning)

ইত্যাদির ব্যবহার বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেতে থাকে। আধুনিক শিক্ষাক্ষেত্রে CAI, CMI, CAL ইত্যাদির ব্যবহার বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেতে থাকে। বর্তমানে দূরশিক্ষা প্রথাগত শিক্ষার সঙ্গে একসঙ্গে অগ্রসর হতে পারছে প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতির জন্যই। www নামান তথ্য সংগ্রহ প্রচার ইত্যাদিতে ইন্টারনেটের ব্যবহার আজ আর নতুন নয়। ভার্চুয়াল বিদ্যালয়, ভার্চুয়াল মহাবিদ্যালয়, ভার্চুয়াল বিশ্ববিদ্যালয় আজ বাস্তব। এমনকি ভার্চুয়াল পাঠাগার, ভার্চুয়াল গবেষণাগারের ব্যবহার আমাদের দেশে ব্যাপক না হলেও বহু দেশেই এটি শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বর্তমান সময়ে প্রযুক্তির ব্যবহার শিক্ষায় এবং শিক্ষণে যে সব গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটিয়েছে তাদের কয়েকটি হল—

(১) শিক্ষায় দূরদর্শনের ব্যবহার।

(২) C.C.T.V

(৩) প্রোগ্রাম নির্দেশনা।

(৪) টিমটিটিং।

(৫) ফ্লেক্সি লার্নিং।

(৬) ব্যক্তিভিত্তিক নির্দেশনা।

(৭) স্বাধীন শিখন।

(৮) ভাষা গবেষণাগার বা ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাবরেটরি।

(৯) মুক্ত শিক্ষা।

(১০) আচরণমূলক উদ্দেশ্যের ব্যবহার।

(১১) সাইবার নেটিকের বিভিন্ন ব্যবহার ইত্যাদি।

upload by dascoaching.in

আজেকর এই যুগ হল তথ্য বিপ্লবের যুগ। তথ্য সংগ্রহ, নির্বাচন এবং প্রসার শিক্ষণের একটি অন্যতম কাজ বলে আজ অনেকেই মনে করেন। এই তথ্য বিপ্লবের যুগে তথ্য যেমন প্রচুর, তেমন তথ্য আবার দ্রুত অপ্রয়োজনীয় হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং শিক্ষার একটি অন্যতম কাজ হল তথ্যকে সময়মতো ব্যবহার এবং সঠিক প্রয়োগ। এ ক্ষেত্রেও শিক্ষকের দায়িত্ব কিন্তু কম নয়। আজকের এই বর্তমান শতাব্দীতে শিক্ষকের দায়িত্ব অনেক বেশি। নতুন শিক্ষণ কৌশলে প্রযুক্তির সফল প্রয়োগ ঘটিয়ে শিক্ষা পদ্ধতিকে আরও অনেক বেশি গতিশীল করাও শিক্ষার একটি নতুন দায়িত্ব। নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার নিয়ে এবার কয়েকটি আলোচনা করার চেষ্টা করবো আমরা।

Scanned with CamScanner

❑ ১.৪.৫.১ শিক্ষণ কৌশলে প্রযুক্তি হিসেবে মাল্টিমিডিয়ার ভূমিকা (Role of Multimedia as Technology in Teaching Stratigies) :

ব্যক্তি এবং সমাজের মধ্যে ভাবনা-চিন্তা আদানপ্রদান ঘটাতে সাহায্য করে যোগাযোগ। এই যোগাযোগের মাধ্যমে সামাজিক ও মানসিক নানা ধরনের কাজ হয়ে থাকে। যোগাযোগের প্রধান কাজ হল তথ্য আদানপ্রদান, সামাজিকীকরণ, প্রেষণা সঞ্চার করা, শিক্ষা ও বিনোদন (Mac Bride, 1980)। যোগাযোগের বিভিন্ন মাধ্যমগুলির মধ্যে আছে—সংকেত এবং শব্দের ব্যবহার, ভাষা, ডাকবিভাগ, টেলিফোন, কম্পিউটার ইত্যাদি। মাধ্যম এবং যোগাযোগ এত সম্পর্কযুক্ত যে অনেক সময়ই একে আলাদা করা কঠিন হয়ে পড়ে।

(ক) শ্রেণিকক্ষে নির্দেশনার মাধ্যমের ব্যবহার (Use of Media in Classroom Instruction) :

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক নির্দেশনার স্তর এবং গুরুত্ব অনুসারে তিন ধরনের মাধ্যম ব্যবহার করেন। এই তিনটি স্তর হল—স্মৃতি স্তর, ধারণার স্তর ও চিন্তামূলক স্তর। শিক্ষায় ব্যবহৃত কয়েকটি সাধারণ মাধ্যম হল—শিক্ষণ প্রদীপন, চক-বোর্ড, চার্ট, ভিডিয়ো ইত্যাদি। এগুলি শিক্ষণে স্পষ্টতা, নির্ভুলতা সম্পন্ন করে শিখনকে সাহায্য করে। শিক্ষাক্ষেত্রে মাধ্যমকে উদ্দেশ্য, শিক্ষার পরিকাঠামো, খরচ ইত্যাদি অনুসারে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা হয়:

(১) **জ্ঞানেন্দ্রিয়কে উদ্দীপিত করার ক্ষেত্রে—**

(ক) শ্রবণ-মাধ্যম—বেতার, গ্রামোফোন, টেপরেকর্ডার ইত্যাদি।

(খ) দর্শন-মাধ্যম (মুদ্রিত)—পুস্তক, ম্যাগাজিন, সাহায্যকারী বইপত্র ইত্যাদি।

(গ) দর্শন-মাধ্যম (দ্বি-মাত্রিক এবং প্রক্ষেপণযোগ্য নয়)—বার্তা চিত্র, পোস্টার ইত্যাদি।

(ঘ) দর্শন-মাধ্যম (ত্রিমাত্রিক এবং প্রক্ষেপণযোগ্য নয়)—মডেল, গ্লোব, পুতুল ইত্যাদি।

(ঙ) দর্শন-মাধ্যম (স্থির এবং প্রক্ষেপণযোগ্য)—স্লাইড, ও.এইচ.পি ইত্যাদি)

(চ) দর্শন-মাধ্যম (গতিশীল এবং প্রক্ষেপণযোগ্য)—চলচ্চিত্র, দূরদর্শন, ক্লোজ সার্কিট টিভি, ভিডিয়ো ক্যাসেট ইত্যাদি।

(ছ) মাল্টিমিডিয়া—স্লাইড + টেপ, স্লাইড + টেপ + ওয়ার্কবুক, টিভি + ওয়ার্কবুক, কম্পিউটার ইত্যাদি।

(জ) নতুন মাধ্যম—ইন্টারনেট, টেলি কনফারেন্সিং ইত্যাদি।

(২) **শিক্ষার্থীর নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে—**

শিক্ষার্থী মাধ্যমকে কতখানি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে সেই অনুসারে বেশি নিয়ন্ত্রণ থেকে কম নিয়ন্ত্রণ অনুসারে সাজানো যায়।

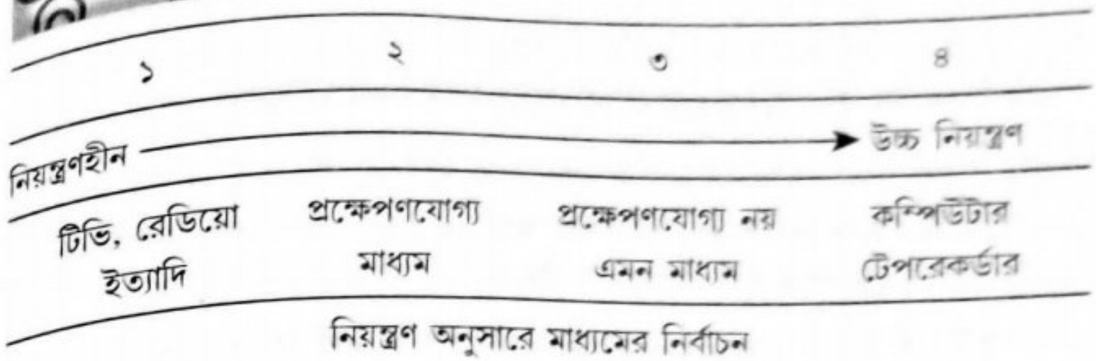

নিয়ন্ত্রণ অনুসারে মাধ্যমের নির্বাচন

(৩) **অভিজ্ঞতা অর্জন করানোর ক্ষেত্রে :** কী ধরনের অভিজ্ঞতা অর্জন করাতে হবে সেদিকে লক্ষ রেখেও মাধ্যম নির্বাচন করা হয়। এডগার ডালের 'কোন্ অব এক্সপিরিয়েন্স (Cone of Experience)-এ এইভাবে মাধ্যমকে সাজানো হয়।

(৪) **শিক্ষার্থীর দলগত বিন্যাস অনুসারে :** ব্যক্তিগত প্রশিক্ষণ, দলগত বা শ্রেণিগত প্রশিক্ষণ অনুসারেও মাধ্যম নির্বাচন করা হয়। ব্যক্তিগত প্রশিক্ষণের জন্য কম্পিউটার ব্যবহার করা হয়।

(খ) **মাধ্যম নির্বাচন ও ব্যবহার** (Proper selection of Media and its use) :

শিখনের মান যদি বেশি পেতে হয়, তাহলে শিক্ষার মাধ্যমকে যথোপযুক্ত ভাবে নির্বাচন এবং ব্যবহার করতে হবে। সুতরাং শিক্ষণের ক্ষেত্রে মাধ্যম নির্বাচন একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আবার মাধ্যম নির্বাচনও নির্ভর করে মাধ্যমকে কীভাবে ব্যবহার করা হবে তার উপর। নিম্নলিখিত কতকগুলি বিষয়-এর উপর মাধ্যমের ব্যবহার নির্ভর করে। বিষয়গুলি হল—

(১) নির্দেশনামূলক উদ্দেশ্য।

(২) বিষয়বস্তু।

(৩) শিক্ষার্থীর পূর্ব অভিজ্ঞতা।

(৪) শিক্ষকের শিক্ষণের ধরন ইত্যাদি।

সুতরাং মাধ্যম নির্বাচনের আগে শিক্ষককে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে চিন্তাভাবনা করতে হবে—

(১) কী শেখানো হবে?

(২) কীভাবে শেখানো হবে?

(৩) কাকে শেখানো হবে?

(৪) মূল্যায়নের পদ্ধতি কী হবে?

Scanned with CamScanner

(৫) শ্রেণিকক্ষের মাধ্যমটিকে কতটা ব্যবহার করা যাবে?

(৬) শিক্ষকের মাধ্যমটি ব্যবহারের অভিজ্ঞতা আছে কিনা? ইত্যাদি।

(গ) **শিক্ষাক্ষেত্রে বহুমাধ্যম** (Multimedia in Education) :

মাল্টিমিডিয়ার সঙ্গে আরও দুটি শব্দ ব্যবহার হতে দেখা যায়, যেগুলি হল— (i) হাইপার টেক্সট এবং (ii) হাইপার মিডিয়া।

(i) **হাইপার টেক্সট** (Hyper text) **এবং হাইপার মিডিয়া** (Hyper media)

থিওডোর নেলসন ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে হাইপার টেক্সট নিয়ে প্রথম আলোচনা করেন। বিংশ শতকের আশির দশকে ম্যাকিনটোস সফটওয়্যার 'হাইপার কার্ড' ব্যবহারের পর হাইপার টেক্সট শব্দ বহুল প্রচারিত হয়েছে। বর্তমানে মাল্টিমিডিয়া এবং হাইপার টেক্সট একত্রে ব্যবহার করা হয়। এর সাহায্যে কোনো ব্যক্তি বিভিন্ন সংযোগের মাধ্যমে একই বিষয়ের বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়। হাইপার টেকসট-এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে **টোলহার্স্ট** (Tolhurs-1995) বলেছেন : "...nonlinear organized and accessed series of text and static diagrams, pictures and tables." বর্তমান প্রযুক্তিবিদ্যার দ্রুত পরিবর্তনের ফলে শব্দ, রেখাঙ্কিত চিত্র, ছবি, ভিডিয়ো ইত্যাদি হাইপার টেক্সট-এ যুক্ত হয়েছে। একেই বলা হয় হাইপার মিডিয়া। হাইপার মিডিয়াকে টেকসট-এর আরো বিস্তারিত রূপ হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে।

বর্তমানে অনেক বিশেষজ্ঞ হাইপার টেকসট এবং হাইপার মিডিয়াকে যুক্তভাবে মাল্টিমিডিয়া বলতে আগ্রহী (**Kid** এবং তাঁর সহযোগী গবেষকবৃন্দ, ১৯৯২) আবার, অনেকে এই দুই-এর সমন্বয়কে 'ইন্টার অ্যাকটিভ মিডিয়া' বলার পক্ষপাতী (**গলব্রেথ** ১৯৯১, **স্ক্রোডার**, ১৯৯২)।

▲ **শিক্ষাক্ষেত্রে মাল্টিমিডিয়া বা বহুমাধ্যমের ব্যবহার** (Use of Multimedia in Education) :

আজকাল বিভিন্ন সফট্ওয়্যারের সাহায্যে মাল্টিমিডিয়া বা বহুমাধ্যমকে ব্যবহার করা হচ্ছে। সেই ধরনের কয়েকটি সফট্ওয়ার হল—অথর ওয়ার প্রফেশনাল, ডাইরেক্টর, স্টুডিয়ো ম্যাক্স, হাইপার কার্ড, অ্যাপল মিডিয়া টুলকিট ইত্যাদি। শ্রেণিশিক্ষণে মালিমিডিয়া বা বহুমাধ্যমের ব্যবহার মিথস্ক্রিয়াকে যেমন বৃদ্ধি করে তেমনি শিখনের হার বাড়াতে সাহায্য করে।

মাল্টিমিডিয়া বা বহুমাধ্যমকে কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে ভালোভাবে ব্যবহার করা যায়, তার একটি তালিকা প্রকাশ করা যেতে পারে:

(i) যে সমস্ত বস্তু দেখা বেশ কষ্টকর সেখানে মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করা যায়।

(ii) ত্রিমাত্রিক বস্তুকে যেহেতু বইতে ছাপানো যায় না, তাই সেক্ষেত্রে মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করা যায়।

(iii) বড়ো ধরনের বিষয়বস্তুকে মাল্টিমিডিয়ার সঙ্গে যুক্ত করা যায়।

(iv) যথেষ্ট ব্যয় সাপেক্ষ বা জটিল বিষয়ে যা প্রচলিত পদ্ধতিতে ব্যবহার করা সম্ভব হয় না, সেক্ষেত্রে মাল্টিমিডিয়ার ব্যবহার করা যায়।

▲ **শিক্ষাক্ষেত্রে বহুমাধ্যম বা মাল্টিমিডিয়ার প্রকৃতি** (Nature of Multimedia in Education) :

(i) বহুমাধ্যমে অনেকগুলি মাধ্যম, যান্ত্রিক ব্যবস্থা ও কৌশল শিক্ষণ-শিখনে ব্যবহৃত হয়।

(ii) বহুমাধ্যম কর্মপ্রক্রিয়ার উৎপত্তি মূলত শিক্ষাপ্রযুক্তি বিজ্ঞানের গবেষণা ও পরীক্ষণ কার্যের পরিপ্রেক্ষিতে, যার উদ্দেশ্য হল শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ায় উন্নতি ঘটানো।

(iii) বহুমাধ্যম-এর লক্ষ্য হল পূর্বনির্ধারিত উদ্দেশ্যগুলির অর্জন করার জন্য শিক্ষার্থীকে অর্থপূর্ণ শিখন অভিজ্ঞতা প্রদান। এজন্য অনেকগুলি মাধ্যমের সমন্বয়ে ব্যবহার করা হয়।

(iv) মাধ্যমগুলিকে এমনভাবে যত্ন সহকারে নির্বাচিত করা দরকার যাতে কোনো একটি মাধ্যম অন্য মাধ্যমের কার্যকারিতাকে বিঘ্নিত না করে, বরং প্রতিটি মাধ্যম অন্য মাধ্যমগুলির পরিপূরক হতে পারে।

(v) মাধ্যমগুলিকে তাদের ক্রম অনুসারে এবং যুক্তিপূর্ণভাবে ব্যবহার করার দরকার হয়। যখন যেটি দরকার তখন সেটিই একমাত্র ব্যবহার করা দরকার, তাহলে সামগ্রিকভাবে অল্প সময়ে মাধ্যমগুলিকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে ব্যবহার করা সম্ভব হয়।

(vi) বহুমাধ্যম কর্মপ্রক্রিয়ায় অনেকগুলি মাধ্যম ও কৌশলকে ব্যবহার করা হয় যোগাযোগের শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে।

▲ **বহুমাধ্যমকে কার্যকরী করে তোলার পদ্ধতি :**

শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ায় বহুমাধ্যম অনেকগুলি মাধ্যমকে নিয়ে গড়ে ওঠে। অনেকগুলি সম্ভাব্য মাধ্যমের যুক্তিপূর্ণ সম্মিলন বা মিশ্রণ-এর প্রয়োজন হয় এতে। **কোনো বহুমাধ্যম কর্ম প্রক্রিয়াকে কার্যকরী করে তুলতে নিম্নলিখিত ধাপ বা পর্যায়গুলি অনুসরণ করা হয়—**

প্রথম পর্যায় : প্রথম পর্যায়ে শিক্ষক শিক্ষণ-শিখন কার্যকে শুরু করেন। নির্ধারিত উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে পাঠদানের প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এই পর্যায়ে শিক্ষক অনেকগুলি মাধ্যম উপস্থাপনের জন্য ব্যবহার করতে পারেন।

দ্বিতীয় পর্যায় : এই পর্যায়ে শিক্ষক একটি নির্দিষ্ট এবং বিশেষভাবে প্রস্তুত মাধ্যমের মিশ্রণকে ব্যবহার করেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জন্য পরিকল্পিত শিখন সামগ্রী বা Programmed Learning Material Cassetes; CD ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারেন।

Scanned with CamScanner

তৃতীয় পর্যায় : এই পর্যায়ে শিক্ষার্থী স্বাধীনভাবে শিখন করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে। শিক্ষার্থীরা নিজেদের মধ্যে অথবা শিক্ষকের সঙ্গে তাঁর পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করে।

চতুর্থ পর্যায় : এই চতুর্থ পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। এক্ষেত্রে অনেকগুলি মাধ্যম এবং অন্যান্য সামগ্রীকে তাদের স্বশিখনে ব্যবহার করে।

পঞ্চম পর্যায় : পঞ্চম পর্যায়ে শিক্ষার্থী শিখন তত্ত্বের সঙ্গে অনুশীলন-এর সংহতি সাধন করে।

ষষ্ঠ পর্যায় : এই শেষ পর্যায়ে শিক্ষার্থী অনুসন্ধানের দ্বারা উপলব্ধি করে শিক্ষণ-শিখন কার্যাবলিকে উচ্চতর স্তরে সংগঠিত করতে হবে। সে সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ, মূল্যায়ন এবং মত বিনিময়ে নিজেকে অন্তর্ভুক্ত করে।

বহুমাধ্যম ব্যবহারে শিক্ষকের ভূমিকা (Role of Teacher in Use of Multimedia): শিক্ষক যদি বহুমাধ্যম-এর কর্ম প্রক্রিয়াকে কার্যকরী করে তুলতে চান তবে, তাঁকে বেশকিছু পরিবর্তন সাধন এবং সমঝোতা করতে হবে। চিরাচরিত ভূমিকার তুলনায় তাঁর ভূমিকায় থাকবে ভিন্ন তাৎপর্য। শিক্ষককে নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলি সম্পন্ন করতে হবে।

(১) শিক্ষককে অনেকগুলি পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বন করতে হবে, তিনি শুধু চক-কথা (chalk-talk) এর মধ্যে বক্তৃতা সীমাবদ্ধ রেখে সন্তুষ্ট থাকবেন না।

(২) বিভিন্ন মাধ্যমের সহজলভ্যতা সম্পর্কে শিক্ষককে ওয়াকিবহাল থাকতে হবে। শারীরিক এবং মানসিকভাবে বিভিন্ন মাধ্যমকে প্রদর্শন করতে দক্ষ হতে হবে।

(৩) মাধ্যমগুলির যুক্তিপূর্ণ নির্বাচন-এর ব্যাপারে শিক্ষককে যথেষ্ট দক্ষ হতে হবে। মাধ্যমগুলির মধ্যে সংহতি ঘটিয়ে পর্যায়ক্রমে সেগুলিকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে হবে।

(৪) শিক্ষকের ভূমিকা হবে একদিকে ভালো ব্যাবস্থাপকের, অন্যদিকে শিক্ষার্থীদের সহজ শিখনে সহায়তা করতে হবে। তাঁর একটি দায়িত্ব হল শিক্ষার্থীদের স্বাধীন ও ব্যক্তিগত শিখনে পরিচালিত করা।

(৫) শিক্ষক শিক্ষার্থীদের এমন অভিজ্ঞতা প্রদান করবেন যাতে তারা তত্ত্ব ও অনুশীলনের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের দ্বারা সংহতি স্থাপন করতে পারে।

❑ ১.৪.৫.২ শিক্ষণ কৌশলে প্রযুক্তি হিসেবে সি.ডি.রম (CD-Rom as Technology in Teaching Strategies) :

বহুমাধ্যম বা multimedia-এর ব্যবহারের ক্ষেত্রে CD-Rom-এর ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। CD-Rom বা কম্প্যাক্ট ডিস্ক 'রিড্ অন্‌লি মেমোরির' (Compact Disc Read Only Memory) যাত্রা শুরু গত শতাব্দীর নব্বই-এর দশকে।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে আশির দশক পর্যন্ত ভিনাইল গ্রামোফোন রেকর্ড ব্যবহার হত। ১৯৫০-এ CD প্রযুক্তি কৌশল উদ্ভাবিত হওয়ার পরে ১৯৫২-তে LP রেকর্ড ব্যবহার প্রায় অর্ধেক কমে গেছে। ১৯৯২-এর হিসেবে ভিনাইল ডিস্কের ব্যবহার খুবই কম।

একটি সাধারণ CD-Rom ডিস্ক বর্তমানে ৭০০ মেগাবাইট তথ্য সঞ্চয় করতে সক্ষম। এই তথ্য পাঠ্যবিষয়, রেখাচিত্র, শব্দ, চলচ্চিত্র, ভিডিয়ো ইত্যাদি হতে পারে। কম্প্যাক্ট ডিস্কে শুধুমাত্র তথ্যকে পেতে পারে। কিন্তু প্রচুর পরিমাণ তথ্য সঞ্চয় করে রাখার জন্য ডিক্শনারি, এন-সাইক্লোপিডিয়া এবং যে-কোনো পাঠ্যবিষয়বস্তুকে সঞ্চয় করে রাখা সম্ভব। এতে স্থান খুব কম লাগে।

আর একটি বড়ো সুবিধা CD-Rom-এ পাওয়া যায়, যেটি হল এতে তথ্য, শব্দ, চিত্র, সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় রাখা সম্ভব। এতে কম ক্ষমতার লেসার ব্যবহার করে তথ্যাবলিকে পুনরুদ্ধার করা সম্ভব। এতে তথ্যের বিকৃতি ঘটতে পারে না। তথ্যকে সংখ্যা (digit) দিয়ে সঞ্চয় করা হয় বলে তথ্যের যে-কোনো অংশকে পুনরুদ্ধার করা অনেক খানি সহজ। এর ফলে যে সব তথ্য পরিবর্তন করার দরকার হয় তা মুদ্রণ আকারে না রেখে CD-তে রাখা অনেক বেশি সহজ এবং কম ব্যয় সাপেক্ষ। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায় টাইম টেবিল, টেলিফোনের ডাইরেক্টরি এবং সফটওয়ার প্যাকেজ ইত্যাদি CD-Rom-এ সংগ্রহ করে রাখা হয়। বর্তমানে CD-Rom প্রযুক্তির প্রভূত উন্নতি ঘটেছে, ফলে ৭০০ মেগাবাইট তথ্য একবার সঞ্চয় করে রাখতে পারলে বহুবার বহুলোকের তা ব্যবহার করার সুযোগ থাকে। অন্য CD-Rom-এ তথ্য সঞ্চালিত করাও অনেক সহজ হয়। মাল্টিমিডিয়ার এই পদ্ধতিকে অনেক প্রতিষ্ঠান WORM (Write Once, Read Many) নামও দিয়ে থাকেন।

শিক্ষাক্ষেত্রে CD প্রযুক্তি সর্বপ্রথম হয় ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে। এর সফল প্রয়োগের পর ব্রিটেন ১৯৯২-তে Interactive Media System-এ প্রযুক্তি প্রচলন করে।

আজকের দিনে কম্পিউটার প্রযুক্তির ক্রমাগত উন্নতির ফলে বিভিন্ন সফট্ওয়ার-এর ব্যবহার CD Rom-এর মাধ্যমে করা হয়। বিজ্ঞানীদের অনুমান যে, নতুন প্রজন্মের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে এই মাধ্যমই উল্লেখযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এছাড়াও, এই প্রযুক্তির দাম ক্রমাগত কমার ফলে আজকের দিনের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, বিনোদন, তথ্য সরবরাহ ইত্যাদিতে স্থান করে নিয়েছে।

CD-I (Compact Disc-Interactive) প্রযুক্তির উন্নতির ফলে কোনো বিষয়বস্তুকে বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করে উন্নতমানের প্রশিক্ষণ দেওয়া সম্ভব। এছাড়া এই ধরনের প্রযুক্তির আর একটি বড়ো সুবিধা হল যে, এটি সহজে বহনযোগ্য এবং সহজে তা নষ্টও হয় না। যেখানেই এগুলি ব্যবহার করার ন্যূনতম সুবিধা আছে সেখানেই তা ব্যবহার করা চলতে পারে।

Scanned with CamScanner

❑ ১.৪.৫.৩ শিক্ষণ-কৌশলে প্রযুক্তি হিসেবে ওয়েব ভিত্তিক নির্দেশনা (Web-based Instructions as Tecechnology in Teaching Stratigies) :

ওয়েব ভিত্তিক নির্দেশনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধ যুক্ত হল ইন্টারনেট। স্বাভাবিকভাবেই ওয়েবভিত্তিক নির্দেশনাকে সঠিকভাবে বোঝার জন্য প্রথমে ইন্টারনেট সম্বন্ধে আমরা জেনে নেব।

(ক) **ইন্টারনেট** (Internet) :

'ইন্টারনেট' কথাটি একটি সংক্ষিপ্ত রূপ। Inter-network System-এর সংক্ষিপ্ত রূপ হিসেবে 'ইন্টারনেট' কথাটি ব্যবহৃত হয়। ইন্টারনেট হল কম্পিউটার এবং অন্যান্য নতুন মাধ্যম গ্রাহক ও প্রেরক যন্ত্রসমূহের একটি বিশ্বব্যাপী জালিকা। সাধারণ জ্ঞানের দ্বারা ইন্টারনেটকে সংজ্ঞায়িত করা হয় এইভাবে—"a global pool of information and services, accessible by means of locally executed interface software." যখন দুই বা তার বেশি কম্পিউটার অথবা অন্য যান্ত্রিক ব্যবস্থা একসঙ্গে এমনভাবে সংযুক্ত করা হয় যে তারা একে অপরকে যোগাযোগের দ্বারা তথ্য প্রদানের জন্য একটি জালকতন্ত্র গড়ে তুলে। এই জালক তন্ত্রে দুটি কাজ হয় তথ্যবহন এবং তথ্যবহন-এর জন্য পথ প্রস্তুত। ইন্টারনেট নতুন মধ্যমের জ্ঞাপন বা যোগাযোগ পদ্ধতিতে তথ্যবহন পথের কাজ করে আর অন্য দিকে ওয়েব সেই পথকে ব্যবহার করে তথ্যবহনের কাজ করে। সুতরাং ইন্টারনেটের সঙ্গে সঙ্গে ওয়েব বিষয়টিও প্রাসঙ্গিক।

প্রকৃতপক্ষে তথ্যবহনকারী বাহনের অংশগুলি হল বিভিন্ন ওয়েবসাইট। বিশেষ বিশেষ কম্পিউটার কার্যক্রম ব্যবহার করে ওয়েবসাইটগুলি তৈরি করা হয়। সাইটগুলি রক্ষিত হয় ওয়েব সার্ভার নামে কম্পিউটারে। প্রতিটি সাইটে থাকে ওয়েব পৃষ্ঠা এবং তার ভিন্ন ভিন্ন তথ্যপঞ্জী। ওয়েবসাইট এবং তার পৃষ্ঠাগুলি দেখার জন্য দরকার হয় ওয়েব ব্রাউজার ধরনের সফ্টওয়্যারের। সুতরাং ইন্টারনেট হল কম্পিউটার এবং অন্যান্য নতুন মাধ্যমের গ্রাহক ও প্রেরক যন্ত্রসমূহের এক বিশাল এবং বিশ্বব্যাপী জালিকা।

(খ) **বিশ্বব্যাপী জালিকা** (World Wide Web সংক্ষেপে www) : www বা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব-এর ধারণার জনক হলেন **টিম বারনার্স লি** নামে সুইজারল্যান্ডের একজন পদার্থবিজ্ঞানী। ১৯৮৯ সালে এই ধারণাটির জন্ম হয়। এই প্রযুক্তি বর্তমানে www নামেই পরিচিত। হাইপার টেক্সট্ এবং হাইপার মিডিয়ার সাহায্যে www কার্যকরী হয়। Web brouser হল একটি সফ্টওয়ার যার সাহায্যে ওয়েব ব্যবহার করা যায়। ১৯৯৪-এর জুলাইতে একটি সংগঠন তৈরি হয়, এটির নাম হয় World Wide Web Consortium (সংক্ষেপে WBC)। এর কাজ হল ভবিষ্যতে web-এর গুণগত মান এবং বৃদ্ধিকে পরিচালিত করা।

বর্তমানে নানা ধরনের ওয়েব ব্রাউজার পাওয়া যায় যেমন—Microsoft Internet Explore, Navigator, Mosaic ইত্যাদি। এগুলির দ্বারা ইন্টারনেটের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ, শব্দ, বর্ণ ইত্যাদি সহ বিভিন্ন বিষয়কে অবিকৃতভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হয়।

(গ) **WWW-এর শিক্ষামূলক সম্ভাবনা** (Educational Potentials of www) : বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে ওয়েবের ব্যবহার ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। যেখানে গবেষণার বিষয় আছে সেখানেই এই ওয়েবের মাধ্যমে তথ্যের আদানপ্রদান, নতুন তথ্য সংগ্রহ ইত্যাদি হচ্ছে। সুতরাং শিক্ষাক্ষেত্রে web-এর ব্যবহার যে ক্রমেই জনপ্রিয় এবং গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। দূরশিক্ষা (Distance Education) এবং মুক্ত শিক্ষার (Open Education)-এর ক্ষেত্রে web-এর ব্যবহারের ফলে গুণগত এবং পরিমাণগত উৎকর্ষ বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। যদিও web-এর ব্যবহার শিক্ষাক্ষেত্রে এখনও পর্যাপ্ত নয়, তথাপি এই প্রযুক্তি ব্যবহারের সব থেকে বড় সুবিধা হচ্ছে এই যে, কম্পিউটার, নেটওয়ার্ক বা প্রোগ্রামিং না জেনেও যে কেউ web ব্যবহার করতে পারে।

www-এর কতকগুলি বিশেষ গুণ রয়েছে সেগুলি হল—

- মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ।
- হাইপার টেক্সট্ এবং হাইপার মিডিয়ার ব্যবহার ক্ষমতা।
- www-এর নেটওয়ার্কের সাহায্যে দূর শিক্ষার ব্যবহার ইত্যাদি।

ওয়েবের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে আর একটি অতিরিক্ত এবং মজার ঘটনা হল আকস্মিক শিখন বা 'accidental learning'। হয়তো কেউ নির্দিষ্ট কোনো কাঙ্ক্ষিত তথ্যের জন্য অনুসন্ধান শুরু করলেন কিন্তু তিনি হয়তো এমন কোনো নতুন তথ্য পেলেন যাতে সেই দিকেই মনোনিবেশ করে ফেললেন, এতে তার পূর্ব কাঙ্ক্ষিত তথ্য পেছনে পড়ে থাকলেও অন্য একটি নতুন শিখন সম্ভব হল, যা তার প্রত্যাশার মধ্যে ছিলই না। এই ধরনের শিখনকে বলা হয় আকস্মিক শিখন বা 'accidental learning'। অবশ্য সংগঠিত শিক্ষণ www-এর মাধ্যমে দু'ভাবে হতে পারে।

(১) এই প্রযুক্তিকে নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুতে সীমাবদ্ধ রাখা। হাইপার মিডিয়া এবং দূরবর্তী শিক্ষার কাজে ওই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা হয়।

(২) এই প্রযুক্তিকে শিক্ষণের নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ না রেখে মুক্ত রাখা। পূর্বে এইভাবে তথ্যকে কাজে লাগানোর পদ্ধতি ছিল না।

শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ গঠনে web-এর মাধ্যমে শিক্ষা যথেষ্ট কার্যকরী। web-এর সাহায্যে শিক্ষার নকশাও প্রস্তুত করা যায়। শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয়েই আরও যে সব ক্ষেত্রের তথ্য, বিষয়বস্তু ইত্যাদি সম্বন্ধে জানতে পারে তা হল—

(১) ভার্চুয়াল শ্রেণিকক্ষে পঠনপাঠন, বিভিন্ন কোর্স ইত্যাদি।

Scanned with CamScanner

(২) যাদুঘরের বিষয় সমূহ (যদি—কর্তৃপক্ষ তা web-এ প্রকাশ করেন)

(৩) ডিজিট্যাল পাঠাগারের মাধ্যমে বিভিন্ন বই, ছবি, গান, রচনা ইত্যাদি।

(৪) বিভিন্ন সভা এবং কনফারেন্স (যা হয়েছে তা বিবরণ এবং যা হবে তার সূচি) ইত্যাদি।

নেটওয়ার্কে ওয়েবের মাধ্যমে বিভিন্ন শিক্ষামূলক বিষয়, বিভিন্ন জটিল বিষয়ের সমাধান বা সমাধানের ইঙ্গিত, গবেষণাগারের বিভিন্ন কাজকর্ম ওয়েবের মাধ্যমে পাওয়া যায়। নিউইয়র্কের The Cornell Theory Centre (CTC) একটি ভার্চুয়াল স্কুল। এটি শুরু হয়েছে ১৯৯৫ থেকে। এই স্কুলটি এই বিষয়ে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে।

কম্পিউটার প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন হার্ডওয়ার এবং সফটওয়্যার প্রস্তুত করা হচ্ছে। এগুলিকে কাজে লাগিয়ে web-এর ব্যবহার ক্রমাগত আরও প্রসারিত হচ্ছে।

❑ ১.৪.৫.৪ শিক্ষণ কৌশলে প্রযুক্তি হিসেবে ইনটেলিজেন্ট টিউটরিং পদ্ধতি (Intelligent Tutoring System as Technology in Teaching Strategies) :

ইনটেলিজেন্ট টিউটরিং পদ্ধতির সঙ্গে কৃত্রিম বুদ্ধির বিশেষ ভাবে সম্পর্কিত। তাই ইনটেলিজেন্ট টিউটরিং পদ্ধতি আলোচনা করার পূর্বে কৃত্রিম বুদ্ধি সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করা যাক। একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে কৃত্রিম বুদ্ধির বিষয়টি বোঝানো যেতে পারে। ধরা যাক, কোনো একজন ব্যক্তি কোনো একটি কারখানার পরিচালক। সুতরাং তার দায়িত্ব হল কারখানায় সর্বোচ্চ উৎপাদন হচ্ছে কিনা, কোনো অপচয় হচ্ছে কিনা, সমস্ত বিভাগ ঠিক মতো কাজ করছে কিনা, ভবিষ্যতে যন্ত্রপাতির কোনো পরিবর্তন করতে হবে কিনা সেই সমস্ত দেখা। তাছাড়া উৎপাদিত সামগ্রীর বিক্রির জন্য বাজার খোঁজা, উৎপাদিত পন্যের গুণমান বজায় রাখা ও পরিচালকের খোঁজখবর রাখার দায়িত্ব। তাঁকে এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের অভিজ্ঞতাকে লিপিবদ্ধ করে রাখতে হলে এবং কম্পিউটারের প্রোগ্রামারকে দিয়ে সমস্ত প্রোগ্রাম করিয়ে কম্পিউটারের মস্তিষ্কে রাখার কাজ করতে হলে ভবিষ্যতে ব্যবহার করার জন্য। এবার তাঁর কম্পিউটার কিন্তু তাঁর কারখানায় অনেক বিশেষজ্ঞের কাজ এবার নিজেই করবে, তবে তা প্রোগ্রামের মাধ্যমে। এক্ষেত্রে কম্পিউটার প্রোগ্রাম অনুসারে বুদ্ধিমান মানুষের মতোই বিশেষজ্ঞের কাজ করবে। এক্ষেত্রে কম্পিউটার-এর কৃত্রিম বুদ্ধি (Artificial Intelligence) আছে বলা হবে। এই ধরনের বুদ্ধিকে কৃত্রিম বুদ্ধি বলার কারণ হল কম্পিউটার বুদ্ধির কাজ করছে কিন্তু তা প্রোগ্রামের সাহায্যে মাত্র। প্রোগ্রাম যেমন যেভাবে করা তার বেশি কিন্তু করতে পারবে না। আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল কম্পিউটার মানুষের থেকে অনেক দ্রুতগতিতে কাজ সম্পন্ন করবে। এবার কৃত্রিম বুদ্ধির একটি সংজ্ঞা দেওয়া যেতে পারে। সংজ্ঞাটি দিয়েছেন তথ্য প্রযুক্তিবিজ্ঞানী **পিটার জোরকোকজি**।

> "The formalization of procedures in a computer programme to carry out tasks which, if they were done by human, would be regarded as intelligent." (Zorkoczy, p. 1990)

ইন্টেলিজেন্ট টিউটরিং পদ্ধতির ব্যবহারের একটি উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে বিষয়টি বোঝাবার জন্য। নিউইয়র্ক টাইমস্ (16 সেপ্টেম্বর, 2004) একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছে। প্রবন্ধটি মোটামুটি এইরকম—**রোচিলি** অষ্টম শ্রেণির একটি মেয়ে। যে তার কম্পিউটারে গণিতের একটি প্রশ্নের উত্তরে ভুল উত্তর (২.৪) দিয়েছে। কম্পিউটার তাকে প্রশ্নের উত্তরের ইঙ্গিত জানালো: "তোমার উত্তরের চিহ্ন সম্বন্ধে ভাব।"

শেষপর্যন্ত রোচিলি সঠিক উত্তর (–1.8) লেখার পর কম্পিউটার তাকে ধন্যবাদ সূচক প্রতিক্রিয়া জানিয়ে নতুন বিষয় শুরু করল। এই সফটওয়ার-এর প্রস্তুতকারক '**কর্নেগি লার্নিং**'। সফটওয়ারটিকে ব্যবহার করছে 'কর্নেগি মেলন বিশ্ববিদ্যালয়'। এটি তৈরি হয়েছে ব্যক্তিগত প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য। এটি একটি ইন্টেলিজেন্ট টিউটোরিং পদ্ধতি। রোচিলি যখন ক্রমাগত চিহ্ন দিতে ভুল করছে তখন প্রোগ্রাম তাকে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর চেয়ে সঠিক পথে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। কৃত্রিম বুদ্ধির (Artificial Intelligence) প্রোগ্রামের জন্যই এই কর্মটি সম্ভব হয়েছে। আবার এই প্রোগ্রামে যে শুধুমাত্র অনুশীলনই আছে তাই নয়, প্রত্যেক ধাপে কোথায় ভুল হচ্ছে তাও জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে। শিক্ষার্থী এক বার টিখ করতে পারলে তাকে প্রশংসা করা এবং একই ধরনের আরও কাজ দেওয়া হচ্ছে যাতে ভুলের পরিমাণ একেবারেই না থাকে অথবা ভুলের পরিমাণ খুব কম হয়। যখন শিক্ষক অনুপস্থিত থাকেন অথবা শ্রেণি শিক্ষণে শিক্ষক ব্যক্তিগত মনোযোগ দিতে পারে না তখন সেখানে এই ধরনের ইনটেলিজেন্ট পদ্ধতি খুবই কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে। এবার আসা যাক্ ইনটেলিজেন্ট টিউটরিং পদ্ধতি কাকে বলে সেই প্রশ্নে—

(ক) ইনটেলিজেন্ট টিউটোরিং পদ্ধতি বলতে কী বোঝায়?

উত্তরে বলা যায় ইনটেলিজেন্ট টিউটোরিং পদ্ধতি হল কৃত্রিম বুদ্ধি যুক্ত এমন একটি শিক্ষামূলক সফটওয়ার যা শিক্ষার্থীর কাজের প্রতি নজর রাখে, প্রয়োজন মতো ফিডব্যাক দেয় এবং দরকার মতো উত্তরের ইঙ্গিতও দিয়ে থাকে। শিক্ষার্থীর কাজের ধারা বিশ্লেষণ করে তার ঐ বিষয়ে ভালো দিক এবং দুর্বলতা জানিয়ে দেয় এবং কী কী করলে ওই দুর্বলতা দূর করা সম্ভব হবে তার জন্য প্রয়োজনীয় অনুশীলনী দেয়।

এখানেই কৃত্রিম বুদ্ধি (Artificial Intelligence) ইন্টেলিজেন্ট টিউটর (Intelligent tutor)-এর ভূমিকা পালন করে। এখানে এই 'Intelligent tutor' একজন গৃহশিক্ষকের কাজ করে। এই গৃহশিক্ষক শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদানের ব্যাপারে ব্যক্তিগত যত্ন নেয়; তার ত্রুটি-বিচ্যুতি, দুর্বলতা দেখিয়ে তাকে নির্দেশনা দেয়, শিক্ষার্থীর ভালো দিকগুলি সম্বন্ধে

Scanned with CamScanner

প্রশংসা করে এবং অনুশীলন করায় যাতে শিক্ষার্থীর ভুলের শতকরা হার অনেকখানি কমে যায়।

একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল যে, এই ইনটেলিজেন্ট টিউটরিং পদ্ধতি কম্পিউটারের সাহায্যে নির্দেশনার (CAI) থেকেও অনেক বেশি শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক। সুতরাং শিক্ষক না থেকেও শিক্ষার্থী এক্ষেত্রে সবসময় শিক্ষকের সান্নিধ্য পায়। নীচের চিত্রে ইন্টেলিজেন্ট টিউটোরিং পদ্ধতির কাঠামো দেখানো হয়েছে।

ইন্টেলিজেন্ট টিউটোরিং পদ্ধতির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে **জিম অং** এবং তাঁর সহযোগী গবেষক বলেছেন—

> "Imagine that each learner in a classroom setting has a personal training assistant who pays attention to the partcipent's learning needs, assesses and diagnoses problems and provided assitance as needed... providing a personal training assistant for each learner is beyond the training budgets of most organizations. However a virtual training assistant that captures the subject matter and teaching experience of experienced trainers provides a captivating new option. The concept known as intelligent tutoring system or intelligent computer-aided instruction" (ong, J and Ramachandran, S, 2000)

(খ) **ইনটেলিজেন্ট টিউটরিং পদ্ধতির উপাদান** (Components of intelligent tutoring system) :

Burns এবং **Capps** (১৯৮৮) ইন্টেলিজেন্ট টিউটরিং পদ্ধতির তিনটি উপাদানের কথা বলেছেন। সেগুলি হল—

(i) **বিশেষজ্ঞের অংশ** (Expert module) : এই অংশের বিভিন্ন ভাগে অন্তর্ভুক্ত থাকে বিভিন্ন স্তরের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞানের বিষয়গুলি, বিশেষজ্ঞের জ্ঞান এবং সমস্যা সমাধানের বৈশিষ্ট্য।

(ii) **শিক্ষার্থীর অংশ** (Student module) : এই অংশটি বেশির ভাগ সময় শিক্ষার্থীর মডেল হিসেবেও পরিচিত। এই অংশে অন্তর্ভুক্ত থাকে শিক্ষার্থীর বোধ (understanding) বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাসমূহ।

(iii) **শিক্ষণের অংশ** (Tutoring module) : এই অংশটিতে প্রধানত শিক্ষণের কৌশল এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনাসমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকে। কৌশল হিসেবে কখনই এই অংশে প্রকৃত শিক্ষককে রাখা হয় না। এই অংশটির মূল উদ্দেশ্যই হল বিশেষজ্ঞ এবং শিক্ষার্থীর মধ্যে জ্ঞানের পার্থক্যকে ধীরে ধীরে যতখানি সম্ভব কমিয়ে আনা।

ইন্টেলিজেন্ট টিউটরিং পদ্ধতির এই তিনটি উপাদান একত্রে 'প্রচলিত ত্রয়ী' বা 'সনাতন ত্রয়ী' (Traditional Trinity) নামে অভিহিত।

(গ) **ইনটেলিজেন্ট টিউটরিং পদ্ধতির প্রয়োগ** (Application of intelligent tutoring system) :

বর্তমানে এই ইন্টেলিজেন্ট টিউটরিং পদ্ধতি নানা বিষয়ে শিক্ষণ, নির্দেশনা এবং প্রশিক্ষণ দেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হচ্ছে। ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশেও এই পদ্ধতিটির সম্প্রতি ব্যবহার শুরু হয়েছে। নিম্নে কয়েকটি ইনটেলিজেন্ট টিউটরিং পদ্ধতির ব্যবহার সংক্ষেপে উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা হল—

(i) **The Love Machine :** David Diamond ২০০৩ সালে এটি তৈরি করেছেন। আমেরিকার MIT এটিকে আরও উন্নত করার চেষ্টা করছেন।

(ii) **Pitch-perfect PC :** Alex Markels ২০০৩ সালে এটি সঙ্গীত শিক্ষার্থীদের জন্য তৈরি করেছেন।

(iii) **Auto Tutor :** এই সফটওয়ারটি প্রকৃত শিক্ষকের মতো কথা বলে, দীর্ঘ বক্তৃতা দেওয়া ইত্যাদি করতে সক্ষম এমনকি শিক্ষার্থীদের সঙ্গেও কথাবার্তা বলতে পারে।

(iv) **Andes :** এটি হল পদার্থবিদ্যা বিষয়ের জন্য ইনটেলিজেন্ট টিউটরিং পদ্ধতি।

(v) **Epsilon :** হিসাব শাস্ত্রে ব্যবহার করার জন্য এটি উদ্ভাবিত।

(vi) **Metutor :** US Naval Postgraduate School-এর N.C. Rowe এটি তৈরি করেছেন। এতে পদ্ধতিগত দক্ষতা শেখানোর ব্যবস্থা আছে।

সবশেষে বলা যায়, কৃত্রিম বুদ্ধির উপর নানা ধরনের গবেষণা এবং কম্পিউটারের ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে নানা ধরনের ইনটেলিজেন্ট টিউটরিং পদ্ধতির প্রস্তুতি এবং ব্যবহার ক্রমাগত বাড়ছে. দূরশিক্ষা ব্যবস্থায় এই পদ্ধতি বর্তমানে ব্যাপকভাবে কাজে লাগানো হচ্ছে। এই ইনটেলিজেন্ট টিউটরিং পদ্ধতির কাজ প্রায় শিক্ষকের মতোই। আবার অনেক ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি ব্যক্তিগত নির্দেশনা এবং যত্ন নেওয়ার ফলে শিখন ভালো হয়। বিভিন্ন গবেষণায় এই তথ্যের সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে।

✪ ১.৫ শিক্ষাবিজ্ঞান শিক্ষণের মাধ্যমে জাতীয় সংহতির ধারণাকে বদ্ধমূলকরণ (In Culcation of National Integraty Through Teaching Education) :

❑ ১.৫.১ জাতীয় সংহতির অর্থ (Meaning of National Integration) :

ঐতিহাসিক **ভিনসেন্ট স্মিথ** ভারতীয় সমাজ-সংস্কৃতির স্বরূপ উন্মোচন ও তার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের' ধারণাকে ভারতীয় সংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির যাঁরা সমর্থক তাঁরা ভারতীয় ঐতিহ্যকে সহনশীল বলে

Scanned with CamScanner

আখ্যায়িত করেছেন। অধ্যাপক তপন রায়চৌধুরী মতানুসারে এই ধরনের আদর্শগত ধারণাকে অবলম্বন করেই জাতীয়তাবাদী ভারতবাসী নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে ভারতবর্ষকে নবরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেছে। জাতীয় সংহতি এমন একটি বিষয় যা জাতীয় জীবনের সর্বদিককে স্পর্শ করে যায়। এটি হল একটি 'feeling of oneness' অথবা আমরা বোধ অর্থাৎ 'We feeling' মনোভাব। এটি হল এমন একটি উপলব্ধি যা জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধকে জাগ্রত করতে সহায়তা করে। এই আবেগমূলক ভাবগত আদর্শটি দেশের প্রতি শ্রদ্ধা ও আনুগত্যকে সুসংহত করে। একটি ভৌগোলিক পরিসীমায় বসবাসকারী মানবগোষ্ঠী তাদের ব্যক্তিস্বার্থকে তুচ্ছ করে ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, ভাষাগত দিক থেকে ভিন্নতা সত্ত্বেও একাত্মতা ও আত্মীয়তা অনুভব করে সমষ্টিগত স্বার্থকে তুলে ধরতে সার্বিক কল্যাণের পথে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করে। সুতরাং জাতীয় সংহতি হল এমন একটি ভাবনা যা ভৌগোলিক সীমা ও গোষ্ঠীগত সংস্কৃতিকে অতিক্রম করে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রয়াসকে জাগ্রত করে। ঐক্যবদ্ধ হওয়ার এই প্রয়াস দেখা যায় সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ভাষাগত এবং সংস্কৃতির অন্যান্য দিকগুলিতে।

❑ ১.৫.২ জাতীয় সংহতির সংজ্ঞা ও প্রকৃতি (Definition and Nature of National Integration) :

জাতীয় সংহতির ধারণাটিকে আরও একটু স্পষ্ট করে তোলার জন্য আমরা কতকগুলি সংজ্ঞা উল্লেখ করতে পারি। যেমন—**ব্রুবাচের** (Brubacher)-এর মতে, "Nationalism ordinarily indicates a wider scope of loyality than patriotism. In addition to ties of lace, nationalism is evidenced by such other factors as race, language, history, culture and traditions."

ডরোথি থম্পসন (Dorothy Thompson)-এর মতানুসারে, "জাতীয় সংহতি হল একটি অনুভূতি, যা একটি দেশের জনসাধারণ বা নাগরিকদের একত্রে বেঁধে রাখে।"

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু (Pandit Jawaharlal Nehru)-এর মতে, "জাতীয় সংহতির দ্বারা আমরা আমাদের মন এবং হৃদয়ের সংহতি বুঝি যা পৃথক করণের অনুভূতিকে ভুলিয়ে রাখে।"

হুমায়ূন কবীর বলেছেন, "Nationalism is that which depends on we feeling towards the nation."

শিক্ষাবিজ্ঞান (১৯৬৪-৬৬)-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে—"National Integration includes a confidence in Nation's future, a continuous rise in the standard of living, development of feeling of values and duties, a good and imperial administrative system and mutual under standing."

উপরে প্রদত্ত সংজ্ঞাগুলির মূল বক্তব্যকে অনুসরণ করে আমরা জাতীয় সংহতিকে এইভাবে সংজ্ঞায়িত করতে পারি যে, জাতীয় সংহতি হল এমন একটি মানসিক অনুভূতি যা বিভিন্ন সংস্কৃতি সম্পন্ন মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে তোলে এবং তাদের চিন্তাভাবনা ও কাজকর্মে একত্ব এ জাতীয় প্রগতির জন্য প্রস্তুত হতে সাহায্য করে।

জাতীয় সংহতির মূল বক্তব্যকে অনুসরণ করে তার প্রকৃতি নির্ধারণ করতে গিয়ে আমরা বলতে পারি, জাতীয় সংহতি হল—

(১) দেশের নাগরিকদের মননে ভ্রাতৃত্ববোধের অনুভূতি।
(২) জীবনের বিভিন্ন দিকে ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতি সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও একত্বের অনুভূতি।
(৩) সংস্কৃতির অনুভূতি।
(৪) চিন্তা ও কর্মে ঐক্যের অনুভূতি।
(৫) সংহতির অনুভূতি।
(৬) দেশের প্রতি আনুগত্যের অনুভূতি।
(৭) দেশপ্রেমের অনুভূতি।
(৮) রাষ্ট্রীয় একতার অনুভূতি।
(৯) অন্যের ভাবনা ও বিশ্বাসের প্রতি সহনশীলতার অনুভূতি।
(১০) 'আমি' থেকে 'আমরা'-এর অনুভূতি।

Download From>>
www.ebook.dascoaching.in

❑ ১.৪.৩ জাতীয় সংহতির উপাদান (Components of National Integration) :

আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি জাতীয় সংহতি হল এক বিশেষ ধরনের মানসিক অনুভূতি। প্রক্ষোভমূলক অনুভূতির সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান। এই ধরনের মানসিক অনুভূতিটি কতকগুলি বিশেষ বিশেষ বিষয়ের উপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে। একটি রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে জাতীয় সংহতির সৃষ্টিতে যে সকল বিষয়গুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে সেগুলিকে নিম্নে উল্লেখ করা হল।

(১) **ভৌগোলিক অখণ্ডতা :** একটি ভৌগোলিক অঞ্চলে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী দীর্ঘদিন পারস্পরিক সান্নিধ্যে অবস্থান করার ফলে তাদের মধ্যে যে সামাজিক-সাংস্কৃতিক মিথস্ক্রিয়া ঘটে তার ফলশ্রুতিতে ওই জনগোষ্ঠীর মধ্যে ঐক্যের ভাব গড়ে ওঠে।

Scanned with CamScanner

সুতরাং ভৌগোলিক অখণ্ডতা জাতীয় সংহতির সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

(২) **জাতীয় ঐতিহ্য** : পৃথিবীর যে-কোনো প্রান্তের দেশের মানুষ তার নিজ দেশের অতীত ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। ঐতিহ্যের প্রতি এই শ্রদ্ধাশীলতা দেশের জনগোষ্ঠীর মধ্যে একটি 'একত্ব' বন্ধনে আবদ্ধ করে, প্রাক্ষোভিক দিক থেকে অনুভূতি প্রবণ করে তোলে। স্বাভাবিকভাবেই জাতীয় ঐতিহ্যকে জাতীয় সংহতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

(৩) **সাংস্কৃতিক উপলব্ধি** : প্রাণীজগতে একমাত্র মানুষই সাংস্কৃতিক প্রাণী। এই সংস্কৃতির মাধ্যমেই মানুষ তার জ্ঞান, জীবনবোধ, সামগ্রিক আচরণ ধারা, কর্মদক্ষতার চিন্ত ভাবনাকে প্রতিফলিত করে। কোনো একটি দেশের সামগ্রিক বিচারে যে সংস্কৃতি গড়ে ওঠে সেই সংস্কৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার কারণে যে উপলব্ধির সৃষ্টি হয় তা দেশের জনগোষ্ঠীর মধ্যে সাংস্কৃতিক সংহতি গড়ে তুলতে সাহায্য করে। এই সাংস্কৃতিক সংহতিই জাতীয় সংহতি সৃষ্টির ক্ষেত্রে পথ প্রস্তুত করে।

(৪) **ভাবাগত নৈকট্য** : মন আছে বলেই মানুষ চিন্তা সম্পদের অধিকারী, তার ভাবসম্পদের জন্মদাতা। মানুষের মনের ভাব প্রকাশের মাধ্যমই হল তার ভাষা। এই ভাষা কোনো বিচ্ছিন্ন বিষয় নয়, আমাদের জীবন, মনন, সমাজ-সংস্কৃতির প্রতি ক্ষেত্রে তার গভীর সংযোগ। মানুষের জীবনের প্রয়োজনেই যেহেতু এই ভাষার সৃষ্টি, তাই ভাবাগত মিল থাকলে কোনো জনগোষ্ঠীর প্রতিটি সদস্য এক বিশেষ প্রকার প্রাক্ষোভিক নৈকট্যের কারণে পরস্পর কাছাকাছি আসে এবং একটি ঐক্যবোধের জাগরণ ঘটে। অর্থাৎ ভাবাগত নৈকট্য জাতীয় সংহতি সৃষ্টির উল্লেখযোগ্য সহায়ক।

(৫) **ধর্মীয় সহনশীলতা** : ধর্ম তথা ধর্মীয় চেতনা মানুষের মধ্যে 'একত্ব' ভাব গড়ে তুলতে সাহায্য করে। একই ধর্মের মানুষের ক্ষেত্রে এটি সত্যতো বটে, এমনকি ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের মানুষের ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য। প্রতিটি ধর্মের মর্ম কথাই অভিন্ন, প্রতিটি ধর্মই সহনশীলতার শিক্ষা দান করে। সুতরাং ধর্মীয় সহনশীলতাকে অবলম্বন করে চলতে পারলে দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সব ধর্মের মানুষের মধ্যে ঐক্য বা সংহতি গড়ে তোলা সম্ভব। সেদিক থেকে ধর্মীয় সহনশীলতা জাতীয় সংহতি সৃষ্টির সহায়ক।

(৬) **প্রগতিশীল ভাবনা** : যে-কোনো দেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হল প্রগতিশীল জনগোষ্ঠী। জনগোষ্ঠীর এই প্রগতিশীলতাকে ধরে রাখতে সাহায্য করে তাদের উদার মানসিকতা, গণতান্ত্রিক চেতনা, যুক্তি ও মুক্তমনা দৃষ্টিভঙ্গি। এই ধরনের জনগোষ্ঠী দেশের জাতীয় জীবনের ধারাটিকে সুসংহত করে দেশের উন্নয়নকে অগ্রবর্তী করে তোলে। সুতরাং কোনো দেশের জনগোষ্ঠীর প্রগতিশীল ভাবনা জাতীয় সংহতির সহায়ক।

(৭) **শিক্ষার প্রসার** : জাতীয় সংহতির ক্ষেত্রে একটি অতি শক্তিশালী উপাদান হল শিক্ষা। উদার, মুক্তমনা এবং প্রগতিশীল শিক্ষা মানুষকে কুসংস্কার, ভেদাভেদ, হিংসা, গোঁড়ামি, ধর্মান্ধতা থেকে দূরে রেখে একটি নিবিড় সম্প্রীতির সঙ্গে অপরাপর মানুষের সাথে মিথস্ক্রিয়ার আবদ্ধ করে। শিক্ষাই কোনো দেশের জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতিকে স্থির করে, ঐতিহ্যের সাথে পরিচিতি ঘটায়, ঐক্যবোধের এক প্রাক্ষোভিক চেতনার জাগরণ ঘটায়, যা ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র সুরক্ষার সহায়ক। সুতরাং শিক্ষার প্রসার জাতীয় সংহতির সৃষ্টির পথকে সবচেয়ে বেশি প্রশস্ত করে তোলে।

❑ ১.৫.৪ জাতীয় সংহতির প্রয়োজনীয়তা (Need for National Integration) :

ভারতবর্ষ একটি বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশ যেখানে জাতি, ধর্ম, ভাষা, সংস্কৃতি প্রথা, রীতিনীতি, বিশ্বাস প্রভৃতি ক্ষেত্রে এই বৈচিত্র্যের প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়। এর ফলশ্রুতিতে ভারতের মতো রাষ্ট্রের জাতীয় সংহতি বহু ক্ষেত্রেই বিপদের সম্মুখীন হচ্ছে। Emotional Integration Committee-এর কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে "One of the hardest problems before us today is the building up a national mind by curling the religious, linguistic and communal conflicts which tend to disunite us." সুতরাং বর্তমান সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে জাতীয় সংহতিকে দৃঢ় করে তুলতে হলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি আমাদের গুরুত্ব দেওয়ার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে।

(১) জাতীয় চরিত্রের বিকাশ
(২) বৈদেশিক আক্রমণ থেকে রক্ষা
(৩) বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য সাধন
(৪) গণতন্ত্রের বিকাশ ও ধারণ
(৫) বর্তমান পরিস্থিতির মোকাবিলা
(৬) সংকীর্ণ প্রবণতার নিয়ন্ত্রণ
(৭) অভ্যন্তরীণ শান্তি স্থাপন
(৮) দেশজ সংস্কৃতির বিকাশ
(৯) অর্থনৈতিক প্রগতি
(১০) বিশ্বশান্তি স্থাপন
(১১) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতি
(১২) সামাজিক প্রগতি

ভারতের মতো রাষ্ট্রে জাতীয় সংহতির প্রয়োজনীয়তার প্রসঙ্গটি তুলে ধরতে উপরোক্ত বিষয়গুলির প্রতি সংক্ষেপে আলোকপাত করা হল—

(১) **জাতীয় চরিত্রের বিকাশ** : বস্তুবাদী সমাজে আজকের জীবন জাতীয় চরিত্রের অভাবে আক্রান্ত। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগে মানুষ চাইছে তার সুখী ও আরামের জীবন। খুব

Scanned with CamScanner

সহজ ভাবে ধনবান হওয়ার লক্ষ্যে ছুটে চলেছে অর্থের সন্ধানে। মানুষ তার ব্যক্তিগত ও সমাজ জীবনে মূল্যবোধ ও নৈতিক জীবনাদর্শকে বিসর্জন দিয়ে হয়ে পড়ছে আত্মকেন্দ্রিক এমনকি দুর্নীতি পরায়ণও। নিজের ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও চাহিদাগুলিকে পূরণ করতে গিয়ে বৃহত্তর জীবনের স্বার্থ, সমাজ ও রাষ্ট্রের স্বার্থ ও কল্যাণকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে। এই অবস্থায় জাতি ও রাষ্ট্রকে রক্ষা করার মতো আত্মত্যাগের কোনো দৃষ্টান্ত যদি আমরা গড়ে তুলতে না পারি তাহলে আমাদের জাতীয় জীবন হবে বিপর্যস্ত ও রাষ্ট্র হবে বিপন্ন। এই পরিস্থিতিতে জাতীয় চরিত্রের বিকাশ অতীব প্রয়োজন, যা আমাদের জাতীয় সংহতিকে দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করতে সক্ষম হবে। জাতি ও রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ স্থায়িত্ব ও বিকাশের ধারা তবেই সুনিশ্চিত হবে।

(২) **বৈদেশিক আক্রমণ থেকে রক্ষা :** অতীতে বারে বারে প্রমাণিত হয়েছে, দেশের অভ্যন্তরীণ গলোযোগ, দ্বন্দ্ব, বিবাদ, অশান্তি বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতাবাদ দেশকে বিপদের মুখে ফেলেছে। আজকের দিনেও প্রতিবেশি এবং আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটের বিচারে সেই পরিস্থিতি দেশের মধ্যে বিরাজ করলে দেশ আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। আবার বিশ্বায়ন ও উদারনীতির হাওয়াও অনেক ক্ষেত্রে সেই পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এই অবস্থায় দেশকে যদি বৈদেশিক যে-কোনো রকম আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করতে হলে দেশের মধ্যে সর্বপ্রথম দরকার জাতীয় সংহতি।

(৩) **বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য সাধন :** এমনিতেই ভারত হল বহু সংস্কৃতির পীঠস্থান। ভারতের প্রাকৃতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ধর্মীয় প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই বৈচিত্র্য বিদ্যমান। এই ধরনের পরিস্থিতি বহুক্ষেত্রেরই দেশে জনগণের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধন কিংবা আত্মীয়তার অনুভূতিকে জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হয় না। সেক্ষেত্রে অবশ্যই জাতীয় সংহতির মতো বিষয়টির প্রাসঙ্গিকতা গরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। **নিত্যানন্দ কানুনগো** এই কারণেই বলেছেন "National unity is essential for any country at any time." ভারতের মতো দেশে এই কথাটি অনিবার্য ভাবেই এসে পড়ে।

(৪) **গণতন্ত্রের বিকাশ ও ধারণ :** ভারত একটি সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। আর এই গণতন্ত্রের মৌলিক ভিত্তিই হল জাতীয় সংহতি। বস্তুত, একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে গণতন্ত্রের বিকাশ ও ধারণ নির্ভর করে সেই সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র গণতন্ত্রের শক্তি কতখানি। ড. সি. ডি. দেশমুখ এই প্রসঙ্গে বলেছেন, "National integration is the pre-requisite for the fulfilment of our democracy." সুতরাং জাতীয় সংহতি দুর্বল হলে আমাদের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রটিও বিপন্ন হয়ে পড়বে।

(৫) **বর্তমান পরিস্থিতির মোকাবিলা :** বর্তমান পরিস্থিতিতে দেশের মধ্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় প্রভৃতি নানান ক্ষেত্রে ছোটো বড়ো সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে। আঞ্চলিকতা, প্রাদেশিকতার মতো বিষয়গুলিও এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এই ধরনের

পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করে গণতান্ত্রিক ভাবধারা ও ঐতিহ্যকে যদি রক্ষা করতে হয় তাহলে অবশ্যই আমাদের জাতীয় সংহতিকে অনেক বেশি শক্তিশালী করে তুলতে হবে। বস্তুত একটি দেশের জাতীয় সংহতিকে যখনই শক্তিশালী হতে সক্ষম হয় যখন দেশের নাগরিকগণ মনেপ্রাণে তার দেশ ও জাতিকে ভালোবাসে, অবিসংবাদিত ভাবে তা বিশ্বাস করে। সুতরাং বর্তমান পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য জাতীয় সংহতির প্রয়োজনীয়তাকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না।

(৬) **সংকীর্ণ প্রবণতার নিয়ন্ত্রণ :** দেশের নাগরিকদের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি জাতীয় সংহতিকে দুর্বল করে। নাগরিকদের এই সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির দিকগুলি হল আঞ্চলিকতা, প্রাদেশিকতা, ভাষাগত সংকীর্ণতা, জাতিভেদগত, সংকীর্ণ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি। দেশের মধ্যে জাতীয় সংহতিকে উপযুক্তভাবে গড়ে তুলতে পারলে উপরোক্ত সংকীর্ণ মানসিক প্রবণতাগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় এবং দেশ ও জাতিকে প্রগতির পথে চালিত করা সম্ভব হয়।

(৭) **অভ্যন্তরীণ শান্তি স্থাপন :** দেশের জনগণের মধ্যে শান্তি ও ঐক্যকে যথার্থভাবে স্থায়ী আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে জাতীয় সংহতি অতি আবশ্যক। জনগণে মধ্যে অভ্যন্তরীণ শান্তি ও ঐক্য জাতীয় জীবনের শৃঙ্খলাকে শক্তিশালী করে এবং গণতান্ত্রিক চেতনাকে উপলব্ধি করতে সাহায্য করে। সুতরাং দেশের অভ্যন্তরীণ স্থাপনের জন্য জাতীয় সংহতির অবশ্যই প্রয়োজন আছে।

(৮) **দেশজ সংস্কৃতির বিকাশ :** আমরা সকলেই এক, যদিও আমাদের জীবনযাপন প্রণালী ভিন্ন ভিন্ন, আমাদের ভাষা আলাদা আলাদা, আমাদের ধর্ম আলাদা আলাদা, কিন্তু তা সত্ত্বেও সামগ্রিকভাবে আমাদের রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে একটি নিজস্ব সংস্কৃতি বর্তমান। জাতীয় সংহতি আমাদের এই সংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে সাহায্য করে, যার ফলশ্রুতিতে আমাদের ভাষা, সাহিত্য, জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলিকে সমৃদ্ধ করে তোলে। সুতরাং দেশজ সংস্কৃতির বিকাশে জাতীয় সংহতির প্রয়োজনীয়তা অনেকখানি।

(৯) **অর্থনৈতিক প্রগতি :** জাতীয় সংহতি কোনো দেশের জনগণের কর্তব্যবোধ, দেশকে সেবা করার উপলব্ধি এবং সর্বোপরি দেশের জন্য আত্মত্যাগের দৃষ্টিভঙ্গিকে জাগ্রত করে। দেশের বাণিজ্য, শিল্প প্রভৃতি ক্ষেত্রেও তাদের কর্মোদ্যগকে জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করে, জনগণের এই সমস্ত গুণাবলি তাদের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের দক্ষতাকে তুলে ধরতে সাহায্য করে। জাতীয় সংহতি রাষ্ট্রের মধ্যে শক্তিশালী অবস্থায় বিরাজ করলে অভ্যন্তরীণ শান্তির যে বাতাবরণ তৈরি হয় তা কার্যত দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি পরিবেশকে সুগঠিত করে, দেশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে আরও বেশি অগ্রবর্তী করে তোলে।

(১০) **বিশ্বশান্তি স্থাপন :** এ কথা আজ অস্বীকার করার উপায় নেই যে, বিশ্বের প্রতিটি দেশ ও জাতি তাদের পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। পারস্পরিক সহযোগিতাকে উপেক্ষা করে কোনো দেশ বা জাতি তার অগ্রগতিকে বজায় রাখতে পারবে না, তার অস্তিত্বকে

Scanned with CamScanner

সুরক্ষিত করতে পারবে না। সুতরাং এই লক্ষ্য পূরণ করতে হলে শুধু মাত্র কোনো রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রেই নয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও তার শান্তির পরিবেশকে অব্যাহত রাখা প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই শান্তি বা বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপায় জাতীয় সংহতিকে সুদৃঢ় করা।

(১১) **বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতি :** কোনো একটি দেশের অগ্রগতির ধারাকে বজায় রাখতে হলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশকে গুরুত্ব দিতেই হবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এই বিকাশ তখন সম্ভব যখন দেশের জাতীয় উদ্দীপনা, ধর্মনিরপেক্ষতা, সাম্য, বিচার এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্ববোধ বজায় থাকে। এই সমস্ত উপাদানগুলি জনগণের বৌদ্ধিক চেতনা এবং বিজ্ঞান চিন্তার গুণগত মানকে সমৃদ্ধ করে তোলে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এই অগ্রগতিকে যথার্থভাবে ধরে রাখার জন্য একান্ত ভাবে দরকার দেশের জাতীয় সংহতি।

(১২) **সামাজিক প্রগতি অর্জন :** বৃহত্তর রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে জনগণের মধ্যে মনের প্রসারতা বৃদ্ধি করতে হলে জাতীয় সংহতিই একমাত্র উপযুক্ত পথ। জনগণের মনের প্রসারতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উদার দৃষ্টিভঙ্গি, স্বচ্ছ চিন্তাভাবনা অনুসরণ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সমাজকল্যাণের পথ প্রশস্ত হয়। এই সমাজকল্যাণের মধ্য দিয়ে সার্বিক সামাজিক প্রগতি ঘটে এবং যা ভবিষ্যত সমাজ পরিবর্তনের ধারাকে বজায় রাখার চেষ্টা করে। সুতরাং বৃহত্তর রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে সামাজিক প্রগতির বিষয়টি অর্জন সম্ভব হয় জাতীয় সংহতির দ্বারা।

❑ ১.৫.৫ জাতীয় সংহতির বাধাসমূহ (Obstacts to National Integration) :

অধ্যাপক **নির্মলকুমার বসু** ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে হিমাচল প্রদেশের সিমলায় ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব অ্যাডভানসড স্টাডিতে তাঁর বক্তৃতামালায় ভারতের জাতীয় সংহতি সমস্যা সংক্রান্ত এক আলোচনায় উল্লেখ করেন—ভারতবর্ষে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক কারণে বৈচিত্র্যের সীমা অতিক্রম করে মানুষে মানুষে ভেদাভেদের দৃষ্টিভঙ্গি নতুন নতুন রূপ পরিগ্রহ করে চলেছে যার প্রতিফলন ঘটেছে সমকালীন বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনগুলিতে। তাঁর মতে বহুত্ববাদী সমাজ সমন্বিত ভারতে বহু জাতি, শ্রেণি, ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতির অস্তিত্ব—এই প্রেক্ষাপটে ভারতের অসম অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সর্বোপরি সাংস্কৃতিক বিকাশের অসামঞ্জস্যের ধারা জাতির সংহতির সমস্যাকে গভীর থেকে গভীরতর করেছে। জাতীয় সংহতির বাধাসমূহ পর্যালোচনা করলে আমরা যেগুলির অস্তিত্ব অনুভব করতে পারব সহজেই। জাতীয় সংহতির বাধাগুলির বিভিন্ন দিক নিম্নে এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হল—

(১) প্রাদেশিকতা (Provincialism)
(২) ভাষা সংক্রান্ত (Linguistic)
(৩) জাতি সত্তাগত (Casteism)
(৪) সাম্প্রদায়িকতা (Communalism)

(৫) শ্রেণিগত (Classism)
(৬) আর্থ-সামাজিক অসাম্য (Socio-economic Inequality)
(৭) রাজনৈতিক দল (Political Parties)
(৮) কর্মহীনতা (Unemployment)
(৯) দারিদ্র্য (Poverty)
(১০) অর্থনৈতিক বৈষম্য (Economic disparities)
(১১) সামাজিক বৈষম্য (Social disparities)
(১২) শিক্ষা সংক্রান্ত বৈষম্য (Educational disparities)
(১৩) নিরক্ষতা (Illiteracy)
(১৪) অজ্ঞতা (Ignorance)
(১৫) ত্রুটিযুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা (Defective educational system)
(১৬) নেতৃত্বের অভাব (Lack of leadership)
(১৭) জাতীয় চরিত্রের অভাব (Lack of national character)
(১৮) বিদেশি ভাষা (Foreign languages)
(১৯) স্বার্থপরতা (Selfishness)
(২০) অস্পৃশ্যতা (Untouchability)

❑ ১.৫.৬ জাতীয় সংহতিতে শিক্ষার ভূমিকা (Role of Education in National Integration) :

যে-কোনো দেশের জাতীয় সংহতির জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন সেদেশের মানুষের উপলব্ধি, জীবন সংযম আর মানবিকতাবোধ। আবার যে-কোনো দেশের জাতির মেরুদণ্ড হল সে দেশের শিক্ষা। স্বাভাবিকভাবেই কোনো দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে উপকরণ ও উপাদানগুলির এমনভাবে সন্নিবেশ ঘটানো দরকার যাতে সেগুলির অনুশীলন বা চর্চা শিক্ষার্থীদের মধ্যে জাতীয় সংহতির সহায়ক মূল্যবোধ গঠন করতে সক্ষম হয়। বাস্তবিক পক্ষে কোনো দেশের শিক্ষা সেদেশের শিক্ষার্থীদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও চেতনার বিকাশ ঘটায় আর দেশের প্রতি মমত্ববোধ গড়ে তোলে। **ড. রাধাকৃষ্ণান** জাতীয় সংহতিতে শিক্ষার ভূমিকা প্রসঙ্গে বলেছেন, "National integration can not be built by brick and mortar; it can not be built by chisel or hammer. It has to grow silently in the minds and hearts of men. The only process is the process of education." শিক্ষা কমিশনের পর্যবেক্ষণে ধরা পড়েছে "Education system must make its contribution to the development of habits attitudes and qualities of character, which will enable the citizens to learn worthily the responsibilities of democratic citizenship and to counteract all those

Scanned with CamScanner

fissiparous tendencies which hinder the emergence of a broad national and secular outlook."

একথা ঠিক যে জাতীয় সংহতি হল একটি প্রক্ষোভমূলক ধারণা এবং এই ধরনের প্রাক্ষোভিক সংহতির ক্ষেত্রে শিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিক্ষা শুধুমাত্র শিক্ষার্থীদের কিছু জ্ঞানের দ্বারা সমৃদ্ধই করে না, বরং তাদের জীবনের বিভিন্ন দিকের বিকাশ ঘটিয়ে তাদের ব্যক্তিত্বকে পূর্ণত্বে উপনীত করতে সহায়তা করে। এই ব্যক্তিত্বই শিক্ষার্থীর মধ্যে দেশে প্রীতির মূল্যবোধকে জাগ্রত করে।

স্বাধীন ভারতে বিভিন্ন সময় যে সমস্ত শিক্ষা কমিশনগুলি গঠিত হয়েছিল তাদের সুপারিশগুলিকে অনুসরণ করে এবং সাম্প্রতিক জাতীয় প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে জাতীয় সংহতিতে শিক্ষার ভূমিকাকে আমরা নিম্নলিখিত দিক গুলির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে পারি :

(১) জাতীয় শিক্ষানীতির প্রবর্তন
(২) পাঠক্রমের পুনর্বিন্যাস
(৩) ভাষাশিক্ষণ
(৪) শিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীত শিক্ষণ
(৫) নৈতিক শিক্ষায় গুরুত্ব প্রদান
(৬) উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক রচনা ও নির্বাচন
(৭) সহপাঠক্রমিক কার্যাবলিতে গুরুত্ব প্রদান
(৮) শিক্ষণ পদ্ধতিতে পরিবর্তন
(৯) শিক্ষাক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক পরিবেশ রচনা
(১০) শিক্ষকের ভাবনা ও মতাদর্শ

Follow Our B.Ed Related Website>>
www.dascoaching.in

উপরোক্ত দিকগুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল :

(১) জাতীয় শিক্ষানীতির প্রবর্তন : শিক্ষা হল কোনো দেশের জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়। শিক্ষার মাধ্যমে যাতে জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে সেজন্য প্রয়োজন একটি বলিষ্ঠ জাতীয় শিক্ষানীতির প্রবর্তন। উপযুক্ত জাতীয় শিক্ষানীতি রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে সংকীর্ণ প্রাদেশিকতা, সাম্প্রদায়িকতা, আঞ্চলিকতা প্রভৃতি বাধাগুলিকে দূর করে জাতীয় ঐক্য ও সংহতিকে দৃঢ় করতে সাহায্য করে।

(২) পাঠক্রমের পুনর্বিন্যাস : সময় ও যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রচলিত পাঠক্রমে পুনর্বিন্যাসেরও প্রয়োজন আছে। ভারতের মতো বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশে যেসব বিষয়গুলির সর্বভারতীয় গুরুত্ব আছে সেগুলিকে গুরুত্ব সহকারে পাঠক্রমে বিন্যাস করার দরকার আছে। এই প্রসঙ্গে পাঠক্রমে অন্তর্গত সমাজ বিজ্ঞান, মানবীয় বিদ্যা এবং সাহিত্যের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেশের ইতিহাসকে তুলে ধরার দরকার আছে। এজন্য

রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের ওপর জোর দিতে হবে। দেশের সামগ্রিক সামাজিক প্রেক্ষাপটকে উপলব্ধি করার জন্য সমাজবিজ্ঞানের স্বচ্ছ ও পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টিভঙ্গি সমন্বিত একটি পাঠক্রম উপস্থাপন করা প্রয়োজন।

(৩) ভাষা শিক্ষণ : মানুষের ভাব প্রকাশের বাহন হল ভাষা। স্বাভাবিকভাবেই যে-কোনো দেশে ভাষার গুরুত্ব অসীম। ভারতের মতো দেশে যেখানে বহু ভাষার প্রচলন সেখানে ভাষার তাৎপর্য অনেকখানি। একদিকে মাতৃভাষা এবং অন্যদিকে ভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের সঙ্গে সংযোগ গড়ে তোলার জন্য একাধিক অন্য ভাষা শিক্ষণেও গুরুত্ব প্রদান করা দরকার। একাধিক ভাষা প্রচলণের কারণে ভাষাগত বিরোধ যাতে না বাধে তার জন্য প্রয়োজন বাস্তবসম্মত ভাষানীতি, সকল ভাষার প্রতি মর্যাদা দান এবং মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের প্রসঙ্গ। বিভিন্ন ভাষার ভালো বই-এর সাথে শিক্ষার্থীদের যাতে পরিচয় ঘটে তার জন্য অনুবাদের ব্যবস্থাও থাকা দরকার। এছাড়া বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষা শিক্ষণের জন্য সেই নির্দিষ্ট ভাষাটির ব্যাকরণ সহজ করতে হবে।

(৪) শিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীত শিক্ষণ : জাতীয় সংহতির চেতনার বিকাশ এবং জাতীয় সংহতি স্থাপনে শিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীতের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। শিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীত মানুষের মানসিক দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রসারিত করে, সংকীর্ণতাবোধকে দূরীভূত করে। এই প্রসঙ্গে **পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু** বলেছিলেন, "Art Galleries and Museums in a great city are like windows which look out in the broader, richer and deeper things of life." জাতীয় সংহতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সাহিত্য আর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কাজ করে। সমাজের উত্থান পতনের ইতিহাসকে তুলে ধরে সাহিত্য। এক সামাজিক গোষ্ঠীর মানুষের সঙ্গে অন্য সামাজিক গোষ্ঠীর মানুষের সম্পর্ককে সংযুক্ত ও মধুর করতে সাহায্য করে সাহিত্য। **ড. রাধাকৃষ্ণান** একবার বলেছিলেন, "Literature works for togetherness, fellowship, love of neighbours and reconcilation of people. Compassion and mercy are the qualities exacted by literature, not hatred and oppression." শিল্প ও সাহিত্যের ন্যায় সঙ্গীত ও মানুষের হৃদয়কে করে প্রসারিত, মানুষে মানুষে বিভেদকে দূর করে এক সূত্রে গ্রথিত করে। স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষাক্ষেত্রে শিল্প-সাহিত্য ও সঙ্গীতকে গুরুত্ব দিয়ে যথাযথ শিক্ষণের ব্যবস্থা করা দরকার।

(৫) নৈতিক শিক্ষায় গুরুত্ব প্রদান : জাতীয় সংহতিকে দৃঢ়মূল করতে হলে দেশের মানুষের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধের বিকাশটিও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। সংকীর্ণ ধর্মীয় গোঁড়ামিকে দূরে রেখে শিক্ষার্থীদের সুস্থ ধর্মনিরপেক্ষতার দৃষ্টিভঙ্গি, মনের উদারতা,

Scanned with CamScanner

সততা ও সহিষ্ণুতার নীতিকে মেনে চলতে অভ্যস্ত করতে হবে। সুতরাং শিক্ষণক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের নৈতিক শিক্ষার যথাযথ ব্যবস্থা করা দরকার।

(৬) **উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক রচনা ও নির্বাচন :** শিক্ষার্থীদের জন্য এমন পাঠ্যপুস্তক রচনা করতে হবে যাতে মানুষের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার কাহিনি থাকবে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে যাতে সহযোগিতা, সহমর্মিতা, একতাবোধ গড়ে ওঠে তার উপাদান ও ব্যবস্থা থাকবে। পাঠ্যপুস্তক রচনা এমনভাবে করতে হবে যা পাঠ ও অনুশীলন করলে শিক্ষার্থীর মধ্যে তার দেশ ও জাতি সম্পর্কে শ্রদ্ধাবোধ, ভালোবাসা ও গর্ববোধ জাগ্রত হবে। অর্থাৎ পাঠ্যপুস্তক এমনভাবে রচিত হবে যার মধ্যে থাকবে জাতীয়তাবোধ জাগরণ ও জাতীয় সংহতি দৃঢ়করণের যাবতীয় উপাদান সমূহ।

এই প্রসঙ্গে পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনের বিষয়টিও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ যে সমস্ত পাঠ্যপুস্তকগুলি পাঠক্রমকে সম্পূর্ণ অনুসরণ করে রচিত হয়েছে সেগুলির সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন থাকা জরুরি। অনেক সময় দেখা যায় পাঠ্যপুস্তকে বিকৃতভাবে পরিবেশিত হয়েছে; জাতি, ধর্ম, লিঙ্গ, অঞ্চল বা প্রদেশের প্রতি পক্ষপাতিত্ব বা নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে বক্তব্য উপস্থাপিত হয়েছে। এই ধরনের পাঠ্যপুস্তককে কোনোভাবেই নির্বাচন করা যাবে না। বিদ্যালয়গুলিতে এজন্য পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন কমিটি গড়ে তোলা দরকার। পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনের ব্যাপারে রাজ্য পুস্তক পর্ষদ (State Book Board) এবং জাতীয় পুস্তক পর্ষদ (National Book Trust) কে অনুসরণ করা যেতে পারে। বর্তমানে জাতীয় শিক্ষা গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ পর্ষদ (National Council of Educational Research and Training সংক্ষেপে NCERT) বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক নিয়ে বহু গবেষণা করে এবং বেশ কিছু নমুনা পুস্তকও রচনা করেছেন। এই সমস্ত পাঠ্যপুস্তককে আদর্শ হিসেবে ধরে নিয়ে পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন করা যেতে পারে।

(৯) **সহপাঠক্রমিক কার্যাবলিতে গুরুত্ব প্রদান :** শিক্ষার্থীদের মধ্যে জাতীয় সংহতির বোধ গড়ে তুলতে বিদ্যালয়ের সহপাঠক্রমিক কার্যাবলির ভূমিকাও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার্থীদের মধ্যে জাতীয় সংহতির বোধ গড়ে তুলতে নিম্নলিখিত কার্যাবলির উপর গুরুত্ব প্রদান করা যেতে পারে।

(i) বিদ্যালয়ের সহপাঠক্রমিক কার্যাবলির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্বচ্ছন্দ মেলামেশার ব্যবস্থা করে সহযোগিতা ও সহমর্মিতার উপলব্ধিকে জাগ্রত করা যেতে পারে।

(ii) বিদ্যালয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে স্বদেশ প্রেম জাগ্রত করার জন্য নাটক মঞ্চস্থ করা, সঙ্গীত প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা।

(iii) এন. সি. সি., স্কাউটিং ও গাইডিং ক্যাম্পের ব্যবস্থা করা।

(iv) ১৫ই আগস্ট, ২৩ শে জানুয়ারি, ২৬ শে জানুয়ারি, ২রা অক্টোবর প্রভৃতি জাতীয় দিবসগুলির যথাযথ পালন করা।

(v) স্বাধীনতা সংগ্রামী ও জাতীয় মনীষীদের জন্ম-মৃত্যু দিবস যথাযোগ্য মর্যাদা সহ পালন করা।

(vi) বিভিন্ন জেলা এবং বিভিন্ন রাজ্যের শিক্ষার্থীদের যোগদানের সুযোগ তৈরি করে যুব উৎসবের আয়োজন করা।

(vii) জাতীয় উৎসব ও জাতীয় মেলার আয়োজন করা।

(viii) শিক্ষামূলক ভ্রমণের আয়োজন করে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সংস্কৃতিকে জানার সুযোগ তৈরি করা।

(ix) জাতীয় সমস্যা ও জাতীয় সংহতিকে অবলম্বন করে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা, বিতর্কসভার আয়োজন, আলোচনা সভার আয়োজন করা।

(x) বিভিন্ন অঞ্চল এবং বিভিন্ন রাজ্যের সংস্কৃতি বা কৃষ্টির সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচিতি ঘটানোর জন্য বিভিন্ন রাজ্যের লোক সঙ্গীত, লোক-নৃত্য, লোক-শিল্প নিদর্শন ও জীবনধারার প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা।

(৮) **শিক্ষণ পদ্ধতিতে পরিবর্তন :** শিক্ষার্থীদের মধ্যে জাতীয় সংহতি বোধ গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন বিষয়ের বিষয় শিক্ষক তাঁদের শিক্ষণ পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনার চেষ্টা করবেন। দেশের সামগ্রিক অবস্থার প্রেক্ষিতে যাতে একটি সামগ্রিকভাবে জাতীয়তাবোধ গড়ে ওঠে শিক্ষণে তার সুযোগ থাকতে হবে। বিতর্কিত কোনো বিষয়কে অত্যন্ত সাবধানে পরিবেশন করার চেষ্টা থাকবে। শব্দ চয়নে শিক্ষককে হতে হবে যথেষ্ট সাবধানী। আবার বিজ্ঞানের শিক্ষকরা বিজ্ঞান শিক্ষণে সমস্ত রকম কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, গোঁড়ামিকে দূরে রেখে নৈর্ব্যক্তিক ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে বিজ্ঞানকে এমনভাবে উপস্থাপন করবেন যাতে তাদের মধ্যে প্রকৃত বাস্তবধর্মী চিন্তাধারা গড়ে ওঠে। দেশের মানুষের মধ্যে সামাজিক ও জাতীয় সংহতি বোধকে জাগ্রত ও দৃঢ়করণে বিজ্ঞানের নিয়মগুলিকে সযত্নে উপস্থাপন করতে হবে।

(৯) **শিক্ষা ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক পরিবেশ রচনা :** গণতন্ত্রের মূল বক্তব্য হল সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা যেগুলি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষার্থী সযত্নে গ্রহণ করতে পারে। স্বাভাবিকভাবেই যে-কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গণতন্ত্রের উপাদানগুলিকে প্রতিপালিত করা দরকার। যে-কোনো সামাজিক ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য সহযোগিতা, সহমর্মিতা, অন্যের মতামত, অন্যের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি, ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ও সহনশীলতার বোধ গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরি। সুতরাং আমরা বলতে পারি শিক্ষার্থীদের মধ্যে জাতীয় সংহতির বোধকে দৃঢ়করণ করার জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক পরিবেশ রচনা করা প্রয়োজন আছে।

Scanned with CamScanner

(১০) **শিক্ষকের ভাবনা ও মতাদর্শ :** জাতীয়তাবোধ এবং জাতীয় সংহতিবোধকে শিক্ষার্থীদের মধ্যে দৃঢ়মূল করার ক্ষেত্রে শিক্ষকের ভাবনা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মতাদর্শ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষক হবেন নিরপেক্ষ, সমস্তরকম কুসংস্কারমুক্ত, নৈর্ব্যক্তিক ভাবনায় সমৃদ্ধ, প্রাদেশিকতা ও সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে। তিনি হবেন গণতন্ত্র এবং ধর্ম-নিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী।

❑ ১.৫.৭ জাতীয় সংহতিতে শিক্ষাবিজ্ঞান শিক্ষণের ভূমিকা (Role of Teaching Education in National Integration) :

ভারতের মতো বহুত্ববাদী সমাজ ব্যবস্থায় বহু জাতি, শ্রেণি, ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতি যেখানে বিদ্যমান সেখানে জাতীয় সংহতি স্থাপন স্বাভাবিকভাবে সমস্যার বিষয়। অথচ জাতীয় সংহতি ছাড়া ভারতের মতো রাষ্ট্র তার অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে পারবে না সে কথাও ঠিক। এই পরিস্থিতিতে আজকের এই আধুনিক সমাজে মানুষের মনোজগতে পরিবর্তন এনে একটি স্থায়ী জাতীয় সংহতির বাতাবরণ তৈরি করতে পারে শিক্ষাবিজ্ঞান নামক সামাজিক বিজ্ঞানটি। শিক্ষার্থীদের মধ্যে জাতীয় চেতনার বিকাশ ঘটিয়ে জাতীয় সংহতিকে সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে শিক্ষাবিজ্ঞান যে বিষয়গুলির প্রতি গুরুত্ব প্রদান করে তার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে সেই বিষয়গুলি হল নিম্নরূপ।

(১) জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা (National system of education)
(২) পাঠক্রমের পুনর্বিন্যাস (Re-designing curriculum)
(৩) পাঠ্যপুস্তকের পুনঃনকসাকরণ (Re-desigining text books)
(৪) সমাজ বিজ্ঞানের সঠিক শিক্ষণ (Proper teaching of social sciences)
(৫) ভাষা শিক্ষণে গুরুত্ব (Importance in language teaching)
(৬) ভাষাগত বিরোধের সমাধান (Solution to language problem)
(৭) শিল্প, সাহিত্য, সংগীত-এর শিক্ষণ (Teaching of art, literature and music)
(৮) নৈতিক শিক্ষাদান ও তার বিস্তার (Expansion and teaching of moral education)
(৯) বয়স্ক শিক্ষার প্রসার (Expansion of adult education)
(১০) জনশিক্ষার বিস্তার (Expansion of man education)
(১১) শিক্ষাদানের মাধ্যম (Medium of instruction)
(১২) প্রাক্ষোভিক সংহতি স্থাপন (Establishment of emotional integration)
(১৩) জাতীয়তাবোধের বিকাশ (Development nationalism)
(১৪) গণতান্ত্রিক নাগরিকতা (Democratic sitizenship
(১৫) ধর্মীয় গোঁড়ামির দূরীকরণ (Eradication of religious conservation)

❑ ১.৫.৮ জাতীয় সংহতিতে শিক্ষকের ভূমিকা (Role of Teachers in National Integration) :

যে-কোনো দেশের জাতীয় প্রেক্ষাপটে শিক্ষক এক তাৎপর্যপূর্ণ স্থান অধিকার করে থাকেন। দেশ ও জাতির সাংস্কৃতিক অস্তিত্বকে ধরে রাখার ক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকাকে অস্বীকার করা যায় না। স্বাভাবিক ভাবেই কোনো দেশের জাতীয়তাবোধ এবং জাতীয় সংহতির বোধকে শিক্ষার্থীদের মধ্যে জাগ্রত করে তোলার ক্ষেত্রে শিক্ষকের অবদান ও দায়িত্ব তাৎপর্যপূর্ণ। জাতীয় সংহতির বোধকে শিক্ষার্থীদের মধ্যে দৃঢ়মূল করার ক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকাকে নিম্নলিখিত দিক থেকে আমরা উল্লেখ করতে পারি :

(১) শিক্ষক তাঁর গণতান্ত্রিক আচরণ, চিন্তনের ধরন এবং কাজের মধ্যে জাতীয় সংহতির ভাবনাকে তুলে ধরার চেষ্টা করবেন।
(২) শিক্ষক ব্যক্তিগতভাবে সমস্ত রকম সংস্কার, প্রাদেশিকতা, আঞ্চলিকতা, সাম্প্রদায়িকতা ও জাতিভেদ প্রভৃতির ঊর্ধ্বে থাকবেন।
(৩) শিক্ষক হবেন জাতি, বর্ণ, ভাষা ও লিঙ্গ নির্বিশেষে সমস্ত রকম পক্ষপাতিত্বের ঊর্ধ্বে অবস্থানকারী।
(৪) শিক্ষক হবেন গণতন্ত্র ও ধর্ম নিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী এবং অনুসরণকারী।
(৫) শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মধ্যে কোনোরকম বৈষম্যমূলক আচরণ করবেন না এবং নিজে শিক্ষার্থীদের এই দৃষ্টিভঙ্গিকে মেনে নেবেন না বা প্রশ্রয় দেবেন না।
(৬) বিদ্যালয়ে জাতীয় সংহতি বোধ জাগ্রত করার জন্য বিভিন্ন সময় সরকারের দিক থেকে বা শিক্ষা দপ্তর থেকে যে সমস্ত নির্দেশাবলি আসে সেগুলিকে সযত্নে এবং আন্তরিকভাবে কার্যকরী করার চেষ্টা করবেন।
(৭) জাতীয় সংহতি বোধ গড়ে তোলার উপযোগী পত্রপত্রিকা, গ্রন্থ পাঠে শিক্ষার্থীরা যাতে আগ্রহী হয় তার ব্যবস্থা করবেন।
(৮) ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষকরা নিজের মাতৃভাষা ছাড়াও অন্যভাষা সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়, অন্য ভাষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তিনি শিক্ষার্থীদের মাতৃভাষা ছাড়াও অন্যান্য ভাষার সাহিত্যকর্ম ও কবি সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে পরিপূরক তথ্য সরবরাহ করবেন। অন্য অঞ্চল এবং সংস্কৃতির মানুষ ও তাদের জীবন সংক্রান্ত সাহিত্য সৃষ্টি পাঠে উৎসাহিত করবেন।
(৯) সমাজবিজ্ঞান বিষয় হিসেবে ইতিহাসের শিক্ষক ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গিতে ইতিহাসের বিষয়বস্তু পরিবেশন করবেন। ইতিহাস পঠনপাঠনের মাধ্যমে তিনি বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যকে তুলে ধরার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করবেন। ইতিহাসের ঘটনাকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে গ্রহণ করবেন এবং নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে উপস্থাপিত করবেন।

Scanned with CamScanner

জাতীয় নেতা বা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ইতিহাস যথাযথভাবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে তুলে ধরার চেষ্টা করবেন।

(১০) ভূগোল শিক্ষক চেষ্টা করবেন ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে-সম্পদের আদনপ্রদান, পারস্পরিক নির্ভরতা এবং জীবনধারা, উৎসব, পোশাক পরিচ্ছদ, খাদ্যাভ্যাস এবং সাংস্কৃতিক পরিচয়কে এমনভাবে তুলে ধরবেন যাতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেশের একটি সামগ্রিক চিত্র সম্পর্কে ধারণা গড়ে ওঠে যা থেকে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে।

(১১) অর্থনীতির শিক্ষক দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সকলের যৌথ প্রচেষ্টা ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশের গুরুত্ব তুলে ধরতে চেষ্টা করবেন। দারিদ্র দূরীকরণ, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, সম্পদের অসমতা দূরীকরণ, সম্পদের উৎপাদন ও সুষম বণ্টন, মানুষের জীবন ধারার মান উন্নয়ন প্রভৃতি জাতীয় লক্ষ্যগুলি অর্জনে শিক্ষার্থীকে যুক্তি সম্মত চিন্তন ও মননে সাহায্য করে জাতীয় সংহতির পথকে প্রশস্ত করার চেষ্টা করবেন।

(১২) ভৌতবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানগুলির পঠনপাঠনের সঙ্গে যুক্ত বিজ্ঞানের শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদের সমস্ত রকমের কুসংস্কার, অন্ধ বিশ্বাস, গোঁড়ামি প্রভৃতি থেকে মুক্ত থেকে নিরপেক্ষ, নৈর্ব্যক্তিক ও উদার দৃষ্টিভঙ্গিতে শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান মনস্ক হতে সাহায্য করবেন। দেশের বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের রাষ্ট্রগঠন ও জাতীয় উন্নয়নে অবদানকে তুলে ধরে সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় জাতির ঐক্যের দৃষ্টিভঙ্গিটিকে জাগ্রত করার চেষ্টা করবেন। বিভিন্ন বিজ্ঞান প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে প্রাক্ষোভিক সংহতিকে কাজে লাগিয়ে জাতীয় সংহতিকে দৃঢ়মূল করার জন্য অগ্রবর্তী ভূমিকা গ্রহণ করবেন।

❑ ১.৫.৯ জাতীয় সংহতিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা (Role of Educational Institution in National Integration) :

শিক্ষা একদিকে যেমন ব্যক্তিকেন্দ্রিক মৌলিক চাহিদাগুলির পরিতৃপ্তি ঘটায় তেমনি আবার অন্যদিকে একজন পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে ওঠার পথকে প্রশস্ত করে তোলে। শিক্ষার এই ব্যক্তিকেন্দ্রিক লক্ষ্য পূরণ করার সঙ্গে সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যটিও পূরণ করার ক্ষেত্রকে প্রসারিত করে। দেশের সংহতিকে সুদৃঢ় করা সেই সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যেরই ফলশ্রুতি। শিক্ষার ফলে এমন কতকগুলি স্থায়ী গুণাবলির বিকাশ ঘটে যা কোনো দেশের জাতীয় সংহতির ক্ষেত্রটিকে প্রসারিত করে। শিক্ষার এই মহান কার্যটি সম্পন্ন হয় তার নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানটিকে ভিত্তি করে। আমরা এখানে জাতীয় সংহতি স্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকাকে সংক্ষেপে আলোচনা করার চেষ্টা করব নিম্নলিখিত দিক থেকে—

(১) সহপাঠক্রমিক কার্যাবলির পরিকল্পনা।

(২) সমাজবিজ্ঞান পাঠে বিশেষভাবে জোর দেওয়া।
(৩) ইতিহাসের সঠিক পাঠ্যপুস্তক।
(৪) ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ।
(৫) বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট পোশাক।
(৬) জাতীয় দিবস পালন।
(৭) মহাপুরুষদের জন্মদিবস পালন।
(৮) জাতীয় পতাকাকে গভীর শ্রদ্ধাজ্ঞাপন
(৯) জাতীয় সংগীতের প্রতি সম্মান।
(১০) দেশাত্মবোধক সংগীত
(১১) বক্তৃতা অনুষ্ঠানের আয়োজন।
(১২) বিভিন্ন উৎসব পালন।
(১৩) জাতীয় সংহতি শিবির সংগঠিতকরণ।
(১৪) মুক্তমঞ্চ নাটক অভিনয়।
(১৫) শিক্ষামূলক ভ্রমণ।
(১৬) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি।
(১৭) বৃত্তি প্রদান।
(১৮) জাতীয় প্রতিককে সম্মান।
(১৯) জাতীয় পুরস্কার।
(২০) আন্তঃরাজ্য ক্লাব স্থাপন।
(২১) বিদ্যালয় প্রকল্প।
(২২) বিদ্যালয় গ্রন্থাগার।
(২৩) সর্বভারতীয় যুব সংসদ।
(২৪) জাতীয় বিজ্ঞান প্রদর্শনী।
(২৫) জনসংযোগ ব্যবস্থা।
(২৬) বিভিন্ন প্রদেশে শিক্ষার্থী বিনিময়।
(২৭) আলোচনা সভার আয়োজন।
(২৮) জাতীয় মেলার আয়োজন।

Scanning Copyright By
DASCoaching.in
Thank You
Visit Our Educational Website
Regularly For More Update:
https://www.dascoaching.in/
Contact Us On:
Facebook: fb/dascoaching.in
YouTube: DAS Coaching
Mail:
mailto:contact.dascoaching@gmail.com
Follow on Dailyhunt Apps: DAS Coaching
Telegram: DAS Coaching

Scanned with CamScanner

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর
(Short Questions & Answers)

❑ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর (Objective type questions & answers) :

Marks – 2

১। শিক্ষার লক্ষ্য কাকে বলে? (What is aims of education?)

উত্তর : শিক্ষার লক্ষ্য হল সমাজের গতানুগতিক কাজের সঙ্গে নতুন যুগের চাহিদা এবং উদ্ভূত নতুন নতুন সমস্যার সুষ্ঠু সঙ্গতি বিধান করা। কাজেই শিক্ষার লক্ষ্য অনেক ব্যাপক এবং সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলিকে সঠিকভাবে পরিচালিত করে চরম লক্ষ্যে পৌছাতে সাহায্য করা। সমাজের চাহিদার সুষ্ঠু সঙ্গতি বিধানের মাধ্যমে ছাত্রদের নির্দিষ্ট পথে পৌছাতে সাহায্য করতে 'লক্ষ্য' স্থিরীকৃত করা অতীব জরুরি।

২। শিক্ষার উদ্দেশ্য কাকে বলে? (What is objectives of education?)

উত্তর : শিক্ষার উদ্দেশ্য লক্ষ্যের একটি বিচ্ছেদ্য অংশ। উদ্দেশ্য হল নির্দিষ্ট একটি লক্ষ্যে পৌছবার ছোটো ছোটো ধাপ। শিক্ষক যখন বিদ্যালয়ের কর্মপরিকল্পনা (Programme) প্রস্তুত করেন এবং তা কার্যকরী করার কথা চিন্তা করেন তখন তাঁকে প্রকৃত পক্ষে উদ্দেশ্যের কথাই মাথায় রাখতে হয়।

৩। উদ্দেশ্য গঠনের প্রধান ভিত্তি কী? (What are bases of formation of objectives?)

উত্তর : যে-কোনো বিষয় শিক্ষণের মতো শিক্ষাবিজ্ঞান শিক্ষণের উদ্দেশ্যগুলি একটি দৃঢ় দার্শনিক,মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক এবং বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর গঠন করা দরকার। উদ্দেশ্য গঠনের এই প্রধান উৎসগুলি হল নিম্নরূপ–

(i) শিক্ষার্থীর চাহিদা এবং সক্ষমতা (The needs and capabilities of the learner)

(ii) সমাজের চাহিদা (The needs of the society)

(iii) বিষয়বস্তুর প্রকৃতি (The nature of the subject matter)

(iv) শিক্ষাব্যবস্থার প্রকৃতি (The nature of the educational system)

(v) সম্ভাব্যতার বাধ্যবাধকতা (Feasibility constraint)

৪। শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যের কার্যগুলি কী কী? (What are the functions of educational objectives?)

উত্তর : শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যগুলি কীভাবে ব্যক্তির জীবনে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করে? এই প্রশ্নের উত্তর এককথায় দেওয়া বেশ কঠিন। সংক্ষেপে বলা যায় উদ্দেশ্যগুলি ব্যক্তিজীবনে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন সাধনে নিম্নলিখিত ভাবে সাহায্যে করে :

(১) শিক্ষামূলক কাজ কর্মের প্রকৃতি এবং শিক্ষা প্রক্রিয়ার নির্দিষ্ট দিক নির্দেশ করে;

(২) শিখনের বিভিন্ন দিকের পার্থক্য নির্ণয় করে;

(৩) শিখন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন সঠিক প্রকৃতিকে নির্দেশিত করে;

(৪) শিক্ষা প্রক্রিয়ার প্রকৃতি নির্ণয় করে;

(৫) শিখনের অভিজ্ঞতাকে ক্রমানুসারে সজ্জিত করে;

(৬) মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ চিহ্নিত করে;

(৭) শিক্ষামূলক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে;

(৮) বিষয়বস্তু নির্বাচনে সাহায্য করে;

(৯) পাঠ্যক্রমের অর্থ ব্যাখ্যা করে;

(১০) বিভিন্ন স্তরে শিক্ষার উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করে;

(১১) শিখন প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীর শক্তি এবং দুর্বলতা নির্ণয় করে ইত্যাদি।

৫। উদ্দেশ্য নির্বাচনের শর্তগুলি কী কী? (What are the criteria of selection of objectives?)

উত্তর : থার্বার এবং কোলেট (Thurber and Collette) উদ্দেশ্য নির্বাচনের মাপকাঠি হিসেবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উল্লেখ করেছেন :

(১) **কার্যকারিতা বা উপযোগিতা** (Usefulness) : শিক্ষার্থীর জীবনের সঙ্গে শিখনটির মূল্য বা গুরুত্ব থাকতে হবে।

(২) **ব্যবহার যোগ্যতা** (Practicability) : শিক্ষার্থীর শিখন উন্নতিতে প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতাগুলি অর্জনের সম্ভাব্যতা থাকতে হবে।

(৩) **মানানসই** (Fitness) : শিখনের বিষয়গুলিকে একটি বৃহৎ উদ্দেশ্য সাধনের পথে মানানসই হতে হবে।

(৪) **সময়োপযোগিতা** (Timeliness) : শিখনকে অবশ্যই শিক্ষার্থীর পরিচিত পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে সময় উপযোগী হতে হবে।

(৫) **উপযুক্ততা** (Appropriateness) : শিখনকে অবশ্যই শিক্ষার্থীর পরিণমনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এবং যে পরিবেশে থেকে বিকশিত হচ্ছে তার প্রেক্ষাপট অনুযায়ী বা উপযোগী হতে হবে।

Scanned with CamScanner

৬। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মধ্যে পার্থক্য কী? (What is the difference 'Aims' and 'Objectives'?)

উত্তর : লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যের মধ্যে পার্থক্যগুলি উল্লেখ করা হল :

লক্ষ্য	উদ্দেশ্য
(১) একটি বিষয় (Subject) কেন শেখানো হয়, সেই প্রশ্নের উত্তর হল লক্ষ্য।	(১) একটি বিষয়ের কোনো অংশ (topic) শেখানোর পর কী অর্জিত হয় সেই প্রশ্নের উত্তর হল উদ্দেশ্য।
(২) লক্ষ্য হল অভিপ্রায় বা উদ্দেশ্যের সাধারণ ঘোষণা যা শিক্ষণ কর্মসূচির দিক নির্দেশ করে ।	(২) উদ্দেশ্য হল সেই দিক নির্দেশের ছোটো ছোটো স্তর বা ধাপ।
(৩) লক্ষ্য আদর্শের খুব নিকট সম্পর্কিত যা সম্পূর্ণভাবে অর্জন করা যায় না।	(৩) উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে অর্জন করা সম্ভব।
(৪) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা বিদ্যালয়ের সঙ্গে সঙ্গে সমাজও লক্ষ্য অর্জনের জন্য দায়ী।	(৪) উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য শুধু বিদ্যালয় দায়ী।

৭। শিখনের চারটি স্তম্ভ কী কী? (What are the 'Four pillers' of Education?)

উত্তর : ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে **জ্যাকস্ ডেলর** (Jacques Delor)-এর সভাপতিত্বে যে আন্তর্জাতিক শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়, সেই কমিশন ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে একটি প্রতিবেদন পেশ করেন। প্রতিবেদনটি পেশ করা হয় **"Learning : The Treasure Within"** (শিখন : অন্তর্নিহিত সম্পদ) এই শিরোনামে। বিশ্বের বিভিন্ন বিশেষজ্ঞদের দীর্ঘ তিন বছরের আলোচনা ও বিশ্লেষণের ফলশ্রুতি হল এই প্রতিবেদন। প্রতিবেদনের মতে শিক্ষা ব্যবস্থাটি গড়ে উঠবে নিম্নলিখিত চারটি স্তম্ভকে ভিত্তি করে :

(১) জানার জন্য শিক্ষা (Learning to know)
(২) কর্মের জন্য শিক্ষা (Learning to do)
(৩) একত্রে বসবাসের জন্য শিক্ষা ((Learning to live together)
(৪) মানুষ হয়ে ওঠার জন্য শিক্ষা (Learning to be)

৮। জ্ঞানমূলক ক্ষেত্রের অন্তর্গত প্রধান ছয়টি শ্রেণির নাম করুন। (Write six main classes or steps of cognitive domain.)

উত্তর : শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যের জ্ঞানমূলক ক্ষেত্রটি শিক্ষার্থীর মেধা সম্বন্ধীয় উদ্দেশ্য গুলিকে নির্ধারণ করে। অধ্যাপক ব্লুমের প্রস্তুত বর্গীকরণ সূত্রে উদ্দেশ্যগুলিকে কাঠিন্য অনুসারে ছয়টি অংশে বিভক্ত করে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রতিটি উদ্দেশ্য তার পরেরটির সাথে যুক্ত, তার

কারণ হল একটি উদ্দেশ্য অর্জন করতে হলে তার পূর্বের উদ্দেশ্যটির মাধ্যমে অগ্রসর হতে হয়। জ্ঞানমূলক ক্ষেত্রের অন্তর্গত ছয়টি প্রধান শ্রেণি বা দিক হল :

(১) জ্ঞান (Knowledge)
(২) উপলব্ধি (Comprehension)
(৩) প্রয়োগ (Application)
(৪) বিশ্লেষণ (Analysis)
(৫) সংশ্লেষণ (Synthesis)
(৬) মূল্যায়ন (Evaluation)

৯। জ্ঞানের প্রধান তিনটি দিক কী কী? (What are the main three aspect of knowledge?)

উত্তর : জ্ঞানের প্রধান তিনটি দিক হল—

(ক) **নির্দিষ্ট জ্ঞান** (Knowledge of Specifics)
(খ) **পদ্ধতি বিষয়ক জ্ঞান** (Knowledge of Methodology)
(গ) **পৃথকীকরণের জ্ঞান** (Knowledge of Abstractions)

১০। নির্মিতিবাদ কী (What is constructivism?)

উত্তর : নির্মিতিবাদের মূল বক্তব্য হল ব্যক্তি বা শিক্ষার্থী যে জ্ঞান লাভ করে তার কোনো স্বাধীন অর্থ বা সত্তা নেই। শিক্ষার্থী জ্ঞান অর্জনের পরিবর্তে জ্ঞান নির্মাণ করে। ব্যক্তি বা শিক্ষার্থী যখন পরিবেশ থেকে জ্ঞান লাভের উপাদান হিসেবে তথ্য সংগ্রহ করে তখন তার প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ নিজস্ব। অর্থাৎ ব্যক্তি তার সম্পূর্ণ নিজস্ব প্রক্রিয়ায় তথ্য সংগ্রহের পর জ্ঞানের নির্মাণ করে। কিন্তু ব্যক্তি কখনোই তার পরিবেশ থেকে গৃহীত তথ্যকে হুবহু একই রকম বা প্রতিকৃতি হিসেবে গ্রহণ করে না। যে প্রক্রিয়ায় ব্যক্তি অভিজ্ঞতা বা জ্ঞানের উপাদান সংগ্রহ করে তাকে বলা হয় প্রজ্ঞা (Cognition)। প্রত্যক্ষণ, স্মরণ যুক্তিকরণ, বিক্ষণ, সিদ্ধান্তগ্রহণ ইত্যাদি মানসিক প্রক্রিয়া এই প্রজ্ঞার অন্তর্গত।

১১। নির্মিতিবাদের চারটি বৈশিষ্ট্য লিখুন। (Write four characteristics of constructivism?)

উত্তর : নির্মিতিবাদের চারটি বৈশিষ্ট্য হল—

(i) ব্যক্তি বা শিক্ষার্থী নিজেই তার জ্ঞানের নির্মাণকর্তা। এই জ্ঞান সে নির্মাণ করে সম্পূর্ণ সক্রিয়ভাবে।
(ii) ব্যক্তি বা শিক্ষার্থী তার জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় এবং স্নায়বিক সংবেদনকে সক্রিয়ভাবে কাজে লাগিয়ে বস্তু বা ঘটনার অর্থ উপলব্ধি করে।
(iii) শিক্ষার্থী তার জ্ঞানকে নিজের মতো করে সংগঠিত বা নির্মাণ করে। এই জ্ঞান নির্মিত হয় শিক্ষার্থীর পূর্ব অভিজ্ঞতা, মানসিক ক্ষমতা, চাহিদা, সৃজনী ক্ষমতা, উলম্ব ও সমান্তরাল চিন্তন এবং সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে।

Scanned with CamScanner

(iv) শিক্ষার্থীর সংগঠিত বা নির্মিত জ্ঞান কখনোই নৈর্ব্যক্তিক (Objective) নয়, তা ব্যক্তিকেন্দ্রিক (Subjective)। এই কারণে প্রতিটি শিক্ষার্থীর জ্ঞানের অর্থ ভিন্ন ভিন্ন।

১২। প্রজ্ঞামূলক নির্মিতিবাদ কাকে বলে? (What is cognitive constructivism?)

উত্তর : এই মতবাদটির প্রবক্তা হলেন **জ্যা পিঁয়াজে** (Piaget)। পিয়াজের মতে মানুষের চিন্তন প্রক্রিয়ার মৌলিক উপাদান হল **স্কিমা** (schema)। এই স্কিমা হল এমন এক ধরনের মানসিক সংগঠন যা দিয়ে পরিবেশ থেকে আগত তথ্য বা অভিজ্ঞতার উপাদান সঞ্চিত হয়। এই স্কিমার সাহায্যেই মানুষ তার পরিবেশের উদ্দীপক পরিস্থিতিকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করে। ব্যক্তি যখন কোনো উদ্দীপক পরিস্থিতির নতুন তথ্যকে বর্তমানে তার মধ্যে বিদ্যমান স্কিমাতে অঙ্গীভূত বা অন্তর্ভুক্তিকরণের কাজটি করে তখন তাকে বলা হয় আত্তীকরণ (Assimilation)। কিন্তু ব্যক্তি যখন কোনো সম্পূর্ণ নতুন তথ্যকে বর্তমানে তার মধ্যে বিদ্যমান স্কিমা দিয়ে অন্তর্ভুক্তিকরণ না করে নতুন স্কিমা গঠন করে অথবা পূর্ববর্তী স্কিমার রূপান্তর ঘটায় তখন তাকে বলা হয় সহযোজন। এই আত্তীকরণ এবং সহযোজনের ফলশ্রুতিতে যে অভিযোজন ঘটে তার দ্বারা ব্যক্তি পরিবেশের সঙ্গে ভারসাম্য আনার চেষ্টা করে। এই অভিযোজনের ধরন প্রত্যেক ব্যক্তির তার নিজস্ব ব্যাপার। এজন্য ব্যক্তি তার নিজের মতো করে পরিবেশ থেকে জ্ঞানের উপাদান সংগ্রহ করে জ্ঞানের নির্মাণ করে।

১৩। সামাজিক নির্মিতিবাদ কাকে বলে? (What is social constructivism?)

উত্তর : সামাজিক নির্মিতিবাদের প্রবক্তা হলেন রুশ মনোবিজ্ঞানী **ভাইগটস্কি** (Vygotsky)। পিঁয়াজের মতো ভাইগটস্কিও মানব শিশুর জ্ঞানলাভের প্রক্রিয়াকে বর্ণনা করেছেন। ভাইগটস্কির নির্মিতিবাদের মূল বক্তব্য হল মানুষ তার জ্ঞানের নির্মাণ করে পরিবেশ থেকে জ্ঞানের উপকরণ বা সংশ্লিষ্ঠ তথ্য সংগ্রহ করে, কিন্তু সেই পরিবেশ হিসেবে তিনি সামাজিক পরিবেশকে গুরুত্ব দিয়েছেন বেশি। এই ব্যাপারে তিনি মানুষের সমাজ, সংস্কৃতি ও ভাষার প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ভাইগটস্কির নির্মিতিবাদ শিশু এবং তার আরো উন্নত সংস্কৃতিসম্পন্ন মানুষের মধ্যে সাংস্কৃতিক বা কৃষ্টিমূলক মিথষ্ক্রিয়াকে গুরুত্ব দিয়ে মানবশিশুর জ্ঞানের নির্মাণ প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করেছেন। সামাজিক নির্মিতিবাদ অনুসারে শিক্ষার্থী তার জ্ঞানের সংগঠিতকরণ বা নির্মাণ করে তার বন্ধু-বান্ধব, সহপাঠী, শিক্ষক, বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি এবং তার সামাজিক প্রেক্ষাপটের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের সান্নিধ্যে।

১৪। 'মস্তিষ্ক ঝঞ্ঝা' কী? (What is Brain storming?)

উত্তর : চিন্তার আলোড়ন শব্দ গুচ্ছটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হল 'Brain Storming', যার অর্থ মস্তিষ্কের আলোড়ন অন্যভাবে বলা যায় ব্যক্তির স্বাধীনভাবনার মন্থনা। চিন্তার-আলোড়ন হল একটি শিক্ষণ কৌশল (teaching strategy)। এই শিক্ষণ কৌশলটির মাধ্যমে ব্যক্তির

চিন্তা ভাবনার একটি ইতিবাচক পরিবেশ সৃষ্টি এবং অতি অল্প সময়ে তাৎক্ষণিক ভাবে অধিক ধারণা লাভ করাই হল মূল উদ্দেশ্য। মুক্তচিন্তার দ্বারা কোনো সমস্যার সমাধান অথবা নতুন কোনো ধারণা নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত ঘটানোর একটি উপায় হল এই 'চিন্তার আলোড়ন' বা 'Brain Storming'। শিক্ষণ কৌশল হিসেবে এটিকে জনপ্রিয় করে তোলেন A.F. Osborn (1963) তাঁর লেখা 'Applied Imagination'-এর মাধ্যমে। তাঁর মতে কোনো রকম বিচারকরণ বা বিরুদ্ধ সমালোচনা ছাড়াই কোনো পরিস্থিতির সমস্যা সমাধান করা বা তার সঙ্গে সম্পর্কিত ধারণার অনুসন্ধান করার জন্য এই শিক্ষণ কৌশলটিকে একজন শিক্ষার্থীর উপর ব্যবহার করা যেতে পারে।

১৫। 'চিন্তনমূলক শিক্ষণ' কী? (What is Reflective Teaching?)

উত্তর : শিক্ষার্থী যখন দূরদৃষ্টি সম্পন্ন হয়ে মৌলিক চিন্তা করে এবং সমালোচনামূলক বিষয়ে গভীরভাবে নিমগ্ন হয়ে চিন্তা করে তখন সেই স্তরই চিন্তনমূলক স্তর হিসেবে পরিগণিত হয়। এই চিন্তনমূলক স্তরের শিক্ষণের মধ্যেও স্মৃতিমূলক এবং বোধমূলক শিক্ষণ অন্তর্গত। অর্থাৎ এই স্তরের শিক্ষণেও প্রথম দুটি শিক্ষণ স্তর—স্মৃতিমূলক ও বোধমূলক শিক্ষণ ব্যবহার করা যায়, তবে এই স্তরটি অন্য দুটির তুলনায় উচ্চ স্তরের হয়ে থাকে। অত্যাবশ্যকীয় ভাবে চিন্তনমূলক শিক্ষণ বলতে বোঝায় 'সমস্যা কেন্দ্রিক' শিক্ষণ।

Reflection শব্দটির অর্থ হল প্রতিফলন-মূলক কার্য অর্থাৎ ফিরিয়ে দেওয়া, মনশ্চক্ষে দর্শন করা বা গভীরভাবে চিন্তা করা। ফলশ্রুতিতে, চিন্তনমূলক শিক্ষণে থাকতেই হবে প্রতিফলনের পদ্ধতি বা যে বর্তমান জ্ঞান বা ধারণা আছে তাকে অত্যন্ত যত্নের সাথে ফিরিয়ে দেওয়ার বিষয়টি।

১৬। চিন্তনমূলক শিক্ষণের উদ্দেশ্যগুলি কী কী? (What are the objectives of Reflective Teaching?)

উত্তর : চিন্তনমূলক শিক্ষণের উদ্দেশ্যগুলি হল—

(i) শেখা ঘটনা এবং অর্জিত বোধগম্যতা অথবা অন্তর্দৃষ্টিমূলক শিখনে শিক্ষার্থীকে চিন্তার স্তরে নিয়ে যাওয়া।

(ii) অন্তর্দৃষ্টির পরীক্ষিত সামান্যীকরণ চরিত্রকে শিক্ষার্থীর জ্ঞানের ভাণ্ডারে সঞ্চিত করতে সহায়তা করা এবং সৃজনীশক্তির বিকাশ ঘটানো।

(iii) শিক্ষার্থী যাতে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে এগিয়ে আসে সেজন্য তার ক্ষমতার বিকাশ ঘটানো।

(iv) স্বাধীন ও মৌলিক চিন্তন ক্ষমতার বিকাশ-সাধন করা।

Scanned with CamScanner

১৭। ইনটেলিজেন্ট টিউটরিং পদ্ধতি কাকে বলে? (What is intelligent tutoring system?)

উত্তর : উত্তরে বলা যায় ইনটেলিজেন্ট টিউটোরিং পদ্ধতি হল কৃত্রিম বুদ্ধি যুক্ত এমন একটি শিক্ষামূলক সফটওয়ার যা শিক্ষার্থীর কাজের প্রতি নজর রাখে, প্রয়োজন মতো ফিডব্যাক দেয় এবং দরকার মতো উত্তরের ইঙ্গিতও দিয়ে থাকে। শিক্ষার্থীর কাজের ধারা বিশ্লেষণ করে তার ঐ বিষয়ে ভালো দিক এবং দুর্বলতা জানিয়ে দেয় এবং কী কী করলে ওই দুর্বলতা দূর করা সম্ভব হবে তার জন্য প্রয়োজনীয় অনুশীলনী দেয়।

১৮। ইনটেলিজেন্ট টিউটরিং পদ্ধতির উপাদানগুলি কী কী? (What are the components of intelligent tutoring system?)

উত্তর : Burns এবং **Capps** (১৯৮৮) ইন্টেলিজেন্ট টিউটরিং পদ্ধতির তিনটি উপাদানের কথা বলেছেন। সেগুলি হল—

(i) **বিশেষজ্ঞের অংশ** (Expert module) **:** এই অংশের বিভিন্ন ভাগে অন্তর্ভুক্ত থাকে বিভিন্ন স্তরের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞানের বিষয়গুলি, বিশেষজ্ঞের জ্ঞান এবং সমস্যা সমাধানের বৈশিষ্ট্য।

(ii) **শিক্ষার্থীর অংশ** (Student module) **:** এই অংশটি বেশির ভাগ সময় শিক্ষার্থীর মডেল হিসেবেও পরিচিত। এই অংশে অন্তর্ভুক্ত থাকে শিক্ষার্থীর বোধ (understanding) বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাসমূহ।

(iii) **শিক্ষণের অংশ** (Tutoring module) **:** এই অংশটিতে প্রধানত শিক্ষণের কৌশল এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনাসমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকে। কৌশল হিসেবে কখনই এই অংশে প্রকৃত শিক্ষককে রাখা হয় না। এই অংশটির মূল উদ্দেশ্যই হল বিশেষজ্ঞ এবং শিক্ষার্থীর মধ্যে জ্ঞানের পার্থক্যকে ধীরে ধীরে যতখানি সম্ভব কমিয়ে আনা।

ইন্টেলিজেন্ট টিউটরিং পদ্ধতির এই তিনটি উপাদান একত্রে 'প্রচলিত ত্রয়ী' বা 'সনাতন ত্রয়ী' (Traditional Trinity) নামে অভিহিত।

১৯। জাতীয় সংহতি কাকে বলে? (What is National Integration?)

উত্তর : জাতীয় সংহতি এমন একটি বিষয় যা জাতীয় জীবনের সর্বদিককে স্পর্শ করে যায়। এটি হল একটি 'feeling of oneness' অথবা আমরা বোধ অর্থাৎ 'We feeling' মনোভাব। এটি হল এমন একটি উপলব্ধি যা জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধকে জাগ্রত করতে সহায়তা করে। এই আবেগমূলক ভাবগত আদর্শটি দেশের প্রতি শ্রদ্ধা ও আনুগত্যকে সুসংহত করে। একটি ভৌগোলিক পরিসীমায় বসবাসকারী মানবগোষ্ঠী তাদের ব্যক্তিস্বার্থকে তুচ্ছ করে ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, ভাষাগত দিক থেকে ভিন্নতা সত্ত্বেও একাত্মতা ও আত্মীয়তা অনুভব করে সমষ্টিগত স্বার্থকে তুলে ধরতে সার্বিক কল্যাণের পথে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করে।

২০। জাতীয় সংহতির উপাদানগুলি কী কী? (What are the components of National Integration?)

উত্তর : জাতীয় সংহতির উপাদানগুলি হল—

(i) ভৌগোলিক অখণ্ডতা
(ii) জাতীয় ঐতিহ্য
(iii) সাংস্কৃতিক উপলব্ধি
(iv) ভাষাগত নৈকট্য
(v) ধর্মীয় সহনশীলতা
(vi) প্রগতিশীল ভাবনা
(vii) শিক্ষার প্রসার

Download From>>

www.ebook.dascoaching.in

Follow Our B.Ed Related Website>>

www.dascoaching.in

This E-Book Download From>>

www.ebook.dascoaching.in

Scanned with CamScanner

সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি

❑ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Very short type questions) : Marks – 2

১। শিক্ষার লক্ষ্য কাকে বলে? (What is aims of education?)

২। শিক্ষার উদ্দেশ্য কাকে বলে? (What is objectives of education?)

৩। উদ্দেশ্য গঠনের প্রধান ভিত্তি কী? (What are bases of formation of objectives?)

৪। শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যের কার্যগুলি কী কী? (What are the functions of educational objectives?)

৫। উদ্দেশ্য নির্বাচনের শর্তগুলি কী কী? (What are the criteria of selection of objectives?)

৬। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মধ্যে পার্থক্য কী? (What is the difference 'Aims' and 'Objectives'?)

৭। শিখনের চারটি স্তম্ভ কী কী? (What are the 'Four pillers' of Education?)

৮। জ্ঞানমূলক ক্ষেত্রের অন্তর্গত প্রধান ছয়টি শ্রেণির নাম করুন। (Write six main classes or steps of cognitive domain.)

৯। জ্ঞানের প্রধান তিনটি দিক কী কী? (What are the main three aspect of knowledge?)

১০। নির্মিতিবাদ কী (What is constructivism?)

১১। নির্মিতিবাদের চারটি বৈশিষ্ট্য লিখুন। (Write four characteristics of constructivism?)

১২। প্রজ্ঞামূলক নির্মিতিবাদ কাকে বলে? (What is cognitive constructivism?)

১৩। সামাজিক নির্মিতিবাদ কাকে বলে? (What is social constructivism?)

১৪। 'মস্তিষ্ক ঝঞ্ঝা' কী? (What is Brain storming?)

১৫। 'চিন্তনমূলক শিক্ষণ' কী? (What is Reflective Teaching?)

১৬। চিন্তনমূলক শিক্ষণের উদ্দেশ্যগুলি কী কী? (What are the objectives of Reflective Teaching?)

১৭। ইনটেলিজেন্ট টিউটরিং পদ্ধতি কাকে বলে? (What is intelligent tutoring system?)

১৮। ইনটেলিজেন্ট টিউটরিং পদ্ধতির উপাদানগুলি কী কী? (What are the components of intelligent tutoring system?)

১৯। জাতীয় সংহতি কাকে বলে? (What is National Integration?)

২০। জাতীয় সংহতির উপাদানগুলি কী কী? (What are the components of National Integration?)

❑ সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্নাবলি (Short answer type questions) : Marks – 5

১। শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যের কার্যাবলি সংক্ষেপে লিখুন। (Write in brief the functions of Educational Objectives.)

২। 'জানার জন্য শিখন' বলতে কী বোঝায়? (What do you mean by 'Learning' to Know?)

৩। 'কর্মের জন্য শিখন' বলতে কী বোঝায়? (What do you mean by 'Learning to Do'?)

৪। 'একত্রে বসবাসের জন্য শিখন' বলতে কী বোঝায়? (What do you mean by 'Learning to Live Together'?)

৫। 'মানুষ হয়ে ওঠার জন্য শিখন' বলতে কী বোঝায়? (What do you mean by 'Learning to Be'?)

৬। নির্দেশনামূলক উদ্দেশ্যের ধারণা দিন। (Give the concept of Instructional objectives.)

৭। মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে শিক্ষাবিজ্ঞানের সম্পর্ক লিখুন। (Write the relation of Education with Psychology.)

৮। সমাজতত্ত্বের সঙ্গে শিক্ষাবিজ্ঞানের সম্পর্ক লিখুন। (Write the relation of Education with Sociology.)

৯। ইতিহাসের সঙ্গে শিক্ষাবিজ্ঞানের সম্পর্ক লিখুন। (Write the relation of Education with History.)

১০। ভূগোল-এর সঙ্গে শিক্ষাবিজ্ঞানের সম্পর্ক লিখুন। (Write the relation of Education with Geography.)

১১। অর্থনীতির সঙ্গে শিক্ষাবিজ্ঞানের সম্পর্ক লিখুন। (Write the relation of Educational with Economics.)

Scanned with CamScanner

১২। নির্মিতিবাদের বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী? (What are the characteristics of Constructivism?)

১৩। চিন্তনমূলক শিক্ষণের বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী? (What are the characteristics of Reflective Teaching?)

১৪। শিক্ষাক্ষেত্রে বহুমাধ্যমের প্রকৃতি উল্লেখ করুন। (Write the nature of multimedia in Education.)

১৫। জাতীয় সংহতির প্রয়োজনীয়তার দিকগুলি কী কী? (What are the needs for National Integration?)

১৬। জাতীয় সংহতিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা কী? (What is the role of educational institution in National Integration?)

❑ রচনাভিত্তিক প্রশ্ন (Essay type questions) : Marks – 10

১। বিদ্যালয় স্তরে শিক্ষাবিজ্ঞান শিক্ষণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলি সংক্ষেপে বর্ণনা করুন। (Discuss the aims and objectives of teaching Education in school level.)

২। শিক্ষাবিজ্ঞান শিক্ষণের মূল্য বর্ণনা করুন। (Describe the values of teaching Education.)

৩। বিদ্যালয় স্তরের পাঠক্রমে শিক্ষাবিজ্ঞানের স্থান নির্ণয় করুন। (State the place of Education in school curriculum.)

৪। নির্মিতিবাদী শ্রেণিকক্ষের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন। (Discuss the characteristics of constructivist classroom.)

৫। নির্মিতিবাদ শিক্ষণে শিক্ষকের ভূমিকা কী? (What is the role of teacher in constructivist approach of teaching?)

৬। চিন্তার আলোড়ন কৌশলের সুবিধা ও অসুবিধাগুলি কী কী? (What are the advantages and disadvantages of Brain Storming Strategy?)

৭। জাতীয় সংহতিতে শিক্ষার ভূমিকা কী? (What is the role of education in National Integration?)

৮। জাতীয় সংহতিতে শিক্ষাবিজ্ঞান শিক্ষণের ভূমিকা কী? (What is the role of teaching Education in National Integration?)

অধ্যায় ২

সমাজবিজ্ঞান (শিক্ষাবিজ্ঞান) শিক্ষণের কৌশলসমূহ

[Strategies of Social Science (Education) Teaching]

◈ বিষয়বস্তুর রূপরেখা :

২.০ ভূমিকা (Introduction)
২.১ বিভিন্ন শিক্ষার পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য, সীমাবদ্ধতা এবং তুলনা (Features, Limitations and comparison of different methods)
২.২ বক্তৃতা পদ্ধতি (Lecture Method)
২.৩ পারস্পরিক ক্রিয়া পদ্ধতি (Interactive Method)
২.৩.১ শ্রেণিকক্ষে পারস্পরিক ক্রিয়া (Interaction in the class)
২.৩.২ ছোট দলে পারস্পরিক ক্রিয়া পদ্ধতি শিক্ষণ (Interactive Instruction in Small Group)
২.৪ প্রতিপাদন-পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি (Demonstration Observation Method)
২.৫ হিউরিস্টিক পদ্ধতি (Heuristic Method)
২.৬ প্রোজেক্ট পদ্ধতি (Project Method)
২.৭ কম্পিউটার সহায়ক নির্দেশনা (Computer Assisted Instruction/CAI)

✪ ২.০ ভূমিকা (Introduction) :

নিজের অজ্ঞাত সারেই মানুষ একদিন শিক্ষার সূত্রপাত ঘটিয়েছিল। তারপর কালে কালে তা একদিন প্রথাগত শিক্ষায় রূপলাভ করে। এই প্রথাগত শিক্ষাও বহু যুগের সাফল্য ও ব্যর্থতার সংমিশ্রণে আধুনিক রূপ গ্রহণ করে। সমাজ জীবনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের এই প্রথাগত শিক্ষা ও বিবর্তিত হয়েছে প্রতিটি যুগের বৈশিষ্ট্য নিয়ে। শিক্ষার লক্ষ্য যেমন বিবর্তিত হয়েছে তেমনি বিবর্তিত হয়েছে শিক্ষার পদ্ধতিও। যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ চিন্তা

Scanned with CamScanner

করে এসেছে কিভাবে, কত সহজে, সার্থকভাবে শিক্ষার বিষয় বস্তুকে শিক্ষার্থীর নিকট পৌঁছে দেওয়া যাবে। এইভাবে শিক্ষার পদ্ধতি একটি প্রাসঙ্গিকতা লাভ করেছে, যা আজও সমানভাবে প্রবহমান।

শিক্ষণ পদ্ধতি বলতে কী বোঝায়? শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও পাঠ্যবিষয়বস্তুর মধ্যে যে প্রক্রিয়ার একটি সুগভীর সম্পর্ক স্থাপিত হয়, তাকেই বলা যায় শিক্ষণ পদ্ধতি। শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ার একপ্রান্তে যেমন অবস্থান করে শিক্ষার্থী তেমনই অন্য প্রান্তে অবস্থান করেন শিক্ষক। শিক্ষকের পরিবেশিত জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থী গ্রহণ করে। বস্তুত শিক্ষক যে নির্দিষ্ট কৌশলে পাঠ্যবিষয়বস্তুকে শিক্ষার্থীদের নিকট পৌঁছে দেন বা শিক্ষার্থীদের আয়ত্ত করতে সহায়তা করেন তাকেই বলা হয় শিক্ষণপদ্ধতি। এই শিক্ষণ পদ্ধতির কয়েকটি সম্পর্কে এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

✪ ২.১ বিভিন্ন শিক্ষার পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য, সীমাবদ্ধতা এবং তুলনা (Features, Limitations and comparison of different methods) :

✪ ২.২ বক্তৃতা পদ্ধতি (Lecture Method) :

বক্তৃতা পদ্ধতি হল পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন শিক্ষণপদ্ধতি। সারা পৃথিবীতে বিদ্যালয় স্তরের পাঠক্রমে অতি অল্প খরচে এই শিক্ষণপদ্ধতি প্রয়োগ করা সম্ভব হয়। শিক্ষক সহজে, অল্প পরিকাঠামোযুক্ত পরিস্থিতিতেও এই পদ্ধতিকে ব্যবহার করতে পারেন। প্রত্যক্ষ নির্দেশনার একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হল এই বক্তৃতা পদ্ধতি কারণ শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব হয় এই পদ্ধতিতে। বক্তৃতা পদ্ধতিতে শিক্ষক পাঠ্যবিষয়বস্তুকে সংগঠিতভাবে শিক্ষার্থীদের সামনে মৌখিকভাবে উপস্থাপন করেন। তত্ত্ব থেকে উদাহরণ এবং প্রয়োজনে পেছন দিকে অর্থাৎ উদাহরণ থেকে তত্ত্ব উপস্থাপন করেন। যদিও বক্তৃতা পদ্ধতি পাঠ্যবিষয়বস্তুকে গভীরে প্রবেশ করার দিকে জোর দেয় এবং বহুলাংশে শিক্ষককেন্দ্রিক, শিক্ষার্থীরা নিষ্ক্রিয় থাকে তথাপি শিক্ষক প্রয়োজন অনুসারে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য প্রশ্নোত্তরের ব্যবস্থা ও রাখতে পারেন। এজন্য অনেক সময় শ্রেণি শিখনে বক্তৃতার প্রশ্নের গুরুত্ব বেশি। সুতরাং বক্তৃতার বর্ণনা এবং ব্যাখ্যাদানের সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্নের ব্যবহার করলে পদ্ধতিটির উপযোগিতা বৃদ্ধি পায়। প্রশ্ন করার মাধ্যমে যেমন শিক্ষার্থীদের বক্তৃতার প্রতি মনোযোগী করা যায় তেমনই সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সক্রিয়তাও বাড়ানো সম্ভব হয়। অবশ্য প্রশ্ন হবে প্রাসঙ্গিক, এর প্রয়োগ হবে যথাযথ এবং পাঠের অগ্রগতির সহায়ক। বক্তৃতা পদ্ধতিতে প্রশ্ন ব্যবহারের কতকগুলি উদ্দেশ্য থাকবে সেগুলি হল :

(i) প্রশ্নের ফলে শিক্ষার্থীকে যেমন সতর্ক করা হবে তেমনই তার মনোযোগ বাড়ানো হবে।

(ii) শিক্ষার্থী যাতে বক্তৃতার সমস্ত অংশের প্রতি নজর রাখে সে জন্য প্রশ্ন করা হবে বক্তৃতার বিভিন্ন দিক থেকে।

(iii) প্রশ্ন শিক্ষার্থীকে সমস্ত বিষয়টিকে যেমন ঝালিয়ে নিতে সাহায্য করবে তেমনই শিখনকে ধরে রাখার কাজও করবে।

(iv) শিক্ষার্থীর শিখনে দুর্বলতার অবস্থান জানতে পারবে প্রশ্নকরণের দ্বারাই।

(v) শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মিথষ্ক্রিয়া বৃদ্ধির মাধ্যমে শিখনের মাত্রা বৃদ্ধি করবে প্রশ্ন।

● **বক্তৃতার পরিকল্পনা** (Planning of the Lecture) : বক্তৃতা পদ্ধতির সাফল্য বহুলাংশে নির্ভরশীল সঠিক পরিকল্পনার উপর। বক্তৃতা দেওয়ার আগে শিক্ষক চারটি মৌলিক প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হবেন। সেগুলি হল–

(ক) বক্তৃতার শ্রোতা কে বা কারা ?

(খ) বক্তৃতাদানের উদ্দেশ্য কী? অথবা, কেন বক্তৃতা দেওয়া হবে?

(গ) কতখানি সময় সহজলভ্য?

(ঘ) বিষয়বস্তু কী?

(ক) শ্রোতা বা শিক্ষার্থী :

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের বক্তৃতা শোনার জন্য যারা থাকে তারা হল শিক্ষার্থী। এইসব শিক্ষার্থীদের প্রকৃতি, পছন্দ, অপছন্দ, সংস্কৃতিগত পরিচয়, শিক্ষার স্তর, বিষয়বস্তু সম্পর্কে পূর্বজ্ঞান ইত্যাদি শিক্ষকের জানা দরকার। এইসব বিষয় জানার জন্য শিক্ষক প্রশ্নোত্তর এর সাহায্য নিতে পারেন।

(খ) বক্তৃতাদানের উদ্দেশ্য :

বক্তৃতাদানের পর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে কী প্রত্যাশা করবেন? এটি নির্ভর করবে তার দৃষ্টিভঙ্গির উপর। এ ব্যাপারে শিক্ষকের উদ্দেশ্য হতে পারে :

(i) একটি বিষয়ের সাধারণ ধারণা দেওয়া,

(ii) নতুন বিষয় প্রসঙ্গে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন,

(iii) কোনো মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করা,

(iv) কোনো বিষয়ে বিস্তৃত তথ্য প্রদান, এবং

(v) কোনো একটি বিশেষ বিষয়ে দক্ষতা শেখানো।

(গ) সময় :

শিক্ষককে এটা বোঝা দরকার যে, যেটুকু সময় বরাদ্দ আছে বক্তৃতার জন্য তাতে বক্তৃতাদানের পরিকল্পনাটি এমন হবে যাতে ওই নির্দিষ্ট সময়ে আকর্ষণীয় উদাহরণ, প্রশ্ন, আলোচনা ইত্যাদি সবকিছু এমনভাবে উপস্থাপিত হবে যাতে শিক্ষার্থীদের সারা বক্তৃতায় আগ্রহ বজায় রাখা যেতে পারে।

Scanned with CamScanner

(ঘ) বিষয়বস্তু :

শিক্ষক যে-বিষয়ে বক্তৃতা দেবেন সেইবিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞানের অধিকারী হবেন। বিষয়বস্তুকে সুনির্দিষ্ট রীতি বিন্যস্ত করার জন্য ছোটো ছোটো ভাগে ভাগ করে সেগুলিকে বিন্যাস অনুযায়ী ধাপে ধাপে উপস্থাপন করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীরা বিষয়বস্তু সহজেই বুঝতে পারে। এ ব্যাপারে একটি বিস্তৃত out line থাকলে ভালো হয়। বক্তৃতার পরিকল্পনাকে আরও একটু উন্নত করা যেতে পারে নিম্নলিখিতভাবে।

(i) বক্তৃতার বিষয়বস্তুকে আগে থেকে শিক্ষার্থীদের বলে দিতে পারলে ভালো হয়। এর জন্য হ্যান্ডআউট ব্যবহার করা যেতে পারে। এতে শিক্ষার্থীরা বিষয়বস্তু সম্বন্ধে প্রস্তুতি নিতে পারবে। বিষয়ের জটিল দিকগুলিও জেনে নিতে পারবে। ফলে শিক্ষার্থীর শ্রেণিতে নোট নেওয়া সহজ হবে।

(ii) বক্তৃতার বিষয়বস্তুর মূল পয়েন্টগুলিকে বোর্ডে লিখে দিলে শিক্ষার্থীদের শিখন প্রক্রিয়া সহজ হয় শিক্ষক ও ধারাবাহিকভাবে নির্দেশনা দিতে পারেন। বোর্ডে পয়েন্টগুলি লেখার সময় চার্ট ও ডায়াগ্রাম প্রাসঙ্গিকভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

(iii) যতটা সম্ভব শিক্ষার্থীদের পূর্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে বিষয়কে বোঝানো যেতে পারে। বিভিন্ন দৃষ্টি-শ্রবণ নির্ভর শিক্ষণ-উপকরণ (Audio-visual Aids) ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন—রেডিয়ো, টেলিভিশন, কম্পিউটার, প্রোজেক্টর ইত্যাদি। এতে বক্তৃতা যেমন মনোগ্রাহী হবে তেমনি অন্যদিকে শিক্ষার্থীদের একঘেয়েমিও দূর হবে।

(iv) পাঠ-সমাপ্তি পর্বে শিক্ষক তার বক্তৃতার উদ্দেশ্য objectives অনুযায়ী বক্তৃতা শেষ করবেন, কিন্তু মূল পয়েন্টগুলিকে ধরে আরও একবার তিনি বক্তৃতার মূলবিষয়বস্তুর সারসংক্ষেপ করবেন।

বক্তৃতা শেষে শ্রেণিতে শিক্ষণ পদ্ধতির গুণগত মান নির্ভর করবে শিক্ষার্থীরা বিষয়বস্তুকে কতখানি

(১) গ্রহণ করতে পেরেছে,

(২) কতটা মনে রাখতে পেরেছে এবং

(৩) কতখানি পুনরুদ্রেক করতে পারছে তার উপরে।

বক্তৃতার সাফল্য নির্ভর করে শিক্ষকের বলা ভাষার ব্যবহার, বাচনভঙ্গি, উপস্থাপনের ধরন বা পদ্ধতির উপর। শিক্ষকের প্রচেষ্টা, অনুশীলন, আগ্রহ এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

চিত্র- ১২ : বক্তৃতার পরিকল্পনা

● **একটি ভালো বক্তৃতার বৈশিষ্ট্য** (Characteristics of a good lecture) : একটি ভালো বক্তৃতা প্রদানের জন্য শিক্ষককে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা দরকার। বিষয়গুলির নিম্নে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল :

(১) **শিক্ষকের অবস্থান :** শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে যখন বক্তৃতা রাখার জন্য প্রস্তুত হবেন তখন তিনি এমনভাবে অবস্থান করবেন বা দাঁড়াবেন যাতে সকল শিক্ষার্থী স্বচ্ছন্দে তাঁকে দেখতে পায়। শিক্ষক এমন একটি সুবিধাজনক স্থানে দাঁড়াবেন যেখানে দৃষ্টিমূলক শিক্ষা-উপকরণগুলি দেখা যায় এবং শিক্ষকের বক্তৃতা খুব স্বচ্ছন্দে শিক্ষার্থীরা শুনতে পায়।

(২) **বাহ্যিক রূপ :** শিক্ষকের চেহারা বা বাহ্যিক রূপ এমন হবে যাতে শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শিক্ষকের সাজপোশাক হবে পরিচ্ছন্ন, রুচিসম্পন্ন এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মানানসই। এককথায় তাঁকে দেখলেই শিক্ষার্থীরা শ্রদ্ধায় আগ্রহ অর্জন করবে।

(৩) **চাল-চলন ব্যবহার :** বক্তৃতা চলাকালীন শিক্ষার্থীদের মনোযোগকে ধরে রাখার জন্য শিক্ষকের আচার-আচরণের সংযম যেমন দরকার তেমনি অন্যদিকে মার্জিত ও অমায়িক ব্যবহার ও দরকার।

(৪) **দেহভঙ্গি :** বক্তৃতা চলাকালে শিক্ষকের কার্যাবলি ও দেহভঙ্গি যতখানি সম্ভব স্বাভাবিক এবং স্বতঃস্ফূর্ত হওয়া দরকার। কোনোরকম মুদ্রাদোষ যেন প্রকাশ না পায়,

Scanned with CamScanner

যেমন চক নিয়ে খেলা বা ছেঁড়াছুড়ি করা, ঠোঁট কামড়ানো, কিংবা অস্বাভাবিক অঙ্গভঙ্গি করা থেকে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

(৫) **কণ্ঠস্বর :** শিক্ষকের কণ্ঠস্বর ব্যবহৃত হবে অত্যন্ত স্বাভাবিক ও স্বচ্ছন্দভাবে। কণ্ঠস্বরে যেমন আত্মবিশ্বাস, আবেগ নিয়ন্ত্রিত থাকবে তেমনই প্রয়োজনে বিশেষে বিশেষ স্থানে স্বরের ওঠানামা হবে। উচ্চারণ হবে স্পষ্ট।

(৬) **শব্দজ্ঞান :** শিক্ষক তাঁর বক্তৃতা দেবেন খুব সহজ সরল ভাষায়। কোনো জটিল, অস্বাভাবিক শব্দ বা অশালীন শব্দ ব্যবহার করবেন না যাতে শিক্ষার্থীরা ভুল ব্যাখ্যা করে। ভাষাগত কু-অভ্যাস থেকে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করবেন। শিক্ষার্থীদের বোধগম্য শব্দ ও বাক্য ব্যবহার করা উচিত।

(৭) **দৃষ্টি-শ্রবণমূলক উপকরণের ব্যবহার :** গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট ব্যবহার করার সময় শিক্ষক যেমন ব্ল্যাকবোর্ডের ব্যবহার করতে পারেন তেমনই সম্ভব হলে দৃষ্টি-শ্রবণমূলক উপকরণ ও ব্যবহার করতে পারেন যাতে বক্তৃতার মূল্য বা গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়।

(৮) **সময়ের ব্যবহার :** বক্তৃতার মূল বস্তু আলোচনার পর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের জন্য শেষের দিকে ১০ মিনিট প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করতে পারেন। সমস্ত বিষয়টি কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই শিক্ষককে শেষ করা দরকার।

● **বক্তৃতা পদ্ধতির সুবিধা** (Merits of Lecture method) :

আজকের এই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতি ঘটা সত্ত্বেও বক্তৃতা পদ্ধতির জনপ্রিয়তা যথেষ্ট। বক্তৃতা পদ্ধতির সুবিধার দিকগুলি হল :

(১) বক্তৃতা পদ্ধতিটির ব্যবহারিক খরচ যেমন অনেক কম তেমনই একজন মাত্র শিক্ষক এক সঙ্গে বহু শিক্ষার্থীকে নির্দেশনা দিতে পারেন।

(২) পরিবেশ সঠিক হলে নতুন তথ্য পরিবেশনার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি অন্য পদ্ধতির মতোই সমান কার্যকরী।

(৩) বহু শিক্ষক বক্তৃতা পদ্ধতিকে সুবিধাজনক পদ্ধতি বলে মনে করেন। শিক্ষক নিজের ইচ্ছামতো খুব সহজেই পাঠদান করতে পারেন।

(৪) শিক্ষক—শিক্ষার্থী সম্পর্ক অনেক বেশি সহজ ও স্বচ্ছন্দ।

(৫) কোনো ঐতিহাসিক ঘটনা, আবিষ্কারের কাহিনির বর্ণনা, তথ্যপূর্ণ কোনো বিষয় উপস্থাপনা, ব্যাখ্যাদানের দ্বারা বিষয়বস্তুর আলোচনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে বক্তৃতা পদ্ধতি বিশেষ উপযোগী।

(৬) বক্তৃতা পদ্ধতির মতো প্রত্যক্ষ নির্দেশনার মাধ্যমে কোনো বিষয়ে আগ্রহ সৃষ্টি করা অনেকবেশি ফলপ্রসূ। গবেষণা এই বক্তব্যকে সমর্থন করে।

(৭) বক্তৃতা পদ্ধতি যেহেতু শিক্ষককেন্দ্রিক তাই শিক্ষার্থীরা সহজেই গ্রহণ করতে পারে।

● **বক্তৃতা পদ্ধতির অসুবিধা** (Demerits of Lecture Method) :

বক্তৃতা পদ্ধতির অনেক সুবিধা থাকলেও, এটি সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত নয়। বক্তৃতা পদ্ধতির বেশ কিছু দুর্বলতা লক্ষ করা যায়। শিক্ষাবিদ্ কারনাইন (Carnine, D, 2000), শিশু মনস্তত্ত্ব বিশেষজ্ঞ ডেভিড অ্যালকাইন্ড এর মন্তব্য উল্লেখ করেছেন : It (Lecture) is even worse for young disadvantaged children because if imprints them with a rote learning style that could be damaging later on"

বক্তৃতার পদ্ধতির বেশ কিছু দুর্বলতা নীচে উল্লেখ করা হল :

(১) শিক্ষকের ব্যক্তিগত যোগ্যতার উপর যেহেতু বক্তৃতা পদ্ধতির সাফল্য নির্ভর করে তাই যোগ্যশিক্ষক না হলে এই পদ্ধতির সাফল্য অনেক কম হবে।

(২) বক্তৃতা শোনার মতো মানসিকতা ও ধৈর্য না থাকলে শিক্ষার্থী এই পদ্ধতিতে উপকার কম পাবে এবং শিখনও কম হবে।

(৩) বক্তৃতা পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা যেহেতু অনেকাংশেই নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করে তাই তাদের মনোযোগ যেমন কম থাকে তেমনি শিখনের মাত্রা কম হয়।

(৪) শিক্ষাবিজ্ঞানের জ্ঞান না থাকলে নির্দেশক শিক্ষার্থীর প্রয়োজন, অসুবিধা ইত্যাদি বুঝতে পারবেন না, এতে শিখনমাত্রা কম হয়।

(৫) বক্তৃতা পদ্ধতিতে নির্দেশকের লেখা, বলা এবং অন্যান্য দক্ষতার যথেষ্ট প্রয়োজন। কিন্তু বাস্তবে অনেকক্ষেত্রে এই ধরনের নির্দেশক পাওয়া বেশ কঠিন।

(৬) বক্তৃতা পদ্ধতিতে বহুক্ষেত্রে ব্যক্তি বৈষম্যের নীতি মেনে চলা সম্ভব হয় না। এজন্য সবধরনের শিক্ষার্থী এতে সুবিধা নাও পেতে পারে।

(৭) দীর্ঘ বক্তৃতা শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানসিক অবসাদ, ক্লান্তি ও একঘেয়েমি সৃষ্টি করে। অনেকসময় শিক্ষার্থীরা এতে আনন্দলাভ করতে পারে না।

(৮) বিজ্ঞান বিষয়ের পরীক্ষা-নিরীক্ষা এই পদ্ধতি করা সম্ভব হয় না। শিক্ষার্থীদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশসাধন হয় না এবং স্বাধীন চিন্তাশক্তিরও বিকাশ ঘটে না।

✪ ২.৩ পারস্পরিক ক্রিয়া পদ্ধতি (Interactive Method) :

এই ধরনের শিক্ষণ পদ্ধতিতে প্রধানত আলোচনা এবং অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের মধ্যে আদান-প্রদানকেই গুরুত্ব দেওয়া হয় বেশি। Seaman এবং Fellenz (১৯৮৯)-এর মতে শিক্ষক এবং সহপাঠীদের সঙ্গে পারস্পরিক আলোচনা এবং চিন্তার আদান-প্রদানে তাঁদের ভাবনা, অভিজ্ঞতা, অন্তর্দৃষ্টি এবং জ্ঞানের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের প্রতিনিয়ত প্রতিক্রিয়া হয়। এর ফলে শিক্ষার্থীরা তাদের নতুন নতুন চিন্তা এবং অনুভূতি গড়ে তুলতে সক্ষম হয়।

Scanned with CamScanner

শিক্ষার্থীগণ তাদের সহপাঠী এবং শিক্ষকদের নিকট থেকে সামাজিক পরিস্থিতিতে নানা কৌশল এবং দক্ষতা অর্জন করতে পারে। এর ফলে এক দিকে যেমন তাদের চিন্তাশক্তির স্ফুরণ ঘটে ও সুসংগঠিত হয় তেমনি অন্যদিকে তাদের মধ্যে যুক্তিবোধ গড়ে ওঠে। এই পারস্পরিক ক্রিয়া পদ্ধতির শিক্ষণে দলগঠন এবং পদ্ধতি বিভিন্ন রকম হতে পারে। দলগঠন এবং পদ্ধতি নির্ভর করে শিক্ষণের পরিবেশ এবং অন্যান্য শর্তের উপর। যেমন—এই পদ্ধতি শ্রেণিতে, ছোট দলের আলোচনায়, দু-তিন জন ছাত্রের প্রজেক্টের কাজ ব্যবহার করার উপযোগী। শিক্ষককে বিষয়ের ছক তৈরি করা, আলোচনার সময় স্থির করা, দলের আয়তন নির্ধারণ করা এবং আলোচনার কৌশল নির্বাচন করে দিতে হবে।

পারস্পরিক ক্রিয়া পদ্ধতির শিক্ষণে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা শোনার অভ্যাস গঠন, পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নত করা এবং অন্যান্য শিক্ষামূলক দক্ষতাকে আরও সুসংবদ্ধ করতে সাহায্য করে।

পারস্পরিক ক্রিয়া শিক্ষণ পদ্ধতির কৌশল এবং পদ্ধতি নির্ভর করে শিক্ষকের দক্ষতার উপর। শিক্ষক যত ভালোভাবে দলের গঠন পরিচালন পদ্ধতি স্থির করতে পারবেন ততই এই শিক্ষণ পদ্ধতি উন্নতমানের হবে। পারস্পরিক ক্রিয়া শিক্ষণ পদ্ধতিতে যে সমস্ত কৌশলকে ব্যবহার করা হয় তাদের কয়েকটি হল নিম্নরূপ—

(i) বিতর্ক (Debate)
(ii) রোল প্লেয়িং (Role Playing)
(iii) প্যানেল আলোচনা (Panel Discussion)
(iv) চিন্তায় আলোড়ন (Brain Storming)
(v) আলোচনা (Discussion)
(vi) সাক্ষাৎকার (Interview)
(vii) কনফারেন্সিং (Conferencing)
(viii) পরীক্ষাগারের দল (Laboratory Groups)

❑ ২.৩.১ শ্রেণিকক্ষে পারস্পরিক ক্রিয়া (Interaction in the class) :

শ্রেণিকক্ষে পাঠদানকালে শিক্ষক যখন কোনো তথ্য সংক্রান্ত আলোচনা করেন অথবা নতুন কোনো তথ্য ব্যাখ্যা করেন তখন ওই শ্রেণি শিক্ষার্থীগণ একটি দল হিসেবে কাজ করে। শিক্ষক তখন চেষ্টা করবেন যাতে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সহজ সম্পর্ক স্থাপন করা যায়। এর ফলশ্রুতিতে প্রকৃত শিখন অনেক বেশি হয় এবং শিক্ষার্থীরাও সহজে আলোচনায় অংশগ্রহণ করার প্রশিক্ষণ পায়। পারস্পরিক ক্রিয়া পদ্ধতিতে দলগত শিখন পদ্ধতি এবং আলোচনার মাধ্যমে শিখনকে রপ্ত করতে হয়। যে সমস্ত শিক্ষার্থী এই পদ্ধতি আয়ত্ত করতে পারে তাদের ক্ষেত্রে শিখন অনেক বেশি কার্যকরী হয় কারণ এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর নিজের প্রতি আস্থা

যেমন বৃদ্ধি পায় তেমনি অন্যদিকে তার নিজের ধারণা বিকাশ ও দ্রুত ও গভীর হয়। শ্রেণিকক্ষে যে দুটি পারস্পরিক ক্রিয়া পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় তা হল—(১) আলোচনা পদ্ধতি এবং (২) প্রশ্ন ও উত্তর পদ্ধতি। নিম্নে এই দুটি পদ্ধতি সংক্ষেপে বর্ণনা করা হল—

(১) **আলোচনা পদ্ধতি** (Discussion) : জ্ঞান বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে সৃজনশীল অনুসন্ধান অনেকবেশি কার্যকরী পদ্ধতি সেই বিষয়ে শিক্ষাবিদ্‌রা একমত। শ্রেণিকক্ষে এই সৃজনশীল অনুসন্ধান অর্জন করা সম্ভব। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক যখন কোনো নতুন বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করেন তখন শিক্ষার্থীরা যদি ওই আলোচনায় অংশগ্রহণ করে তবে ধারণাগুলির বিকাশ ঘটে এবং নতুন জ্ঞান অর্জন অনেক বেশি সহজ হয়। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যেতে পারে, কোনো শিক্ষক যখন কোনো নতুন তথ্য আলোচনা করেন তখন যদি শিক্ষক দেখেন যে শিক্ষার্থীরা বিষয়টি নিয়ে বেশ আগ্রহী এবং তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আলোচনায় অংশগ্রহণ করছে তবে একদিকে শিক্ষকের শিক্ষণ দিতে যেমন ভাল লাগে, অন্যদিকে তেমনি সমস্ত শ্রেণি আলোচনায় অংশ গ্রহণ করার ফলে বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনা হয়ে যায় এবং কোনো শিক্ষার্থীর কোথাও কোনো দুর্বলতা থাকলে তাও সে কাটিয়ে উঠতে পারে। অবশ্য এক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় মনে রাখতে হবে—প্রথমত, যে বিষয়টি নিয়ে শিক্ষক আলোচনা করছেন সেই বিষয়টি তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান থাকতে হবে নতুবা শিক্ষার্থীদের সমস্ত জিজ্ঞাসার সম্পূর্ণ যুক্তিপূর্ণ উত্তর প্রদান করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না। দ্বিতীয়ত, শিক্ষার্থীদের আলোচনা করার সময় শিক্ষককে নজর রাখতে হবে শিক্ষার্থীদের নতুন পদ নতুন ধারণা বিষয়ে তারা আয়ত্ত করতে পেরেছে কিনা। বিষয়টি যদি শিক্ষার্থীদের কাছে স্বচ্ছ হয়ে ওঠে তবেই হয়তো সে পরবর্তীকালে ওই বিষয়টি নিয়ে গবেষণা স্তর পর্যন্ত অগ্রসর হতে পারে।

(২) **প্রশ্ন ও উত্তর পদ্ধতি** (Question and answer) : শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক যখন কোনো শিক্ষার্থীকে প্রশ্ন করেন, তখন শিক্ষার্থী কিন্তু মনে করে যে, শিক্ষক তাকে বিশেষভাবে দেখছেন। এইভাবে প্রশ্ন ও উত্তরের মাধ্যমে যখন শ্রেণিত পঠন-পাঠন সম্পন্ন হয় তখন শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক তৈরি হয়। এর ফলে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর পারস্পরিক ক্রিয়া অনেক বেশি হয় এবং সেই সঙ্গে একটি সহজ সম্পর্কের মাধ্যমে সমস্ত শিক্ষা পরিবেশ সংগঠিত হয়। সুতরাং এইভাবে শ্রেণিতে পঠন-পাঠনে শুধুমাত্র বোধমূলক এবং অনুভূতিমূলক ক্ষেত্রই নয়, মানসিক ক্রিয়ার গতি সংক্রান্ত ক্ষেত্রেও শিক্ষার্থীর যথেষ্ট পরিবর্তন হয়। আবার অন্যদিকে শিক্ষকের প্রশ্নের পরে শিক্ষার্থীর উত্তরদান বা প্রতিক্রিয়ার সাহায্যে শিক্ষক একদিকে জানতে পারে শিক্ষার্থীর শিখনের মাত্রা, অন্যদিকে তিনি জানতে পারেন শিক্ষকের নির্দেশনা পদ্ধতি, পাঠ্যসূচির কাঠিন্য বা শিক্ষার্থীর ক্ষমতা ইত্যাদি।

প্রশ্ন ও উত্তরদানের এই কৌশলটি সঠিকভাবে কার্যকরী করে তুলতে হলে কতকগুলি বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সেগুলি হল—

Scanned with CamScanner

(i) শ্রেণিকক্ষে যে প্রশ্নগুলি করা হবে, সেই প্রশ্নগুলি আগে থেকেই স্থির করে রাখতে হবে।

(ii) প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে উত্তর কী হতে পারে এবং শিক্ষার্থী কী উত্তর দিলে তাকে আরো নির্দেশনা দিতে হবে তাও আগে থেকে স্থির করতে হবে।

(iii) বিষয়বস্তুকে সুবিন্যস্ত করতে হবে।

(iv) শিক্ষার্থী যখন উত্তর দেবে তখন কিন্তু সেই উত্তর শিক্ষকের জন্য নয়, সমস্ত শিক্ষার্থীকে দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া থাকবে।

(v) প্রশ্নগুলি ঘন ঘন করা হলেও, দুটি প্রশ্নের মাঝে কিছু সময়ের ব্যবধান থাকবে।

(vi) শিক্ষার্থী যদি কোনো প্রশ্নের উত্তর সঠিকভাবে দিতে না পারে, তাহলে শিক্ষক ইঙ্গিত দেবেন, অন্য শিক্ষার্থীকে উত্তর দিতে বলবেন এবং শেষ পর্যন্ত উত্তর পাওয়া না গেলে শিক্ষক উত্তরের কিছু নির্দিষ্ট বিষয় বলে দেবেন।

(vii) প্রশ্নগুলি ছোট হওয়া দরকার এবং তার ভাষা সহজ এবং প্রত্যক্ষ হলে ভালো হয়।

❑ ২.৩.২ ছোট দলে পারস্পরিক ক্রিয়া পদ্ধতি শিক্ষণ (Interactive Instruction in Small Group) :

এই ধরনের শিক্ষণ কৌশল সামাজিক এবং শিক্ষামূলক দক্ষতা বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট কার্যকরী। পরিচালনা (Guidance) করার ক্ষেত্রেও ছোট দলে এই প্রকার শিক্ষণ ভালো হয়। দল ছোট হলে প্রত্যেক শিক্ষার্থী অংশ গ্রহণ, শোনা এবং নিজে কথা বলার সুযোগ পায়, এর ফলে সরাসরি ফিডব্যাকও পেতে পারে।

◆ **সহযোগিতামূলক পারস্পরিক ক্রিয়া (Cooperative Interaction) :** প্রত্যেক শিখন পদ্ধতিতে সহযোগিতামূলক পারস্পরিক ক্রিয়া সম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন। দল যখন ছোট হয় (সদস্য সংখ্যা ২ থেকে ৬) এবং দলের সদস্যরা বিভিন্ন শ্রেণির হয়, তখন শিক্ষকের নির্দেশনার সঙ্গে সহপাঠীদের সহযোগিতা না থাকলে শিখনের কাজ অগ্রসর হতে পারে না। কিন্তু যখন পারস্পরিক সহযোগিতা থাকে তখন নিজেদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীর শিখন সহজ হয়। এর ফলে শিক্ষার লক্ষ্যে পৌঁছোবার সম্ভাবনা অনেক বেশি হয়। যদিও প্রধান লক্ষ্য এখানে শিখন, কিন্তু দলগত সম্পর্ক, পারস্পরিক বোঝাপড়া, সামাজিক বোধ ইত্যাদিও গড়ে ওঠে। বিভিন্ন গবেষণায় প্রমানিত যে, সহযোগিতামূলক পারস্পরিক ক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষণ কার্য যথেষ্ট কার্যকরী। জনগণ এবং তার সহযোগী গবেষকদের (১৯৮৯) মতে :

Cooperative learning experiences, compared to competitive and individualistic ones, promote higher achievement, greater motivation, more positive interpersonal relations among students, more positive attitude towards the subject area and teacher, greater selfesteam and psychological health, more accurate perspective taking and greater social skills.

অন্য একজন শিক্ষাবিজ্ঞানীর মতে এই পদ্ধতিতে ভাল ফল পেতে গেলে দুটি শর্ত পূরণ করতে হবে। শর্ত দুটি হল—শিক্ষার্থীদের একটি সাধারণ লক্ষ্যে কাজ করতে হবে এবং লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য দলের সদস্যদের নিজেদের প্রচেষ্টা চালাতে হবে। (Selvin, 1987) সহযোগিতামূলক পারস্পরিক ক্রিয়া বিভিন্ন পরিবেশ এবং পরিস্থিতিতে হতে পারে। প্রত্যেক ক্ষেত্রের বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করে পাঠক্রম, বিষয়বস্তু, পদ্ধতি ইত্যাদি ঠিক করতে হবে। এক্ষেত্রে শিক্ষকের মানসিকতা, অভিজ্ঞতা এবং কাজের প্রতি নিষ্ঠা একান্ত জরুরি।

❑ ২.৪ প্রতিপাদন-পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি (Demonstration Observation Method) :

প্রত্যক্ষ নির্দেশনার ক্ষেত্রে বক্তৃতা পদ্ধতি ব্যতীত অপর আর একটি উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি হল প্রতিপাদন বা ডেমনস্ট্রেশন পদ্ধতি। শ্রেণি শিক্ষণের সময় এই ডেমনস্ট্রেশন পদ্ধতির দ্বারাও শিখন বেশ ভালো হয়। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক সাধারণত তিনটি ধাপ বা পর্যায়ে ডেমনস্ট্রেশন দেন। অবশ্য এই তিনটি ধাপের মধ্যে স্পষ্ট সীমারেখা নেই। এই তিনটি ধাপের প্রথম ধাপে শিক্ষার্থীদের বলা হয় বা দেখানো হয় তাদের কী শেখানো হবে; দ্বিতীয় ধাপে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের পরিচালনায় অনুশীলন করে, এই স্তরে বোঝার ক্ষেত্রে অসুবিধা হলে শিক্ষক তা দেখেন বা সংশোধন করেন, যখন শিখন সম্পূর্ণ হয় তখন পরের তৃতীয় ধাপে যাওয়া হয়। তৃতীয় ধাপে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের স্বাধীনভাবে শিখনের দিকে অগ্রসর হতে সাহায্য করেন। এই তৃতীয় স্তরে শিক্ষকের অংশগ্রহণ তুলনামূলক কম। এই তৃতীয় ধাপে শিক্ষার্থীরা স্বাধীনভাবে শিখনে সচেষ্ট হয় এবং তাদের দক্ষতাও বাড়ানোর সুযোগ থাকে।

● **প্রতিপাদন পদ্ধতির ধাপ বা পর্যায় সমূহ** (Steps of Demonstration Method) :

আগেই বলা হয়েছে প্রতিপাদন পদ্ধতিতে শিক্ষণ কার্য পরিচালনা করার জন্য শিক্ষক মূলত তিনটি ধাপ বা পর্যায়ে অগ্রসর হন। একটি পর্যায়ের শিখন সম্পূর্ণ হলে পরের পর্যায়ে অগ্রসর হতে হয়। যে তিনটি ধাপ এক্ষেত্রে পরিচালিত হয় সেগুলির বিবরণ নিম্নে দেওয়া হল–

প্রথম ধাপ : শিক্ষার্থীকে কী শেখানো হবে তা শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করাই হল প্রথম ধাপের প্রধান কাজ। এক্ষেত্রে শিক্ষক নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি খুব সচেতনভাবেই গুরুত্ব দেবেন :

(i) পাঠ্যবিষয়বস্তুর লক্ষ্য শিক্ষার্থীদের আগেভাগেই জানিয়ে দেবেন,

(ii) পাঠের এক একটি অংশকে পর্যায় ক্রমে নির্দেশনা দেবেন,

(iii) পর্যায় বা ধাপগুলিকে যতটা সম্ভব ছোটো ছোটো করবেন,

(iv) পাঠ্যবিষয়বস্তুকে এমনভাবে সংগঠিত করবেন যাতে একটি অংশে দক্ষতা অর্জন সম্ভব হলে তবেই পরেরটিতে আসা যায়,

Scanned with CamScanner

(v) জটিল বা দুর্বোধ্য অংশগুলিতে বেশি বেশি উদাহরণ দেবেন এবং উদাহরণ এর মধ্যে বৈচিত্র্য থাকবে। উদাহরণগুলি হবে যতটা সম্ভব পূর্ব অভিজ্ঞতা প্রাপ্ত।

(vi) পরবর্তী অংশে আসার পূর্বে প্রথমটির শেখানো অংশটিতে শিখনে দক্ষতা অর্জন হয়েছে কি না তা শিক্ষক পরীক্ষা করে দেখবেন অর্থাৎ ফরমেটিভ মূল্যায়ন সম্পন্ন করবেন।

দ্বিতীয় ধাপ : শিক্ষণ কার্যের এই দ্বিতীয় ধাপে শিক্ষক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। কোনো নতুন বিষয়ের শুরুতে বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা স্পষ্ট এবং দৃঢ়ভাবে গড়ে তোলার জন্য শিক্ষক সহযোগিতার ভূমিকা পালন করেন। সহযোগিতার এই কাজ নিম্নলিখিতভাবে করা যেতে পারে–

(i) নতুন বিষয় অনুশীলনের জন্য শিক্ষার্থীদের পরিচালনা করা,

(ii) শিক্ষার্থীদের উপলব্ধি বা বোধ কতখানি হয়েছে তা জেনে নেওয়া, দুর্বলতার দিকগুলিকে চিহ্নিত করা খুঁজে নেওয়া, শিক্ষার্থীদের ধারণায় অস্পষ্টতা আছে কতখানি তা বুঝে নেওয়া,

(iii) শিক্ষার্থীদের ভুলগুলিকে সংশোধন করা,

(iv) শিখন সম্পন্ন হওয়ার পর অনুশীলনের ব্যবস্থা করা এবং সুযোগ দেওয়া।

শিক্ষার্থীদের অনুশীলনের জন্য শিক্ষক যতখানি সম্ভব ঘন ঘন প্রশ্ন করবেন; এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, দেখতে হবে প্রশ্নগুলি যেন বিষয়বস্তুর সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ও সম্পর্কিত হয়। গবেষণায় (স্টালিং এবং কাসকোইজ-১৯৭৪, স্টালিং-১৯৭৯, কোকের-১৯৮০) দেখা গেছে শিক্ষক বেশি করে প্রশ্ন করলে শিক্ষার্থীদের শিখন ভালো হয়। শিক্ষক সাধারণত দুই ধরনের প্রশ্ন করেন— নির্দিষ্ট উত্তরধর্মী প্রশ্ন এবং আলোচনা ও ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন।

বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের উপলব্ধি কতটুকু হয়েছে তা জানার জন্য বেশি বেশি বা ঘন ঘন প্রশ্ন করলে শিক্ষার্থীর শিখনের ভুল জায়গাগুলিকে চিহ্নিত করা যায় এবং তার ভিত্তিতে শিক্ষক প্রয়োজনীয় সংশোধন করে নিতে পারেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়, শিক্ষার্থীদের ভুল সংশোধন করার জন্য যে সমস্ত প্রশ্নগুলি উত্থাপন করেন সেগুলি আগে থেকেই ঠিক করলে ভালো হয়। এজন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি নজর দেওয়া দরকার :

(i) শিখন সম্পর্কিত নির্দেশ, পদ্ধতি এবং প্রধান অংশগুলিকে শিক্ষার্থীদের পুনরায় করতে বলবেন।

(ii) প্রধান অংশের উপর বেশি করে প্রশ্ন করবেন এবং শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে উত্তর চাইবেন।

(iii) শিক্ষার্থীদের লিখিত উত্তরগুলি দেখবেন।

(iv) প্রতিটি শিক্ষার্থীকে সমস্ত উত্তরগুলি অন্য শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে বলবেন।

এই সময় শিক্ষককে একটি বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়, সেটি হল— শিক্ষার্থীদের কয়েকজনকে প্রশ্ন করে সঠিক উত্তর পেলেও ধরে নেওয়া উচিত হবে না যে সমস্ত শিক্ষার্থীদের শিখন সম্পন্ন হয়েছে অথবা কোনো শিক্ষার্থীই যদি উত্তর না দেয় তবে ধরে নেওয়া ঠিক হবে না যে সবার বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা পরিষ্কার হয়েছে। এই কারণেই শিক্ষককে আগে থেকে অনেকগুলি প্রশ্ন তৈরি করে রাখতে হয়।

শিক্ষার্থীদের উত্তরদানের পর যদি দেখা যায় সঠিক উত্তরদানের পর ও শিক্ষার্থী কিছু সন্দিহান তবে শিক্ষক সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে সঠিক উত্তরদানের জন্য উৎসাহিত করবেন। এতে শিক্ষার্থী তার উত্তর সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারে। প্রয়োজনে আরও বেশি বেশি প্রশ্ন করা যেতে পারে। এবং সঠিক উত্তরদানের পর প্রশংসাসূচক বাক্য ব্যবহার করবেন তাতে শিখনের মান উন্নত হয়।

তৃতীয় ধাপ : আগেই বলা হয়েছে এই তৃতীয় ধাপের মূল উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীদের স্বাধীনভাবে শিখনের জন্য সচেষ্ট করে তোলা এবং তাদের শিখন দক্ষতা বাড়ানো। এই কারণে এই তৃতীয় ধাপটি হল স্বাধীনভাবে অনুশীলন করা। কার্যকরী নির্দেশনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ স্বাধীনভাবে অনুশীলন। শিক্ষার্থী যাতে স্বাধীনভাবে অনুশীলন করতে পারে, শিখনে বুৎপত্তি লাভ করতে পারে তার জন্য শিক্ষক অবশ্যই কিছু সময় বরাদ্দ করে রাখবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে সাধারণত দুটি উপস্তরের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে হয়। প্রথমটি হল দক্ষতা একত্র করার স্তর। শিক্ষার্থী যে যে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে তা এক্ষেত্রে কাজে লাগায়। অনুশীলনের পর শিক্ষার্থী যে দক্ষতা অর্জন করেছে তা এক্ষেত্রে কাজে লাগায়। অনুশীলনের পর শিক্ষার্থী দক্ষতা অর্জন করতে পারলেই, সে দ্বিতীয় স্তরে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই উপনীত হয়। স্যামুয়েলস (১৯৮১) এই দুটি স্তরের নাম দিয়েছেন 'একীকরণ' (unitization) স্তর এবং স্বতঃস্ফূর্ত বা স্বয়ংক্রিয় (automatic) স্তর। শিখনের এই স্তর আবার ভবিষ্যতে নতুন শিখনের পক্ষে কার্যকরী।

● **প্রতিবাদন পদ্ধতির সুবিধা** (Merits of Demonstratioin Method) :

(১) শিক্ষকের জন্য সামান্য এক সেট শিক্ষণ প্রদীপন, চক ও ব্ল্যাকবোর্ড এবং পাঠ-পরিকল্পনা নিয়ে সামান্য খরচে এই পদ্ধতি সহজেই ব্যবহার করা যায়।

(২) এই পদ্ধতিতে সময় কম লাগে। শ্রেণিকক্ষে নির্দিষ্ট যেটুকু সময় পাওয়া যায় তার ভিত্তিতেই এই প্রতিপাদন পদ্ধতিকে শিক্ষক প্রয়োগ করতে পারেন।

(৩) এই পদ্ধতিতে 'মূর্ত থেকে বিমূর্ত' শিক্ষার এই নীতির প্রয়োগ করা যায়।

(৪) পরীক্ষা প্রদর্শন শিক্ষার্থীদের প্রেষণা সঞ্চার যেমন করতে পারে তেমনই তাদের অনুসন্ধিৎসা জাগিয়ে তুলতে পারে।

ebook.dascoaching.in

Scanned with CamScanner

(৫) এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর দর্শন ও শ্রবণ অনুভূতিকেন্দ্রিক অভিজ্ঞতা লাভের দ্বারা পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, চিন্তন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় বলে বোধ ও দক্ষতা অর্জন সহজ হয়, পাঠ্যবিষয়ের ধারণা স্পষ্ট ও বাস্তবভিত্তিক হয়।

(৬) শিক্ষকের পাঠ পরিচালনার সঙ্গে শিক্ষার্থীরাও সমানভাবে অংশ গ্রহণের সুযোগ পায় বলে তারাও যথেষ্ট সক্রিয় শিখনে অভ্যস্থ হতে পারে এবং পুঁথিকেন্দ্রিক জ্ঞানকে বাস্তব পরীক্ষামূলক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়।

(৭) সব ধরনের শিক্ষার্থী যেমন উন্নত, মাঝারি এবং পিছিয়ে পড়া বা অল্প মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীরাও এই পদ্ধতিতে উপকৃত হয়, কার্যকরী শিখনের সুযোগ লাভ করে। শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্কও মধুর হয়।

(৮) শিক্ষার্থীদের সৃজনী ক্ষমতারও বিকাশ ঘটে।

- **প্রতিবাদন পদ্ধতির অসুবিধা** (Demerits of Demonstration Method) :

(১) এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা পর্যবেক্ষণের যথেষ্ট সুযোগ পেলেও, নিজেরা সরাসরি হাতেকলমে করার সুযোগ পায় না। তাই 'কাজের মাধ্যমে শিখন' অর্থাৎ 'learning by doing' এর সুযোগ শিক্ষার্থীরা পায় না।

(২) শিক্ষক নিজে দক্ষতার সঙ্গে প্রতিপাদন পদ্ধতিকে ব্যবহার করে পাঠ পরিচালনা করলেও প্রতিটি শিক্ষার্থী তাদের নিজেদের ব্যক্তিগত চাহিদা ও ক্ষমতা অনুযায়ী সম্পূর্ণভাবে শেখার সুযোগ পায় না। অনেকসময় শিক্ষকও প্রদর্শনের প্রতি মনোযোগ বেশি দেওয়ার কারণে শিক্ষার্থীদের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে পারেন না।

(৩) দর্শন ও শ্রবণেন্দ্রিয় এর ব্যবহার যথেষ্ট হলেও অন্যান্য জ্ঞানেন্দ্রিয়ের যথাযথ ব্যবহারের সুযোগ থাকে না বলে শিক্ষণ সম্পূর্ণভাবে সুদৃঢ় হয় না। তা ছাড়া শিক্ষকের প্রদর্শন অনেকসময় বেশ কিছু শিক্ষার্থীকে দূর থেকে দেখতে হয় এবং শুনতে হয়। এতে ধারণা লাভ অনেকসময় সঠিকভাবে সম্পন্ন হয় না।

(৪) শ্রেণিকক্ষের নির্দিষ্ট সময় মেনে প্রতিপাদন পদ্ধতি প্রয়োগের চেষ্টা করলেও অনেকক্ষেত্রে উন্নত মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীরা উপকৃত হলে অল্প মেধাসম্পন্নরা উপকৃত হয় না,আবার অল্প মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীরা উপকৃত হলে উন্নত মেধাসম্পন্নরা হয় না যদিও মাঝারি মেধাসম্পন্নরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই উপকৃত হয়। পাঠ-পরিকল্পনা তৈরি করা শিক্ষকের পক্ষে বেশ অসুবিধা হয়।

(৫) শিক্ষার্থীদের লেবরেটরি শিক্ষায় দক্ষতা অর্জনে এই পদ্ধতিতে সাফল্য পায় না।

(৬) শিক্ষকের ব্যক্তিগত দক্ষতার অভাব থাকলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শ্রেণিকক্ষে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি হয়, শিক্ষার্থীদের মনোযোগও ব্যহত হয় এবং সামগ্রিক শিক্ষণকার্য ব্যর্থ হয়।

○ ২.৫ হিউরিস্টিক পদ্ধতি (Heuristic Method) :

বিজ্ঞানমূলক বিষয়গুলির শিক্ষণ-শিখনের ক্ষেত্রে আবিষ্কার পদ্ধতি একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় পদ্ধতি। বিজ্ঞানমূলক বিষয়গুলির শিক্ষণ-শিখনের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিটি প্রথম প্রয়োগ করেন লন্ডনের রসায়নের অধ্যাপক এইচ. ই. আর্মস্ট্রং (H.E Armstrong)। তিনি এই ধরনের শিক্ষণ-শিখনের ক্ষেত্রে 'হিউরিস্টিক' (heuristic) শব্দটি ব্যবহার করেন। 'heuristic' শব্দটির উৎপত্তি গ্রিক শব্দ 'heurisco' থেকে যার অর্থ হল 'আবিষ্কার করা' (to discover) অথবা 'অনুসন্ধান করা' (to find out) অধ্যাপক আর্মস্ট্রং অনুভব করেন যে, একজন শিক্ষার্থীকে যদি আবিষ্কারকের পরিস্থিতিতে স্থাপন করা যায়, তাহলে সে শিক্ষকের বক্তব্যের চেয়ে বেশি শিখতে পারে। এটি 'কাজের মাধ্যমে শিখন' (Learning by doing) এই নীতির উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। শিক্ষার্থীরা তথ্য সংগ্রহ করতে শিখবে, তথ্যগুলিকে ব্যাখ্যা করতে পারবে এবং শেষ পর্যন্ত একটি সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছোবে। এই পদ্ধতিটি হল অভিজ্ঞতা ভিত্তিক একটি কৌশল যা সমস্যা সমাধান, শিখন এবং আবিষ্কারে সহায়তা করে। প্রথম দিকে বিজ্ঞানমূলক বিষয়গুলির শিক্ষণ-শিখনে ব্যবহার করা হলেও পরবর্তীকালে যখন দেখা গেল অন্যান্য বিষয়গুলির শিক্ষণ-শিখনে কাজে লাগানো যায় তখন থেকে সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়গুলির শিক্ষণ-শিখনে ব্যবহৃত হতে থাকে।

- **আবিষ্কার পদ্ধতি বলতে কী বোঝায়?**

আবিষ্কার পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের কাছে এমন দৃষ্টিভঙ্গি বা কৌশল উপস্থাপিত করে যেখানে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কোনো তথ্য বা জ্ঞান প্রদান করেন না, কোনো পাঠ্যপুস্তক থেকে ইতিমধ্যেই প্রস্তুত কোনো তথ্য বা নিয়ম বা সূত্র হাজির করেন না। তার পরিবর্তে শিক্ষার্থীদের এমন একটি পরিস্থিতির মধ্যে স্থাপন করা হয়, যাতে শিক্ষার্থীরা নিজেদের চেষ্টায় তথ্য সংগ্রহ করে এবং স্বাধীনভাবে অনুসন্ধান করবে। শিক্ষার্থী যা শিখবে তা সে নিজেই শিখন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আবিষ্কার করবে। শিক্ষার্থী তার জ্ঞানের কাঠামোর সঙ্গে ওই আবিষ্কৃত নতুন জ্ঞানকে অর্থপূর্ণভাবে সমন্বিত করবে। শিক্ষার্থী এই প্রক্রিয়ায় তথ্যকে পুনর্বিন্যাস করে বর্তমান জ্ঞানের কাঠামোর সঙ্গে সমন্বয় করে এমনভাবে জ্ঞানটিকে রূপান্তরিত করবে যাতে এটি শিখনের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যবস্তু হয়ে ওঠে। আবিষ্কৃত বিষয় বস্তু উপস্থাপিত বিষয় বস্তুর মতোই সমান অর্থপূর্ণ হয়। আবিষ্কার পদ্ধতিকে অধ্যাপক আর্মস্ট্রং এই ভাবে সংজ্ঞা দিয়েছেন—

> **"Heuristic (or discovery) method is that method of teaching in which we try to place the students as far as possible in the attitude of a discoverer. In other words, it is the method in which emphasis is laid on the discovering things instead of merely told about them."—(Brock, William Hodson, 1973)**

Scanned with CamScanner

● **আবিষ্কার পদ্ধতির উদ্দেশ্যগুলি নিম্নরূপ :**

(১) শিক্ষার্থীদের অনুসন্ধান ও গবেষণামূলক অভ্যাস গঠন করা।

(২) শোনা, পর্যবেক্ষণ, প্রশ্নকরণ এবং আবিষ্কারের অভ্যাস শিক্ষার্থীদের মধ্যে ধীরে ধীরে সঞ্চারিত করা।

(৩) শিক্ষার্থীদের বেশি বেশি চিন্তনমুখী করে তোলা।

(৪) ভবিষ্যৎ শিখনের ভিত্তি তৈরি করা।

(৫) শিক্ষার্থীদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের উদ্দীপনা সঞ্চার করা এবং প্রবণতা দৃঢ়ভাবে গেঁথে দেওয়া।

আবিষ্কার পদ্ধতির অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কতকগুলি শর্ত হল নিম্নরূপ :

(১) শিক্ষার্থীদের স্বাধীনভাবে কাজের সুযোগ।

(২) প্রতিক্রিয়াধর্মী বা সংবেদনশীল পরিবেশ প্রদান।

(৩) প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষকের পরামর্শ গ্রহণের সুযোগ। এবং

(৪) আবিষ্কার পদ্ধতির মাধ্যমে ধারাবাহিক শিখনের উৎসাহলাভ।

আবিষ্কার পদ্ধতির সুবিধা (Merits of Discovery Method) :

আবিষ্কার বা হিউরিস্টিক পদ্ধতির বেশকিছু সুবিধা আছে। সেগুলি হল—

(১) **মনোবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি :** সব দিক থেকে এই পদ্ধতি মনোবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি। শিক্ষণ প্রক্রিয়ার কেন্দ্রে স্থান পায় শিক্ষার্থী। অনুসন্ধানমূলক কাজে শিক্ষার্থীরা সম্পূর্ণ স্বাধীনতার সুযোগ পায়। ফলে তারা নিজের মতো করে আবিষ্কারের প্রেরণা পায়। অনুসন্ধান বা আবিষ্কারের আনন্দ শিশুদের জ্ঞানলাভের ক্ষেত্রে এবং পাঠ্যবিষয় বস্তুর অনুধারণে যথেষ্ট সাহায্য করে।

(২) **'কাজের মাধ্যমে শিক্ষা' নীতির প্রয়োগ :** শিক্ষার্থী স্বভাব সক্রিয়। তার এই সক্রিয়তার সুযোগকে কাজে লাগাতে হলে শিক্ষার্থীকে 'কাজের মাধ্যমে শিক্ষা' নীতির যথার্থ প্রয়োগের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে হয়। আবিষ্কার পদ্ধতিতে সেই 'কাজের মাধ্যমে শিক্ষা' নীতির যথার্থ প্রয়োগ দেখা যায়।

(৩) **বৌদ্ধিক বিকাশের সহায়ক :** এই পদ্ধতি শিক্ষার্থীর সঠিক বৌদ্ধিক বিকাশের সহায়ক। শিক্ষার্থীর মানসিক বিভিন্ন ক্ষমতাগুলির চর্চা বা অনুশীলনের মাধ্যমে যেমন—চিন্তনক্ষমতা, পর্যবেক্ষণক্ষমতা, কল্পনাশক্তি, সমস্যা সমাধান করার ক্ষমতা, সিদ্ধান্ত গঠনের ক্ষমতা উন্নয়নের দ্বারা সামগ্রিকভাবে শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক ক্ষমতার বিকাশ ঘটে।

(৪) **বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির গঠন :** এই শিক্ষণপদ্ধতি শিক্ষার্থীকে যেমন নতুন জ্ঞানের দ্বারা সমৃদ্ধ করে তেমনই বিজ্ঞানসম্মত চিন্তনে এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গঠনে সহায়তা করে।

(৫) **বৈজ্ঞানিক দক্ষতার বিকাশ :** আবিষ্কার পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের যেমন সক্রিয় করে তোলে তেমনই স্বাধীন অনুসন্ধানকারী এবং আবিষ্কারকের মর্যাদা দিয়ে নিজস্ব চেষ্টায় শিক্ষার্থীকে জ্ঞান অন্বেষণে সহায়তা করে। শিক্ষার্থী নিষ্ক্রিয় ভাবে শিক্ষকের দেওয়া তথ্যের নিছক শ্রোতা মাত্র নয়। শিক্ষার্থীকে সমস্যাটি বা পাঠ্যবিষয় বস্তুটিকে বিশ্লেষণ করতে হয়, তথ্য সংগ্রহ করতে হয়, প্রকল্প গঠন এবং বিচার বিশ্লেষণের দ্বারা একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয় সম্পূর্ণভাবে তার নিজস্ব স্বাধীন প্রচেষ্টার দ্বারা। এর সামগ্রিক ফলশ্রুতিতে শিক্ষার্থীর বৈজ্ঞানিক দক্ষতার বিকাশ ঘটে।

(৬) **আত্মবিশ্বাস গঠনের সহায়ক :** এই পদ্ধতি শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত কাজ, সযত্ন পর্যবেক্ষণ এবং স্বাধীন চিন্তন ক্ষমতার উন্নয়ন ঘটিয়ে শিক্ষার্থীকে তার আত্মবিশ্বাস গঠন করতে সহায়তা করে।

(৭) **ব্যক্তিবৈষম্যনীতির স্বীকৃতি :** এই পদ্ধতিতে শ্রেণির প্রতিটি শিক্ষার্থী তার মতো করে নিজস্ব ক্ষমতা, চাহিদা, রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে অনুসন্ধানমূলক কাজের সুযোগ পায়। অর্থাৎ শিক্ষার্থীর ব্যক্তিবৈষম্যের নীতি এখানে স্বীকৃতি পায়।

(৮) **দীর্ঘস্থায়ী জ্ঞানের উদ্ভব :** আবিষ্কার পদ্ধতিতে স্মরণক্রিয়ার ভূমিকা অতি নগণ্য। এই পদ্ধতিতে যা শেখা হয় বা জ্ঞান অর্জিত হয় তা শিক্ষার্থীর প্রত্যক্ষ প্রচেষ্টার দ্বারা ঘটে। এর ফলশ্রুতিতে এই পদ্ধতিতে অর্জিত জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার শিক্ষার্থীর যেমন উদ্দেশ্যপূরণ ঘটে তেমনই তা দীর্ঘস্থায়িত্ব লাভ করে।

(৯) **দৈনন্দিন জীবনে নানা গুণের বিকাশ :** এই পদ্ধতি শিক্ষার্থীর দৈনন্দিন জীবনের নানা গুণের বিকাশ ঘটায়, যেমন—আত্মনির্ভরতা, অত্মবিশ্বাস, আত্মশিখন ও অনুশীলন, শিল্পসচেতনতা ইত্যাদি। এই সমস্ত গুণগুলি শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক জীবনের যথেষ্ঠ উপযোগী।

(১০) **শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্কের উন্নতি :** এই পদ্ধতিতে শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ায় শিক্ষার ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটি মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠে শিক্ষার্থীদের নিয়মিত এবং সময় উপযোগী পরামর্শদানের কারণে তাঁদের মধ্যে একটি নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

আবিষ্কার পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা (Limitations of Discovery Method) :

(১) **বাস্তব সম্মত নয় :** তত্ত্বগত দিক থেকে আবিষ্কার পদ্ধতি কার্যকরী পদ্ধতি হলেও, বাস্তবে তা কার্যকরী করা বেশ কঠিন। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীকে আবিষ্কারকের ভূমিকায় স্থাপন করে তার মর্যাদা দিলেও প্রকৃত পক্ষে মানসিক দিক থেকে অপরিপক্ক শিক্ষার্থীরা আবিষ্কারের মানসিকতা নিয়ে এগিয়ে যেতে পারে না।

(২) **সব ধরনের শ্রেণি ও শিক্ষার্থীদের উপযোগী নয় :** খুব অল্প সংখ্যক শিক্ষার্থীদের নিয়ে গঠিত ক্লাসে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা সম্ভব হলে ও বেশি সংখ্যক শিক্ষার্থী

Scanned with CamScanner

নিয়ে গঠিত ক্লাসে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায় না, আবার প্রতিভাবান শিক্ষার্থী বা উন্নত বুদ্ধি সম্পন্ন শিক্ষার্থীরা এই পদ্ধতিতে আনন্দ পেলেও মাঝারি এবং অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষার্থীরা এই পদ্ধতিকে গ্রহণ করতে পারে না, ফলে তাদের মধ্যে হতাশা জন্মাবার সম্ভাবনা বা আশঙ্কা থাকে।

(৩) **উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব :** আবিষ্কার পদ্ধতি প্রয়োগ করতে শিক্ষককেও যথেষ্ট প্রতিভাবান ও দক্ষ হতে হয়। এই কাজের জন্য শিক্ষকের ধৈর্য, সহনশীল, সংবেদনশীল, সহমর্মীতার মতো গুণগুলিও থাকা দরকার। এই ধরনের উপযুক্ত শিক্ষকের যথেষ্ট অভাব।

(৪) **উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তকের অভাব :** আবিষ্কার পদ্ধতি এখনও আমাদের মতো দেশে জনপ্রিয় নয়, শিক্ষাক্রম বিন্যাসও সেই অনুসারে গড়ে ওঠেনি। স্বাভাবিক কারণেই এই পদ্ধতির উপযোগী পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ণ পর্যাপ্ত নয়।

(৫) **জ্ঞানার্জন অপেক্ষা দক্ষতা অর্জনে জোর :** আবিষ্কার পদ্ধতিতে শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীরা যতখানি জ্ঞানার্জন করে তার চেয়ে ও বেশি দক্ষতা অর্জনে জোর দেয়। এর ফলে শিখনে ভারসাম্য নষ্ট হয় এবং জ্ঞানার্জন গৌণ হয়ে পড়ে।

(৬) **সময়সাপেক্ষ পদ্ধতি :** আবিষ্কার পদ্ধতিতে শিক্ষণ-এর ক্ষেত্রে সময় লাগে প্রচুর। বিদ্যালয়ে নির্দিষ্ট শ্রেণিতে যেমন কোনো পাঠদান শেষ করা সম্ভব হয় না, তেমনই সময় অনুযায়ী সব সময় পাঠ্যসূচি সম্পূর্ণ করাও বেশ কঠিন। শিক্ষাবিজ্ঞান শিক্ষকের নিকট এটা বেশ সমস্যা তৈরি করে।

(৭) **ব্যয় সাপেক্ষ পদ্ধতি :** প্রতিটি শিক্ষার্থীকে আবিষ্কার পদ্ধতি শিক্ষণের ক্ষেত্রে বহুরকমের উপকরণ ও যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয়। সেজন্য অর্থের প্রয়োজন হয় যথেষ্ট। বিদ্যালয়গুলির পক্ষে সেই অর্থের জোগান দেওয়া খুব কঠিন হয়ে পড়ে।

(৮) **সময়-তালিকা অনুসরণ কঠিন :** সময়-তালিকা অনুসরণ করে আবিষ্কার পদ্ধতিতে সব শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানের কার্যটি বেশ কঠিন। শিক্ষক প্রচুর পরিশ্রম করেও এই পদ্ধতিকে কার্যকরী করে তুলতে পারেন না অনেক ক্ষেত্রেই।

✪ ২.৬ প্রোজেক্ট পদ্ধতি (Project Method) :

মার্কিন প্রয়োগবাদী দার্শনিক জন ডিউই-এর শিক্ষাদর্শনের উপর ভিত্তি করে এই শিক্ষা পদ্ধতিটি গড়ে উঠেছে। এই শিক্ষাপদ্ধতিটিও শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক নির্দেশনার মধ্যে পড়ে। পদ্ধতিটির উদ্ভাবক হলেন অধ্যাপক উইলিয়াম, এইচ, কিলপ্যাট্রিক। আমাদের দৈনন্দিন কর্মজীবনে নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হই, এবং সেগুলির সমাধানের চেষ্টা করি। এইভাবে গঠনমূলক কাজের মধ্য দিয়ে মানুষ বাস্তবজীবনে নানা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। সমস্যা সমাধানে কর্মতৎপরতার দ্বারা মানুষ যেভাবে অভিজ্ঞতা লাভ বা জ্ঞানলাভ করে,

সেই নীতিরই প্রয়োগ করেছেন জন ডিউই তাঁর শিক্ষা পদ্ধতিতে। একে বলা হয় Problem Method বা সমস্যা পদ্ধতি। ডিউই চেয়েছিলেন শিক্ষার্থী স্বাভাবিক পরিবেশে যতটা সম্ভব নিজেরাই সমস্যার সমাধান করবে এবং তাতেই তাদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটবে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে ডিউই এর শিষ্য Prof. William, H. Kilpatrick ডিউই এর Problem Method এর কিছু পরিবর্তন সাধন করে প্রোজেক্ট পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। প্রোজেক্ট (Project) বলতে কী বোঝায়? নীচে Project-এর কিছু সংজ্ঞা দেওয়া হল—

ব্যালার্ড (Ballard) এর মতে "A project is a bit of real life that has been imparted into the school." অর্থাৎ "প্রকল্প হচ্ছে একটি বাস্তব জীবনের অংশ যা কিনা বিদ্যালয়ে আমদানি করা হয়।"

বার্টন (Barton) বলেছেন : "The problem is a project which results in doing. The motor element is not what makes the activity a project, but the problem solving of practical nature accompanying the activity."

স্টিভেনশন (Stevenson) : "A project is a problematic act carried to completion in its nature setting." অর্থাৎ প্রোজেক্ট হল এমন একটি সমস্যামূলক কাজ, যেটি তার স্বাভাবিক পরিবেশে সম্পন্ন হয়।

স্নেডেন (Snedden) বলেছেন, "Project is a unit of educative work in which the most prominent feature is some forms of positive and concrete achievements."

কিল প্যাট্রিক বলেছেন, "Project is a whole hearted purposeful activity executed in a social environment." অর্থাৎ প্রোজেক্ট হল এমন একটি উদ্দেশ্যমূলক কাজ, যা একটি সামাজিক পরিবেশে আন্তরিকতার সঙ্গে সম্পাদিত হয়।

উপরে বর্ণিত সংজ্ঞাগুলি অনুসরণ করে আমরা বলতে পারি—প্রকল্প হল একটি সমস্যামূলক কর্ম, উদ্দেশ্যমুখী সক্রিয়তা, আন্তরিক সক্রিয়তা, স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে একটি তৎপরতা, সামাজিক পরিস্থিতিতে ক্রিয়াশীলতা, বিদ্যালয়ে প্রবর্তিত বাস্তবজীবনের একটি অংশ, ব্যবহারিক জীবনের একটি সমস্যা সমাধান, একটি ইতিবাচক এবং মূর্ত কর্মসম্পাদন, এমন এক ক্রিয়াশীলতা যার মাধ্যমে নানা ধরনের সমস্যার সমাধান আবির্ভূত হয়।

● **প্রকল্প বা প্রোজেক্ট পদ্ধতির মূলনীতি** (Main principles of the Project Method) :

প্রকল্প পদ্ধতির মূলনীতিগুলি হল নিম্নরূপ :

(১) **উদ্দেশ্যের নীতি** (Principle of purpose) : প্রোজেক্ট পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের কাছে প্রথমেই নির্দিষ্ট হয়ে যায় কর্মমূলক প্রচেষ্টাটির উদ্দেশ্য। শিক্ষার্থীরা উপলব্ধি

Scanned with CamScanner

করতে পারে কী উদ্দেশ্য নিয়ে তারা কাজ করছে। শিক্ষার্থীরা সেই উদ্দেশ্য পৌঁছোনোর চেষ্টা করে। উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করেই তারা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছোতে সক্ষম হয়। লক্ষ্যহীন কর্মপ্রচেষ্টা কখনোই আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারে না।

(২) **সক্রিয়তার নীতি** (Principle of activity) : প্রকৃতিগত বা স্বাভাবগতভাবে শিশুরা সক্রিয়। তাদের এই সক্রিয়তাকে কাজে লাগানোর জন্য কিছু সুযোগ নিয়ে হবে যাতে তাদের 'কাজের মাধ্যমে শেখার' পরিস্থিতি তৈরি হয়, এ দৈহিক এ মানসিক উভয় প্রকার কাজের সুযোগ দিতে হবে।

(৩) **অভিজ্ঞতার নীতি** (Principle of experience) : মানবশিশুর সব চেয়ে বড় শিক্ষক তার পরিবেশ থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা। শিক্ষার্থীরা যা কিছু শিখবে তার ভিত্তি হবে অভিজ্ঞতালাভ। শিক্ষার্থীরা তার পরিবেশের চারপাশের বিভিন্ন উপাদানের প্রেক্ষিতে মিথষ্ক্রিয়ার মাধ্যমে যে জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা লাভ করে তা-ই তাদের চরিত্র গঠন, মূল্যবোধ, নৈতিকতা, দৃষ্টিভঙ্গি এবং ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহায়ক হয়।

(৪) **সামাজিক অভিজ্ঞতার নীতি** (Principle of social experience) : মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। শিক্ষার্থীকে সমাজজীবনের উপযোগী করে গড়ে তোলাই শিক্ষার লক্ষ্য। সেই কারণে তাদের অভিজ্ঞতা প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক পরিবেশের মধ্যে অর্জিত হওয়ার দরকার। সামাজিক অভিজ্ঞতার দ্বারা শিক্ষার্থীর সৌহার্দ্য জীবন-যাপনের নীতিতে অভ্যস্ত হওয়ার সুযোগ পায়।

(৫) **বাস্তবতার নীতি** (principle of reality) : জীবন একদিকে যেমন বাস্তবধর্মী তেমনই অন্যদিকে আবার শিক্ষামূলক। জীবনের অর্থ থাকবে, জীবনের বাস্তব পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীরা যে অভিজ্ঞতা অর্জন করবে তা-ই হবে তার প্রকৃত শিক্ষা। শিক্ষার্থীরদের নিকট তাদের নিজস্ব জীবনটাই একটা প্রকল্পমূলক পরিস্থিতি। বিদ্যালয়ের শিক্ষাজীবনেও শিক্ষার্থীরা উপলব্ধি করবে বিদ্যালয়ের শিক্ষা ও মানুষের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন নয়।

(৬) **স্বাধীনতার নীতি** (Principle of freedom) : যে-কোনো কাজে শিক্ষার্থীর ইচ্ছা তার স্বতঃস্ফূর্ততার উপর নির্ভরশীল, শিক্ষকের বলপ্রয়োগ বা পীড়াপীড়িতে তা সম্ভব নয়। সেজন্য প্রোজেক্ট পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের কর্মপ্রচেষ্টা শিক্ষকের জোর পূর্বক হস্তক্ষেপ কাঙ্ক্ষিত নয়। শিক্ষার্থীদের পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া দরকার যাতে তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই কার্য-সম্পাদন করতে সক্ষম হয়। শিক্ষার্থী যাতে তার আগ্রহ, চাহিদা এবং সক্ষমতা অনুসারে সক্রিয়তার সুযোগ পায়।

(৭) **উপযোগিতার নীতি** (Principle of utility) : জ্ঞান তখনই যথার্থ এবং মূল্যবান হয়ে ওঠে, যখন তার ব্যবহারিক জীবনে তার উপযোগিতা থাকে। প্রোজেক্ট পদ্ধতিতে সক্রিয়তার মাধ্যমে জ্ঞানলাভের ক্ষেত্রে এই বিষয়টি খেয়াল রাখা দরকার যে, শিক্ষার্থী

কাজের মাধ্যমে শেখার বিষয়টি বা অভিজ্ঞতাটির যেন ব্যবহারিক উপযোগিতা থাকে। দেখা যায় এই পদ্ধতিতে কর্মপ্রচেষ্টা শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ গড়ে ওঠে যেগুলির গুরুত্ব শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক জীবনে অনেকখানি।

(৮) **সহ-সম্পর্কের নীতি** (Principle of correlation) : শিক্ষার্থীর জীবনে সমস্ত অভিজ্ঞতাই কোনো না কোনো ভাবে প্রয়োজন হয়। সেইজন্য প্রতিটি বিষয়ের (subject) জ্ঞান তার কাছে প্রয়োজনীয়। কিন্তু বিষয়গুলির জ্ঞান বিচ্ছিন্নভাবে অর্জন করলেই শিক্ষার্থীর জীবনে কার্যকরী হয় না, তাই বিষয়গুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক উপলব্ধি করা খুবই দরকার। প্রোজেক্ট পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থী যেসব বিভিন্ন জ্ঞান লাভ করে সেগুলি শিক্ষার্থীর জীবনে সামগ্রিক বোধ তৈরি করতে সক্ষম হয়।

● **প্রোজেক্টের প্রকার ভেদ** (Types of projects) : প্রোজেক্টের উদ্দেশ্য, প্রয়োগ পদ্ধতি ও উপযোগিতা বিবেচনা করে উইলিয়াম কিল প্যাট্রিক প্রোজেক্টকে নিম্নলিখিত চারটি ভাগে ভাগ করেছেন।

(১) **উৎপাদনমূলক প্রোজেক্ট** (Producer type project) : এই ধরনের প্রোজেক্ট এর অন্তর্গত হল কোনো সৃজনমূলক কর্ম-সম্পাদন এর দ্বারা বস্তু উৎপাদন, যেমন—মাটির মূর্তি তৈরি, পুতুল তৈরি, নাটকের পোশাক-পরিচ্ছদ তৈরি, বিদ্যালয় বা শ্রেণির সৌন্দর্যবৃদ্ধিমূলক কাজ ইত্যাদি।

(২) **উপভোগমূলক প্রোজেক্ট** (Consumer type project) : এই ধরনের প্রোজেক্টের মূল কথা উপভোগ। উৎপাদন ও উপভোগ এখানে একে অন্যের পরিপূরক। সৌন্দর্য সৃষ্টি ও তার উপভোগ এর উদ্দেশ্যে এই ধরনের প্রোজেক্ট গ্রহণ করা হয়। যেমন—বিদ্যালয়ে বাগান তৈরি, গল্প-শোনার আসর এর আয়োজন করা, সংগীত ও নাটকের আয়োজন ও তা উপভোগ করা।

(৩) **সমস্যামূলক প্রোজেক্ট** (Problem Type project) : এই ধরনের প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হল বৌদ্ধিক প্রক্রিয়ায় কোনো সমস্যার সমাধান করা। যেমন শিক্ষা ও সামাজিক সমস্যা নিয়ে বাস্তব কোনো সমস্যাকে প্রোজেক্ট হিসেবে গ্রহণ করা যায়। যেমন—সাক্ষরতা অভিযান প্রকল্পে ছাত্রদের ভূমিকা।

(৪) **অনুশীলনমূলক প্রোজেক্ট** (Drill type project) : এই জাতীয় প্রোজেক্টের মূল উদ্দেশ্য হল অনুশীলনের মধ্য দিয়ে কোনো কাজে শিক্ষার্থীর দক্ষতা বৃদ্ধি। যেমন—কবিতা মুখস্থ করা, চিত্রাঙ্কন, গ্রাফ ও মানচিত্র অঙ্কন ইত্যাদি।

প্রোজেক্টকে অন্যভাবে ভাগ করা যায়—সাধারণ প্রোজেক্ট এবং বিদ্যালয় প্রোজেক্ট। সাধারণ প্রোজেক্টের মধ্যে অন্তর্গত হল পত্রিকা এবং ম্যাগাজিনের উপর প্রোজেক্ট, বাড়িতে

Scanned with CamScanner

করার মতো প্রোজেক্ট, পরিবেশ সংক্রান্ত প্রোজেক্টে, খেলাধূলার উপর প্রোজেক্ট, টেলিভিশন-রেডিয়ো-ভিডিয়ো ইত্যাদির প্রোজেক্ট।

বিদ্যালয় স্তরের প্রোজেক্টকে আবার দুইভাগে ভাগ করা যায়—

(ক) পাঠক্রমিক প্রোজেক্ট এবং (খ) সহ-পাঠক্রমিক প্রোজেক্ট। বিদ্যালয় স্তরে যেগুলিকে সবসময় প্রোজেক্ট হিসেবে গ্রহণ করা যায় সেগুলি হল—

(১) পরীক্ষাগারের জন্য গৃহীত প্রোজেক্ট,

(২) ফিল্ড ওয়ার্ক জাতীয় প্রোজেক্ট, এবং

(৩) পাঠাগারের জন্য গৃহীত প্রোজেক্ট।

উপরোক্ত তিনপ্রকারে প্রোজেক্ট সম্বন্ধে নীচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল :

(১) **পরীক্ষাগারের জন্য গৃহীত প্রোজেক্ট :** এই ধরনের প্রোজেক্টে মূলত মানস সঞ্চালন মূলক ক্ষেত্র বা Psychomotor Domain এর ব্যবহার হয় বেশি। বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান সম্পর্কিত বিষয়ের ক্ষেত্রে এই প্রোজেক্ট বিশেষ কার্যকরী। এই প্রোজেক্ট স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি দুই রকমেরই হতে পারে। বিদ্যালয়ে প্রধানত স্বল্পমেয়াদি প্রোজেক্ট হলেও, উচ্চশিক্ষায় দুইরকম প্রোজেক্টই ব্যবহার করা যায়। এই ধরনের প্রোজেক্টে হাতের কাজ করার কৌশল, সংগঠিতকরণ, পরীক্ষা করে দেখা এবং ফলাফল ব্যাখ্যা করা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে তাত্ত্বিক বিষয় বাস্তবে প্রয়োগ করার সুযোগ থাকে। শিক্ষক এখানে সহায়কের ভূমিকা পালন করে থাকেন।

(২) **ফিল্ড ওয়ার্ক বা বহিরঙ্গন অনুসন্ধান মূলক কাজ :** শিক্ষার্থী এখানে মুক্ত পরিবেশে এবং স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ লাভ করে। বোধমূলক, মানসিক এবং কৌশলমূলক পদ্ধতিগুলিকে শিক্ষার্থীরা রপ্ত এবং চর্চা করার সুযোগ পায় এই প্রোজেক্টে। এই ধরনের প্রোজেক্ট নানা রকম হতে পারে যেমন— ইতিহাস, ভূগোল, জীবনবিজ্ঞান, সমাজবিদ্যা বা শিক্ষা সম্পর্কিত কাজ, শিক্ষামূলক ভ্রমণ ইত্যাদি। বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে নিরক্ষরতা দূরীকরণ, টীকাদান প্রকল্প, বিজ্ঞানচেতনা বৃদ্ধির প্রকল্প, কুসংস্কার দূরীকরণ প্রকল্প ইত্যাদি নানা রকম প্রকল্প গ্রহণ করা যায়। ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠে এই ধরনের প্রকল্পে।

(৩) **পাঠাগারের জন্য গৃহীত প্রোজেক্ট :** বিদ্যালয়ে অল্পবয়সি শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই প্রোজেক্ট পরিচালনা একটু কষ্টকর হলেও উচ্চশ্রেণিতে বা উচ্চশিক্ষায় এই প্রোজেক্ট কার্যকরী হতে পারে। এই ধরনের প্রোজেক্টে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত জ্ঞানের ভাণ্ডার বৃদ্ধি পায়। প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানমূলক এবং কর্মকৌশলমূলক দক্ষতা বৃদ্ধিতে এই প্রোজেক্ট সাহায্যকারী ভূমিকা পালন করে।

প্রোজেক্ট সম্পাদনের স্তরসমূহ (Steps of conducting a project) : যে কোনো প্রোজেক্টের কাজ করার জন্য প্রস্তুতি, পরিকল্পনা ইত্যাদি প্রাথমিক বিষয়গুলি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

প্রোজেক্ট শিক্ষকের ভূমিকা পরোক্ষ হলেও বেশ গুরুত্বপূর্ণ। পরোক্ষ নির্দেশনা দান এবং প্রয়োজনে সাহায্য করা শিক্ষকের দায়িত্ব। একটি প্রোজেক্টে কাজ করার জন্য নিম্নে লিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার।

(১) **প্রোজেক্টের প্রস্তুতি** (Preparation of Project) : প্রস্তুতির সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলির দিকে লক্ষ রাখতে হবে এবং প্রয়োজনে শিক্ষক তাঁর শিক্ষার্থীদের সাহায্য করবেন।

(i) যথোপযুক্ত বিষয়/দক্ষতা/পদ্ধতি/সমস্যা ইত্যাদি নির্বাচন।
(ii) সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা।
(iii) প্রোজেক্টের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানের তালিকা প্রস্তুত করা।
(iv) কাজের পদ্ধতি নির্ধারণ করা।
(v) বাস্তবতার প্রেক্ষিতে সময়সারণি প্রস্তুত করা।
(vi) তালিকাবদ্ধ করার ব্যবস্থা করা।
(vii) মূল্যায়নের পদ্ধতি নির্ণয় করা।
(viii) মূল্যায়নের শর্ত ঠিক করা।
(ix) মূল্যায়নের কৌশল নিরূপণ করা।

(২) **প্রোজেক্ট প্রয়োগের স্তর** (Implimenting stage of project) : প্রোজেক্টের এই স্তরে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি নজর রাখতে হবে

(i) প্রোজেক্টের কাজ শুরুর আগে সার্ভে করা।
(ii) প্রয়োজনমতো দল গঠন করা।
(iii) বিভিন্ন সদস্যের মধ্যে কাজ বন্টন করা।
(iv) প্রোজেক্টের একটি রূপরেখা তৈরি করা।
(v) প্রয়োজনীয় উপকরণগুলির প্রয়োগ স্থির করা।
(vi) সময়সারণির প্রয়োগধর্মিতা যাচাই করা।
(vii) সঠিক তথ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা করা।
(viii) প্রোজেক্টের অগ্রগতির হিসেব রাখা।
(ix) কোথাও পরিবর্তনের প্রয়োজন হলে তার ব্যবস্থা করা।
(x) মূল্যায়নের পদ্ধতি ঠিক কিনা বিচার করা। এবং
(xi) প্রোজেক্টের প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ করা ইত্যাদি।

ebook.dascoaching.in

(৩) **প্রোজেক্টের প্রতিবেদন লেখা স্তর** (Report writing stage of the project) : রিপোর্ট তৈরি বা প্রতিবেদন লেখা প্রোজেক্টের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর। প্রতিবেদন লেখার উপর প্রোজেক্টের কার্যকারিতা অনেকটাই নির্ভর করে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, প্রোজেক্ট খুব ভালো হওয়া সত্ত্বেও ঠিকমতো সমস্ত তথ্য সঠিকভাবে সন্নিবেশিত না হওয়ায় অন্য

Scanned with CamScanner

কেউ তা সহজে প্রয়োগ করতে পারে না বা বেশ অসুবিধার সম্মুখীন হয়। রিপোর্ট লেখার এই স্তরের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি হল—

(i) প্রাপ্ত তথ্যের এবং পরোক্ষ উৎসগুলিকে লিপিবদ্ধ করা।

(ii) তথ্যগুলিকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করা।

(iii) তথ্যগুলির বিশ্লেষণকে সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করা।

(iv) ধাপে ধাপে নিয়ম অনুসারে রিপোর্ট প্রস্তুত করা।

(৪) **প্রোজেক্টের মূল্যায়ন করার স্তর** (Evaluating stage of the project) : প্রোজেক্টের যে কাজটি বা সমস্যাটির সমাধান করা হল তা কতটা পূর্ব নির্ধারিত উদ্দেশ্যে পৌঁছেচে বা সাফল্য পেয়েছে তা দেখা হয়। শিক্ষার্থীরা নিজেদের ত্রুটিগুলি বিচার করে দেখবে। মূল্যায়নের মধ্যে থাকবে প্রোজেক্ট সম্পাদনের পদ্ধতি এবং প্রোজেক্টের ফল। প্রোজেক্টের ফল হল প্রোজেক্টের উৎপন্ন বস্তু বা প্রোজেক্টের রিপোর্ট।

মূল্যায়নের জন্য নির্দিষ্ট কোন্ ছকটি বিশেষজ্ঞকে দেওয়া হবে এবং তিনি তাঁর মূল্যায়ন করবেন। শিক্ষার্থী নিজেও তার কাজের মূল্যায়ন করবে।

● **প্রোজেক্ট পদ্ধতির সুবিধা** (Merits of project Method) :

প্রোজেক্ট পদ্ধতির কতকগুলি সুবিধা আছে। এই পদ্ধতির সুবিধা গুলি হল—

(১) **শিখনতত্ত্বের প্রভাব :** প্রোজেক্ট পদ্ধতি শিখনের তিনটি সূত্রের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। শিখনের প্রস্তুতির সূত্র, অনুশীলনের সূত্র এবং ফললাভের সূত্রের প্রয়োগ এই পদ্ধতিতে দেখা যায়। প্রোজেক্ট পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীকে কাজের পরিস্থিতি তৈরি করে সামাজিক প্রস্তুতির সুযোগ দেয়। 'কাজের মাধ্যমে শিখন' এর অনুশীলন করতে গিয়ে অনুশীলনের সূত্রের প্রয়োগ দেখা যায়। প্রোজেক্টটি সাফল্যের সঙ্গে শেষ হলে শিক্ষার্থী মানসিক তৃপ্তিলাভ করে আর এইভাবে শিখনের ফললাভের সূত্র কার্যকরী হয়।

(২) **মনোবিজ্ঞানসম্মত :** প্রতিটি শিশুর মধ্যে স্বাভাবিক কর্মপ্রবণতা রয়েছে। এর বশবর্তী হয়ে সে কাজ করতে চায়। আবার তার মধ্যে যে সৃজনী প্রতিভা থাকে তার ফলে সে নতুন কিছু সৃষ্টি করতে চায়। সৃষ্টিশীল এই কর্মপ্রবণতা সে সম্পন্ন করে স্বতঃস্ফূর্ততায়, নিজের আগ্রহেই। সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা তাই তার কাছে আনন্দস্বরূপ।

(৩) **সক্রিয়তাভিত্তিক :** এই পদ্ধতি সক্রিয়তাতত্ত্বের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। প্রকৃতিগতভাবেই শিশু সদা সক্রিয়তা বজায় রাখতে চায়। এই সক্রিয়তাকে প্রোজেক্ট পদ্ধতিতে সমস্যা সমাধান মূলক শিখনের সুযোগ পায়।

(৪) **বাস্তবমুখী শিক্ষা :** প্রোজেক্ট পদ্ধতিতে শিশুকে যখন অর্থপূর্ণ এবং উদ্দেশ্যমুখী কাজ করার সুযোগ দেওয়া হয় তখন সে বাস্তব পরিস্থিতিতে, সত্যিকার জীবন-সমস্যার সমাধান করতে হয়। এতে তার শিখন যেমন তাত্ত্বিক থেকে ব্যবহারিক হয় তেমনই প্রয়োগধর্মীও হয়ে ওঠে।

(৫) **অনুবন্ধ শিখন :** শিক্ষার্থী প্রোজেক্ট পদ্ধতি সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে যে পারস্পরিক সম্পর্ক তা অনুধাবন করতে পারে। কোনো একটি বিষয়ের জ্ঞান বা অভিজ্ঞতাকে সে বিচ্ছিন্নভাবে দেখে না। ফলে শিক্ষার্থী পাঠক্রমের সামগ্রিক রূপ উপলব্ধি করতে পারে, একটি ঐক্যের ধারণা সে লাভ করে।

(৬) **বৌদ্ধিক ক্ষমতার বিকাশ :** প্রোজেক্ট পদ্ধতিতে কর্ম-সম্পাদানের সময় শিক্ষার্থীকে পর্যবেক্ষণ করতে হয়, মনোযোগী হয়ে কাজের বিষয় সম্পর্কে নিজস্ব চিন্তাভাবনা প্রয়োগ করতে হয়। অর্থাৎ শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক ক্ষমতার বিকাশ ঘটে।

(৭) **শিক্ষায় স্বাধীনতা :** আধুনিক শিক্ষার মূল কথাই হল শিক্ষার্থী তার নিজস্ব তাগিদে স্বতঃস্ফূর্তভাবে শিক্ষাগ্রহণ করবে, এই শিক্ষালাভ সম্ভব শিক্ষার্থীর স্বাধীনতা থাকলে। প্রোজেক্ট পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীকে সেই স্বাধীনতা দেওয়া হয় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত।

(৮) **সামাজিক বিকাশ :** প্রোজেক্ট পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীকে অনেকক্ষেত্রেই দল বেঁধে যৌথভাবে কর্ম-সম্পাদন বা সমস্যা সমাধান করতে হয়। একসঙ্গে কাজ করতে গিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে যেমন— দলগত সংহতিবোধ, team spirit, গড়ে ওঠে তেমনই তাদের মধ্যে সহনশীলতা, আত্মত্যাগ, সহযোগিতা, প্রভৃতি সামাজিক গুণগুলির বিকাশ ঘটে।

(৯) **শ্রমের প্রতি মর্যাদা :** প্রোজেক্ট পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীকে শ্রমের প্রতি মর্যদা প্রদর্শনে উৎসাহিত করা হয়। শিক্ষার্থীরা বা এর ফলে চার্ট তৈরি, মডেল তৈরি ও প্রদর্শন, ইত্যাদি শেখে। তাদের দায়িত্ববোধ ও আত্মনির্ভরতা বৃদ্ধি পায়।

(১০) **ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রতি গুরুত্ব :** প্রোজেক্ট পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা হয়। শিক্ষার্থীরা তাদের আগ্রহ, সার্মথ্য ও চাহিদা অনুযায়ী প্রোজেক্ট নির্বাচন ও তা সম্পাদনের সুযোগ লাভ করে।

● **প্রোজেক্ট পদ্ধতির অসুবিধা** (Demerits of Project Method) : প্রোজেক্ট পদ্ধতিতে বেশ কিছু অসুবিধাও আছে সেগুলি হল—

(১) **ব্যয়সাপেক্ষ ও সময়সাপেক্ষ :** প্রোজেক্ট পদ্ধতি শিক্ষালাভ বেশ ব্যয়সাপেক্ষ এবং সময়সাপেক্ষ। একটি প্রোজেক্টের জন্য নানা ধরনের উপকরণ এর প্রয়োজন হয় যা বেশ খরচ-সাপেক্ষ। বিদ্যালয়ের পক্ষে এই খরচ জোগানো বেশ কষ্টকর। আবার

Scanned with CamScanner

নির্দিষ্ট শিক্ষাবর্ষে পাঠক্রম শেষ করার তাগিদ থাকে অথচ প্রোজেক্ট পদ্ধতির জন্য বেশ সময়ও লাগে।

(২) **শিক্ষকের অভাব :** উপযুক্ত বিচক্ষণতা সম্পন্ন শিক্ষক ব্যতীত প্রোজেক্ট-এর কাজ সম্পাদন করা বেশ কঠিন। অনভিজ্ঞ এবং শ্রমবিমুখ শিক্ষকের পক্ষে এই কাজ সম্ভব নয়।

(৩) **আংশিক জ্ঞান অর্জন :** প্রোজেক্ট পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা যে জ্ঞান সঞ্চয় করে তা অসম্পূর্ণ এবং আংশিক। কোনো একটি বিষয়ের একটি বিশেষ দিকের প্রোজেক্ট তৈরি হলেও সবগুলির সম্ভব হয় না। বহু উল্লেখযোগ্য 'ধারণা' শিক্ষার্থীর নিকট অস্পষ্টই রয়ে যায়।

(৪) **সময়ের অপচয় :** প্রোজেক্ট পদ্ধতিতে শিক্ষালাভ করতে গিয়ে শিক্ষার্থীদের অনেকখানি সময় অপচয় হয়। তা ছাড়া বিদ্যালয়ের সময় তালিকা মেনে সম্পদন করা যেমন কষ্টকর তেমনই সময়-তালিকার পুনর্গঠন ও সম্ভব হয় না।

(৫) **প্রশাসনিক অসুবিধা :** প্রোজেক্ট পদ্ধতিতে শিক্ষা দিতে গিয়ে বিদ্যালয় বেশ কিছু অসুবিধার সম্মুখীন হয়। প্রশাসনিক ব্যবস্থার নানা গোলযোগ দেখা দেয়। প্রচলিত সময়সূচি ও পিরিয়ড অনুযায়ী বিষয় শিক্ষা দেওয়া বেশ অসুবিধা হয়। প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের যথেষ্ট স্বাধীনতা দেওয়া বাস্তবে সম্ভব হয় না।

(৬) **পাঠ্যপুস্তকের অভাব :** প্রোজেক্ট পদ্ধতিতে ব্যবহারিক জ্ঞানের ওপর গুরুত্ব বেশি দেওয়া হয় এবং তাত্ত্বিক দিকগুলি অবহেলিত হয়। এই পদ্ধতিতে উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তকের বেশ অভাব রয়েছে।

(৭) **অলস শিক্ষার্থীদের জন্য অনুপযুক্ত :** দলবেঁধে প্রোজেক্ট এর কার্য-সম্পাদনের ক্ষেত্রে অনেক সময়েই দেখা যায় বেশ কিছু অলস শিক্ষার্থী ফাঁকি দিয়ে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায় ফলে একদিকে কেমন তারা বিশৃঙ্খলা পরায়ণ হয়ে ওঠে তেমনই তাদের প্রকৃত শিক্ষালাভের দিকটি চূড়ান্ত অবহেলিত হয়।

✪ ২.৭ কম্পিউটার সহায়ক নির্দেশনা (Computer Assisted Instruction/CAI) :

Bruner (1972)-এর মতানুসারে মানুষের হাতে যন্ত্র তার চিন্তন প্রক্রিয়াকে পরিবর্তিত করেছে এবং একই সঙ্গে তার আচরণেও এনেছে পরিবর্তন। কম্পিউটার মানুষের প্রশিক্ষণ (training) এবং নির্দেশনা (instruction) চিন্তায় এনেছে ব্যাপক রূপান্তর। কম্পিউটার সহায়ক নির্দেশনা (CAI)-এর প্রবর্তন ঘটে ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে এবং মাইক্রো কম্পিউটার আসে ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে। বস্তুত ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকায় CAI-এর সূচনা হয়। স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের Patrick Suppes প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের উপর গণিত শিখন এবং

পঠনের ক্ষেত্রে এটিকে প্রয়োগ করেন প্রথম। এরপর ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে Atkinson প্রোগ্রাম ভিত্তিক CAI গঠন করেন পঠন অনুশীলনের জন্য। বর্তমানে CAI শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। পশ্চিমের দেশগুলিতে কম্পিউটারকে বাদ দিয়ে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কথা ভাবতেই পারে না।

◆ অর্থ ও সংজ্ঞা (Meaning and Definition) :

কম্পিউটার সহায়ক নির্দেশনা (Computer assisted instruction) বা সংক্ষেপে CAI বলতে বোঝায় এমন এক ধরনের নির্দেশনা যা কম্পিউটারের সাহায্যে সম্পন্ন হয়। শিক্ষণ-যন্ত্র অপেক্ষা CAI এক ধাপ এগিয়ে আছে, এবং সম্ভবত নির্দেশনা প্রক্রিয়ায় স্বশিক্ষণ এবং ব্যক্তিগত শিক্ষণের ক্ষেত্রে প্রোগ্রামভিত্তিক পাঠ্যপুস্তকের দুটি ব্যবহারকে কাজে লাগানো হয়। শিক্ষণ মেসিন অপেক্ষা এটি এগিয়ে আছে বলার কারণ হল CAI কাজ করার ক্ষমতা এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ কর্ম সম্পাদনার দ্বারা অসংখ্য শিক্ষার্থীকে একসঙ্গে নির্দেশনা দায়িত্ব পালন করতে পারে যা শিক্ষণ যন্ত্রের পক্ষে সম্ভব নয়। Hilgard এবং Bower (1977) পর্যবেক্ষণ করেছেন যে, "Computer-assisted instruction has now taken as so many dimensions that it can no longer be considered as a simple derivative of the teaching machine or the kind of programmed learning that Skinner introduced."

এটা আমাদের কাছে পরিষ্কার যে, কম্পিউটারের ব্যবহার বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার নানা দিককে বিশেষ করে শিক্ষণ বা নির্দেশনার ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে। Computer-assisted instruction-এর প্রসঙ্গ যেসব সংজ্ঞা বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ দিয়েছেন অথবা অন্যান্য সূত্র থেকে যেগুলি পাওয়া যায় সেগুলি নিম্নে উল্লেখ করা হল—

Britannica Online Encyclopedia থেকে জানা যায় "CAI is a programme of instructional material presented by means of a computer or computer systems."

Glossary of Distance Education and Internate Terminology-তে পাওয়া যায় "Computer Assisted Instruction (CAI) is the teaching process in which a computer is used to enhance the education of a student."

International Dictionary of Education (1985)-এর সূত্র ধরে জানতে পারা যায় Use of a computer to assist in the presentation of instructional materials to a student to monitor learning progress, or to select additional instructional material in accordance with the needs of individualised learners.

Scanned with CamScanner

The Concise Dictionary of Education (1982) এইভাবে উল্লেখ করেছে যে, "Instruction in which a computer is used to present substantial amounts of learning material to the student; it often represents an aut, instructional technique enabling students to progress at their own individual rates."

Bhatt এবং Sharma (1992) CAI-এর সংজ্ঞার উল্লেখ করেছেন "CAI is an interaction between a student, a computer controlled display and a response entry device for the purpose of achieving educational outcomes."

◆ **কম্পিউটার সহায়ক নির্দেশনার মৌলিক ধারণা (Basic Assumptions of computer Assisted Instruction) :**

কম্পিউটার সহায়ক নির্দেশনা গড়ে উঠেছে গড়ে উঠেছে কতকগুলি মৌলিক নীতির উপর ভিত্তি করে। সেগুলি হল–

১. একই সময়ে বহুসংখ্যক শিক্ষার্থীর জন্য নির্দেশনা
(Instruction for a number of learners at a time)

২. শিক্ষার্থীদের কাজকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ধারণ
(Automatic recording of the learners performence)

৩. পদ্ধতি এবং কৌশল ব্যবহারে বৈচিত্র্য
(Variety in the use of methods and techniques)

উপরোক্ত নীতিগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করা হল :

(১) একই সময়ে বহুসংখ্যক শিক্ষার্থীর জন্য নির্দেশনা :

CAI একই সময়ে একসঙ্গে হাজার হাজার শিক্ষার্থীকে ব্যক্তিগত শিক্ষণ বা নির্দেশনার পথ বেয়ে শেখানোর কাজ করতে সক্ষম। কোনো বিশেষ বিষয়ে বা বিশেষ কোনো পাঠ এককে শিক্ষার্থী তার চাহিদা ও আগ্রহ অনুসারে শিখতে পারে। সেই অনুসারে কম্পিউটার থেকে শিক্ষার্থী তার পাঠ্যবিষয়বস্তু (materials) এবং প্রাসঙ্গিক সহায়তা লাভ করে। এই ধরনের ব্যক্তিগত শিখন গুণগত এবং পরিমাণগত উভয়দিক থেকে খুবই কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে।

(২) শিক্ষার্থীদের কাজকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ধারণ :

উপস্থাপিত নির্দেশনার বিষয়বস্তুর পরিপ্রেক্ষিতে একজন শিক্ষার্থী কেমনভাবে প্রতিক্রিয়া করে? তার প্রশ্নগুলি কী কী? তার অসুবিধাই বা কোথায় কোথায়? তার কাজের সাফল্য কতখানি? এই সমস্ত কিছুই খুব নিখুঁত এবং সার্থকভাবে কম্পিউটারে স্বয়ংক্রিয় ভাবে ধরে

রাখা যায়। ব্যক্তি শিখনের পরবর্তী পরিকল্পনায় শিক্ষার্থীকে প্রয়োজনমতো সাহায্য করা সম্ভব হয়।

(৩) পদ্ধতি এবং কৌশল ব্যবহারে বৈচিত্র্য :

CAI এই ধারণায় বিশ্বাস রাখে যে কোনো একটি পদ্ধতি দ্বারা সমস্ত শিক্ষার্থীই সুবিধা পেতে পারে না। সমস্ত বিষয়, সমস্ত পাঠ একক কোনো একটি সাধারণ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর নিকট সহজবোধ্যভাবে শিখন সার্থকতা পায় না। ব্যক্তি বৈষম্য অনুসারে বিভিন্ন শিক্ষার্থী নিজের নিজের ক্ষমতা, চাহিদা ও আগ্রহ অনুযায়ী এক একটি পদ্ধতিতে শিখতে পারে।

● **কম্পিউটার সহায়ক নির্দেশনার কার্যপ্রণালী** (Modes of Computer Assisted Instruction) :

কম্পিউটার বিভিন্ন উপায়ে নির্দেশনায় তার কার্য সম্পাদন করে। এগুলিকে নিম্নলিখিতভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে :

(১) **তথ্য-সংক্রান্ত নির্দেশনা** (Informational Instruction)—শিক্ষার্থী যে সমস্ত তথ্যগুলি চায়, যেগুলি তার বিশেষভাবে প্রয়োজন, কম্পিউটার যেগুলিকে শিক্ষার্থীর কাছে সরবরাহ করে। কম্পিউটারের সঞ্চয় ভাণ্ডার থেকে শিক্ষার্থী সহজেই তথ্যগুলিকে সংগ্রহ করে তার শিখনে প্রয়োজনমতো কাজে লাগাতে পারে।

(২) **প্রশিক্ষণ এবং অনুশীলনমূলক কর্ম-পরিকল্পনা** (Drill and Practice Programmes)—কোনো একটি বিশেষ বিষয়ের বিশেষ পাঠ এককের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ কিংবা অনুশীলনমূলক কাজের পরিকল্পনায় CAI বিশেষভাবে সহায়তা করে। বিভিন্ন প্রকার দক্ষতা অর্জনে শিক্ষার্থীকে সহায়তা করে থাকে। যেমন—গণিতের গুণন প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীকে CAI এমনভাবে সহায়তা করে যে, সমস্যাটি উপস্থাপনের পর শিক্ষার্থী তার প্রতিক্রিয়ায় ভুল করে উত্তর দেয়, কম্পিউটার তাকে জানিয়ে দেয় যে ভুল। সেইসময় feed back-এর মাধ্যমে তার শেখার দরকার হয় না। ঠিক হলে যে পরবর্তী স্তরে এগিয়ে যায়। সমস্যা সমাধান-এর ক্ষেত্রে CAI-এর মাধ্যমে অনুশীলন ভীষণ কার্যকরী।

(৩) **গৃহশিক্ষকের ভূমিকা পালন** (Tutorial modce of CAI)— যথার্থ পারস্পরিক ক্রিয়া বা মিথষ্ক্রিয়ার মাধ্যমে কম্পিউটার সহায়ক নির্দেশনা শিক্ষার্থীকে নির্দেশনা দানে প্রকৃত শিক্ষণ কার্য সম্পন্ন করে। প্রকৃতপক্ষে CAI এখানে শিক্ষার্থীর নিকট গৃহশিক্ষকস্বরূপ। শিক্ষার্থীকেবিভিন্ন দিক থেকে তথ্যপ্রদান, পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ ব্যবস্থা, বৈজ্ঞানিক ঘটনার প্রদর্শন প্রভৃতি ক্ষেত্রে গৃহশিক্ষকের ভূমিকা পালন করে CAI। শিক্ষার্থী যদি অগ্রবর্তী হতে হতে বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জনে সক্ষম হয় তাহলে তাকে পরবর্তী উচ্চস্তরে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করে, আর যদি পশ্চাদবর্তী হয়ে পড়ে

Scanned with CamScanner

তাহলে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে তার শিখনকে সার্থক করে তোলার চেষ্টা করে।

(৪) **শিক্ষামূলক খেলা (Mode of Educational Games)**— অনেক সময় শিক্ষার্থীকে ভালো নকশাকৃত ও পরিকল্পিত কম্পিউটার খেলা দেওয়া হয়। এই ধরনের খেলাগুলি শিক্ষার্থীদের বুদ্ধিগত বিকাশ, বুদ্ধিগত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ, আগ্রহের উদ্দীপনা সঞ্চার এবং প্রেষণা সঞ্চারে শিক্ষার্থীকে সহায়তা করে। এই ধরণের খেলাগুলি শিক্ষার্থীর নির্দেশনা কার্যত কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে। খেলার মাধ্যমে শিক্ষালাভ এখানে সম্ভব হয়।

(৫) **ভূমিকায়ন নির্দেশনা** (Simulation Instruction)— শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ বা training-এর ক্ষেত্রে একটি বিশেষ কৌশল হল ভূমিকায়নের ব্যবহার। এই ধরনের নির্দেশনায় কর্মপদ্ধতি শিক্ষার্থীকে ক্ষমতাশালী শিখনযন্ত্রের সামনে উপস্থিত করে। এখানে খুব যত্ন সহকারে প্রস্তুত প্রোগ্রামের দ্বারা শিক্ষার্থীকে বাস্তবধর্মী অথবা আদর্শায়িত পরিস্থিতির সম্মুখীন করা হয়। শিক্ষার্থীদেরকে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে পরিস্থিতির ফলাফল সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহন করতে হয়। যেমন—যুদ্ধক্ষেত্রে একজন সৈনিককে শত্রু-পক্ষের দিকে গুলি বর্ষণ করে এগিয়ে যেতে হয় অথবা শিক্ষার্থীর ঘন জঙ্গলে হিংস্র জন্তুদের মোকাবিলা করার ঘটনা শিক্ষার্থীকে বাস্তবধর্মী করে তার প্রশিক্ষণে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে।

(৬) **সমস্যা সমাধানমূলক নির্দেশনা** (Problem solving mode of Instruction)— এই ধরনের নির্দেশনায় শিক্ষার্থীকে কোনো একটি সমস্যার সমাধানটি না দিয়ে বরং তার সামনে সমস্যার উত্তর বা সমাধান খোঁজার প্রক্রিয়াটি শিক্ষার্থীর নিকট উপস্থাপিত করা হয়। শিক্ষার্থীকে এক্ষেত্রে সুশৃঙ্খল পদ্ধতিতে সমাধানের দিকে আগ্রসর হতে হয়। শিক্ষার্থীর CAI-এর সাহায্যে সমস্যাকে বিভক্ত করতে, বা বিশ্লেষণ করতে পারে এবং একটি প্রস্তাবিত পথ ধরে এগিয়ে যেতে পারে।

(৭) **ব্যবহারিক কার্য সম্পাদনমূলক নির্দেশনা** (Practical work oriented Instruction)— CAI প্রোগ্রামে ল্যাবরেটারি এবং অন্যান্য ব্যবহারিক কর্মসম্পাদন এর ক্ষেত্রে অত্যন্ত মূল্যবান সহায়তা দান করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে ব্যবহারিক কাজের আগে একজন শিক্ষার্থী বিজ্ঞানের পরীক্ষণের সম্পর্কে বহু কিছু স্বচ্ছন্দে শিখতে পারে কম্পিউটারের নির্দিষ্ট কিছু প্রোগ্রামের মাধ্যমে। একইভাবে সে প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন এবং অভিজ্ঞতালাভ করতে পারে কম্পিউটারে পূর্বোক্ত ধরনের ব্যবহারিক শিক্ষার দ্বারা।

(৮) **শিখন সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনাধর্মী নির্দেশনা** (Learning affairs managing type)— এই ধরনের নির্দেশনামূলক কর্মকাণ্ডে CAI শিক্ষার্থীদের শিখন সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা

ও পরিদর্শন সংক্রান্ত ব্যাপারে মূল্যবান সহায়তা দান করতে সমর্থ। শিক্ষার্থীরা শিখন সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডের ব্যক্তিগত সুবিধা ও অসুবিধাগুলি, সর্বোপরি তাদের দুর্বলতাগুলিকে খুঁজে চিহ্নিত করতে পারে। শিক্ষা-সংক্রান্ত বেশ কিছু প্রোগ্রাম যা CAI-তে অন্তর্ভুক্ত করা হয় যেগুলি শিক্ষার্থীদের বিশেষভাবে সাহায্য করে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের অভিভাবক তাদের সন্তান বা শিক্ষার্থীদের কোনো নির্দিষ্ট কাজের দায়িত্ব, আত্ম-শিখনে সহায়তা দান, গ্রন্থাগার-পঠন, দলগত কার্য-সম্পাদনে বিশেষ ভূমিকা নিতে পারেন CAI-এর মাধ্যমে। ছোটো একটি কম্পিউটার অনায়াসেই বিশাল গণনাকারী যন্ত্র বা Calculating machine-এর ব্যাপক পরিমাণ কাজকে সম্পন্ন করতে সক্ষম। সামান্য পরিশ্রমের দ্বারা মূক ও বধির শিশু-শিক্ষার্থীদের কাছে কম্পিউটার এক বিরাট ক্ষমতা নিয়ে তাদের শিক্ষার সাহায্য এগিয়ে আসতে সক্ষম। বস্তুত কম্পিউটার শিক্ষাজগতের যাবতীয় কাজকর্মের সমস্যার সমাধানে বিশাল কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণে আজ ক্ষমতা রাখে।

◆ কম্পিউটার সহায়ক নির্দেশনার ক্রিয়াশীলতা (Operation of Computer Assisted Instruction) :

CAI-এ বিভিন্ন পর্যায় বা স্তর আছে, যেমন—হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার, কমিউনিকেশন বা যোগাযোগ এবং কারিকিউলাম বা পাঠক্রম পর্যায়। অতি অল্প সময়ের মধ্যে জ্ঞান অনুসন্ধান করে তার সঞ্চয় এবং পুনরুদ্ধার করার বিশাল ক্ষমতা থাকার কারণে CAI বর্তমানে প্রথমিক স্তর থেকে উচ্চশিক্ষার সর্বোচ্চ স্তরের শিক্ষায় দারুণভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। Atkinson-এর মডেলের CAI-তে তিনটি পর্যায় আছে। প্রথম পর্যায়ে শিশুরা রেকর্ড কণ্ঠস্বরের সাহায্য একক বর্ণ উচ্চারণ করতে শেখে। দ্বিতীয় পর্যায়ে শিশুরা একজোড়া বর্ণের ব্যবহার শেখে, তৃতীয় পর্যায়ে অনেকগুলি বর্ণের সমন্বিত ব্যবহার শেখে। কম্পিউটার শিক্ষার্থীদের শিখন-সংক্রান্ত নানা বিষয় ধারণ করে রাখতে পারে এবং শিক্ষার্থীরা যখনই অসুবিধার মুখোমুখি হয় তখন শিক্ষকের সহায়তা পায় খুব সহজেই।

Stolurow এবং Davis (1965)-এর মতানুসারে, একটি শিক্ষণযন্ত্র বা teaching machine-এ তিনটি মূল বৈশিষ্ট্য অবশ্যই থাকতে হবে—

(i) এটি অবশ্যই শিক্ষার্থীর প্রারম্ভিক পর্যায়ের আচরণ, সাধারণ মানসিক-ক্ষমতা, ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যগুলিকে ব্যবহার করবে।

(ii) এটি অবশ্যই নির্দেশনা চলাকালীন সময়ে প্রোগ্রামকে পরিবর্তন করতে সক্ষম হবে।

উপরোক্ত এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলি একমাত্র কম্পিউটার নামক যন্ত্রেরই থাকে। একটি কম্পিউটারের প্রধান কার্যাবলিকে নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করা যায়।—

(i) তথ্যের ভাণ্ডার

Scanned with CamScanner

(ii) সঞ্চয় ভাণ্ডার থেকে তথ্যবহন

(iii) দূরদেশ থেকে প্রাপ্ত তথ্যকে ছাপানো অবস্থায় প্রদান

(iv) একটি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রস্তুতিকরণ

ফ্রেমের বিন্যাস অনুসারে কোনো একজন ব্যক্তি CAI কৌশলকে ব্যবহার করে রৈখিক, শাখা-বিভাজিত, শিপ-রৈখিক, অবরোহী, আরোহী এবং সমস্যা সমাধানমূলক ক্ষেত্রে কাজে লাগাতে পারে। অন্যান্য প্রোগ্রাম-এর তুলনায় CAI-এ ধীরগতি কিংবা স্বাভাবিক গতিসম্পন্ন সব ধরনের শিক্ষার্থীদের সংশোধনমূলক বিন্যাসকে কাজে লাগানো সম্ভব। কারণ CAI বিশাল ও বহু রকমের প্রোগ্রাম সঞ্চয় করে রাখতে পারে।

◆ **কম্পিউটার সহায়ক নির্দেশনার বৈশিষ্ট্য (Features of computer Assisted Instruction) :**

(i) **প্রস্তুতির একক** (Unit of Preparation) : সবচেয়ে নিম্ন স্তরে CAI হতে পারে রৈখিক অথবা শাখা বিভাজিত ধরনের এবং এরপর চাহিদা অনুসারে পরিবর্তিতও হতে পারে।

(ii) **ধাপের আকার এবং সংখ্যা** (Step size and number) : শিখনের স্তর অনুসারে ধাপের আকার এবং সংজ্ঞা কমবেশি হতে পারে।

(iii) **ভুলের মাত্রা** (Error rate) : বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন প্রোগ্রাম ব্যবহার হয় বলে, ভুলের হার বা মাত্রা বিভিন্ন প্রোগ্রামে বিভিন্ন রকম হয়।

(iv) **পুনঃশক্তি সঞ্চার** (Re-inforcement) : CAI-তে শিক্ষার্থী তার প্রতিক্রিয়া সম্পাদনে সঠিক উত্তর প্রদানের মাধ্যমে পুনঃশক্তি সঞ্চার ঘটে বা Re-inforcement লাভ করে।

(v) **বিষয়বস্তুর উপযুক্ততা** (Subject matter suitability) : CAI-তে যেকোনো স্তরের যেকোনো বিষয়বস্তুর ব্যবহার সম্ভব।

◆ **কম্পিউটার-ব্যবস্থাপক নির্দেশনা/কম্পিউটার পরিচালিত নির্দেশনা (Computer-managed Instruction) :**

কম্পিউটার ব্যবস্থাপক নির্দেশনা বলতে বোঝায় কম্পিউটার টেকনোলজির সহায়তায় নির্দেশনামূলক কাজের ব্যবস্থাপনা। নির্দেশনামূলক ক্ষেত্রে এটিকে প্রত্যক্ষভাবে-এর কার্যকারিতা এবং প্রয়োগ-এর সুফল পাওয়া সম্ভব। যাইহোক কম্পিউটার প্রযুক্তিবিদ্যার ভাষায় কম্পিউটার ব্যবস্থাপক নির্দেশনা বা CMI-কে সজ্ঞায়িত করা হয়েছে নিম্নরূপ ভাবে—

"As a category of computer programme that may be used by educators and instructors to organize and manage data related to instruction for attaining the institutional objectives in a most effective way."

◆ **কম্পিউটার পরিচালিত নির্দেশনা বা শিক্ষণ এর কার্যাবলি (Functions of Computer Managed Instruction) :**

শিক্ষাক্ষেত্রে নির্দেশনা নিম্নলিখিতভাবে কম্পিউটার দ্বারা পরিচালিত হয় :

(১) **শিক্ষার্থীদের প্রারম্ভিক আচরণ নির্ণয়** (Diagnosis of entry level behaviour of the learners) : কম্পিউটার প্রোগ্রাম শিক্ষার্থীদের ক্ষমতা ও তাদের দুর্বলতার দিকগুলিকে চিহ্নিত করতে বা নির্ণয় করতে সাহায্য করে। শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পর্কিত কোনো বিশেষ জ্ঞান, দক্ষতা, আগ্রহ, মনোভাব, চাহিদা, উদ্দেশ্য এবং ব্যক্তিত্বের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলিকে নির্ণয় করে শিক্ষার্থীকে একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যপূরণের পথে বা লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করতে সাহায্য করে।

(২) **নির্দেশনামূলক উদ্দেশ্যগুলির সেটিং** (Setting of instructional objectives) : বর্তমানে কম্পিউটার সফটওয়ার পাওয়া যায়। এই সফটওয়ার প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ এবং শিক্ষার্থীর বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অনান্য তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে। এবং এর সাহায্যে শিক্ষার্থীর বিভিন্ন স্তরে তাদের প্রয়োজনীয়তাকে নির্দেশিত করতেও পারে। এর সাহায্যে নির্দিষ্ট পাঠক্রমের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যও নির্ধারিত করা সম্ভব।

(৩) **ব্যক্তিগত নির্দেশনার পরিকল্পনা সৃষ্টি** (Generating individualiazed instructional plans) : শিক্ষার্থীর চাহিদা, বৈশিষ্ট্য এবং ব্যক্তিগত বিভিন্ন দিকগুলির উপর নির্ভর করে কম্পিউটার সফটওয়ার ব্যক্তিগত নির্দেশনার পরিকল্পনা গঠন করতে এবং সংগঠিত করতে সহায়তা করে। এই ব্যাপারে কম্পিউটার প্রতিভাবান, মাঝারি বুদ্ধিসম্পন্ন এবং ধীরগতিসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের সহায়তা করে থাকে, এমনকি মানসিক দিক থেকে অনেকখানি দুর্বল ও অক্ষম ব্যক্তিরাও উপকৃত হতে পারে। একই সময়ে একসঙ্গে বহু শিক্ষার্থীকে কম্পিউটার সফটওয়ার-এর নির্দেশনা সার্থকভাবেই দেওয়া সম্ভব।

(৪) **নির্দেশনার বস্তু বা সামগ্রী এবং শিখন অভিজ্ঞতার সৃষ্টি** (Generating instructional materials amd learning creperiences) : বৈচিত্র্যপূর্ণ চাহিদা, আগ্রহ ও ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীদের মিথস্ক্রিয়ামূলক শিখন অভিজ্ঞতা প্রদানের জন্য ব্যক্তিগত নির্দেশনার এমন পরিকল্পনা এবং কৌশল কম্পিউটার সফটওয়ারের মাধ্যমে তৈরি করা সম্ভব যার ফলে উপযুক্ত নির্দেশনামূলক বস্তু বা সামগ্রী এবং সুযোগ-সুবিধাপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করা যায়।

(৫) **নির্দেশনার সামগ্রীকে পাঠক্রম এককে সহজলভ্য করে তোলা** (Availability of Instructinal material into curriculum unit) : নির্দেশনার সঠিক সংগঠন ও পরিচালনার দ্বারা শিক্ষার্থীর নিকট নির্দেশনার সামগ্রীকে সহজলভ্য করে তোলা যায়। উদ্দেশ্য অনুযায়ী সমগ্র শিখন সামগ্রীকে কতকগুলি উপযুক্ত এককে স্পষ্টভাবে

Scanned with CamScanner

বা নির্দিষ্টভাবে ভাগ করে এই কাজকে সফল করে তুলতে কম্পিউটারের পক্ষে সম্ভব। শিক্ষার্থীদের কাছে নির্দেশ থাকবে। তারা তাদের প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য অনুসারে শিখন সামগ্রীকে সংগ্রহ করবে। তাদের বলা যেতে পারে বই পড়তে, নিজেদের প্রস্তুত লেখা পড়তে, অন্য কোনো অভিজ্ঞতা বা জ্ঞানলাভ করতে, কোনো পরীক্ষণ কার্য চালাতে, কোনো দলগত নির্দেশনায় উপস্থিত থাকতে, কোনো চলচ্চিত্রের বিষয় দেখতে এবং অন্যান্য আরও কিছু করতে।

(৬) **সংশোধনমূলক নির্দেশনা দান** (Providing remedial instructions) : কম্পিউটার সফটওয়ার শিক্ষার্থীদের সংশোধনমূলক নির্দেশনার সঙ্গে যুক্ত বা সম্পর্কিত বিষয়ের অগ্রগতিকে দারুণভাবে সম্পন্ন করতে পারে। শিক্ষার্থীদের চিহ্নিত অসুবিধাগুলি বা সমস্যাগুলির ভিত্তিতে এবং সম্ভাব্য কারণ খতিয়ে দেখে কম্পিউটার সফটওয়ারগুলি সংশোধনের জন্য সম্ভাব্য উপায় উল্লেখ করে নির্দেশনার পরিকল্পনা ও সংগঠনকে সম্ভব করে তুলতে সক্ষম।

(৭) **অগ্রগতি দেখাশোনা বা পরিদর্শন** (Monitoring of Progress) : শিক্ষার্থীর অগ্রগতির দেখাশোনা করতে বা পরিদর্শন করতে CMI বিশেষ ভাবে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে। শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিশিখনকে সম্পূর্ণভাবে সন্তোষজনক করার ক্ষেত্রে CMI-এর ভূমিকা প্রশংসনীয়। সঠিক নির্দেশনার পরিকল্পনা থাকলে একজন শিক্ষার্থী কী কাজ করেছে, ভবিষ্যতে কী করতে পারবে তা নিয়মিত পরিদর্শনের মাধ্যমে পথ নির্দেশ করা সম্ভব CMI-এর পক্ষে। এইভাবে অসংখ্য শিক্ষার্থী উপকৃত হতে পারে। CMI শিক্ষার্থীর নিম্নমানের শিক্ষার্জন, শিখনে তার দুর্বলতা, দুর্বলতার সম্ভাব্য কারণগুলির অনুসন্ধান করে উপযুক্ত পরামর্শ দান করতে সক্ষম।

(৮) **তথ্যের ব্যবস্থাপনা এবং রেকর্ড রাখা (Management of information and record keeping)** : নির্দিষ্ট কম্পিউটার সফটওয়ার-এর মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার তথ্যের সংগ্রহ, সঞ্চয়, শ্রেণিবিন্যাস্তকরণ এবং পরিব্যাপ্তি ঘটানো সম্ভব। এই সমস্ত কাজকর্ম করা হয় সুসংগঠিত ব্যবস্থার দ্বারা রেকর্ড রাখার মাধ্যমে। শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীরা মিলিতভাবে শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ায় কাজে লাগানোর জন্য এই রকম একটি তথ্যভাণ্ডার গড়ে তোলা খুবই জরুরি। শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবনের পূর্ববর্তীস্তরের বিভিন্ন তথ্য যেগুলি তাদের আগ্রহ, মনোযোগ, ক্ষমতা, চাহিদা, শিক্ষাগত পরিবেশের পটভূমিকা। ধরে রাখে, সেগুলিকে সংগ্রহ করে সযত্নে সংরক্ষিত বা সঞ্চিত করে রাখতে সেগুলি শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ নির্দেশনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

(৯) **পরীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা সংগঠিত করা** (Organizing of testing and evaluation programme) : কম্পিউটার সফটওয়ার শিক্ষার্থীদের পরীক্ষণ ও

মূল্যায়ন ব্যবস্থা সংগঠিত করার ক্ষেত্রে মূল্যবান সহায়তা দান করে। শ্রেণিকক্ষের নির্দেশনায় এবং শিক্ষামূলক অগ্রগতিতে বিভিন্নভাবে সহায়তা দান করে। শিক্ষার্থীদের শিক্ষামূলক আচরণকে পরিমাপ ও মূল্য নিরূপণ করতে সফটওয়ারগুলি বিশেষভাবে সাহায্য করে। শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি কম্পিউটার খুব সহজেই সম্পাদন করতে পারে সেগুলি হল বিভিন্ন বিষয়ের প্রশ্ন-ব্যাঙ্ক প্রস্তুত করা, প্রশ্নগুচ্ছের শ্রেণিবিন্যাস করা,প্রশ্নপত্রে পদগুলির কাঠিন্যমাত্রা নির্ধারণ ও পার্থক্য নির্ণায়ক ক্ষমতা নির্ণয়, প্রশ্ন নির্বাচন, প্রশিক্ষণের দৃষ্টিভঙ্গিতে শিক্ষার্থীদের দক্ষতা যাচাই করা, শিক্ষার্থীদের তুলনামূলক বিচারকরণ ও দুর্বলতা নির্ণয় ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি।

(১০) **সব ধরনের প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ** (Generating all types of reports) : প্রতিবেদন প্রস্তুতিতেও কম্পিউটারের ভূমিকা অনন্য। নির্দিষ্ট সফটওয়ারের মাধ্যমে নির্দেশনার সঙ্গে সম্পর্কিত ও যুক্ত বিভিন্ন কার্য এবং তাদের ফলাফল এর ভিত্তিতে যে প্রোগ্রাম প্রস্তুত করা যায় তার দ্বারা প্রতিবেদনের কাজ করা সম্ভব। শিক্ষার্থীদের সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য কম্পিউটারের তথ্যভাণ্ডারে জমা রেখে সেগুলির সাহায্যে সহজেই শিক্ষার্থীদের শিক্ষা সংক্রান্ত তথা সার্বিক অগ্রগতির পরিচয় পাওয়া যায়। এগুলিই শিক্ষার্থী সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রস্তুতির উপাদান হিসেবে কাজ করে।

Download From>>

www.ebook.dascoaching.in

Follow Our B.Ed Related Website>>

www.dascoaching.in

Scanned with CamScanner

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর
(Short Questions & Answers)

❑ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর (Objective type questions & answers) : Marks – 2

১। একটি ভালো বক্তৃতার বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী? (What are the characteristics of a good lecture?)

উত্তর : একটি ভালো বক্তৃতা প্রদানের জন্য শিক্ষককে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা দরকার। বিষয়গুলির নিম্নে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল :

(i) **শিক্ষকের অবস্থান :** শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে যখন বক্তৃতা রাখার জন্য প্রস্তুত হবেন তখন তিনি এমনভাবে অবস্থান করবেন বা দাঁড়াবেন যাতে সকল শিক্ষার্থী স্বচ্ছন্দে তাঁকে দেখতে পায়।

(ii) **বাহ্যিক রূপ :** শিক্ষকের চেহারা বা বাহ্যিক রূপ এমন হবে যাতে শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

(iii) **চাল-চলন ব্যবহার :** বক্তৃতা চলাকালীন শিক্ষার্থীদের মনোযোগকে ধরে রাখার জন্য শিক্ষকের আচার-আচরণের সংযম যেমন দরকার তেমনি অন্যদিকে মার্জিত ও অমায়িক ব্যবহারও দরকার।

২। বক্তৃতা পদ্ধতির চারটি সুবিধা উল্লেখ করুন। (State the four merits of Lecture Method.)

উত্তর : বক্তৃতা পদ্ধতির চারটি সুবিধা হল :

(i) বক্তৃতা পদ্ধতিটির ব্যবহারিক খরচ যেমন অনেক কম তেমনই একজন মাত্র শিক্ষক এক সঙ্গে বহু শিক্ষার্থীকে নির্দেশনা দিতে পারেন।

(ii) পরিবেশ সঠিক হলে নতুন তথ্য পরিবেশনার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি অন্য পদ্ধতির মতোই সমান কার্যকরী।

(iii) বহু শিক্ষক বক্তৃতা পদ্ধতিকে সুবিধাজনক পদ্ধতি বলে মনে করেন। শিক্ষক নিজের ইচ্ছামতো খুব সহজেই পাঠদান করতে পারেন।

(iv) শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক অনেক বেশি সহজ ও স্বচ্ছন্দ।

৩। বক্তৃতা পদ্ধতির চারটি অসুবিধা উল্লেখ করুন। (State the four demerits of Lecture Method.)

উত্তর : বক্তৃতার পদ্ধতির চারটি অসুবিধা নীচে উল্লেখ করা হল—

(i) শিক্ষকের ব্যক্তিগত যোগ্যতার উপর যেহেতু বক্তৃতা পদ্ধতির সাফল্য নির্ভর করে তাই যোগ্যশিক্ষক না হলে এই পদ্ধতির সাফল্য অনেক কম হবে।

(ii) বক্তৃতা শোনার মতো মানসিকতা ও ধৈর্য না থাকলে শিক্ষার্থী এই পদ্ধতিতে উপকার কম পাবে এবং শিখনও কম হবে।

(iii) বক্তৃতা পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা যেহেতু অনেকাংশেই নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করে তাই তাদের মনোযোগ যেমন কম থাকে তেমনি শিখনের মাত্রা কম হয়।

(iv) শিক্ষাবিজ্ঞানের জ্ঞান না থাকলে নির্দেশক শিক্ষার্থীর প্রয়োজন, অসুবিধা ইত্যাদি বুঝতে পারবেন না, এতে শিখনমাত্রা কম হয়।

৪। পারস্পরিক ক্রিয়া পদ্ধতির কৌশলগুলি কী কী? (What are the strategies of Interactive Method?)

উত্তর : পারস্পরিক ক্রিয়া শিক্ষণ পদ্ধতিতে যে সমস্ত কৌশলকে ব্যবহার করা হয় তাদের কয়েকটি হল নিম্নরূপ—

(i) বিতর্ক (Debate)

(ii) রোল প্লেয়িং (Role Playing)

(iii) প্যানেল আলোচনা (Panel Discussion)

(iv) চিন্তায় আলোড়ন (Brain Storming)

(v) আলোচনা (Discussion)

(vi) সাক্ষাৎকার (Interview)

(vii) কনফারেন্সিং (Conferencing)

(viii) পরীক্ষাগারের দল (Laboratory Groups)

৫। প্রতিপাদন পদ্ধতির সুবিধাগুলি কী কী? (What are the merits of Demonstration method?)

উত্তর : প্রতিপাদন পদ্ধতির সুবিধাগুলি হল—

(i) শিক্ষকের জন্য সামান্য এক সেট শিক্ষণ প্রদীপন, চক ও ব্ল্যাকবোর্ড এবং পাঠপরিকল্পনা নিয়ে সামান্য খরচে এই পদ্ধতি সহজেই ব্যবহার করা যায়।

(ii) এই পদ্ধতিতে সময় কম লাগে। শ্রেণিকক্ষে নির্দিষ্ট যেটুকু সময় পাওয়া যায় তার ভিত্তিতেই এই প্রতিপাদন পদ্ধতিকে শিক্ষক প্রয়োগ করতে পারেন।

(iii) এই পদ্ধতিতে 'মূর্ত থেকে বিমূর্ত' শিক্ষার এই নীতির প্রয়োগ করা যায়।

Scanned with CamScanner

(iv) পরীক্ষা প্রদর্শন শিক্ষার্থীদের প্রেষণা সঞ্চার যেমন করতে পারে তেমনই অনুসন্ধিৎসা জাগিয়ে তুলতে পারে।

৬। প্রতিপাদন পদ্ধতির অসুবিধাগুলি কী কী? (What are the demerits of Demonstration Method?)

উত্তর : প্রতিপাদন পদ্ধতির অসুবিধাগুলি হল—

(i) এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা পর্যবেক্ষণের যথেষ্ট সুযোগ পেলেও, নিজেরা সরাসরি হাতেকলমে করার সুযোগ পায় না। তাই 'কাজের মাধ্যমে শিখন' অর্থাৎ 'learning by doing' এর সুযোগ শিক্ষার্থীরা পায় না।

(ii) শিক্ষক নিজে দক্ষতার সঙ্গে প্রতিপাদন পদ্ধতিকে ব্যবহার করে পাঠ পরিচালনা করলেও প্রতিটি শিক্ষার্থী তাদের নিজেদের ব্যক্তিগত চাহিদা ও ক্ষমতা অনুযায়ী সম্পূর্ণভাবে শেখার সুযোগ পায় না।

(iii) দর্শন ও শ্রবণেন্দ্রিয় এর ব্যবহার যথেষ্ট হলেও অন্যান্য জ্ঞানেন্দ্রিয়ের যথাযথ ব্যবহারের সুযোগ থাকে না বলে শিক্ষণ সম্পূর্ণভাবে সুদৃঢ় হয় না।

(iv) শ্রেণিকক্ষের নির্দিষ্ট সময় মেনে প্রতিপাদন পদ্ধতি প্রয়োগের চেষ্টা করলেও অনেক ক্ষেত্রে উন্নত মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীরা উপকৃত হলে অল্প মেধাসম্পন্নরা উপকৃত হয় না, আবার অল্প মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীরা উপকৃত হলে উন্নত মেধাসম্পন্নরা হয় না।

(v) শিক্ষার্থীদের লেবরেটরি শিক্ষায় দক্ষতা অর্জনে এই পদ্ধতিতে সাফল্য পায় না।

৭। আবিষ্কার পদ্ধতি বলতে কী বোঝায়? (What is Heuristic Method or Discovery Method?)

উত্তর : আবিষ্কার পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের কাছে এমন দৃষ্টিভঙ্গি বা কৌশল উপস্থাপিত করে যেখানে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কোনো তথ্য বা জ্ঞান প্রদান করেন না, কোনো পাঠ্যপুস্তক থেকে ইতিমধ্যেই প্রস্তুত কোনো তথ্য বা নিয়ম বা সূত্র হাজির করেন না। তার পরিবর্তে শিক্ষার্থীদের এমন একটি পরিস্থিতির মধ্যে স্থাপন করা হয়, যাতে শিক্ষার্থীরা নিজেদের চেষ্টায় তথ্য সংগ্রহ করে এবং স্বাধীনভাবে অনুসন্ধান করবে। শিক্ষার্থী যা শিখবে তা সে নিজেই শিখন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আবিষ্কার করবে। শিক্ষার্থী তার জ্ঞানের কাঠামোর সঙ্গে ওই আবিষ্কৃত নতুন জ্ঞানকে অর্থপূর্ণভাবে সমন্বিত করবে। শিক্ষার্থী এই প্রক্রিয়ায় তথ্যকে পুনর্বিন্যাস করে বর্তমান জ্ঞানের কাঠামোর সঙ্গে সমন্বয় করে এমনভাবে জ্ঞানটিকে রূপান্তরিত করবে যাতে এটি শিখনের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যবস্তু হয়ে ওঠে। আবিষ্কৃত বিষয়বস্তু উপস্থাপিত বিষয়বস্তুর মতোই সমান অর্থপূর্ণ হয়।

৮। আবিষ্কার পদ্ধতির উদ্দেশ্যগুলি কী কী? (What are the objectives of Heuristic Method?)

উত্তর : আবিষ্কার পদ্ধতির উদ্দেশ্যগুলি হল—

(i) শিক্ষার্থীদের অনুসন্ধান ও গবেষণামূলক অভ্যাস গঠন করা।

(ii) শোনা, পর্যবেক্ষণ, প্রশ্নকরণ এবং আবিষ্কারের অভ্যাস শিক্ষার্থীদের মধ্যে ধীরে ধীরে সঞ্চারিত করা।

(iii) শিক্ষার্থীদের বেশি বেশি চিন্তনমুখী করে তোলা।

(iv) ভবিষ্যৎ শিখনের ভিত্তি তৈরি করা।

(v) শিক্ষার্থীদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের উদ্দীপনা সঞ্চার করা এবং প্রবণতা দৃঢ়ভাবে গেঁথে দেওয়া।

৯। প্রোজেক্ট পদ্ধতির চারটি মূল নীতি উল্লেখ করুন। (State the four main principles of Project Method.)

উত্তর : প্রোজেক্ট পদ্ধতির চারটি মূল নীতি হল—

(i) **উদ্দেশ্যের নীতি** (Principle of purpose) : প্রোজেক্ট পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের কাছে প্রথমেই নির্দিষ্ট হয়ে যায় কর্মমূলক প্রচেষ্টাটির উদ্দেশ্য। শিক্ষার্থীরা উপলব্ধি করতে পারে কী উদ্দেশ্য নিয়ে তারা কাজ করছে।

(ii) **সক্রিয়তার নীতি** (Principle of activity) : প্রকৃতিগত বা স্বাভাবগতভাবেই শিশুরা সক্রিয়। তাদের এই সক্রিয়তাকে কাজে লাগানোর জন্য কিছু সুযোগ দিতে হবে যাতে তাদের 'কাজের মাধ্যমে শেখার' পরিস্থিতি তৈরি হয়, দৈহিক এবং মানসিক উভয় প্রকার কাজের সুযোগ দিতে হবে।

(iii) **অভিজ্ঞতার নীতি** (Principle of experience) : মানবশিশুর সব চেয়ে বড়ো শিক্ষক তার পরিবেশ থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা। শিক্ষার্থীরা যা কিছু শিখবে তার ভিত্তি হবে অভিজ্ঞতালাভ।

(iv) **সামাজিক অভিজ্ঞতার নীতি** (Principle of social experience) : সামাজিক অভিজ্ঞতার দ্বারা শিক্ষার্থীর যৌথ জীবন-যাপনের নীতিতে অভ্যস্ত হওয়ার সুযোগ পায়।

১০। কম্পিউটার সহায়ক নির্দেশনার মৌলিক নীতিগুলি কী কী? (What are the basic assumptions of Computer assisted Instruction?)

উত্তর : কম্পিউটার সহায়ক নির্দেশনা গড়ে উঠেছে গড়ে উঠেছে কতকগুলি মৌলিক নীতির উপর ভিত্তি করে। সেগুলি হল—

Scanned with CamScanner

(i) **একই সময়ে বহুসংখ্যক শিক্ষার্থীর জন্য নির্দেশনা :** CAI একই সময়ে একসঙ্গে হাজার হাজার শিক্ষার্থীকে ব্যক্তিগত শিক্ষণ বা নির্দেশনার পথ বেয়ে শেখানোর কাজ করতে সক্ষম।

(ii) **শিক্ষার্থীদের কাজকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ধারণ :** উপস্থাপিত নির্দেশনার বিষয়বস্তুর পরিপ্রেক্ষিতে একজন শিক্ষার্থী কেমনভাবে প্রতিক্রিয়া করে? তার প্রশ্নগুলি কী কী? তার অসুবিধাই বা কোথায় কোথায়? তার কাজের সাফল্য কতখানি?— এই সমস্ত কিছুই খুব নিখুঁত এবং সার্থকভাবে কম্পিউটারে স্বয়ংক্রিয় ভাবে ধরে রাখা যায়।

(iii) **পদ্ধতি এবং কৌশল ব্যবহারে বৈচিত্র্য :** CAI এই ধারণায় বিশ্বাস রাখে যে কোনো একটি পদ্ধতি দ্বারা সমস্ত শিক্ষার্থীই সুবিধা পেতে পারে না। সমস্ত বিষয়, সমস্ত পাঠ একক কোনো একটি সাধারণ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর নিকট সহজবোধ্যভাবে শিখন সার্থকতা পায় না। ব্যক্তি বৈষম্য অনুসারে বিভিন্ন শিক্ষার্থী নিজের নিজের ক্ষমতা, চাহিদা ও আগ্রহ অনুযায়ী এক একটি পদ্ধতিতে শিখতে পারে।

সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি

❑ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Very short type questions) : Marks – 2

১। একটি ভালো বক্তৃতার বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী? (What are the characteristics of a good lecture?)

২। বক্তৃতা পদ্ধতির চারটি সুবিধা উল্লেখ করুন। (State the four merits of Lecture Method.)

৩। বক্তৃতা পদ্ধতির চারটি অসুবিধা উল্লেখ করুন। (State the four demerits of Lecture Method.)

৪। পারস্পরিক ক্রিয়া পদ্ধতির কৌশলগুলি কী কী? (What are the strategies of Interactive Method?)

৫। প্রতিপাদন পদ্ধতির সুবিধাগুলি কী কী? (What are the merits of Demonstration method?)

৬। প্রতিপাদন পদ্ধতির অসুবিধাগুলি কী কী? (What are the demerits of Demonstration Method?)

৭। আবিষ্কার পদ্ধতি বলতে কী বোঝায়? (What is Heuristic Method or Discovery Method?)

৮। আবিষ্কার পদ্ধতির উদ্দেশ্যগুলি কী কী? (What are the objectives of Heuristic Method?)

৯। প্রোজেক্ট পদ্ধতির চারটি মূল নীতি উল্লেখ করুন। (State the four main principles of Project Method.)

১০। কম্পিউটার সহায়ক নির্দেশনার মৌলিক নীতিগুলি কী কী? (What are the basic assumptions of Computer Assisted Instruction?)

❑ সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্নাবলি (Short answer type questions) : Marks – 5

১। বক্তৃতা পদ্ধতির সুবিধাগুলি লিখুন। (Write the merits of Lecture Method.)

২। বক্তৃতা পদ্ধতির অসুবিধাগুলি লিখুন। (Write the demerits of Lecture Method.)

৩। ভালো বক্তৃতা পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যগুলি লিখুন। (Write the characteristics of a good Lecture.)

Scanned with CamScanner

৪। সহযোগিতামূলক পারস্পরিক ক্রিয়া কাকে বলে? (What is co-operative Interaction?)

৫। প্রতিপাদন পদ্ধতির ধাপগুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করুন। (State the steps of Demonstration Method.)

৬. প্রতিপাদন পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধাগুলি লিখুন। (Write the merits and demerits of Demonstration Method.)

৭। প্রোজেক্ট পদ্ধতির মূলনীতিগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করুন। (Discuss in brief the main principles of Project Method.)

৮। কম্পিউটার সহায়ক নির্দেশনার ক্রিয়াশীলতা উল্লেখ করুন। (State the operation of Computer Assisted Instruction.)

❑ রচনাধর্মী প্রশ্নাবলি (Essay type questions) : Marks – 10

১। শ্রেণিকক্ষের শিক্ষণে সবচেয়ে কার্যকরী পদ্ধতি হিসেবে বক্তৃতা পদ্ধতিকে বিবেচনা করা হয় কেন? (Why lecture method is considered as most effcetive method in classroom teaching.)

২। প্রতিপাদন পদ্ধতির প্রধান ধাপগুলি বর্ণনা করুন। (Discuss the main principles of Demosnstration Method.)

৩। আবিষ্কার পদ্ধতির লক্ষ্যগুলি বর্ণনা করুন। (Explain the aims of Discovery Method/Heuristic Method.)

৪। কম্পিউটার সহায়ক নির্দেশনার কার্যপ্রণালী বর্ণনা করুন। (Discuss the modes of Computer Assisted Instruction.)

৫। শ্রেণিকক্ষে পারস্পরিক ক্রিয়ার বিবরণ দিন। (Give the description of Interaction in the class.)

অধ্যায় ৩

সমাজবিজ্ঞানের (শিক্ষাবিজ্ঞান) শিখনসম্পদ

[Learning Resource in Social Science (Education) Teaching]

◆ বিষয়বস্তুর রূপরেখা :

৩.০ ভূমিকা (Introduction)

৩.১ শিখন সম্পদের অর্থ, প্রকারভেদ ও গুরুত্ব (Meaning, Type and Importance of Learning Resources)

- ৩.১.১ সম্পদের অর্থ ও প্রকৃতি (Meaning and Nature of Resoures)
- ৩.১.২ শিখন সম্পদের অর্থ (Meaning of Learning Resources)
- ৩.১.৩ শিখন সম্পদের গুরুত্ব (Importance of Learning Resources)
- ৩.১.৪ শিখন সম্পদের প্রকারভেদ (Types of Learning Resources)
- ৩.১.৫ শিখন সম্পদ হিসাবে পুস্তক (Book as Learning Resorce)
  - ৩.১.৫.১ পাঠ্যপুস্তক (Text Book)
  - ৩.১.৫.২ আকরগ্রন্থ (Reference Book)
  - ৩.১.৫.৩ হাতবই (Handbook)
  - ৩.১.৫.৪ বিশ্বকোশ (Encyclopedia)
  - ৩.১.৫.৫ অভিধান (Dictionary)
  - ৩.১.৫.৬ স্বনির্দেশনামূলক উপকরণ (Self-Unstructional Material)
  - ৩.১.৫.৭ প্রোগ্রামড্ লার্নিং মেটেরিয়াল (Programmed Learning Material)
  - ৩.১.৫.৮ অনুশীলনী বই (Work Book)
  - ৩.১.৫.৯ প্রশ্নভান্ডার (Question Bank)

৩.২ ভালো শিক্ষাবিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তকের গুণাবলি (Qualities of good Education Text book)

Scanned with CamScanner

৩.৩ শিখন সম্পদ হিসাবে শিক্ষণ প্রদীপন (Teaching Aids in Social Science Resources)

৩.৩.১ শিক্ষণ প্রদীপন ও শিক্ষামূলক উপকরণ (Teaching Aids and Teaching Application)

৩.৩.২ শিক্ষণ প্রদীপনের উপযোগিতা (Utility of Teaching Aids)

৩.৩.৩ শিক্ষণ প্রদীপনের সংজ্ঞা (Definition of Teaching Aids)

৩.৩.৪ শিক্ষণ প্রদীপনের অত্যাবশকীয় গুণাবলি (Essential Qualities of Teaching Aids)

৩.৩.৫ শিক্ষণ প্রদীপন ব্যবহারে সীমাবদ্ধতা (Limitation in the uses of Teaching Aids)

৩.৩.৬ শিক্ষণ প্রদীপনের শ্রেণিবিভাগ (Classification of Teaching Aids)

৩.৩.৭ কিছু শিক্ষণ প্রদীপনের বিবরণ (Description of some Teaching Aids)

৩.৩.৭.১ বেতার (Radio)

৩.৩.৭.২ টেপরেকর্ডার (Tape-Recoder)

৩.৩.৭.৩ গ্রামোফোন (Gramophone)

৩.৩.৭.৪ চার্ট (Chart)

৩.৩.৭.৫ মডেল (Model)

৩.৩.৭.৬ বাস্তবস্তু বা নমুনা (Real object/Specimen)

৩.৩.৭.৭ ছবি ও ফটোগ্রাফ (Picture and Photograph)

৩.৩.৭.৮ মানচিত্র (Map)

৩.৩.৭.৯ স্লাইড (Slide)

৩.৩.৭.১০ রেখাচিত্র (Diagram)

৩.৩.৭.১১ লেখচিত্র (Graph)

৩.৩.৭.১২ গ্লোব (Globe)

৩.৩.৭.১৩ ফিলম্ স্ট্রিপ (Film strip)

৩.৩.৭.১৪ চলচিত্র (Cinema)

৩.৩.৭.১৫ দূরদর্শন (Television)

৩.৩.৭.১৬ কম্পিউটার (Computer)

৩.৩.৭.১৭ ট্রান্সপারেনসি (Transperency)

৩.৩.৭.১৮ ভিডিয়ো (Video)

৩.৩.৭.১৯ অ্যানিমেশন (Animation)

৩.৩.৮ শ্রবণ-দৃষ্টি নির্ভর প্রদীপনের নির্বাচন, প্রস্তুতি ও ব্যবহার (Selection, Preparation and uses of Audio-visual Aids)

৩.৪ শিক্ষণ প্রদীপনের তাৎক্ষণিক উদ্ভাবন (Improvisation of Teaching Aids)

৩.৪.১ ভূমিকা (Introduction)

৩.৪.২ তাৎক্ষণিক উদ্ভাবিত শিক্ষণ প্রদীপনের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Improvised Teaching Aids)

৩.৪.৩ তাৎক্ষণিক উদ্ভাবিত শিক্ষণ প্রদীপনের নির্মাণ পদ্ধতি (Process of Developing Improvised Teaching Aids)

৩.৪.৪ শিক্ষাবিজ্ঞান শিক্ষণে শিক্ষণ প্রদীপন উদ্ভাবনের গুরুত্ব (Importance of Improvised Teaching Aids in Teaching Education)

৩.৪.৫ তাৎক্ষণিক উদ্ভাবিত শিক্ষণ প্রদীপনের কিছু দৃষ্টান্ত (Examples of some Improvised Teaching Aids)

৩.৪.৬ তাৎক্ষণিক উদ্ভাবিত শিক্ষণ প্রদীপনের নির্মাণ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে সমস্যা (Problem in the Development and Effective use of Improvised Teaching Aids)

৩.৫ সমাজবিজ্ঞান (শিক্ষাবিজ্ঞান) ল্যাবরেটরির পরিকল্পনা ও সংগঠন (Planning and Organisation of Social Science (Education) Laboratory)

৩.৫.১ শিক্ষাবিজ্ঞান ল্যাবরেটারির অর্থ (Meaning of Education Laboratory)

৩.৫.২ শিক্ষাবিজ্ঞান ল্যাবরেটারির প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব (Need and Importance of Education Laboratory)

৩.৫.৩ শিক্ষাবিজ্ঞান ল্যাবরেটারির পরিকল্পনা (Designing of Education Laboratory)

৩.৫.৪ শিক্ষাবিজ্ঞান ল্যাবরেটরিতে যে সমস্ত শিক্ষামূলক সামগ্রী ও উপকরণ রাখা যেতে পারে (Type of Material and Eqipment to be kept in a Education Laboratory)

ebook.dascoaching.in

Scanned with CamScanner

৩.০ ভূমিকা (Introduction) :

বিংশ শতাব্দির মধ্যবর্তী সময় থেকে যোগাযোগ এবং শিক্ষামূলক প্রযুক্তিবিদ্যায় নানান যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম উদ্ভাবনের ফলে উন্নত দেশগুলিতে শিক্ষা বিতরণ ও অর্জনে সম্পদ (resource) প্রত্যয়টির উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপিত হতে শুরু করে। বিদ্যালয় শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও প্রযুক্তিগত কর্মকৌশল ভিত্তিক ওই প্রত্যয়কে কেন্দ্র করে ব্রিটেনে নতুন ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত হয় ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে। এই প্রেক্ষিতে ব্রিটেনের লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন কয়েকটি নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এর ফলে শিক্ষা ও গবেষণার কাজে গ্রন্থ ও শ্রবণ-বীক্ষণ সামগ্রী সমুদয় পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে স্বীকৃতি পায় এবং গ্রন্থাগারের সমন্বিত সংগ্রহ হিসেবে বিবেচিত হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গিই ক্রমশ পৃথিবীর অন্যান্য দেশে বিশেষত উন্নয়নশীল দেশগুলিতে গুরুত্ব পেতে থাকে। ভারতের মতো দেশও এই দৃষ্টিভঙ্গিকে গ্রহণ করে। এর ফলশ্রুতিতে বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে যোগাযোগ ও প্রযুক্তিবিজ্ঞান ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশেও শিক্ষার বিশেষ দিককে প্রভাবিত করেছে অনেকখানি। এইসব মিলিয়ে শিক্ষার জগতে শিখন সম্পদ তার নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে হাজির হয়েছে আমাদের কাছে। শিক্ষাক্ষেত্রে ওই শিখন সম্পদ আর যোগাযোগ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে।

৩.১ শিখন সম্পদের অর্থ, প্রকারভেদ ও গুরুত্ব (Meaning, Type and Importance of Learning Resources) :

৩.১.১ সম্পদের অর্থ ও প্রকৃতি (Meaning and Nature of Resoures) :

আমরা সাধারণভাবে 'সম্পদ' বলতে বুঝি 'ঐশ্বর্য' বা 'ধনসম্পত্তি'। কিন্তু অর্থবিদ্যায় সম্পদ বলতে বোঝায় সেই উপাদনকে যার (i) উপযোগিতা আছে, (ii) চাহিদার তুলনায় জোগান কম, (iii) যার বিক্রয় মূল্য আছে এবং (iv) যার উৎপাদন অর্থনৈতিক দিক থেকে লাভজনক। অর্থনৈতিক ভূগোলে সম্পদ কিন্তু কোনো বস্তু বা উপাদান মাত্র নয়। বস্তুর কার্যকারিতাই হল সম্পদ। সেক্ষেত্রে সম্পদের দু'টি উল্লেখযোগ্য গুণ থাকবে— (i) উপযোগিতা, (ii) কার্যকারিতা। বিশিষ্ট সম্পদ শাস্ত্রকার E.W. Zimmermann (১৯৫১)-এর ভাষায় "সম্পদ হল লক্ষ্যপূরণের একটি মাধ্যম, যে লক্ষ্য হল ব্যক্তিগত চাহিদাপূরণ বা সামাজিক উদ্দেশ্য সাধন।" Encyclopedia of Social Sciences মতানুসারে সম্পদ হল মানুষের পার্থিব ও আর্থ-সামাজিক পরিবেশের উপাদান। সেই সমস্ত উপাদানগুলিকে সম্পদ বলা হবে যেগুলি মানুষের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারে এবং সামাজিক লক্ষ্য পূরণের অনুকূল। সম্পদের মূল লক্ষ্যই হল মানুষের কল্যাণ সাধন। প্রকৃতপক্ষে মানুষ যখন তার কর্মক্ষমতা দিয়ে প্রাকৃতিক উপাদানগুলিতে উপযোগিতা এবং কার্যকারিতা আরোপ করে মানব সমাজে

কল্যাণকামী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে তখনই সেগুলি সম্পদে পরিণত হয়। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যেতে পারে যে, 'কয়লা' নামক প্রাকৃতিক উপাদানটি যখন মাটির সুগভীর অংশে নিহীত থাকে তখন সেটি সাধারণ একটি পদার্থ মাত্র। কিন্তু যখন সেই কয়লাকে মাটির সুগভীর অংশ থেকে তুলে এনে কাঁচামাল হিসেবে বিদ্যুৎ উৎপাদনে কাজে লাগানো হচ্ছে তখনই তা উপকরণ বা সম্পদে পরিণত হচ্ছে।

সমাজ বিবর্তনের সাথে সাথে সম্পদের সংজ্ঞাও বদলায় কোলারস এবং নাইস্টুয়েনের (Kolars and Nystuen, 1975) মতানুসারে সম্পদকে কোনো দৃষ্টিভঙ্গিতে গ্রহণ করা হবে তা নির্ভর করে সংস্কৃতির উপর, যেমন মানুষের কাছে কয়লা একটি সাধারণ কালো রঙের পাথর হলেও, শিল্পবিপ্লব পরবর্তী যুগে মানুষের কাছে কয়লা একটি অতীব মূল্যবান বস্তু। স্থান ও কাল ভেদে সম্পদের সংজ্ঞা বদলে যায়।

জীবমণ্ডল এবং সম্পদের মধ্যে সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। এজন্য ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে ব্রাজিলের রিও-ডি-জেনেইরোতে অনুষ্ঠিত বসুন্ধরা সম্মেলনে সম্পদের যে নতুন সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে যাতে বলা হয়েছে— "পরিবেশের যা কিছু বস্তু তার কার্যকারিতার মাধ্যমে মানুষের চাহিদা পূরণের সঙ্গে সঙ্গে জীবকূলের সংরক্ষণকেও সুনিশ্চিত করে তাকেই সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত।"

উপলব্ধির দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পদের অর্থ বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, মানুষ তার সংস্কৃতি (Culture)-এর সাহায্যে প্রকৃতির বিশাল ভাণ্ডার থেকে সংগৃহীত উপাদান সমূহকে বিচার করে, পরীক্ষানিরীক্ষা করে কোন্‌টি সম্পদ তা স্থির করে, যেমন এক সময় কীটনাশক বস্তু হিসেবে DDT সম্পদ হিসেবে মান্যতা পেলেও পরবর্তীকালে তা জীব বৈচিত্র্য ধ্বংসকারী হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে, ফলে তা আর সম্পদ নয়। বস্তুত, 'জ্ঞান হল সম্পদের প্রকৃত জননী।' শ্রেষ্ঠ মানবিক গুণ হিসেবে জ্ঞান সম্পদের জন্ম দেয়। প্রাচীনকাল থেকে ধীরে ধীরে মানুষ তার নিজের প্রয়োজনে সমস্ত বাধা-বিপত্তিকে অতিক্রম করে নতুন নতুন সমম্পদের সৃষ্টি করে চলেছে। জ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, গবেষণা, অর্থনৈতিক অবস্থা, সামাজিক কাঠামো, রাজনৈতিক চেতনা ও বিন্যাসের উপর ভিত্তি করে মানুষ সম্পদ সম্পর্কে তার উপলব্ধিকে পরিবর্তিত করে নিজেকে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করেছে। সুতরাং শিক্ষাই হল প্রকৃত উপায় যার মাধ্যমে মানুষ জ্ঞান অর্জন করে, বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির প্রয়োগকে বিস্তৃত করে এবং সামগ্রিকভাবে উপলব্ধির জগৎকে সমৃদ্ধ করে। সেদিক থেকে মানুষ নিজেই সম্পদে পরিণত হতে পারে এই শিক্ষার মাধ্যমে।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে সম্পদের প্রকৃতি সম্পর্কে আমরা নিম্নলিখিত ধারণা পেতে পারি :

(১) সম্পদ পরিবেশের উপাদান।

Scanned with CamScanner

(২) সম্পদ প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে সংগৃহীত অথবা মানুষের দ্বারা সৃষ্ট হতে পারে।

(৩) সম্পদ মানুষের চাহিদা পূরণ করে।

(৪) সম্পদ মানব সমাজের কল্যাণ সাধন করে।

(৫) সম্পদ অসীম বা সীমাহীন নয়।

(৬) কিছু সম্পদ বারে বারে ব্যবহার করা যায়।

(৭) সম্পদের কার্যকারিতা একমুখী ও বহুমুখী উভয়ই হতে পারে।

(৮) সম্পদের ধারণা স্থান ও কাল-এর উপর নির্ভর করে।

(৯) মানুষের জ্ঞান, বুদ্ধি, চেতনা, দক্ষতা, বিচারবোধ হল সম্পদ।

(১০) সম্পদ সর্বদা গতিশীল। জ্ঞান, বুদ্ধি, প্রযুক্তির উন্নয়নের সাথে সাথে নিরপেক্ষ সামগ্রী সম্পদে পরিণত হয় এবং কোনো সম্পদ আরো উন্নত থেকে উন্নততর সম্পদে বিকশিত হয়।

(১১) প্রকৃতি, মানুষ ও সংস্কৃতি এই তিনটি উপাদানের পারস্পরিক ক্রিয়ায় সম্পদ সৃষ্টি হয়।

(১২) সম্পদ জীবমণ্ডলের সংরক্ষণে সহায়ক ভূমিকা গ্রহণ করে।

❑ ৩.১.২ শিখন সম্পদের অর্থ (Meaning of Learning Resources) :

শিক্ষা, বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছে সেই পরিবর্তনের ধারায় বিকাশলাভ করেছে শিক্ষা প্রযুক্তিবিদ্যার। এই শিক্ষা প্রযুক্তিবিদ্যার বিবর্তনের সূত্র ধরে কয়েক দশক পরে এসেছে একটি নতুন ধারণা যা শিখন সম্পদ বা Learning Resource নামে অভিহিত। শিক্ষা জগতের সঙ্গে সম্পদের ধারণায় এটি একটি নতুন প্রত্যয় হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এর সমার্থ হল শিক্ষণ ও শিখন প্রক্রিয়ায় একটি অভিনব কৌশল প্রয়োগ করা, যাতে সমস্ত রকম শ্রবণ-দৃষ্টি নির্ভর মাধ্যমের সাহায্য নেওয় যায়। সম্পদের অর্থ আলোচনায় আমরা দেখেছি অবস্তুগত সম্পদ হিসেবে 'জ্ঞান' মানুষের জীবনে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই জ্ঞান অর্জন তথা অভিজ্ঞতা লাভের জন্য আমাদের নির্ভর করতে হয় চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক নামক জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির উপর। বস্তুত, আমাদের অভিজ্ঞতা লাভ বা জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে দর্শন ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের ভূমিকা সর্বাধিক। জ্ঞানের ৮৩ শতাংশ অর্জিত হয় চক্ষু বা দর্শনেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে এবং ১১ শতাংশ অর্জিত হয় কর্ণ বা শ্রবণেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে। স্বাভাবিক ভাবেই দৃষ্টি ও শ্রবণ নির্ভর মাধ্যমগুলি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এই সমস্ত মাধ্যমগুলি বস্তুগত সম্পদ হিসেবে মানুষের জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে যেমন চাহিদা পূরণ করে তেমনই সামগ্রিকভাবে তার কল্যাণ সাধন করতে সক্ষম হয়। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে সম্পদ হিসেবে এগুলির বিশেষ

স্বীকৃতি আজ সর্বজনগ্রাহ্য। আবার জ্ঞান যেমন মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, তেমনই মানুষ নিজেও এই জ্ঞানের দ্বারাই মানব সম্পদে পরিণত হতে পারে। আবার একথাও আজ সর্বজনস্বীকৃত যে গ্রন্থ এবং অগ্রন্থ (বিভিন্ন প্রকার শিখন সহায়ক সামগ্রী) উভয় প্রকার সম্পদ পরস্পরের সহায়ক ও পরিপূরক। সুতরাং মানুষের জ্ঞানলাভের ক্ষেত্রে গ্রন্থ ও অগ্রন্থ উভয় প্রকার সামগ্রীই সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আলোচনার শেষ প্রান্তে এসে আমরা বলতে পারি অক্ষরযুক্ত গ্রন্থ এবং শিখনে সহায়ক অন্যান্য বিভিন্ন অগ্রন্থ সামগ্রী যা কিছু মানুষের শিখনে কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করে সেগুলি সবই শিখন সম্পদ (Learning Resource) হিসেবে পরিচিত। এইসব শিখন সম্পদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— পাঠ্যপুস্তক, আকরগ্রন্থ, অভিধান, অনুশীলনমূলক বই, প্রশ্নভাণ্ডার, ব্ল্যাকবোর্ড, চক, ঝাড়ন, রেডিয়ো বা বেতারযন্ত্র, দূরদর্শন, টেপ রেকর্ডার, গ্রামোফোন, মানচিত্র, চার্ট, পোস্টার, মডেল, বাস্তববস্তু, স্লাইড, ট্রান্সপারেন্সি ফিল্‌ম্ স্ট্রিপ, চলচ্চিত্র, ভিডিয়ো, অ্যানিমেশন, বিদ্যালয়, শিক্ষক এবং সর্বোপরি শিক্ষার্থী।

❑ ৩.১.৩ শিখন সম্পদের গুরুত্ব (Importance of Learning Resources) :

বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলিতে জনসংখ্যা যেমন বেশি তেমনি সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ স্বাক্ষরতার আওতার বাইরে অবস্থান করে। এই সমস্ত উন্নয়নশীল দেশগুলির অনুন্নত ও প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলগুলিতে শিখন সম্পদকেন্দ্র বা বিকল্প কোনো প্রতিষ্ঠান যেমন দেখাই যায় না, তেমনি থাকলেও সেই সমস্ত কেন্দ্র বা প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিখন সম্পদের ব্যবহার ও চাহিদা উভয়ই বেশ নগণ্য ও অবহেলিত। অথচ এই সমস্ত শিখন সম্পদগুলি (গ্রন্থ এবং অগ্রন্থ সামগ্রী)র প্রয়োজন আর উপযোগিতা অনেকখানি। ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রেও তা সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, তথ্য ও বিনোদনের পরিষেবার ক্ষেত্রে শিখন সম্পদগুলির প্রয়োজন অনেকখানি অথচ ভারতের গ্রামাঞ্চলগুলিতে তুলনামূলকভাবে তার সুযোগ বেশ কম। শিখন সম্পদকেন্দ্রগুলি অথবা বিদ্যালয়গুলি যদি যথার্থভাবে মানুষের শিক্ষার প্রসারে এগিয়ে আসতে চায় তাহলে গ্রন্থের সঙ্গে সঙ্গে অগ্রন্থকেও অনেক বেশি ব্যবহার করে সাফল্য পেতে পারে। বিভিন্ন প্রকার শিখন সম্পদ-কেন্দ্র বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির উচিত হচ্ছে শিখন সম্পদগুলির সহযোগিতায় সাক্ষরতার ভারসাম্যকে সার্থক করে তোলা। সেদিক থেকে উনয়নশীল দেশগুলিতে শিখন সম্পদের প্রয়োজনীয়তও গুরুত্ব অপরিসীম।

Scanned with CamScanner

❑ ৩.১.৪ **শিখন সম্পদের প্রকারভেদ (Types of Learning Resources)** ছকের সাহায্যে দেখানো হল :

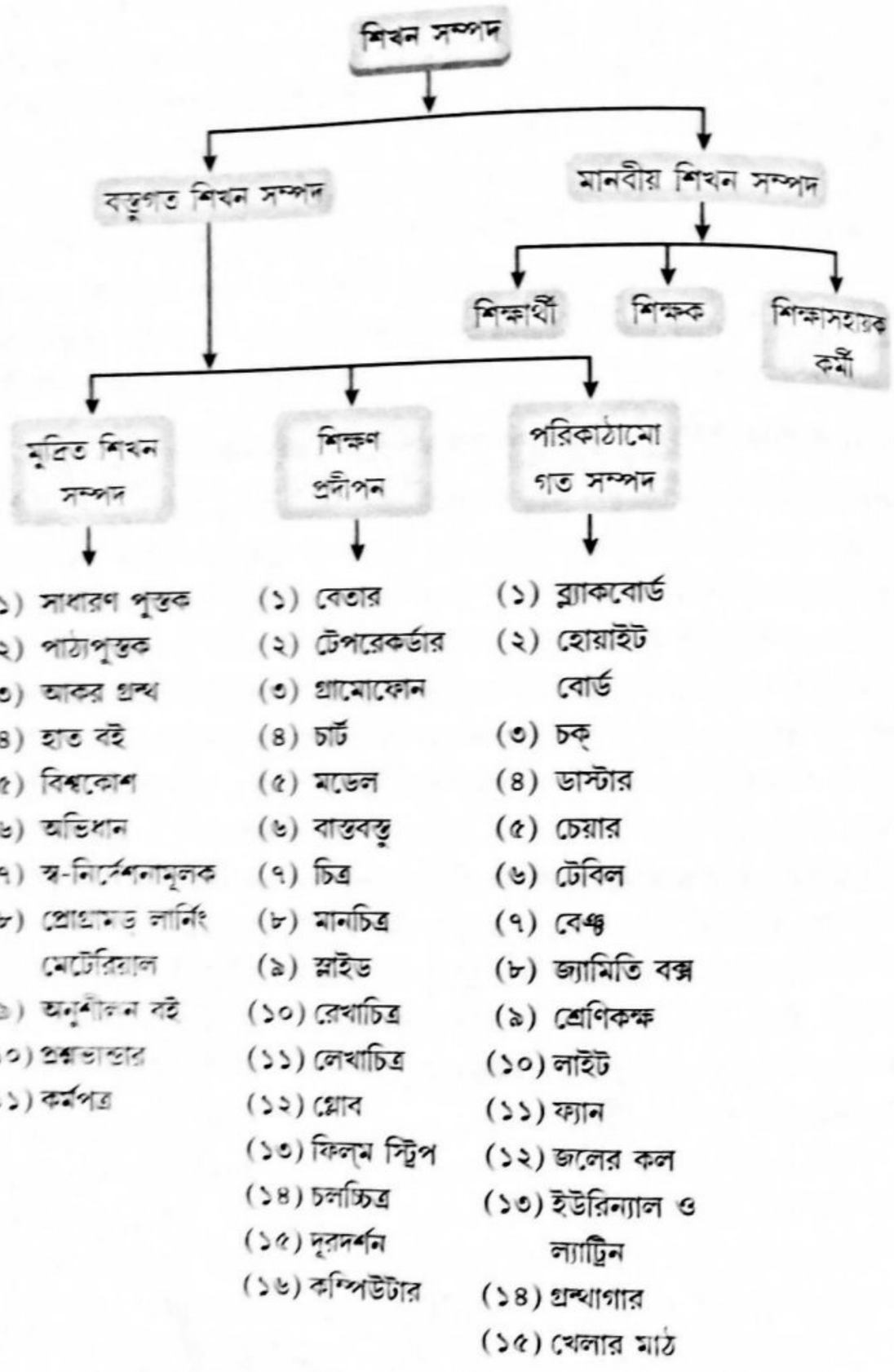

❑ ৩.১.৫ **শিখন সম্পদ হিসাবে পুস্তক (Book as Learning Resorce) :**

প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ **ডেভিড মুর** শিক্ষা সম্পর্কিত তাঁর একটি লেখায় (১৯৯৩) শিক্ষার বিবর্তন প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে কয়েকটি যুগ বা ধাপের কথা উল্লেখ করেছেন। তাতে দেখা যায় যে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার প্রসার যেমন ঘটেছে তেমনই শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার গুণগত মানের উন্নয়ন ঘটানোও প্রসঙ্গিক ভাবেই এসেছে। স্বাভাবিকভাবেই এই একবিংশ শতাব্দীতে এই বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে যে, শিক্ষাক্ষেত্রে শুধুমাত্র শিক্ষার প্রসার ঘটানোই একমাত্র লক্ষ নয়, শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার গুণগত মানের উন্নয়ন ঘটানোও অনতম লক্ষ। সেই লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করতে হলে শিক্ষার উন্নয়নে সহায়ক উপাদানগুলিরও গুণমান উন্নত করা জরুরি। শিখন সম্পদ যেহেতু শিক্ষার উন্নয়নের সঙ্গে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বিষয়, সুতরাং শিখন সম্পদের গুণগত মান যাচাই করা এবং সেজন্য যাচাই-এর শর্তগুলি সম্বন্ধে শিক্ষককে সচেতন থাকার দরকার আছে অবশ্যই।

◆ **ভালো শিক্ষাবিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তকের গুণ (Quality of Good Education Textbook) :**

মুদ্রিত শিখন সম্পদগুলির মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হল পাঠ্যপুস্তক বা Text book। শিক্ষার আঞ্চলিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তকের এই গুরুত্ব ও অপরিহার্যতা স্বীকৃত। সুতরাং শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত শিক্ষক, শিক্ষাপ্রশাসক, শিক্ষাবিশেষজ্ঞ সকলের কাছেই উন্নত গুণমানের পাঠ্যপুস্তকের প্রাসঙ্গিকতা অনেকখানি। সেজন্য শিক্ষকের এই পাঠপুস্তক নির্বাচনের বিষয়ে যথেষ্ট প্রশিক্ষিত হওয়ার প্রয়োজন আছে।

পাঠ্যপুস্তকের নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয় বা শর্তগুলি হল নিম্নরূপ :

(১) লেখকের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
(২) পাঠ্যসূচির সম্পূর্ণ প্রতিফলন
(৩) শিখনের উদ্দেশ্যগুলির উপলব্ধি
(৪) বিষয়বস্তুর নির্বাচন ও সংগঠন
(৫) ভাষা ও উপস্থাপনা রীতি
(৬) পুস্তকের আকার ও সামগ্রিক রূপ
(৭) মুদ্রণ ও বাঁধাই-এর মান
(৮) ভূমিকা ও বিষয়বস্তুর তালিকা
(৯) সংযোজন ও নির্ঘন্ট
(১০) শিক্ষণ প্রদীপনের ব্যবহার
(১১) মূল্য ও সহজলভ্যতা
(১২) অন্যান্য বৈশিষ্ট্য

Scanned with CamScanner

উন্নতগুণমানের পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনের বিভিন্ন শর্তগুলি এবার নিম্নে আলোচনা করা হল :

(১) লেখকের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা (Academic and Professional Qualification) :

(i) পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের জন্য পুস্তক প্রণেতা বা লেখকের যথেষ্ট শিক্ষাগত এবং পেশাগত যোগ্যতা থাকা দরকার।

(ii) বিষয় সম্পর্কে লেখকের পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা থাকা বাঞ্ছনীয়।

(iii) লেখকের স্বাধীন কাজকর্ম এবং লেখার ক্ষমতা থাকা দরকার এবং সেই ব্যাপারে তাঁকে যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য হতে হবে।

(iv) শিক্ষক, গবেষক অথবা লেখক হিসেবে তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি থাকা দরকার।

(২) পাঠ্যসূচির সম্পূর্ণ প্রতিফলন (Coverage of the syllabus) :

(i) যে পাঠ্যসূচির ভিত্তিতে পাঠপুস্তকটি রচিত হয়েছে, সেই পাঠ্যসূচিকে সম্পূর্ণ করে লেখা হয়েছে কিনা তা দেখা দরকার।

(ii) পাঠ্যসূচির সমস্ত দিক সঠিক বা যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে সে সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে।

(৩) শিখনের উদ্দেশ্যগুলির উপলব্ধি (Realization of learning objectives) :

(i) যে স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠপুস্তকটি রচিত হয়েছে সেই স্তরে পাঠ্যক্রমে নির্ধারিত উদ্দেশ্যগুলিকে পূরণ করার বিষয়টি উপলব্ধি করা হয়েছে কি না তা দেখতে হবে।

(ii) উদ্দেশ্যপূরণের উপলব্ধির জন্য বিষয়বস্তুর উপস্থাপনা রীতি মেনে চলা হয়েছে কি না তা বিচার করে দেখা দরকার।

(৪) বিষয়বস্তুর নির্বাচন ও সংগঠন (Selection and organization of the contents) :

(i) পাঠ্যপুস্তকটির বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের মানসিক স্তর অনুসারে রচিত হয়েছে কি না তা দেখা দরকার।

(ii) বিষয় পাঠের জন্য শিক্ষার্থীদের আগ্রহ এবং কৌতূহল বৃদ্ধিতে পাঠ্যপুস্তকটির সহায়তা করা ক্ষমতা থাকতে হবে অবশ্যই

(iii) শিক্ষার্থীদের দৈনন্দিন জীবনের প্রাকৃতিক সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন এবং সংযোগ সাধন করার ক্ষমতা পাঠ্যপুস্তকটির আছে কি না তাও বিচার্য বিষয়।

(iv) পাঠ্যপুস্তকে সন্নিবেশিত তারিখ, ঘটনা, এবং তথ্যাবলি, মানচিত্র, রেখাচিত্র, লেখচিত্র প্রভৃতি নির্ভরযোগ্য, যথার্থ এবং সর্বাধুনিক হওয়া প্রয়োজন।

(v) পাঠ্যপুস্তকটির বিষয়বস্তুর সামাজিক সংশক্তি, প্রাক্ষোভিক এবং জাতীয় সংহতি রক্ষার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা গ্রহণের ক্ষমতা থাকা দরকার।

(vi) পাঠ্যপুস্তকটির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত বিষয়বস্তুর শিক্ষার্থীদের মধ্যে জাতীয় ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি গঠন করার ক্ষমতা থাকতে হবে।

(৫) ভাষা ও উপস্থাপন রীতি (Language and style of the presentation) :

(i) পাঠ্যপুস্তকটিতে ব্যবহৃত ভাষা শিক্ষার্থীদের মানসিক স্তরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে, অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের মানসিক পরিণমন উপযোগী হতে হবে।

(ii) ভাষার অন্তর্গত বাক্যবিন্যাস ও শব্দের ব্যাকরণগত শুদ্ধতা থাকতে হবে এবং তা যথার্থ হতে হবে।

(iii) বিষয়বস্তু উপস্থাপনে শিখনের নীতি ও তত্ত্ব অনুসৃত হয়েছে কি না তা বিচার করে দেখতে হবে। উপস্থাপনার রীতি শিক্ষার্থীদের নিকট আকর্ষণীয় ও প্রেষণা সঞ্চারকারী হতে হবে।

(iv) পাঠ্যপুস্তকে উপস্থাপিত বিষয়বস্তু এবং ব্যবহৃত শব্দভাণ্ডার শিক্ষার্থীদের নিকট সহজে বোধগম্য হতে হবে।

(৬) পুস্তকের আকার ও সামগ্রিকরূপ (Size and overall book) :

(i) পাঠ্যপুস্তকটির আকার ও আয়তন সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদের বয়স উপযোগী কি না তা দেখতে হবে। সামগ্রিকভাবে পাঠপুস্তকটি দেখতে আকর্ষণীয় হতে হবে।

(ii) পাঠ্যপুস্তকটির কভার পৃষ্ঠার লেখকের নাম এবং পিছনের পৃষ্ঠায় লেখক ও পুস্তকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় থাকা দরকার।

(iii) পাঠ্যপুস্তকটির নাম (title), পাঠ্যপুস্তকটির রচনার উদ্দেশ্য ও অর্থ বহন করতে সমর্থ হবে।

(৭) মুদ্রণ ও বাঁধাই (Printing and binding) :

(i) পাঠ্যপুস্তকটির মুদ্রণ হতে হবে স্পষ্ট, ত্রুটিমুক্ত এবং সন্তোষজনক।

(ii) ছাপার অক্ষরের আকার এবং পাঠ্যপুস্তকে ব্যবহৃত অনুচ্ছেদে শিরোনাম, শিক্ষার্থীদের বয়স এবং শিক্ষার স্তর অনুযায়ী সন্তোষজনক হতে হবে।

(iii) পুস্তকটির কাগজ এবং কালির মান উন্নত হতে হবে।

(iv) পাঠ্যপুস্তকটির বঁধাই টেকসই এবং সন্তোষজনক হওয়া দরকার।

Scanned with CamScanner

(৮) মুখবন্ধ ও বিষয়বস্তুর তালিকা (Preface and table of contents) :

(i) পাঠ্যপুস্তকটিতে লেখকের একটি মুখবন্ধ বা পূর্বভাষণ থাকা উচিত এবং মুখবন্ধে পুস্তকটি লেখার উদ্দেশ্য এবং তার অধ্যায়গুলির অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ থাকতে হবে।

(ii) বিভিন্ন অধ্যায়গুলির একটি বিন্যাস তালিকা থাকা বাঞ্ছনীয় যাতে পাঠকের উপলব্ধি সহজ হয়। বিভিন্ন বিষয়বস্তু সন্নিবেশের উল্লেখ নির্ধারিত পৃষ্ঠায় থাকতে হবে।

(৯) সংযোজন এবং নির্ঘণ্ট (Appendix and index) :

(i) পুস্তকটিতে সন্তোষজনক সংযোজন এবং নির্ঘণ্ট থাকা দরকার।

(১০) শিক্ষণ-প্রদীপনের ব্যবহার (Use of teaching aids) :

(i) পাঠ্যপুস্তকটির অধ্যায়-এর প্রয়োজন অনুসারে পর্যাপ্ত চিত্র, রেখাচিত্র, মানচিত্র, চার্ট, সারণি ইত্যাদি থাকা দরকার এবং সেগুলি অবশ্যই শিক্ষার্থীদের নিকট আকর্ষণীয় হতে হবে।

(ii) সন্নিবেশিত চিত্র, রেখাচিত্র, মানচিত্র, চার্ট বা সারণি ইত্যাদিগুলি বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যায় প্রাসঙ্গিক ও সহায়ক কি না তা দেখতে হবে।

(১১) মূল্য ও সহজলভ্যতা (Price And availability) :

(i) পাঠ্যপুস্তকটির মূল্য শিক্ষার্থীদের সামর্থ্যভিত্তিক হওয়া দরকার।

(ii) পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও লাইব্রেরির নিকট সহজলভ্য হতে হবে।

(১২) অন্যান্য বৈশিষ্ট্য (Other features) :

(i) পাঠ্যপুস্তকটিতে প্রতিটি অধ্যায়-এর শেষে অনুশীলনীতে বিভিন্ন ধরনের পর্যাপ্ত সংখ্যক প্রশ্ন সন্নিবেশিত থাকা দরকার। প্রশ্নগুলি বিষয়বস্তুর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া অবশ্যই দরকার।

(ii) প্রদত্ত প্রশ্নগুলি শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞান, বোধ, দক্ষতা ও প্রয়োগধর্মী হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(iii) প্রতিটি অধ্যায়-এর শেষে সারসংক্ষেপ থাকলে ভালো হয়।

(iv) পাঠ্যপুস্তকটির শেষে একটি গ্রন্থপরিচয় তালিকা বা গ্রন্থপঞ্জি থাকা দরকার।

(v) পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনার ক্ষেত্রে প্রকাশনা সংস্থাটির খ্যাতি ও পরিচিতি থাকা দরকার।

❖ ৩.১.৫.১ পাঠ্যপুস্তক (Text Book) :

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে বইকে আমরা প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করতে পারি—(১) টেক্সট বই, (২) সাহিত্যের বই। **টেক্সট বই বা পাঠ্যপুস্তক বলতে কী বোঝায়-এর উপযোগিতামূলক আলোচনা নীচে করা হল—**

সাধারণ অর্থে পড়ার উপযোগী বইকে পাঠ্যপুস্তক বলা হয়। ব্যবহারিক অর্থে পাঠ্যপুস্তক হল পরিকল্পিত শিক্ষাক্রম (পাঠ্যক্রম) ও পাঠ্যসূচি অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের জন্য স্তর ও শ্রেণি

ভিত্তিক রচিত পুস্তক। প্রথাগত, প্রথামুক্ত অথবা অন্যান্য শিক্ষার জন্যও নির্ধারিত পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তক রচিত হতে পারে। যেহেতু পুস্তক মাত্রই পাঠের জন্য। সেই অর্থে সব পুস্তকই পাঠ্য বা পাঠ্যপুস্তক বলা যায়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে যেসব পুস্তক পরীক্ষাপাস, পদোন্নতি, পেশায় দক্ষতা অর্জন, প্রশিক্ষণ বা পাঠসহায়ক গ্রন্থ হিসেবে চিহ্নিত হয় সেইগুলিই মূলত পাঠ্যপুস্তক। শিক্ষার্থীর বয়স, মেধা, চাহিদা, গ্রহণযোগ্যতা অনুসারে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়, ভাষা রীতি, ও উপস্থাপন নীতি কৌশল নির্ধারিত হয়। বিষয়ের চাহিদা এবং শিক্ষার্থীর শিখন চাহিদার সমন্বয় সাধন করে পরিকল্পিত ভাবে সুনির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তক রচনা করতে হয় বলে নানা ধরনের সীমাবদ্ধতা এতে থেকে যায়। পাঠ্যপুস্তকে রাষ্ট্রের আদর্শ, সংবিধান, শিক্ষার আদর্শ শিক্ষার উদ্দেশ্য ও নীতি প্রতিফলিত হয়।

পাঠ্যপুস্তকের চাহিদা সব সময়েই অন্য পুস্তকের তুলনায় বেশি। দেশে যত স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের সংজ্ঞা বাড়তে থাকে ততই পাঠ্যপুস্তকের চাহিদা ও বিক্রি বাড়তে থাকে। যেহেতু বিশ্বের প্রায় সমস্ত দেশেই শিক্ষার মাধ্যম মাতৃভাষা, তাই মাতৃভাষার মাধ্যমে পাঠ্যপুস্তক লেখার প্রবণতা বেশি। অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যবই এখনও বহুল পরিমাণে আন্তর্জাতিক ভাষাগুলিতে লেখা হয়ে থাকে। এর কারণ হল প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে মাতৃভাষার পাঠ্যপুস্তক লেখা সম্ভব হলেও তৃতীয় বিশ্বের বহু দেশেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা মাতৃভাষার মাধ্যমে সম্পন্ন হয় না। বহু বিষয়ে মাতৃভাষায় উচ্চশিক্ষার পাঠ্যপুস্তক রচনার বাধা হিসেবে পরিভাষা এবং দক্ষ লেখকের অভাবকে দায়ী করা হয়।

পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব, ব্যবহারিক উপযোগিতা নিম্নে আলোচনা করা হল।

(ক) পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব (Need and Importance of text book) :

বর্তমান এই সংকটকালে শিক্ষণ-শিখন পরিস্থিতিতে কোনো বিশেষ শ্রেণির বিশেষ বিষয়ের যে পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন ও সুপারিশ করা হয়, দেখা যাচ্ছে তা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কোনো একটি বিশেষ বিষয়কে ভিত্তি করে কোনো শ্রেণিতে কী পড়ানো হবে, কী শেখানো হবে তা সম্পূর্ণ নির্ভর করে নির্বাচিত পাঠ্যপুস্তকে কী লিখিত আছে। পাঠ্যপুস্তকের প্রথম ও শেষ কথা হল নির্ধারিত পাঠ্যবিষয়। শিক্ষক তাঁর পাঠ পরিকল্পনা, পাঠদান, প্রকল্প গঠন ও ব্যবহারিক কর্মসম্পাদন, গৃহকাজ প্রদান সবকিছুই করেন পাঠ্যপুস্তক থেকেই। পাঠ্যপুস্তকে লিপিবদ্ধ প্রতিটি শব্দ, লাইন, কার্যাবলিকে প্রশ্নাতীত, যথার্থ ও নির্ভরযোগ্য বলে গ্রহণ করা হয়। পাঠ্যপুস্তকই শিক্ষকের শিক্ষণকার্য, শিক্ষার্থীর শিখন এবং পরীক্ষকের পরীক্ষণ কার্য সম্পাদন স্থির করে দেয়। কার্যত, শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষণ, শিখন ও পরীক্ষণ তথা মূল্যায়ন কোনো কিছুই পাঠ্যপুস্তক ছাড়া হয় না। স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং সামগ্রিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা পাঠ্যপুস্তকের উপর অতি পরিমাণে নির্ভরশীল বলা যায়।

যথার্থ পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন একটি বড় কাজ। উন্নত গুণমানের পাঠ্যপুস্তকের দ্বারা শিক্ষক, শিক্ষার্থী, পরীক্ষণ বা মূল্যায়ন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিগণ সকলেই উপকৃত হতে পারেন।

Scanned with CamScanner

সুতরাং এই ব্যাপারে যথেষ্ট যত্নবান হওয়ার দরকার আছে। এই প্রসঙ্গে **L.D. Crow** এবং **Alice Crow** (1964)দের বক্তব্য প্রনিধানযোগ্য। তাঁরা বলেন, "Neither the textbook nor the teacher alone constitute the best medium for education. A combination of well chosen text books and a well trained teacher is needed if young people are to be trained to meet the responsibilities." অর্থাৎ না শিক্ষক না পাঠ্যপুস্তক কারো পক্ষেই এককভাবে শিক্ষার শ্রেষ্ঠ মাধ্যম গঠন করা সম্ভব নয়। সুনির্বাচিত পাঠ্যপুস্তক এবং সুপ্রশিক্ষিত শিক্ষক মিলিত ভাবে এই কাজ করতে পারেন, যদি নবীনরা প্রশিক্ষিত হওয়ার দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে আসেন।

(খ) **শিক্ষকের নিকট পাঠ্যপুস্তকের ব্যবহারিক উপযোগিতা** (Usefulness of textbook for the teacher) : **শিক্ষকের নিকট পাঠ্যপুস্তকের উপযোগিতা অনেকখানি। নিম্নে সেগুলি উল্লেখ করা হল—**

(১) পাঠ্যক্রমভিত্তিক পাঠ্যবিষয়বস্তুর ধারণা, প্রাসঙ্গিক তথ্য, দৃষ্টান্ত প্রভৃতি পাঠ্যপুস্তকে প্রস্তুত থাকে। শিক্ষক পাঠপুস্তক থেকে তা সংগ্রহ করে স্বচ্ছন্দে, পাঠদান করতে পারেন।

(২) বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তথ্যের উৎস, জ্ঞান ভাণ্ডার হিসেবে কাজ করে পাঠ্যপুস্তক। এই সমস্ত তথ্য, জ্ঞান বা অভিজ্ঞতাসমূহ সুসংগঠিত ভাবে বিন্যস্ত থাকে। এ ছাড়াও পাঠ্যপুস্তকে এগুলি যৌক্তিক ও মনোবৈজ্ঞানিক নীতি অনুসরণ করে বিন্যস্ত থাকে। শিক্ষক এই পাঠ্যপুস্তককে সহজেই তার নির্দেশনায় কাজে লাগাতে পারেন।

(৩) পাঠ্যপুস্তক সাধারণত রচিত হয় অভিজ্ঞ শিক্ষক এবং বিষয় বিশেষজ্ঞদের দ্বারা। পাঠ্যপুস্তকে এইসব অভিজ্ঞ শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা তাঁদের প্রজ্ঞা, পরিশ্রম এবং অভিজ্ঞতার ফসলকে পাঠ্যপুস্তকে আবদ্ধ করেন। শিক্ষক তাঁর শিক্ষণ কার্যে এগুলিকেই সহজেই কাজে লাগাতে পারেন।

(৪) শুধু পাঠ্য বিষয়বস্তুই নয়, পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে শিক্ষক তাঁর দৈনন্দিন পাঠপরিকল্পনা তৈরি, শিক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার এবং শিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী ব্যবহার করতে সহযোগিতা লাভ করেন।

(৫) ব্যবহারিক ও প্রকল্পভিত্তিক কার্য সম্পাদনে পাঠ্যপুস্তক শিক্ষককে সহায়তা দেয়।

(৬) পাঠ্যপুস্তকের সহায়তা নিয়ে শিক্ষক পাঠের পুনারাবৃত্তি মূলক পর্যালোচনা করতে পারেন, প্রশ্ন-উত্তর মিথষ্ক্রিয়া সম্পাদন এবং বিভিন্ন ঘটনা ও নীতিগুলির প্রয়োগমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। গৃহকাজ প্রদানের কাজও তিনি সম্পন্ন করেন।

(৭) পাঠ্যপুস্তক শিক্ষককে পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচির সীমানা সংক্রান্ত ধারণা নিয়ে পাঠ্যবিষয়কে প্রয়োজন অনুযায়ী একাধিক একক ও উপএককে ভাঙতে সাহায্য করে। এতে শিক্ষকের পক্ষে পাঠদান সহজ হয়।

(গ) **শিক্ষার্থীদের নিকট পাঠ্যপুস্তকের ব্যবহারিক উপযোগিতা** (Usefulness of text book for the students) : পাঠ্যপুস্তক শিক্ষকের কাছে যেমন উপযোগী তেমনি শিক্ষার্থীদের কাছেও সমান উপযোগী। শিক্ষার্থীদের কাছে পাঠ্যপুস্তকের উপযোগিতা নীচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল—

(১) পাঠ্যপুস্তক শিক্ষার্থীকে বিষয়বস্তুর সঙ্গে পরিচিতি ঘটাতে সাহায্য করে। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন রেখে অধ্যয়নে নিবদ্ধ রাখে। শিক্ষার্থীকে পাঠে আগ্রহী করে তোলে।

(২) পাঠ্যপুস্তক শিক্ষার্থীকে বিষয়বস্তু অনুধাবনে প্রস্তুত করে তোলে। বাড়িতে শিক্ষার্থী তার নিজের চেষ্টায় অধীত পাঠ্য-বিষয়বস্তুকে বোধমূলক স্তরে নিয়ে যেতে পারে। এমনকি পরের দিন শ্রেণির পাঠ অথবা ভবিষ্যতের জন্য নিজেকে বিষয়জ্ঞান সমৃদ্ধ করতে সমর্থ হয়।

(৩) শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের পাঠদানের সময় শিক্ষার্থীকে সবকিছু তথ্য, ব্যাখ্যা, নীতি, দৃষ্টান্তসমূহ কিংবা রেখাচিত্র প্রভৃতি তাৎক্ষণিকভাবে লিখে রাখতে হয় না, এর ফলে শিক্ষার্থী শিক্ষকের পাঠদানে নিজের মনোনিবেশ ঘটাতে সক্ষম হয় অনেকখানি।

(৪) শ্রেণিকক্ষের পাঠদানের সময় পাঠ অনুধাবন করা শিক্ষার্থীর পক্ষে সবসময় সম্ভব হয় না, আবার অনেক সময় তা স্মৃতিতে থাকে না, সেক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তকই একমাত্র শিক্ষার্থীকে বিষয়বস্তু অনুধাবন, সংশোধন করতে সাহায্য করে।

(৫) পাঠ্যপুস্তক নিয়মিত পাঠের অভ্যাস শিক্ষার্থীকে অনেক বেশি তথ্য সমৃদ্ধ, সাম্প্রতিক ঘটনাবলি সম্পর্কে সচেতন হতে এবং সর্বাধুনিক তত্ত্ব ও নীতিগুলি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করতে সহায়তা করে।

(৬) অবসর সময় যাপনের ক্ষেত্রেও শিক্ষার্থীকে সহায়তা করে পাঠ্যপুস্তক।

(৭) পাঠ্যপুস্তক শিক্ষার্থীকে স্বাধীনভাবে স্ব-শিখনে এবং মুক্ত চিন্তনে অভ্যস্ত করে তোলে।

❖ ৩.১.৫.২ আকর গ্রন্থ (Reference Book) :

রেফারেন্স বই কোনো নির্দিষ্ট তথ্য জানার জন্য রচিত হয়, পাঠ্যবই-এর মতো এক নাগাড়ে পড়ার জন্য রচিত হয় না বিশেষ ধরনের কতকগুলি নির্দিষ্ট তথ্য পরিবেশনের উদ্দেশ্য নিয়ে এই রেফারেন্স বই বা আকর গ্রন্থ লেখা হয়।

Scanned with CamScanner

সাধারণভাবে আমরা যখন কোনো বই পড়ি তখন অনেক ক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট কোনো তথ্য বা বিষয় জানার দরকার হয়। প্রাসঙ্গিক ওই সমস্ত তথ্য বা বিষয় জানার জন্য কোনো কোনো বইয়ের পরামর্শ আমাদের নিতে হয়। পরামর্শলাভের জন্য নির্দিষ্ট এই সমস্ত বইকেই আকরগ্রন্থ বা রেফারেন্স বই বলা হয়ে থাকে। 'Glossary of Library Terms' গ্রন্থে রেফারেন্স বই-এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে—নির্দিষ্ট কোনো তথ্যের জন্য মাঝে মাঝে সুবিন্যস্ত যে গ্রন্থের সাহায্য নেওয়া হয়, এক নাগাড়ে পড়ার জন্য যা রচিত নয়, সেই গ্রন্থই হল রেফারেন্স গ্রন্থ বা আকর গ্রন্থ।

রেফারেন্স বই সাধারণত দুই ধরনের হয়—

(১) তথ্যসম্বলিত রেফারেন্স বই,

(২) তথ্য নির্দেশী রেফারেন্স বই।

(১) তথ্য সম্বলিত রেফারেন্স বই— যে সমস্ত রেফারেন্স বই থেকে বিষয়, ঘটনা, ভাব, স্থান, কাল, পাত্র বা ব্যক্তি ইত্যাদি বিভিন্ন তথ্য সম্পর্কে জানতে পারা যায়, তাকে তথ্য সম্বলিত রেফারেন্স বই বলা হয়, যেমন— জীবনীগ্রন্থ, বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক অভিধান ইত্যাদি।

(২) তথ্য নির্দেশী রেফারেন্স বই— যে ধরনের রেফারেন্স বইতে বিভিন্ন তথ্যের উৎস সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া থাকে, যার ফলে কাঙ্ক্ষিত তথ্যগুলির সন্ধান পাওয়া যায় তাদের তথ্য নির্দেশক বা তথ্য নির্দেশী রেফারেন্স বই বলা হয়। যেমন— ডাইরেক্টরি, গ্রন্থপঞ্জি, বর্ষপঞ্জি ইত্যাদি।

বিন্যাস অনুসারে রেফারেন্স বই আবার দুভাগে বিভক্ত করা যায়—

(১) সাধারণ রেফারেন্স বই, (২) বিশেষ রেফারেন্স বই।

(১) সাধারণ রেফারেন্স বই— যে সমস্ত রেফারেন্স বইতে সমস্ত রকম বিষয়ের সন্নিবেশ ঘটে, তাদের সাধারণ রেফারেন্স বই বলা হয়। যেমন— এনসাইক্লোপিডিয়া, ব্রিটানিকা।

(২) বিশেষ রেফারেন্স বই— যে সমস্ত রেফারেন্স বইতে এক বা একাধিক বিশেষ কয়েকটি বিষয়ের সমাবেশ ঘটে, সেই সমস্ত রেফারেন্স বইকে বলা হয় বিশেষ রেফারেন্স বই। যেমন— ম্যাকগ্রো-হিল এনসাইক্লোপিডিয়া অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি।

রেফারেন্স বই-এর প্রকারভেদ এবং সাধারণ বই-এর সঙ্গে পার্থক্য সংক্ষেপে নিম্নে উল্লেখ করা হল।

(ক) বিভিন্ন প্রকার রেফারেন্স বই-এর ব্যবহার :

তথ্যের উৎস সন্ধানকারী বহু রেফারেন্স বই আছে। রেফারেন্স প্রশ্নের উত্তর জানার জন্য কোন্ ধরনের রেফারেন্স গ্রন্থ ব্যবহার করা দরকার তা বিশেষভাবে জানার প্রয়োজন আছে। নীচে এদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল—

(১) **অভিধান**— শব্দের অর্থ, উৎপত্তি, বানান, উচ্চারণ, প্রয়োগ, বর্তমান অবস্থা জানতে এই ধরনের রেফারেন্স বই ব্যবহৃত হয়।

(২) **বিশ্বকোশ**—এই ধরনের রেফারেন্স বইতে যে-কোনো বিষয় সম্পর্ক আলোচনা করা থাকে। এ ছাড়াও এখান থেকে জানা যায় কোনো বিষয়ের সংজ্ঞা, বর্ণনা, পটভূমি ইত্যাদি।

(৩) **বর্ষপঞ্জি**— কোনো বিশেষ বর্ষের পূর্ণাঙ্গ প্রকাশনা এতে থাকে। পূর্ববর্তী বছরের বিভিন্ন ঘটনা এতে লিপিবদ্ধ থাকে।

(৪) **হাতবই বা হ্যান্ডবুক** — বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন বিষয়ের খুঁটিনাটি তথ্য জানার জন্য এই ধরনের রেফারেন্স বই ব্যবহৃত হয়।

(৫) **নির্দেশক**— এই ধরনের রেফারেন্স বই কোনো একটি তথ্য কোথায় পাওয়া যাবে তার সন্ধান দেয়।

(৬) **অ্যালমানাক**— এই ধরনের রেফারেন্স বইতে সারা বিশ্বের উল্লেখযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলির সংক্ষিপ্ত তথ্য এবং পরিসংখ্যান থাকে।

(৭) **জীবনীকোষ**— বিশেষ বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গের সংক্ষিপ্ত জীবনী এতে অবস্থান করে।

(৮) **ডাইরেক্টরি**—এই ধরনের রেফারেন্স বইতে বিভিন্ন সংঘ-সমিতি, প্রতিষ্ঠান এবং সেখানে কর্মরত ব্যক্তিবর্গের ঠিকানাসহ নাম সন্নিবেশিত থাকে।

(৯) **অ্যাটলাস**—দেশ-বিদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মানচিত্র, ভূচিত্রাবলি, চার্ট ইত্যাদি জানা যায় এই ধরনের রেফারেন্স বই থেকে।

(১০) **গেজেটিয়ার**—বিভিন্ন ভৌগোলিক তথ্য এবং বিভিন্ন স্থানের ওপর প্রয়োজনীয় তথ্য এই ধরনের রেফারেন্স বই থেকে পাওয়া যায়।

(১১) **বিবলিওগ্রাফি**— এই ধরনের রেফারেন্স বই হল বই-এর তথ্যপূর্ণ বিবরণ। এখানে লেখক, প্রকাশক, মূল্য, পৃষ্ঠা সংখ্যা ইত্যাদি অবস্থান করে।

(১২) **গাইড বই**—এখানে থাকে বিভিন্ন স্থানের ভ্রমণ সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের তথ্য।

(১৩) **সাময়িকী প্রকাশনা**— বিভিন্ন ম্যাগাজিন এবং জার্নাল-এ যে সমস্ত সাম্প্রতিক ঘটনা বের হয় সেগুলি সংকলিত থাকে এই ধরনের রেফারেন্স বইতে।

(১৪) **অ্যাবস্ট্রাক্ট জার্নাল**— এই ধরনের রেফারেন্স বইতে সাময়িকপত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির সার সংক্ষেপ প্রকাশিত হয়।

Scanned with CamScanner

(খ) সাধারণ বই-এর সাথে রেফারেন্স বই-এর পার্থক্য :

সাধারণ বই-এবং রেফারেন্স বই-এর মধ্যে কতকগুলি মৌলিক পার্থক্য বর্তমান। সেগুলি হল নিম্নরূপ—

সাধারণ বই	রেফারেন্স বই
(১) সাধারণ বই একনাগাড়ে পড়া হয়।	(১) নির্দিষ্ট তথ্যের জন্য নির্বাচিত অংশটুকু পড়তে হয়, একনাগাড়ে পড়া হয় না।
(২) সাধারণ বইতে বাক্যের সাথে বাক্যের, অনুচ্ছেদের সাথে অনুচ্ছেদের একটা সঙ্গতি পূর্ণ মিল বা ছন্দ থাকে।	(২) রেফারেন্স বইতে বাক্যের সাথে বাক্যের কিংবা অনুচ্ছেদের সাথে অনুচ্ছেদের মিল বা ছন্দ থাকে না।
(৩) সাধারণ বইতে একটা অধ্যায়ের সঙ্গে পরবর্তী অধ্যায়ের গ্রন্থনে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হয়।	(৩) রেফারেন্স বইতে এই ধরনের ধারাবাহিকতা থাকে না।
(৪) সাধারণ বই-এর দাম তুলনামূলকভাবে কম।	(৪) রেফারেন্স বই-এর দাম তুলনামূলক ভাবে অনেক বেশি।

❖ ৩.১.৫.৩ হাতবই বা হ্যান্ডবুক (Handbook) :

নির্দিষ্ট কোনো কাজের ধারাবাহিক নির্দেশনামূলক বইকে বলা হয় হ্যান্ড বুক। এই বই-এর নির্দেশনাকে অনুসরণ করে কোনো ব্যক্তি ওই নির্দিষ্ট কাজটি সম্পাদন করতে পারেন। সরাসরি প্রশিক্ষণের বিকল্প হিসেবে অতি কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করে হ্যান্ডবুক। এই ধরনের বই থেকে নতুন নতুন তথ্য সংগ্রহ করা যায়। এই ধরনের বইতে সমাজ সংক্রান্ত, জনসংখ্যা সংক্রান্ত, অর্থনীতি সংক্রান্ত, শিক্ষা সংক্রান্ত, শিল্প ও বাণিজ্য সংক্রান্ত নানা বিষয়ের তথ্য সন্নিবেশিত থাকে। বিভিন্ন ধরনের হ্যান্ডবুক নিম্নে উল্লেখ করা হল—

বিভিন্ন প্রকার হ্যাণ্ডবুক :

(১) **General Handbook :** Guiness Book of World Records. NewYork : Sterling 1955 Annual.

(২) **Statistical Handbook :** Handbook of Labour Statistics. Simla : Labour Bureau 1991.

(৩) **Historical Handbook :** The Time Table of History. A chronology of world Events on W. Kulturfahr Plan. Bernard Gmn. Rev. Ed. New York : Simon & Schuster, 1987.

(৪) **Literacy Handbook :** The Oxford Companion to American Literature. by Janes D. Hart, Ed. 5. New York : Oxford University Press 1983.

(৫) **Subject Handbook :** Women's of Special Librarianship and Information, by Dosett. London : ASLIB.

(৬) **Practical Hankbook :** Women's Home Companion Household Booked. by Henry Humphrey. New York : Calier. 1948.

(৭) **Tables :** Tables of physical and chemical constant. by G.W.C. Kaya and T.H. Laby, Ed. 14, Longman 1973.

(৮) **Official Hand book.**

বস্তুত দেখা যায় যে, হ্যান্ডবুকের সাহায্যে কোনো প্রশিক্ষণের সম্পর্কে যেমন— লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, সময়, স্থান, প্রশিক্ষণ পরিচালনার ধরন প্রভৃতির বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। আবার কোনো জটিল কাজ যেমন উপকরণ প্রস্তুতি ও উন্নয়ন পরীক্ষা গ্রহণ কিংবা গবেষণা পরিচালনার ধারাবাহিক প্রক্রিয়াও এই হ্যান্ডবুকের সাহায্যে জানা যায় এবং তা সম্পাদনের পথনির্দেশ পাওয়া যায়। বৃত্তিমূলক ও পেশাগত দায়িত্ব ঠিক ঠিক পালন করার ক্ষেত্রে কিংবা পেশাগত উন্নয়নের ক্ষেত্রে হ্যান্ডবুক বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে।

❖ ৩.১.৫.৪ বিশ্বকোশ (Encyclopedia) :

বিশ্বকোশ হল জ্ঞান-এর সর্ব বিষয় ভিত্তিক বর্ণানুক্রমিক সংকলন, বিশ্বকোশের ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Encyclopedia' শব্দটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন ১৫৩১ খ্রিস্টাব্দে **থমাস ইলিয়ট**। শব্দটি এসেছে গ্রিক enkyklios paideia শব্দ থেকে, যার অর্থ হল general or well rounded education অর্থাৎ সকলের জন্য শিক্ষা বা সাধারণ শিক্ষা। এর থেকে শব্দটি এসেছে বিশ্বকোশ। Encyclopedia Britannica-এর বিজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়েছে— "A literary work containing extensive information on all Branches of knowledge, usually arranged in alphabatical order."

প্রথমদিকে বিশ্বকোশের আওতায় ছিল ব্যাকরণ, অলঙ্কার, সংগীত, গণিত দর্শন, জ্যোতির্বিদ্যা ও শরীরচর্চা সম্পর্কিত জ্ঞান। একটি পুস্তকেই এই সমস্ত বিভিন্ন জ্ঞানের সমাবেশ ঘটানোই ছিল এর লক্ষ্য। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে প্লেটোর শিষ্য সিসিপাস সর্বপ্রথম বিশ্বকোশ রচনা করেন। রোমানদের মধ্যে প্রথম বিশ্বকোশ রচনা করেন **মারকাস টেরেনটিয়াস ভেরো** খ্রিস্ট্রীয় প্রথম শতাব্দীতে। ১৭০৮-১৭১০ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজি ভাষায় প্রথম বর্ণনাক্রমিক বিশ্বকোশ রচনা করেন **জন হ্যারিস**, সেটির নাম ছিল 'লেক্সিকোন টিকনিকাম, ধীরে ধীরে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বকোশে স্থান পায় সর্ব বিষয়ের জ্ঞান।

প্রতিটি বিষয়ের সুবিস্তৃত তথ্যাবলি জানা কৌতূহলী পাঠক ও সন্ধিৎসু জ্ঞান পিপাসু সমস্ত মানুষেরই কাম্য। বিশ্বকোশ হচ্ছে এর একমাত্র উৎস। প্রকৃত পক্ষে বিশ্বকোশ মানব সমাজের যে-কোনো স্তরের মানুষকে প্রয়োজনীয় বিষয়ের তথ্যাবলি সরবরাহ করার দায়িত্ব গ্রহণ করে।

Scanned with CamScanner

বিশ্বকোশকে সাধারণত দুটি ভাগে বিভক্ত করা যায়—

(১) সাধারণ বিশ্বকোশ এবং (২) বিষয়ভিত্তিক বিশ্বকোশ।

(১) সাধারণ বিশ্বকোশ :

(ক) সাধারণ বিশ্বকোশের একটি উল্লেখযোগ্য হল Encyclopaedia Britannica বা 'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা'। ১৭৬৮-৭১ থেকে প্রকাশিত এই বিশ্বকোশটি আধুনিক কালের বিশ্বকোশ সমূহের অন্যতম। ১৭৬৮ খ্রিস্টাব্দের প্রথম সংস্করণে ছিল ৩ খণ্ড, ১৪তম সংস্করণ পর্যন্ত সাময়িক সংশোধন পদ্ধতিতে সংশোধন হয়ে আসছিল। পরবর্তীকালে প্রতি ৫ বছরে একটি নতুন সংস্করণ প্রকাশের পদ্ধতি চালু হয়।

(খ) সাধারণ বিশ্বকোশের আর একটি উল্লেখযোগ্য হল Encyclopedia Americana বা 'এনসাইক্লোপিডিয়া আমেরিকানা'। এটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে। এই বিশ্বকোশটিতে মূলত আমেরিকার ইতিহাস, ভূগোল, জীবনী ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক প্রবন্ধও আছে।

(গ) এছাড়া আছে Chamber's Encyclopedia, Funk and Wagnalls New Encyclopedia, Collier's Encyclopedia with Bibliography and Index.

(ঘ) বাংলা ভাষায় প্রথম বিশ্বকোশ রচনা করেন উইলিয়াম কেরির পুত্র ফেলিকস কেরি। 'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা' অবলম্বনে রচিত এটির নাম 'বিদ্যাহারাবলী'। ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে কালীকৃষ্ণদেব সংকলন করেন 'সংক্ষিপ্ত সংম্বিদ্যাবলী', ১৮৪৬-৫১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'বিদ্যাকল্পদ্রুম' (১৩টি খণ্ড সম্বলিত), ১২২৭ বঙ্গাব্দে রাজকৃষ্ণ রায় এবং শরচ্চন্দ্র দেব সংকলিত ও বর্ণনানুক্রমে সজ্জিত 'ভারতকোশ' এগুলি বাংলাভাষার অনেকখানি সমৃদ্ধ করেছে।

ebook.dascoaching.in

(২) বিষয়ভিত্তিক বিশ্বকোশ :

বিষয়ভিত্তিক বিশ্বকোশগুলির কয়েকটি উল্লেখযোগ্য হল—

(ক) The New Pal grave : A Dictionary of Economics

(খ) Dictionary of Art

(গ) Encyclopedia of Library and Information Science

(ঘ) Encyclopedia of Indian Culture by R.N. Saletore

(ঙ) Encyclopedia of Indian Literature by Amaresh Dutta

❖ ৩.১.৫.৫ অভিধান (Dictionary) :

অর্থসহ শব্দের সংকলনকে বলা হয় অভিধান। এটি হল শব্দার্থের আকরগ্রন্থ বা রেফারেন্স বই। এই অভিধান শব্দার্থের ভাণ্ডার হলেও এতে থাকে শব্দের বুৎপত্তি, সংজ্ঞা, সমার্থক ও

বিপরীতার্থক শব্দ, ব্যাকরণ, উচ্চারণ, বাক্যরীতি ও বিভিন্ন বানানরীতি। অভিধান এই বাংলা শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হল Dictionary, শব্দটি এসেছে লাটিন শব্দ Dictionarium থেকে। আবার Dictionarium শব্দটি এসেছে Dictio থেকে যার অর্থ শব্দ। অভিধানের বৈশিষ্ট্য এবং উৎপত্তি ও পরিচয় সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল।

(ক) অভিধানের উপযোগিতামূলক বৈশিষ্ট্যগুলি হল নিম্নরূপ—

(১) এর মধ্যে থাকে প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহৃত শব্দ, উপমা, প্রবাদ-প্রবচন ইত্যাদি।

(২) শব্দের সংজ্ঞা, অর্থ, উৎপত্তি, বানানরীতি, উচ্চারণরীতি, ব্যবহার বিধি।

(৩) একটি শব্দের প্রচলিত এবং অপ্রচলিত ব্যবহার বিধি।

(৪) একটি শব্দের সমার্থক শব্দ, প্রতিশব্দ, ভিন্নার্থবোধক শব্দ, বিপরীতার্থক শব্দ।

(৫) প্রতীক বা চিহ্ন, দেশ বিদেশের মানচিত্র, আব্রিভিয়েশান।

(৬) বৃত্তিমূলক বা পেশাগত শব্দ, টেকনিকাল শব্দ, সম্প্রদায়গত শব্দ।

(৭) উপভাষা এবং আঞ্চলিক শব্দের ব্যবহার।

(৮) দেশি-বিদেশি নতুন শব্দ এবং তাদের ব্যবহার।

(খ) বিভিন্ন অভিধানের উৎপত্তি ও পরিচয় :

একেবারে প্রাথমিক স্তরের অভিধান হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় ১২২৫ খ্রিস্টাব্দে **জে.ডি. গারলান্ডিয়া** রচিত ল্যাটিন ভাষার একটি সংকলন। **রবার্ট কড্রে** নামে এক ব্যক্তি একটি ইংরেজি অভিধান তৈরি করেন। এতে প্রায় তিন হাজার শব্দের সমাবেশ ঘটেছিল। এরপর **হেনরি ককোরাম** একটি অভিধান লেখেন ১৬২৩ খ্রিস্টাব্দে। প্রায় ৬০ হাজার শব্দের সমষ্টি নিয়ে একটি ইংরেজি অভিধান লেখেন **নাথানিয়ান বেইলি** নামে এক ইংরেজ ব্যক্তি ১৭২১ খ্রিস্টাব্দে। ১৭৫৫ খ্রিস্টাব্দে **স্যামুয়েল জনসন** 'A dictionary of English Language' নামে একটি অভিধান প্রকাশ করেন। এরপর ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দে **ওয়েবস্টার** যে স্কুল ডিকশনারি প্রকাশ করেন তা নতুন নতুন সংস্করণে প্রকাশিত হয়ে আসছে। ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে প্রথম পাণ্ডিত্য পূর্ণ অভিধান হল A New English Dictionary on Historical Principles.

অভিধান একই ভাষার শব্দার্থ নিয়ে যেমন, তেমন দুই বা তার বেশি ভাষার শব্দার্থ নিয়েও রচিত হতে পারে। প্রথম বাংলা অভিধান Vocabularies em Idioma Bengala E Partuguez নামে পোর্তুগিজ পাদ্রি **মসো এল দ্য আস সুম্পসাঁউ** কর্তৃক লিখিত হয়। এটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৬০২ এবং ১৭৪৩ খ্রিস্টাব্দে লিসবন শহর থেকে মুদ্রিত হয়। বাংলা ভাষায় প্রথম বৃহৎ অভিধান রচনার কৃতিত্ব **হেনরি পিটস ফরস্টারের**। দুই খণ্ডে ৮৪৪ পৃষ্ঠার এই অভিধানটিতে স্থান পায় প্রায় ২০ হাজার বাংলা শব্দের ইংরেজি অর্থ। বাংলাভাষায় মুদ্রিত প্রথম সম্পূর্ণ বাংলা-বাংলা অভিধান হল **রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের** লেখা 'বঙ্গভাষা বিধান।' কলকাতা থেকে ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে এটি প্রকাশিত হয়। ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত

Scanned with CamScanner

হয় **জয়গোপাল তর্কালংকার** রচিত বঙ্গাভিধান। এছাড়াও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বাংলা অভিধান হল **জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের** বাঙ্গালা ভাষার অভিধান, **হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের** বঙ্গীয় শব্দকোশ, **সুবলচন্দ্র মিত্রের** সরল বাঙ্গালা অভিধান, **সাহিত্য সংসদ** প্রকাশিত 'সংসদ বাংলা অভিধান', **আশুতোষ দেব**-এর 'স্টুডেন্টস ফেবারিট ডিকশনারি' ইত্যাদি।

❖ ৩.১.৫.৬ স্ব-নির্দেশনামূলক উপকরণ (Self-Instructional Material) :

শিখনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী যখন নিজেই নিজের নির্দেশকের ভূমিকা পালন করে তখন তা স্ব-নির্দেশনা মূলক শিখন বলে পরিচিত পায় স্ব-নির্দেশনামূলক শিখনে ক্ষেত্র বিশেষে শিক্ষার্থীদের জন্য একটি সাধারণ লিখিত বা মৌখিক নির্দেশনা দেওয়া থাকে। এই সাধারণ নির্দেশনা অনুসরণ করে শিক্ষার্থী নিজেই নিজের শিখনে বিশেষ নির্দেশনা প্রদান করে। সাধারণ নির্দেশনা অনুসরণ করে শিখন বিষয় আয়ত্ত করার জন্য শিক্ষার্থী কখনো নিজের পরিকল্পিত এবং স্বয়ং নির্দেশিত উপায়ে অগ্রসর হতে পারে আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রথাগত শিক্ষায় অনিয়মিত শিক্ষার্থী হিসেবে পূর্ব নির্ধারিত পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যবই অনুসরণ করেও নিজের শিখন সম্পন্ন করতে পারে। শিক্ষার্থী যখন তার নিজের নির্দেশনার কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কিছু উপকরণ সামগ্রী ব্যবহার করেন, তখন তাই স্ব-নির্দেশনামূলক উপকরণ হিসেবে পরিচিতি পায়। সাধারণত ঐ উপকরণে প্রদত্ত নির্দেশনা সমূহ স্বয়ং ব্যাখ্যাত হয়ে থাকে। এই ধরণের স্বনির্দেশনামূলক উপকরণ মুদ্রিত হতে পারে আবার অনুদ্রিতও হতে পারে। বস্তুত বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এর নানা ধরণের পার্থক্য ও লক্ষ্য করা যায়। যাইহোক, স্ব-নির্দেশনামূলক উপকরণের বৈশিষ্ট্য হিসেবে আমরা নিম্নলিখিত দিকগুলিকে চিহ্নিত করতে পারি :

(i) স্ব-নির্দেশনা মূলক উপকরণ শিক্ষার্থীদের শিখনে সাহায্য করে।

(ii) স্ব-নির্দেশনামূলক উপকরণের বিষয়বস্তুর উপস্থাপন হয় যাতে শিক্ষার্থী সহজেই নিজের চেষ্টায় বিষয়বস্তু উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়।

(iii) স্ব-নির্দেশনামূলক উপকরণকে অবলম্বন করে শিক্ষার্থী সহজেই প্রথাগত শিক্ষার বিষয়বস্তু আয়ত্ত করে যোগ্যতা বৃদ্ধির সুযোগ লাভ করতে পারে। শিক্ষকের তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য সহযোগিতার প্রয়োজন হয় না।

(iv) স্ব-নির্দেশনামূলক উপকরণকে ব্যবহার করে শিক্ষার্থী তার নিজের সুবিধাজনক সময়ে শিখন অনুশীলন করতে পারে।

(v) স্ব-মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থী নিজেই নিজের শিখন অর্জনও যাচাই করতে পারে।

(vi) প্রথাগত শিক্ষার নিয়মে নির্দিষ্ট শিক্ষণ-শিখন পরিস্থিতি ছাড়াই শিক্ষার্থী শিখনে সমর্থ হয়।

• স্ব-নির্দেশনামূলক উপকরণের উপাদান (Components of Self Instructional Mateeial) :

স্ব-নির্দেশনামূলক উপকরণের উপাদানগুলি হল নিম্নরূপ :

(১) **শিরোনাম** (Title) : স্ব-নির্দেশনামূলক উপকরণের একটি সংক্ষিপ্ত শিরোনাম থাকবে কিন্তু তা হবে অত্যন্ত স্পষ্ট যাতে শিক্ষার্থীর কোনো অসুবিধা না হয় বুঝতে।

(২) **প্রস্তাবনা** (Introduction) : প্রস্তাবনার মধ্যে উল্লেখিত থাকে কোন ধরনের শিক্ষার্থীদের জন্য উপকরণটির বিকাশ ঘটানো হচ্ছে, তার পশ্চাতে কোনো যুক্তি আছে; তার একটি সামগ্রিক প্রেক্ষাপট।

(৩) **সামগ্রিক ধারণা** (Over View) : উপকরণ সম্পর্কে শিক্ষার্থী যাতে সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারে তারজন্য একটি সামগ্রিক ধারণা শিক্ষার্থীর নিকট উপস্থাপিত করার প্রয়োজন হয়। এজন্য স্ব-নির্দেশনামূলক উপকরণটির উদ্দেশ্য, কাঠামোগত দিক, সংগঠন প্রভৃতির উপস্থাপন করা হয়।

(৪) **উদ্দেশ্যাবলি** (Objectives) : স্ব-নির্দেশনামূলক উপকরণটি শিক্ষার্থীর কোনো উপযোগিতাকে তুলে ধরবে তার উপর নির্ভর করে উদ্দেশ্যাবলি স্থান পায়। শিক্ষার্থী ব্যক্তি স্ব নির্দেশনামূলক উপকরণটির পাঠ সার্থকভাবে শেষ করার পর কোনো কোনো শিখন অর্জন করতে পারবে তার একটি সংক্ষিপ্ত রূপ উল্লেখ করা থাকে, সেগুলি হয় জ্ঞানমূলক, বোধমূলক ও প্রয়োগমূলক। এটি শিক্ষার্থীদের যথোপযুক্ত শিখন ফলশ্রুতির বিষয়ে সাহায্য করে থাকে।

(৫) **স্ব-নির্দেশনামূলক উপকরণের মূল কাঠামো :** স্ব-নির্দেশনামূলক উপকরণ (SIM) বা স্ব-শিখনমূলক উপকরণ (SLM) এর শিখন সংক্রান্ত মূল বিষয়বস্তু একটি নির্দিষ্ট ক্রম অনুসারে সাজানো থাকে। সহজ ও সরল ভাষায় যা সহজেই উপলব্ধি করা যায় এমনভাবে উপস্থাপিত করা হয়। শিক্ষার্থীর চিন্তন প্রক্রিয়া একটি নিজস্ব গতিলাভ করে। বিভিন্ন উদাহরণ সন্নিবেশিত থাকে। সামগ্রিকভাবে বিষয়বস্তুর অর্থ, তার গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিকতা থাকতে হয়। প্রত্যেক একক (Unit) আলোচনার শেষে থাকে শিক্ষার্থীর অগ্রবতির পরিমাপের বিষয়টি যাতে শিক্ষার্থীকে স্বচ্ছন্দেই তার নিজের অগ্রগতিকে যাচাই করতে পারে। এটি উল্লেখ করা থাকে এইভাবে "Let up Check our Progress"। বিষয়বস্তুর উপর কতকগুলি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন এতে সন্নিবেশিত থাকে। শিক্ষার্থী এই প্রশ্নগুলির যথাযথ উত্তরদানের চেষ্টা করে নিজে নিজেই, যাচাই করে নিজে নিজেই এবং নিজের শিখনের অগ্রগতিকে বজায় রাখার চেষ্টা করে।

Scanned with CamScanner

(৬) **সারসংক্ষেপ** (Sum up) : আলোচিত এককটির পাঠ সম্পূর্ণ হওয়ার পর সমগ্র বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থী কতখানি উপলব্ধি করতে পারলেন সেই নিয়ে সমগ্র বিষয় বস্তুর একটি সারসংক্ষেপ সন্নিবেশিত হয়। এটি সাধারণত লেখা থাকে ঐ ভাষায় : "Let up sum up"।

(৭) **সহায়ক পঠন (Suggested Readings)** : উপকরণটির উপস্থাপনের একেবারে শেষ প্রান্তে উৎসাহী শিক্ষার্থীদের জ্ঞান, বোধ, দক্ষতা ও প্রয়োগ ক্ষমতার বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সহায়ক পঠনের একটি পরামর্শ দেওয়া থাকে। বিভিন্ন লেখকের গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা, গবেষণাপত্র প্রভৃতি এখানে সন্নিবেশিত থাকে।

● স্ব-নির্দেশনামূলক উপকরণের গুণগত মান যাচাই-এর শর্ত (Criteria of Judging the quality of Self-Instructional Material) :

স্ব-নির্দেশনামূলক উপকরণের গুণগত মান যাচাই শর্তগুলি নিহিত থাকে উপকরণটির কার্যকরী কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে। স্ব নির্দেশনামূলক উপকরণের সেই বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নে উল্লেখ করা হল :

(১) **স্ব-ব্যাখ্যাধর্মী** (Self-explanatory) : স্ব-নির্দেশনামূলক উপকরণ এর আলোচিত বিষয়বস্তু সহজ ভাষায় এমনভাবে ব্যাখ্যা করা থাকতে হবে যাতে শিক্ষার্থীদের বুঝতে গিয়ে কোনো অস্পষ্টতা থাকে। পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনাটি উপস্থাপিত হতে হবে বিভিন্ন ঘটনা ও দৃষ্টান্ত সহযোগে। দৃষ্টান্ত যতখানি সম্ভব হতে হবে শিক্ষার্থী চেনা জানা পরিবেশের কোনো বিষয়বস্তু বা ঘটনা। বিশ্লেষণ হবে এমন ধারাবাহিকভাবে যাতে শিক্ষার্থীর চিন্তন প্রক্রিয়া ধারণালাভের ক্ষেত্রে নিজস্ব একটা গতি পায়।

(২) **স্ব-বিষয়বস্তুধর্মী** (Self-contained) : উপকরণে উপস্থাপিত বিষয় এমনভাবে করা হবে যাতে, আলোচনাটি মূল বিষয়বস্তু নিবন্ধ থাকে। অন্য কোনো অপ্রাসঙ্গিক বিষয় বেশি প্রাধান্য না পায়। বিষয়বস্তুগত ধারণালাভের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী যাতে স্বয়ং সম্পূর্ণভাবে আরো অগ্রসর হতে পারে সেই জন্য সহায়কপাঠের একটি নির্দিষ্ট তালিকা সন্নিবেশিত হওয়াও জরুরি।

(৩) **স্ব-পরিচালনাধর্মী** (Self-directed) : স্ব-নির্দেশনামূলক উপকরণগুলি সাধারন পাঠ্যগ্রন্থের তুলনায় আরো অনেক বেশি পরিচালনধর্মী হতে হয়, শিক্ষার্থীদের নিকট আকর্ষণীয় হতে হয়। এজন্য উপকরণগুলি এমনভাবে প্রস্তুত হতে হবে যাতে সেগুলি শিক্ষার্থীকে কারো সাহায্য ছাড়াই নিজে নিজে পাঠে অগ্রসর হতে সাহায্য করতে পারে। উপকরণগুলি প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার্থীদের নিকট পথ প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করে থাকে।

(৪) **স্ব-প্রেষণাধর্মী** (Self- motivating) : স্ব-নির্দেশনামূলক উপকরণগুলিকে অতি অবশ্যই প্রেষণাধর্মী হতে হবে। উপকরণগুলি এমনভাবে প্রস্তুত হতে হবে যাতে শিক্ষার্থীরা প্রেষণালাভ করতে সমর্থ হয়। শিক্ষার্থী যতক্ষণ স্ব-নির্দেশনামূলক উপকরণের পাঠে নিমগ্ন থাকবে ততক্ষণ তার প্রেষণাকে ধরে রাখার ক্ষমতা উপকরণটির থাকতে হবে। সামগ্রিকভাবে বিষয়বস্তুর উপস্থাপন, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, দৃষ্টান্ত স্থাপন উপকরণটিকে প্রেষণাধর্মী করে তুলতে সহায়তা করে।

(৫) **স্ব-বিষয়বস্তুধর্মী** (Self-evaluating) : স্ব-নির্দেশনামূলক উপকরণে শিক্ষার্থীর নিজেই নিজের মূল্যায়ণ করার উপায় উল্লেখ করা থাকতে হবে। পাঠ্যবিষয়বস্তুর উপস্থাপনের পরে পরেই বিভিন্ন প্রশ্ন, ক্রিয়ামূলক একক এবং পাঠের উপস্থাপনের অন্তিমলগ্নের প্রশ্নের সমাবেশ থাকতেই হবে, যাতে শিক্ষার্থীরা নিজেই নিজের মূল্যায়ণ করতে সমর্থ হয়। উপকরণের উপস্থাপনের মধ্যে ফিডব্যাকের ব্যবস্থা শিক্ষার্থীকে মূল্যায়ণধর্মী করে তুলতে সহায়তা করে।

❖ ৩.১.৫.৭ প্রোগ্রামড লার্নিং মেটেরিয়াল (Programmed Learning Material) :

শিক্ষার্থীদের প্রোগ্রাম নির্দেশনার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার জন্য যে উপকরণ প্রস্তুত করা হয় তাকে বলা হয় প্রোগ্রাম লার্নিং মেটিরিয়াল বা উপকরণ। এই ধরনের একটি প্রোগ্রাম লার্নিং-এর মেটেরিয়াল-এর দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া হল।

প্রোগ্রাম : ১ ভারতীয় সংবিধানের বৈশিষ্ট্য (দশম শ্রেণি)

ভূমিকা : ভারতীয় সংবিধানের বৈশিষ্ট্য উপলব্ধির জন্য তোমাদের নিকট একটি প্রোগ্রাম বা পরিকল্পনা উপস্থাপন করা হচ্ছে। এই পরিকল্পনায় তোমরা কয়েকটি অনুচ্ছেদ দেখতে পাবে, এগুলিকে বলা হয় ফ্রেম। প্রতিটি ফ্রেম খুব যত্ন সহকারে পড়বে এবং নিম্নে এ বিষয়ে যা জানতে চাওয়া হবে তার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবে। নিম্নে একটি উত্তরমালা ও সংযোজিত আছে। নিম্নে প্রদত্ত উত্তরমালার উত্তরের সঙ্গে তোমার দেওয়া উত্তর মিলিয়ে দেখবে তোমার উত্তর সঠিক হয়েছে কি না। যদি উত্তর সঠিক না হয় তাহলে জানবে তুমি অনুচ্ছেদের বা ফ্রেমের বিষয়বস্তুটি ঠিকমতো উপলব্ধি করতে পারোনি, সেক্ষেত্রে পুনরায় তুমি ওই ফ্রেমের বিষয়বস্তুটি ভালোভাবে পড়বে, বোঝার চেষ্টা করবে। এটি একটি নিজে নিজে শেখার পরিকল্পনা।

ফ্রেম : ১

ভারতীয় সংবিধান রচনা করার জন্য ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ৯ ডিসেম্বর একটি গণপরিষদ গঠিত হয়েছিল। প্রায় তিনবছর ধরে নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক ইত্যাদির পর ভারতীয় সংবিধান রচনার কাজ শেষ করে গণপরিষদ। ভারতীয় এই সংবিধানটি গৃহীত

Scanned with CamScanner

হয় ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের ২৬শে নভেম্বর। সংবিধানটি কার্যকর হয় ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারি থেকে।

প্রশ্ন :

(i) ভারতীয় সংবিধান রচনার দায়িত্ব কার উপর দেওয়া হয়?

(ii) গণ পরিষদ কত তারিখে গঠিত হয়?

(iii) ভারতীয় সংবিধান রচনার কাজ কতদিন ধরে চলে?

(iv) ভারতীয় সংবিধান গৃহীত হয় কোন্ তারিখে?

(v) ভারতীয় সংবিধান কার্যকর হয় কোন্ তারিখে?

ফ্রেম : ২

ভারতীয় সংবিধানে একটি প্রস্তাবনা আছে। মার্কিন সংবিধানের অনুকরণে এর সৃষ্টি এতে সংবিধানের উৎস, আইনগত ভিত্তি, নৈতিক আদর্শ ও মূল লক্ষ্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত উল্লেখ আছে। প্রস্তাবনায় ভারতকে 'সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র' হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দের ৪২ তম সংশোধনের মাধ্যমে 'সমাজতান্ত্রিক', 'ধর্মনিরপেক্ষ' এবং 'সংহতি' এই তিনটি শব্দ প্রস্তাবনায় সংযুক্ত করা হয়েছে।

প্রশ্ন :

(i) ভারতীয় সংবিধানে প্রস্তাবনার সৃষ্টি_____সংবিধানের অনুকরণে।

(ii) প্রস্তাবনায়_____উৎস,_____ভিত্তি উল্লেখ আছে।

(iii) প্রস্তাবনায় ভারতকে সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক_____ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

(iv) ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দের ৪২ তম সংশোধনের মাধ্যমে কোন্ তিনটি শব্দ প্রস্তাবনায় সংযুক্ত করা হয়েছে?

ফ্রেম : ৩

ভারতে সংবিধানের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ভারতীয় সংবিধান হল দেশের মৌলিক ও সর্বোচ্চ আইন। সরকারের সমস্ত ক্ষমতার উৎস হল এই সংবিধান। আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও অন্য সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বে অবস্থান করে এই সংবিধান। সরকার সংবিধান-বিরোধী কোনো আইন-প্রণয়ন করলে সুপ্রিমকোর্ট তা বাতিল করে দিতে পারে।

প্রশ্ন :

(i) ভারতে কার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে?

(ii) ভারতীয় সংবিধান হল মৌলিক ও_____ _____।

(iii) ভারত সরকারের যাবতীয় ক্ষমতার উৎস কী?

(iv) যে-কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বে কে অবস্থান করে?

(v) সংবিধান-বিরোধী আইনকে কে বাতিল করতে পারে?

উত্তরমালা :

১। (i) গণপরিষদের উপর।
(ii) ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বর।
(iii) প্রায় তিনবছর ধরে।
(iv) ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের ২৬শে নভেম্বর।
(v) ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারি।

২। (i) মার্কিন
(ii) সংবিধানের, আইনগত।
(iii) সাধারণতন্ত্র।
(iv) 'সমাজতান্ত্রিক', 'ধর্মনিরপেক্ষ' এবং 'সংহতি'।

৩। (i) সংবিধানের।
(ii) সর্বোচ্চ আইন।
(iii) সংবিধান।
(iv) সংবিধান।
(v) সুপ্রিমকোর্ট।

৩.১.৫.৮ অনুশীলন বই (Work Book) :

কোনো পাঠ্যবই ন্যায় এটিও একটি মুদ্রিত সম্পদ হিসেবেই বিবেচিত হয়। পাঠ্যবই পরিপূরক বই হিসেবে এই ধরনের বই ব্যবহৃত হয় এবং অনুশীলনী বই বা অনুশীলন বই অথবা কর্মপুস্তক হিসেবে অভিহিত হয়। শিক্ষার্থীর পাঠের বিষয়বস্তুকে আত্মস্থ করে তাকে আরো বেশি উপলব্ধি করে জ্ঞানের বিষয়বস্তুকে দৃঢ় করাই হল অনুশীলন বইএর মূল উদ্দেশ্য। শিক্ষার্থী শ্রেণিকক্ষের শিক্ষণ-শিখন পরিস্থিতিতে বিষয়বস্তুর উপলব্ধি সম্পূর্ণতা পায় না। আবার পাঠ্যবই নিজেও সেই অভাব দূর করতে পারে না। ফলে শ্রেণিকক্ষ আর পাঠ্যবই এর সীমাবদ্ধতাকে দূর করে জ্ঞানলাভের ধারাকে যথোপযুক্ত গড়ে তুলতে অনুশীলন বই-এর সাহায্য গ্রহণ করতে শিক্ষার্থীকে। অনুশীলন বইতে ধারাবাহিকভাবে মূল পাঠ্যবই এর প্রতিটি অধ্যায় এবং পাঠ্যবিষয় বস্তুর সকল ধারণার উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, উত্তর লেখা ও কাজ করার সুস্পষ্ট নির্দেশ এবং পর্যাপ্ত পরিমাণ জায়গাও তাতে থাকে। শ্রেণিশিক্ষক বাড়ি বা শ্রেণির কাজ হিসেবে শিক্ষার্থী অনুশীলন বই-এর পাঠ্যভিত্তিক প্রশ্নের উত্তর লিখতে, কাজ করতে বলতে পারেন এবং তার উত্তর মূল্যায়ণ করে শিক্ষার্থীর ধারাবাহিক অগ্রগতির তথ্য সংরক্ষণ করতে পারেন। কখনো কখনো শিক্ষার্থী নিজেও পাঠ্যবই ও অনুশীলন বই দেখে বার বার তার পূর্বপাঠ অনুশীলন করতে পারে। এমনকি অনেক সময় শিক্ষার্থী নিজেই নিজের দক্ষতার মান যাচাই করে দেখতে পারেন। একটা কথা মাথায় রাখতেই হয় যে অনুশীলন বই পাঠ্য

Scanned with CamScanner

বই-এর পরিপূরক হিসেবে কাজ করলেও কখনোই এটি পাঠ্যবই এর বিকল্প নয়। শিক্ষার ক্ষেত্রে এই অনুশীলন বই কখনো বিষয়ভিত্তিক আবার কখনো কর্মভিত্তিক পারে, আবার কখনো পরীক্ষণ কার্যভিত্তিক হতে পারে। এই অনুশীলন বইকে সারা বছর ধরে যদি অনুসরণ করে কাজের মধ্যে থাকা যায় তাহলে শিক্ষার্থীর সাথে বিষয়ভিত্তিক একটি শিখনের ধারাকে বজায় রাখা সম্ভব হয়।

সাম্প্রতিক কালে আর এক ধরনের অনুশীলন বই অন্য দৃষ্টিভঙ্গিতে শিক্ষার্থীরা করতে শুরু করেছে। পশ্চিবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষদের নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে বইটি 'ওয়ার্ক বুক ও মৌখিক প্রশ্নোত্তর' আকারে গঠিত হয়। এই ধরনের 'অনুশীলন বই' 'কর্মপুস্তকে' বেশ কিছু প্রজেস্ট ওয়ার্ক এবং অধ্যায় ভিত্তিক মৌখিক প্রশ্নোত্তরগুলি সন্নিবেশিত হয়। প্রজেক্টের দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে এইভাবে : বীজ থেকে কেমন অঙ্কুর ও ভ্রূণমূল বের হয়, পাতা কীভাবে গজায়, গাছ কীভাবে ধীরে ধীরে বেড়ে ইত্যাদি। বিভিন্ন কীটপতঙ্গ ও জীবজন্তুর বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে শিক্ষার্থীরা জীবজগৎ সম্প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করে শুধু তাই নয়, জীবজন্তুদের প্রতি শিক্ষার্থীদের একটি ইতিদৃষ্টিভঙ্গির আবেগমূলক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এই ধরনের কাজ করার মাধ্যমে যে অভিজ্ঞতা অর্জিত হয় তা এসেছে Learning by doing বা করে শেখা'র নীতিকে অনুকরে। যে প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থী হাতে কলমে কাজ করার মাধ্যমে শেখে তাকে বলে করে বা 'কাজের মাধ্যমে শেখা'। এই প্রক্রিয়ায় শিশু শিক্ষার্থীরা সর্বসত্তা দিয়ে শেখে শিক্ষর্থীরা তাদের অনুভূতি, আনন্দ, বুদ্ধি এবং শারীরিক ক্রিয়াকলাপ দিয়ে অভিজ্ঞতা করে যার থেকে তারা ফলাফল দেখে এবং শেখার কাজ সম্পন্ন করে।

সাম্প্রতিককালে 'কাজের মাঝে বিজ্ঞান' অথবা 'এসো কিছু করে দেখাই' গোছের কথা বলা হয়েছে মধ্যশিক্ষাপর্ষদের নির্দেশে। **ডেল কর্মিশনের** রিপোর্টে শিখনের উদ্দে বলতে গিয়ে যে চারটি স্তরের কথা বলা হয়েছে তার একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্তর 'Learning by doing'। হাতে কলমে কার্য সম্পাদনের দ্বারা শিখন অভিজ্ঞতা অর্জ কথাই এখানে বলা হয়েছে, যার কিছুটা প্রতিফলন প্রজেক্ট ওয়ার্ক বুকে দেখতে পাই।

শিক্ষার্থীদের এই অনুশীলন বই বা কর্মপুস্তিকার উপযোগিতাগুলি নিম্নে উল্লেখ হল—

(i) শিক্ষার্থীরা তাদের নিজের সুবিধামতো। সময়ে অনুশীলন বইয়ের নির্দে কাজগুলিকে তারা সম্পন্ন করতে পারে।

(ii) অনুশীলনমূলক কর্মে সম্পাদনে অথবা পরীক্ষণমূলক কার্য সম্পাদনের শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষে আবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন হয় না।

(iii) শ্রেণিশিক্ষণের কোনো কোনো ক্ষেত্রে সহায়তা নেওয়ার সুযোগ থাকলেও সময় তার প্রয়োজন হয় না।

(iv) অনুশীলনমূলক পুস্তিকার মধ্যে সন্নিবেশিত প্রশ্নগুলির উত্তর দানের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সময় সম্বন্ধে বাস্তব ধারণা জন্মায়, সময়কে কাজে লাগাতে শেখে। সময় সচেতনতার বৈশিষ্ট্যটি তারা অর্জন করতে সমর্থ হয়।

(v) অনুশীলন বইতে উত্তর প্রদানের পর সময় সুযোগ অনুযায়ী শিক্ষার্থীরা শ্রেণিশিক্ষককে দেখানোর সুযোগ পায়। শিক্ষক শিক্ষার্থীর দুর্বলতাগুলিকে চিহ্নিত করার পর প্রয়োজনীয় সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।

(vi) সামগ্রিকভাবে অনুশীলন বইটি শিক্ষার্থীদের নথি হিসেবে সংরক্ষিত করে রাখার সুযোগ আসে এবং নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ণ পদ্ধতিতে তা কাজে লাগানো সম্ভব হয়।

(vii) কাজের মাধ্যমে অর্জিত অভিজ্ঞতার দ্বারা শিক্ষার্থীদের শিখন অনেক বেশি কার্যকরী হয়। শিক্ষার্থীদের উদ্ভাবনী শক্তি আরো বিকশিত হয়।

(viii) শিক্ষার্থীদের সৃজনমূলক শিখন কার্যকরী হয়ে ওঠে।

(ix) এই ধরনের শিখনে শিক্ষার্থী সৃজনশীল হয়, শিখন সুদৃঢ় হয়।

(x) শেখার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী আবিষ্কারকে আনন্দ উপভোগ করার সুযোগ পায়।

● অনুশীলন বই বা কর্মপুস্তকের গুণগত মান যাচাই এর শর্তাবলী (Criteria of Judging the quality of Work Book) :

অনুশীলন বই-এর গুমগত মান যাচাই এর শর্তগুলি জানতে হলে আমাদের অনুশীলন বইয়ের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বৈশিষ্ট্য জানতে হবে। উল্লেখযোগ্য সেই সমস্ত বৈশিষ্ট্য বা শর্তগুলি হল :

(১) অনুশীলন বইকে শিক্ষার্থীদের অতি অবশ্যই অনুশীলন করার সুযোগ দিতে হবে।

(২) অনুশীলন বইটি অবশ্যই পাঠ্যবই পরিপূরক হতে হবে।

(৩) অনুশীলন বইটিতে সন্নিবেশিত প্রশ্নগুলিকে অবসাই জ্ঞানমূলক, বোধমূলক, দক্ষতামূলক এবং প্রয়োগমূলক হতে হবে।

(৪) অনুশীলন বইটি যদি প্রজেক্ট ওয়ার্ক সমন্বিত হয় তাহলে কাজের পর্যাপ্ত সুযোগসুবিধা শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরতে সমর্থ হতে হবে। তছাড়া বইটিতে পাঠের রূপরেখা, পর্যাপ্ত সংখ্যক কাজের নিমিত্ত প্রশ্নাবলি, প্রাসঙ্গিক নির্দেশিকা থাকতে হবে।

(৫) শিক্ষার্থীদের কার্যকরী স্ব শিখনে সহায়তা করার ক্ষমতা থাকতে হবে।

(৬) অনুশীলন বইটিতে একটি ভূমিকা থাকবে, ভূমিকাতে থাকতে হবে বইটির ব্যবহার প্রণালী, বিষয়ের উল্লেখ, উত্তর সংকেত বা কার্যপ্রণালী সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক সংকেত ও নির্দেশিকা।

(৭) প্রজেক্ট ওয়ার্ক সমেত অনুশুলন বইতে বিভিন্ন কার্য বিভিন্ন অংশে পৃথক পৃথকভাবে সন্নিবেশিত থাকতে হবে।

Scanned with CamScanner

(৮) অনুশীলন বইতে সামগ্রিকভাবে সমস্ত শিখন অভিজ্ঞতার সংকেতগুলি সযত্নে সুসংগঠিতভাবে সন্নিবেশিত থাকতে হবে।

(৯) উত্তর দানের পৃথক ব্যবস্থা সমেত সমগ্র বইটি চিন্তানের অগ্রগতিকে ধরে রাখার ক্ষমতা থাকতে হবে।

(১০) অনুশীলন বইতে একদিকে শিক্ষার্থীর নিজেই নিজের মূল্যায়নের সুযোগ আবার শিক্ষকের দ্বারা মূল্যায়ণ নিরূপিত করার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

❖ ৩.১.৫.৯ প্রশ্নভাণ্ডার (Question Bank) :

কোনো নির্দিষ্ট নির্দেশনামূলক উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের জন্য সঠিক প্রকৃতির প্রশ্ন তৈরি করা শিক্ষকের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। সন্দেহ নেই কাজটি বেশ কঠিন। শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ায় মূল্যায়নের এই গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে স্পষ্টত প্রত্যেক শিক্ষকের নিকট এই প্রত্যাশা করা হয় যে, তাঁরা যে সমস্ত বিষয়ে শিক্ষাদানের দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে এসেছেন সেই সমস্ত বিষয়গুলির (Subjects) অন্তর্গত বিভিন্ন বিষয়বস্তু (contents)-এর উপর ভিত্তি করে বহু সংখ্যক প্রশ্ন তৈরি করবেন। শ্রেণিকক্ষের মূল্যায়ন ছাড়াও তাঁর কাছ থেকে আশা করা হয় লিখিত প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের ব্যবস্থা তিনি করবেন। কিন্তু বাস্তবে, সবকিছু সম্পূর্ণ ভাবে জেনে বুঝে অতি অল্প সময়ে শিক্ষকের নিকট থেকে অনেকগুলি উন্নত মানের প্রশ্ন তৈরি করার প্রত্যাশাও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। এমনকি বিভিন্ন বিষয়ের প্রশ্নকর্তা যাঁদের পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা আছে, আবার নিজের বিষয়ে যাঁদের পাণ্ডিত্য আছে, জ্ঞানের গভীরতা অনেকখানি তাঁদের পক্ষেও ভালো মানের প্রশ্নপত্র প্রস্তুত করা বেশ জটিল কাজ। এছাড়াও থাকে কতকগুলি সমস্যা যেমন–

(i) কয়েকটি বিশেষ উদ্দেশ্যকে ভাবনা-চিন্তায় রেখে পাঠ্যসূচি নির্ধারিত হয়, প্রশ্নপত্র রচনার সময় অনেক ক্ষেত্রে তার বাইরেও প্রশ্ন রচিত হয়ে যায়।

(ii) অনেক সময় পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলির বেশ কিছু অংশ প্রশ্নপত্রে বাদ পড়ে যায় অথবা প্রয়োজন মতো গুরুত্ব পায় না।

(iii) কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রশ্নপত্র রচনায় শিক্ষার্থীদের কাম্য সামর্থ্যগুলি যেমন– জ্ঞান, বোধ, প্রয়োগ, দক্ষতা ইত্যাদি যাচাই করার ক্ষেত্রে প্রশ্নপত্রে যথাযথ আনুপাতিক গুরুত্ব পায় না।

(iv) এমনও পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, যখন প্রশ্নপত্রে প্রশ্নকর্তা যে বিষয়টি জানতে চান বা যে কথা বলতে চান, শিক্ষার্থীরা সঠিকভাবে তা অনুধাবন করতে পারে না।

(v) প্রশ্নপত্রে যে প্রশ্নগুলি দেওয়া হয় সেগুলির উত্তর প্রদানে কত সময় লাগতে পারে তা সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করে দেওয়া হয় না, ফলে শিক্ষার্থীরা সময়-এর সামঞ্জস্য করতে গিয়ে সমস্যায় পড়ে।

উপরোক্ত সমস্যাগুলি দূর করে একটি যথার্থ প্রশ্ন যদি প্রস্তুত করা যায় তাহলে, শিক্ষার্থীরা যেমন উপকৃত হয় তেমনি শিক্ষকও বেশ কতকগুলি সুবিধা পায়। এই উদ্দেশ্যেই প্রশ্নভাণ্ডার তৈরি করার প্রাসঙ্গিকতা আছে। আগে থেকেই যদি বহু সংখ্যক প্রশ্ন সংবলিত প্রশ্ন ভাণ্ডার প্রস্তুত থাকে তাহলে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, প্রশ্নকর্তা, প্রশাসক এবং মূল্যায়নের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি সকলেই তার সুবিধা লাভ করে।

▲ প্রশ্নভাণ্ডারের অর্থ (Meaning of Question Bank) : প্রশ্নভাণ্ডার কোনো এলোমেলো বিচ্ছিন্নভাবে গৃহীত বহুসংখ্যক প্রশ্নের বিশৃঙ্খল সমষ্টিগত অবস্থা নয়। প্রশ্নভাণ্ডার হল এমন একটি সুবিন্যস্ত, সুশৃঙ্খল প্রশ্নাবলির সমাহার যেখানে পাঠ্যবিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে সমস্ত রকম কাঠামোযুক্ত প্রশ্ন অবস্থান করে, শিক্ষার্থীদের নির্দেশনামূলক উদ্দেশ্য অর্জনের পরিমাপের জন্য উপযুক্তভাবে সমস্ত স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য প্রশ্ন সংবলিত করা হয়। প্রকৃতপক্ষে প্রশ্নভাণ্ডার হল সব ধরনের সম্ভাব্য প্রশ্নাবলির একটি পরিপূর্ণ উদ্দেশ্যমূলক সংকলন। প্রশ্নভাণ্ডারে যে সমস্ত প্রশ্নগুলি স্থান পায় সেগুলি দুভাগে ভাগ করা যায়, যেমন—

(i) আচরণগত মূল্যায়নের জন্য প্রশ্ন এবং

(ii) উদ্দেশ্যগত মূল্যায়নের জন্য প্রশ্ন। উদ্দেশ্যগত প্রশ্নগুলি শিখন ফলশ্রুতিকে পরিমাপ করতে সহায়তা করে। এগুলিকে তিনভাগে ভাগ করা যায়–

(ক) জ্ঞানমূলক ক্ষেত্র সংবলিত প্রশ্ন

(খ) অনুভূতিমূলক ক্ষেত্র সংবলিত প্রশ্ন এবং

(গ) মানসিক ক্রিয়ার গতি সংক্রান্ত ক্ষেত্র সংবলিত প্রশ্ন।

একথা বলাই বাহুল্য যে, প্রশ্নভাণ্ডারে অন্তর্ভুক্ত প্রশ্নপত্রে বিষয়বস্তুর উপর সমস্ত ধরনের ক্ষমতা পরিমাপক সংক্রান্ত প্রশ্ন এবং সমস্ত দিককে স্পর্শ করে এমন সব প্রশ্ন থাকা দরকার।

▲ প্রশ্নভাণ্ডারের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Question Bank) :

প্রশ্নভাণ্ডারের নিজস্ব কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। সেগুলি হল—

(১) প্রশ্নভাণ্ডার প্রস্তুত হয় বহুসংখ্যক অভিজ্ঞ শিক্ষকের সম্মিলিত চেষ্টায়।

(২) প্রশ্নভাণ্ডার প্রস্তুত হয় নির্দেশনামূলক উদ্দেশ্য অর্জনের পরিমাপের কথা মাথায় রেখে।

(৩) প্রশ্নভাণ্ডারে স্থান পাওয়া প্রশ্নপত্রগুলির যথার্থতা (Validity), নির্ভরযোগ্যতা (Reliability), এবং উপযোগিতা (Use ability) থাকতে হয়।

(৪) প্রশ্নভাণ্ডারে সমস্ত ধরনের প্রশ্ন অন্তর্ভুক্তি থাকে।

(৫) প্রশ্নভাণ্ডারের প্রশ্ন শিক্ষার্থীকে যেমন পরীক্ষার প্রস্তুতিতে সহায়তা করে তেমনি শিক্ষককে পরীক্ষার জন্য প্রশ্নপত্র গঠন করতে সহায়তা করে।

(৬) প্রশ্নভাণ্ডারে স্থান পাওয়া প্রশ্নপত্রের প্রশ্নগুলি অনেকখানি ত্রুটিমুক্ত থাকে।

Scanned with CamScanner

(৭) সময় এবং পাঠ্যসূচির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্নভাণ্ডারের প্রশ্নগুলির পরিবর্তন, পরিমার্জন ও সংশোধনের সুযোগ থাকে।

(৮) প্রশ্নভাণ্ডারের প্রশ্নপত্রগুলির ক্রমাগত সমাধান করতে গিয়ে শিক্ষার্থীর যে অনুশীলন হয় তার ফলশ্রুতিতে শিক্ষার্থীর পরীক্ষা-ভীতি দূর হয়।

(৯) প্রশ্নভাণ্ডার শিক্ষককে শিক্ষণ পরিকল্পনাতেও সহায়তা করে থাকে।

(১০) প্রশ্নভাণ্ডার তৈরি কোনো সাময়িক কাজ নয়, বরং এটি একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া বিশেষ।

(১১) প্রশ্নভাণ্ডার একটি পরিকল্পিত গ্রন্থাগারের মূল্যবান শিখন সম্পদ।

▲ প্রশ্নভাণ্ডার গঠনের পরিকল্পনা (Planning of Question Bank Formation) : মূল্যায়ন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন শিক্ষক এবং অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের নিকট প্রশ্নভাণ্ডারকে অত্যন্ত দরকারি বস্তু হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রথমেই যেটি দরকার তা হল প্রশ্ন ভাণ্ডার প্রস্তুত করার জন্য সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা। প্রশ্নভাণ্ডার এককভাবে সম্পাদনা করা ঠিক নয়। প্রকৃত পক্ষে একটি ভালোমানের প্রশ্নভাণ্ডার তৈরি করার জন্য বহু সংখ্যক অভিজ্ঞ শিক্ষকের অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা দরকার। প্রশ্নভাণ্ডার হল বহু মানুষের একটি সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি।

একটি ভালো প্রশ্নভাণ্ডার গঠন বা প্রস্তুতির জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা অতীব জরুরি :

(১) অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী নির্বাচন
(২) উদ্দেশ্য নির্দিষ্টকরণ
(৩) বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ
(৪) কর্মশালা অনুষ্ঠিতকরণ
(৫) প্রশ্নপত্রের চূড়ান্ত রূপদান
(৬) প্রশ্নপত্রগুলিকে প্রশ্নভাণ্ডারে অন্তর্ভুক্তিকরণ
(৭) প্রশ্নভাণ্ডারের পরিমার্জিত সংস্করণ
(৮) পরীক্ষায় প্রয়োগ

উপরোক্ত দিকগুলি এবার সংক্ষেপে আলোচনা করা হল :

(১) **অভিজ্ঞ শিক্ষক মণ্ডলী নির্বাচন :** প্রশ্নপত্র তৈরি করার জন্য দরকার একদল অভিজ্ঞ শিক্ষকের। যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ এবং যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষকদের এক্ষেত্রে নির্বাচিত করা হয়। এই সমস্ত শিক্ষকরা নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়ার ভিত্তিতে তাঁদের কর্মপ্রণালী স্থির করেন।

(২) **উদ্দেশ্য নির্দিষ্টকরণ :** প্রশ্ন তৈরি, প্রশ্নপত্র রচনা ও প্রশ্নভাণ্ডারে প্রশ্নপত্রগুলিকে যে অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী অন্তর্ভুক্তি ঘটাবেন সেই সমস্ত শিক্ষকদের নিকট প্রশ্নভাণ্ডার গঠনের উদ্দেশ্যটি স্পষ্ট হয়ে ওঠা দরকার। প্রশ্নভাণ্ডার-এর পরিধি বা সীমানা কতদূর বিস্তৃত হবে তার ধারণাও আগাম স্থির করা দরকার।

(৩) **বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ :** পাঠ্যবিষয়বস্তুকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে বিশ্লেষণ করা হয় এই পর্যায়ে। সমস্ত পাঠএককে কতকগুলি ছোটো ছোটো উপএককে বিশ্লেষণ করা হয়। প্রতিটি উপএককে গুরুত্ব দিয়ে সেগুলির মধ্যে যে ছোটো ছোটো 'ধারণা' গুলি আছে সেগুলিকে কেন্দ্র করে প্রশ্ন তৈরি করা হয়। বিষয়বস্তুর কোনো অংশ বা উপএককে বাদ দেওয়া হয় না।

(৪) **কর্মশালা অনুষ্ঠিতকরণ :** যে শিক্ষকমণ্ডলীর উপর প্রশ্ন ও প্রশ্নপত্র রচনার দায়িত্ব দেওয়া হয় তাঁদের নিয়ে একটি কর্মশালার আয়োজন করার প্রয়োজন হয়। এই কর্মশালায় শিক্ষকগণ মূল্যায়নের সর্বাধুনিক ধারণা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষণের উদ্দেশ্য, পশ্নের ধরন, প্রশ্ন তৈরির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অবহিত হন এবং উপযুক্ত প্রশিক্ষণ লাভ করেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে তাঁরা প্রশ্ন ও প্রশ্নপত্র প্রস্তুত করেন।

(৫) **প্রশ্নপত্রের চূড়ান্ত রূপদান :** কর্মশালায় শিক্ষকগণ যে প্রশ্নগুলি তৈরি করে প্রশ্নপত্রে সংযোজিত করেন, যেগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার-বিশ্লেষণ করেন বিশেষজ্ঞগণ। প্রশ্ন বা আইটেমগুলির বিশ্লেষণ করে তাদের যথার্থতা, নির্ভরযোগ্যতা ও উপযোগিতার ভিত্তিতে প্রশ্নগুলির পরিবর্তন, পরিমার্জন ও সংশোধন করে প্রশ্নগুলির চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত করে প্রশ্নপত্রে স্থান দেওয়া হয়।

(৬) **প্রশ্নপত্রগুলিকে প্রশ্নভাণ্ডারে অন্তর্ভুক্তিকরণ :** চূড়ান্তভাবে গৃহীত প্রশ্নগুলিকে এবার বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করে নির্দিষ্ট রীতি মেনে পৃথক প্রশ্নপত্রে বিন্যস্ত করা হয়। এই সমস্ত প্রশ্নপত্রগুলিকে এরপর মূল্যায়নের প্রকৃতি অনুসারে সাজিয়ে সংকলিত করা হয়। সংকলিত এই প্রশ্নপত্রের বিন্যস্ত সমগ্রটি একটি প্রশ্নভাণ্ডার হিসেবে বিবেচিত হয়।

(৭) **প্রশ্নভাণ্ডারের পরিমার্জিত সংস্করণ :** দুই থেকে তিন বা চার বছর অন্তর প্রশ্ন-ভাণ্ডারের প্রশ্নগুলির পরিমার্জন প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। বিষয়বস্তু বা content-এর যে সমস্ত 'ধারণা'গুলি ক্রমশ পরিবর্তিত হয়ে চলেছে যেগুলির সঙ্গে সম্পর্কিত প্রশ্নের পরিবর্তন ও পরিমার্জন করা দরকার। আবার যে সমস্ত 'ধারণা'গুলির প্রাসঙ্গিকতা হ্রাস পাচ্ছে সেগুলির সঙ্গে সম্পর্কিত প্রশ্নগুলিকে বাদ দেওয়া দরকার। এছাড়া পাঠ্যসূচির পরিবর্তনে যে সমস্ত নতুন 'ধারণা' অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে সেগুলির সঙ্গে সম্পর্কিত প্রশ্নের নতুন করে সংযোজনও দরকার। সব মিলিয়ে বলা যায় সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্নভাণ্ডারের পরিমার্জিত সংস্করণ হওয়ার দরকার হয়।

Scanned with CamScanner

(৮) **পরীক্ষায় প্রয়োগ :** প্রশ্নভাণ্ডারের প্রশ্ন নিয়ে শিক্ষকগণ যে প্রশ্ন পত্র তৈরি করে বিভিন্ন সময়ের সাময়িক পরীক্ষা অথবা চূড়ান্ত পরীক্ষায় কাজে লাগান তখন প্রশ্ন ভাণ্ডারের উপযোগিতা অনুভূত হয় এবং এর চূড়ান্ত সার্থকতা প্রকাশ পায়, যখন শিক্ষার্থীরা স্বচ্ছন্দে তাদের পরীক্ষায় ব্যবহার করতে পারে।

সবশেষে উল্লেখ করা দরকার যে, প্রশ্নগুলির রক্ষণ ও তদারকির দায়িত্বে থাকতে পারে NCERT, SCERT, DIET, বোর্ড অব সেকেন্ডারি এডুকেশন বা মধ্যশিক্ষাপর্ষদ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান।

▲ প্রশ্নভাণ্ডারের সুবিধা (Advantages of Question Bank) : প্রশ্নভাণ্ডারের সুবিধা ভোগ করেন শিক্ষক তেমনি শিক্ষার্থীরা ও তা থেকে উপকৃত হয়। সুবিধার সেই দিকগুলি উল্লেখ করা হল :

(১) শিক্ষকের দিক থেকে একটি বড়ো সুবিধা হল, তিনি প্রশ্নভাণ্ডার থেকে প্রশ্ন নির্বাচন করে সহজেই পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তৈরি করতে পারেন এবং সারা বছর শিক্ষণের কাজেও প্রস্তুতি নিতে পারেন।

(২) প্রশ্নভাণ্ডার থেকে নির্বাচিত প্রশ্ন নিয়ে প্রশ্নপত্র রচনা করার ফলে শিক্ষার্থীদের উত্তরপত্র মূল্যায়ন করার ক্ষেত্রে দক্ষতা প্রদর্শন করতে পারেন।

(৩) প্রশ্নভাণ্ডারের প্রশ্নগুলির সমাধান ও চর্চা করার সুযোগ পায় বলে শিক্ষার্থীরা সারা বছর ধরে শিখনের সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে পারে স্বচ্ছন্দে।

(৪) প্রশ্নভাণ্ডারের প্রশ্নগুলির সঙ্গে পূর্ব পরিচিতি থাকার ফলে পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে যে প্রশ্ন থাকে সেগুলির ভাষা উপলব্ধিতে কোনো অস্পষ্টতা থাকে না, তাদের কাছে সহজে বোধগম্য হয়।

(৫) প্রশ্নভাণ্ডারের প্রশ্নগুলির মধ্যে যথেষ্ট বৈচিত্র্য থাকায় শিক্ষার্থীরা পাঠ্যবিষয়বস্তুকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে উপলব্ধি করার সুযোগ পায়, যেহেতু প্রশ্নগুলির ভিত্তিতে পাঠ অনুসরণ করতে হয়।

(৬) প্রশ্নভাণ্ডারের প্রশ্নগুলির যথার্থতা, নির্ভরযোগ্যতা ও উপযেগিতা থাকায় প্রশ্নগুলির মান নিয়ে সংশয় থাকে না, স্বাভাবিক ভাবেই শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের কাজটিও অনেক বেশি বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয়।

প্রশ্নভাণ্ডারের সীমাবদ্ধতা (Limitation of the Question Bank) :

(১) প্রশ্নভাণ্ডার গঠন করা বেশ সময় সাপেক্ষ, ব্যয় সাপেক্ষ এবং জটিল কাজ।

(২) প্রশ্নভাণ্ডার গঠন করার মতো প্রশাসনিক কাঠামো পর্যাপ্ত নয়।

(৩) প্রশ্নভাণ্ডারকে গ্রহণ করে পরীক্ষা কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের গ্রহণযোগ্যতা সর্বজনীন পর্যায়ে এখনো পৌঁছায় নি।

(৪) প্রয়োগমূলক প্রশ্নের অন্তর্ভুক্তির যথেষ্ট সুযোগ প্রশ্নভাণ্ডারে নেই।

৩.২ ভালো শিক্ষাবিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তকের গুণাবলি (Qualities of good Education Text book) :

মুদ্রিত শিখন সম্পদগুলির মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হল পাঠ্যপুস্তক বা Text book। শিক্ষার আঞ্চলিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তকের এই গুরুত্ব ও অপরিহার্যতা স্বীকৃত। সুতরাং শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত শিক্ষক, শিক্ষাপ্রশাসক, শিক্ষাবিশেষজ্ঞ সকলের কাছেই উন্নত গুণমানের পাঠ্যপুস্তকের প্রাসঙ্গিকতা অনেকখানি। সেজন্য শিক্ষকের এই পাঠপুস্তক নির্বাচনের বিষয়ে যথেষ্ট প্রশিক্ষিত হওয়ার প্রয়োজন আছে।

পাঠ্যপুস্তকের নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয় বা শর্তগুলি হল নিম্নরূপ :

(১) লেখকের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
(২) পাঠ্যসূচির সম্পূর্ণ প্রতিফলন
(৩) শিখনের উদ্দেশ্যগুলির উপলব্ধি
(৪) বিষয়বস্তুর নির্বাচন ও সংগঠন
(৫) ভাষা ও উপস্থাপনা রীতি
(৬) পুস্তকের আকার ও সামগ্রিক রূপ
(৭) মুদ্রণ ও বাঁধাই-এর মান
(৮) ভূমিকা ও বিষয়বস্তুর তালিকা
(৯) সংযোজন ও নির্ঘন্টি
(১০) শিক্ষণ প্রদীপনের ব্যবহার
(১১) মূল্য ও সহজলভ্যতা
(১২) অন্যান্য বৈশিষ্ট্য

উন্নতগুণমানের পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনের বিভিন্ন শর্তগুলি এবার নিম্নে আলোচনা করা হল :

(১) লেখকের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা (Academic and Professional Qualification) :

(i) পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের জন্য পুস্তক প্রণেতা বা লেখকের যথেষ্ট শিক্ষাগত এবং পেশাগত যোগ্যতা থাকা দরকার।

(ii) বিষয় সম্পর্কে লেখকের পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা থাকা বাঞ্ছনীয়।

(iii) লেখকের স্বাধীন কাজকর্ম এবং লেখার ক্ষমতা থাকা দরকার এবং সেই ব্যাপারে তাঁকে যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য হতে হবে।

(iv) শিক্ষক, গবেষক অথবা লেখক হিসেবে তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি থাকা দরকার।

Scanned with CamScanner

(২) **পাঠ্যসূচির সম্পূর্ণ প্রতিফলন** (Coverage of the syllabus) :

(i) যে পাঠ্যসূচির ভিত্তিতে পাঠপুস্তকটি রচিত হয়েছে, সেই পাঠ্যসূচিকে সম্পূর্ণ করে লেখা হয়েছে কিনা তা দেখা দরকার।

(ii) পাঠ্যসূচির সমস্ত দিক সঠিক বা যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে সে সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে।

(৩) **শিখনের উদ্দেশ্যগুলির উপলব্ধি** (Realization of learning objectives) :

(i) যে স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠপুস্তকটি রচিত হয়েছে সেই স্তরে পাঠ্যক্রমে নির্ধারিত উদ্দেশ্যগুলিকে পূরণ করার বিষয়টি উপলব্ধি করা হয়েছে কি না তা দেখতে হবে।

(ii) উদ্দেশ্যপুরণের উপলব্ধির জন্য বিষয়বস্তুর উপস্থাপনা রীতি মেনে চলা হয়েছে কি না তা বিচার করে দেখা দরকার।

(৪) **বিষয়বস্তুর নির্বাচন ও সংগঠন** (Selection and organization of the contents) :

(i) পাঠ্যপুস্তকটির বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের মানসিক স্তর অনুসারে রচিত হয়েছে কি না তা দেখা দরকার।

(ii) বিষয় পাঠের জন্য শিক্ষার্থীদের আগ্রহ এবং কৌতুহল বৃদ্ধিতে পাঠ্যপুস্তকটির সহায়তা করা ক্ষমতা থাকতে হবে অবশ্যই

(iii) শিক্ষার্থীদের দৈনন্দিন জীবনের প্রাকৃতিক সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন এবং সংযোগ সাধন করার ক্ষমতা পাঠ্যপুস্তকটির আছে কি না তাও বিচার্য বিষয়।

(iv) পাঠ্যপুস্তকে সন্নিবেশিত তারিখ, ঘটনা, এবং তথ্যাবলি, মানচিত্র, রেখাচিত্র, লেখচিত্র প্রভৃতি নির্ভরযোগ্য, যথার্থ এবং সর্বাধুনিক হওয়া প্রয়োজন।

(v) পাঠ্যপুস্তকটির বিষয়বস্তুর সামাজিক সংশক্তি, প্রাক্ষোভিক এবং জাতীয় সংহতি রক্ষার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা গ্রহণের ক্ষমতা থাকা দরকার।

(vi) পাঠ্যপুস্তকটির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত বিষয়বস্তুর শিক্ষার্থীদের মধ্যে জাতীয় ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি গঠন করার ক্ষমতা থাকতে হবে।

(৫) **ভাষা ও উপস্থাপন রীতি** (Language and style of the presentation) :

(i) পাঠ্যপুস্তকটিতে ব্যবহৃত ভাষা শিক্ষার্থীদের মানসিক স্তরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে, অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের মানসিক পরিণমন উপযোগী হতে হবে।

(ii) ভাষার অন্তর্গত বাক্যবিন্যাস ও শব্দের ব্যাকরণগত শুদ্ধতা থাকতে হবে এবং তা যথার্থ হতে হবে।

(iii) বিষয়বস্তু উপস্থাপনে শিখনের নীতি ও তত্ত্ব অনুসৃত হয়েছে কি না তা বিচার করে দেখতে হবে। উপস্থাপনার রীতি শিক্ষার্থীদের নিকট আকর্ষণীয় ও প্রেরণা সঞ্চারকারী হতে হবে।

(iv) পাঠ্যপুস্তকে উপস্থাপিত বিষয়বস্তু এবং ব্যবহৃত শব্দভাণ্ডার শিক্ষার্থীদের নিকট সহজে বোধগম্য হতে হবে।

(৬) **পুস্তকের আকার ও সামগ্রিকরূপ** (Size and overall book) :

(i) পাঠ্যপুস্তকটির আকার ও আয়তন সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদের বয়স উপযোগী কি না তা দেখতে হবে। সামগ্রিকভাবে পাঠপুস্তকটি দেখতে আকর্ষণীয় হতে হবে।

(ii) পাঠ্যপুস্তকটির কভার পৃষ্ঠার লেখকের নাম এবং পিছনের পৃষ্ঠায় লেখক ও পুস্তকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় থাকা দরকার।

(iii) পাঠ্যপুস্তকটির নাম (title), পাঠ্যপুস্তকটির রচনার উদ্দেশ্য ও অর্থ বহন করতে সমর্থ হবে।

(৭) **মুদ্রণ ও বাঁধাই** (Printing and binding) :

(i) পাঠ্যপুস্তকটির মুদ্রণ হতে হবে স্পষ্ট, ত্রুটিমুক্ত এবং সন্তোষজনক।

(ii) ছাপার অক্ষরের আকার এবং পাঠ্যপুস্তকে ব্যবহৃত অনুচ্ছেদে শিরোনাম, শিক্ষার্থীদের বয়স এবং শিক্ষার স্তর অনুযায়ী সন্তোষজনক হতে হবে।

(iii) পুস্তকটির কাগজ এবং কালির মান উন্নত হতে হবে।

(iv) পাঠ্যপুস্তকটির বঁধাই টেকসই এবং সন্তোষজনক হওয়া দরকার।

(৮) **মুখবন্ধ ও বিষয়বস্তুর তালিকা** (Preface and table of contents) :

(i) পাঠ্যপুস্তকটিতে লেখকের একটি মুখবন্ধ বা পূর্বভাষণ থাকা উচিত এবং মুখবন্ধে পুস্তকটি লেখার উদ্দেশ্য এবং তার অধ্যায়গুলির অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ থাকতে হবে।

(ii) বিভিন্ন অধ্যায়গুলির একটি বিন্যাস তালিকা থাকা বাঞ্ছনীয় যাতে পাঠকের উপলব্ধি সহজ হয়। বিভিন্ন বিষয়বস্তু সন্নিবেশের উল্লেখ নির্ধারিত পৃষ্ঠায় থাকতে হবে।

(৯) **সংযোজন এবং নির্ঘণ্ট** (Appendix and index) :

(i) পুস্তকটিতে সন্তোষজনক সংযোজন এবং নির্ঘণ্ট থাকা দরকার।

(১০) **শিক্ষণ-প্রদীপনের ব্যবহার** (Use of teaching aids) :

(i) পাঠ্যপুস্তকটির অধ্যায়-এর প্রয়োজন অনুসারে পর্যাপ্ত চিত্র, রেখাচিত্র, মানচিত্র, চার্ট, সারণি ইত্যাদি থাকা দরকার এবং সেগুলি অবশ্যই শিক্ষার্থীদের নিকট আকর্ষণীয়

Scanned with CamScanner

হতে হবে।

(ii) সন্নিবেশিত চিত্র, রেখাচিত্র, মানচিত্র, চার্ট বা সারণি ইত্যাদিগুলি বিষয়বস্তুর প্রাসঙ্গিক ও সহায়ক কি না তা দেখতে হবে।

(১১) **মূল্য ও সহজলভ্যতা** (Price And availability) :

(i) পাঠ্যপুস্তকটির মূল্য শিক্ষার্থীদের সামর্থ্যভিত্তিক হওয়া দরকার।

(ii) পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও লাইব্রেরির নিকট সহজলভ্য হতে হবে।

(১২) **অন্যান্য বৈশিষ্ট্য** (Other features) :

(i) পাঠ্যপুস্তকটিতে প্রতিটি অধ্যায়-এর শেষে অনুশীলনীতে বিভিন্ন ধরনের পর্যা সংখ্যক প্রশ্ন সন্নিবেশিত থাকা দরকার। প্রশ্নগুলি বিষয়বস্তুর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হও অবশ্যই দরকার।

(ii) প্রদত্ত প্রশ্নগুলি শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞান, বোধ, দক্ষতা ও প্রয়োগধর্মী হওয়া বাঞ্ছনী

(iii) প্রতিটি অধ্যায়-এর শেষে সারসংক্ষেপ থাকলে ভালো হয়।

(iv) পাঠ্যপুস্তকটির শেষে একটি গ্রন্থপরিচয় তালিকা বা গ্রন্থপঞ্জি থাকা দরকার।

(v) পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনার ক্ষেত্রে প্রকাশনা সংস্থাটির খ্যাতি ও পরিচিতি থাকা দরকা

✪ ৩.৩ শিখন সম্পদ হিসাবে শিক্ষণ প্রদীপন (Teaching Aids in Social Scienc Resources) :

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষণকার্যকে যথার্থভাবে কার্যকরী করে তুলতে হলে অবশ্যই শিক্ষকের বক্তৃতা বা ব্যাখ্যাদান করতেই হয়। কিন্তু সেটাই যথেষ্ট নয়। শিক্ষক যদি ব্যাখ্যাদান করতে গি এমন কিছু উপকরণ বা সামগ্রী ব্যবহার করেন যাতে শিক্ষার্থীদের পাঠ বোঝার ক্ষেত্রে সুবি হয়, তবে সেটাই শিক্ষকের করা দরকার। এই সামগ্রীগুলিকে বলা হয় শিক্ষণ প্রদীপন উপকরণ। অর্থাৎ শিখন শেখানো কার্যক্রমে পাঠ পরিচালনার জন্য শিক্ষক যে সমস্ত উপক বা সামগ্রী ব্যবহার করেন সেগুলিই হল শিক্ষণ প্রদীপন বা উপকরণ। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা বিভিন্ন শিক্ষাবিদ এই সমস্ত শিক্ষামূলক উপকরণগুলির ব্যবহারের উপর গুরুত্ব প্রদান করেছে এই প্রসঙ্গে **কোঠারি কমিশনের** (১৯৬৪-৬৬) বক্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে—"The supply of teaching aids to every school is essential for the improvement of the quality of teaching. It would indeed bring about an educational revolution in the country."

বস্তুত, আজকের এই আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থাতেই নয়, বহু বছর পূর্বে **গ্রিক** এবং রোমানর যাদের চিন্তাভাবনা ও তথ্যকে কথার মাধ্যমে, ছবির মাধ্যমে, প্রতীকের মাধ্যমে পৌঁ

দিতেন ব্যক্তিদের নিকট। **রুশো** শিক্ষাক্ষেত্রে বহু শব্দ ব্যবহারের দ্বারা অনুৎসাহিত করতেন। তিনি মনে করতেন যে, শিশুর দেহ ও মনের প্রকৃতি হল চারপাশের বস্তুজগৎ থেকে অভিজ্ঞতা অর্জন। **ফ্রয়বেলও** মনে করতেন শিশুর পারিপার্শ্বিক জগতের বস্তু সামগ্রী থেকে শিক্ষালাভ করা উচিত। মন্তেসরির বক্তব্যতে সেই কথাই ধ্বনিত হয় যে, শিশু হাতে-কলমে কাজের মাধ্যমে শিখবে।

সুতরাং বহু বছর আগে থেকে আজ এই আধুনিককাল পর্যন্ত শিক্ষণ প্রদীপন বা উপকরণগুলির উপযোগিতার কথা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আধুনিক শিক্ষাতত্ত্ব, শিক্ষা পদ্ধতি ও মনস্তত্ত্ব সব কিছুর বিচারে এর গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। **Rulon, Charters** প্রমুখ শিক্ষাবিজ্ঞানীদের গবেষণাও এই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

❑ ৩.৩.১ শিক্ষণ প্রদীপন ও শিক্ষামূলক উপকরণ (Teaching Aids and Appliances) :

শিক্ষণকার্যকে যথার্থভাবে কার্যকরী করে তোলার জন্য শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রী ব্যবহার করেন। এই সামগ্রীগুলিকে বলা হয় শিক্ষণ প্রদীপন ও শিক্ষামূলক উপকরণ। কিন্তু শিক্ষণ প্রদীপন এবং শিক্ষামূলক উপকরণ একই অর্থে ব্যবহৃত হলেও এদের মধ্যে খুব সূক্ষ্ম পার্থক্য বর্তমান। শিক্ষামূলক উপকরণ হল শিক্ষণকার্যে সহায়ক এমন কতকগুলি সামগ্রী যেগুলি শ্রেণিকক্ষে পাঠদানকালে শিক্ষকের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বা অপরিহার্য। অর্থাৎ বলা যেতে পারে যে, শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের সময় বিষয়বস্তুর জ্ঞান ছাড়াও অন্যান্য অপরিহার্য সামগ্রী হল শিক্ষণমূলক উপকরণ, যেমন— পাঠ্যপুস্তক, বোর্ড, চক, ডাস্টার বা ঝাড়ন, স্কেল ইত্যাদি। এগুলি শিক্ষকের পাঠদানের ক্ষেত্রে জরুরি সামগ্রী বা আবশ্যিক সামগ্রী। কিন্তু অন্য দিকে শিক্ষণ প্রদীপন হল শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের পাঠদানের ক্ষেত্রে শিক্ষণের গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য বা শিক্ষার্থীর শিখনের গুণগত মান বৃদ্ধি করে এমন কিছু শিক্ষা সহায়ক সামগ্রী। শিক্ষণ প্রদীপন শিক্ষকের নিকট অপরিহার্য বা আবশ্যিক নয়। এই সামগ্রীটি হলে ভালো হয়, কিন্তু না হলেও চলে। কিন্তু শিক্ষামূলক উপকরণ অবশ্যই শিক্ষকের প্রয়োজন। ভূগোলের পাঠ বোঝাবার জন্য শিক্ষকের চক, ডাস্টার, বোর্ড লাগেই, কিন্তু গ্লোব, মানচিত্র হলে ভালো কিন্তু না হলেও চলে। এই গ্লোব, মানচিত্র ইত্যাদিগুলি হল শিক্ষণ প্রদীপন।

যাইহোক শ্রেণি শিক্ষণকে কার্যকরী করে তোলার জন্য শিক্ষামূলক প্রদীপন এবং শিক্ষামূলক উপকরণ উভয়রই প্রয়োজন আছে। এদের পারস্পরিক সহাবস্থানের ভিত্তিতেই পাঠদানের কার্য সার্থকতা লাভ করতে পারে।

ebook.dascoaching.in

Scanned with CamScanner

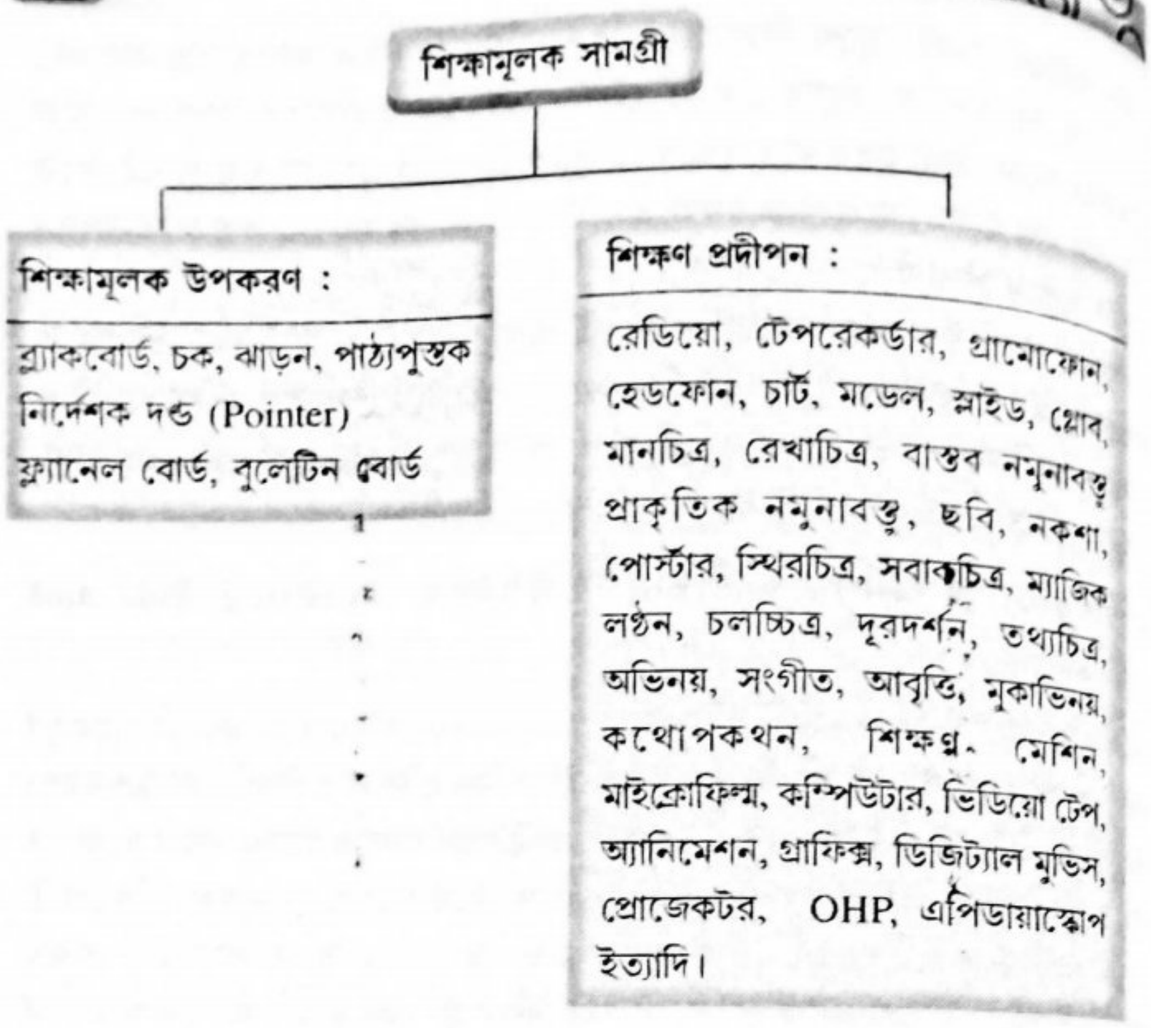

চিত্র- ১০ : শিক্ষামূলক সামগ্রী

❑ ৩.৩.২ শিক্ষণ প্রদীপনের উপযোগিতা (Utility of Teaching Aids) :

আধুনিক শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থায় শ্রেণিকক্ষে অথবা শ্রেণিকক্ষের বাইরেও একটি শিক্ষণমূলক পরিবেশ গড়ে তুলতে শিক্ষণ প্রদীপনের উপযোগিতা বা গুরুত্বকে অস্বীকার করার উপায় নেই। শিক্ষণের মূল উদ্দেশ্যকে যথার্থভাবে সফল করার জন্য আজ পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র এই শিক্ষণ প্রদীপনকে ব্যবহার করা নিয়ে চিন্তাভাবনা করছেন। আগেই উল্লেখ করেছি যে **ভারতীয় শিক্ষাকমিশন** বা **কোঠারি কমিশন** (১৯৬৪-৬৬) এই শিক্ষণ প্রদীপন ব্যবহারের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করে মন্তব্য করেছেন।

শিক্ষণ প্রদীপনের উপযোগিতার প্রধান দিকগুলি হল :

(i) শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও মনোযোগের সঞ্চার ঘটানো,
(ii) জটিল পাঠ্য-বিষয়বস্তুকে সহজ করে তোলা,
(iii) বিমূর্ত ধারণাকে সহজবোধ্যভাবে মূর্ত করে তোলা,
(iv) বিভিন্ন জ্ঞানের মধ্যে সমন্বয়সাধন করা,

(v) পাঠ্যবিষয়ের জ্ঞান, বোধ ও প্রয়োগের বিকাশসাধন,
(vi) কল্পনাশক্তি, বিচারশক্তি, চিন্তাশক্তির বৃদ্ধি ঘটানো,
(vii) বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বা অনুবন্ধ ঘটানো,
(viii) বাচনভঙ্গি ও ভাষার বিকাশ ঘটানো,
(ix) জীবনকেন্দ্রিক শিক্ষার সূচনা।

উপযোগিতার বিভিন্ন দিকগুলি সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হল :

(i) **শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও মনোযোগের সঞ্চার ঘটানো** : শ্রেণিকক্ষে পাঠদান কালে শিক্ষকের নিকট দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও মনোযোগ। মৌখিকভাবে শিক্ষক প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, বর্ণনাদান, বক্তৃতা প্রভৃতি ব্যবহার গ্রহণ করলেও সর্বাংশে তা সফল হয় না। শ্রেণিকক্ষে কিছু শিক্ষার্থী অন্তত এই আগ্রহ ও মনোযোগ তেমনভাবে দেখায় না। সেক্ষেত্রে শিক্ষক যদি তার পাঠদানের বর্ণনার সময় শিক্ষামূলক কিছু প্রদীপন ব্যবহার করেন তাহলে সহজেই শিক্ষার্থীদের মনোযোগ যেমন আকৃষ্ট হয় তেমনই তাদের আগ্রহেরও সঞ্চার হয়। তাদের প্রেষণা বৃদ্ধি পায়।

(ii) **জটিল পাঠ্যবিষয়বস্তুকে সহজ করে তোলা** : শিক্ষকের কাজ বা দায়িত্ব হল যে-কোনো ধরনের পাঠ্য-বিষয়বস্তু তা সে জটিলই হোক আর সরলই হোক শিক্ষার্থীর নিকট স্বচ্ছন্দে পৌঁছে দেওয়া, শিক্ষার্থীর নিকট সহজবোধ্য করে তোলা। মৌখিক ব্যাখ্যার সময় শুধুমাত্র ভাষার মাধ্যমে অনেক ক্ষেত্রে এই উদ্দেশ্য সাধন সম্ভব হয় না। কিন্তু শিক্ষণ প্রদীপনের মাধ্যমে সেই উদ্দেশ্য সাধন হয়। যেমন মানুষের শিক্ষায় অভিজ্ঞতা অর্জনের ক্ষেত্রে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ভূমিকা জটিল বিষয় হলেও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের চিত্র ও রেখাচিত্রের সাহায্যে সহজবোধ্য করে তোলা সম্ভব। নদীর গতিপথকে বোঝাতে চিত্র বা তথ্যচিত্রকে ব্যবহার করা যায়।

(iii) **বিমূর্ত ধারণাকে সহজবোধ্যভাবে মূর্ত করে তোলা** : শিক্ষাবিজ্ঞানের অন্তর্গত এমন বহু বিষয়বস্তু আছে যেগুলি প্রকৃতিতে বিমূর্ত ধরনের, এই বিমূর্ত ধারণাগুলি শিক্ষার্থীদের নিকট সার্থকভাবে তাদের উপলব্ধিতে আনা অনেক সময়েই বেশ কষ্টকর হয় শিক্ষকের পক্ষে। এই সমস্ত ক্ষেত্রে বিমূর্ত ধারণাটিকে অবলম্বন করে পরিকল্পিত চার্ট, তথ্যচিত্র ইত্যাদির সাহায্যে মূর্ত করে তোলা যায়। শিক্ষার্থীর ভাবনার জগতে প্রবেশ করা যায়। বিমূর্ত ধারণাটিকে কেন্দ্র করে শিক্ষার্থী তখন সহজেই বিমূর্ত ধারণা গঠনে সক্ষম হয়। যেমন, জাতীয় বিকাশ বোঝাতে গিয়ে কিংবা সংস্কৃতির ধারণা দিতে গিয়ে পূর্বে উল্লিখিত প্রদীপন যেমন চার্ট, তথ্যচিত্র ইত্যাদির সাহায্যে শিক্ষক সার্থকতা পেতে পারেন।

(iv) **বিভিন্ন জ্ঞানের মধ্যে সমন্বয়সাধন করা** : আমাদের অভিজ্ঞতা অর্জনের সাথে সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত হল জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি। এক একটি জ্ঞানেন্দ্রিয় এক এক ধরনের

Scanned with CamScanner

জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করে, যেমন— চোখ দর্শনমূলক অভিজ্ঞতা অর্জন, কান শ্রবণ অভিজ্ঞতা, নাক ঘ্রাণমূলক অভিজ্ঞতা, জিহ্বা স্বাদমূলক এবং ত্বক স্পর্শমূলক অভিজ্ঞতা জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করে। এই জ্ঞানেন্দ্রিয় অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন প্রকার জ্ঞান শিক্ষার্থীর করে, সেগুলি যদি সম্পূর্ণতা পেতে চায় তবে বিভিন্ন জ্ঞানের মধ্যে সমন্বয় দরকার। বিভিন্ন প্রদীপন ব্যবহারের দ্বারা জ্ঞানের এই সমন্বয় সাধনের কাজটি সহজে সম্পন্ন করা পারেন শিক্ষক। যেমন পার্বত্য প্রবাহে নদীর গতিপথের বৈশিষ্ট্য চলচ্চিত্র বা তার মাধ্যমে সহজবোধ্য করা যায় সমন্বয়ের দ্বারা।

(v) **পাঠ্যবিষয়ের জ্ঞান, বোধ ও প্রয়োগের বিকাশসাধন :** শিক্ষার্থী প্রাথমিকভাবে জ্ঞান লাভ করে তা শুধুই জ্ঞানের স্তরে থাকে, কিন্তু যখন তা শিক্ষার্থীর উপলব্ধিতে এসে পৌঁছোয় তখন তা বোধের উন্মেষ ঘটায়, আবার বোধের প্রকৃত উন্মেষ ঘটলে শিক্ষার্থী অর্জিত জ্ঞানকে প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়। এই যে জ্ঞান অর্জন থেকে বোধের উন্মেষ এবং বোধের উন্মেষ থেকে প্রয়োগ করা ক্ষমতার বিকাশ ঘটে, এদের প্রতিটি স্তরে শিক্ষণ প্রদীপন যথেষ্ট কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে।

(vi) **কল্পনাশক্তি, বিচারশক্তি ও চিন্তাশক্তির বৃদ্ধি ঘটানো :** শিক্ষার্থীকে কোনো বস্তুর ধারণা দেওয়ার সময় অনেকক্ষেত্রে শিক্ষক প্রকৃত বস্তুটি শিক্ষার্থীকে দেখাবার সুযোগ পান না, তার অভাব মেটাবার জন্য তখন প্রকৃত বস্তুটির অনুরূপ একটি মডেল ব্যবহার করা হয়। এখানে শিক্ষার্থীকে তার নিজের কল্পনাশক্তি দিয়ে মডেলটি প্রকৃত বস্তুর দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে হয়। অর্থাৎ নির্জীব মডেলটিতে অনেক সময় সজীব বস্তুর কল্পনা শক্তি আরোপ করে শিক্ষার্থীকে চিন্তাশক্তির বৃদ্ধি ঘটাতে হয়। আবার, প্রকৃত বস্তু ও বিকল্প মডেলটির তুলনামূলক বিচার করতে গিয়ে শিক্ষার্থীর বিচারশক্তিও বৃদ্ধি পায়। মডেল-এর পরিবর্তে চিত্র, চার্ট প্রভৃতিরও ব্যবহার করা যায়।

(vii) **বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বা অনুবন্ধ ঘটানো :** আধুনিক শিক্ষায় কোনো একটি বিষয়কে (subject) একক বা বিচ্ছিন্নভাবে দেখা হয় না। এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি শিক্ষার্থীর শিক্ষণকে সম্পূর্ণতা দিতে পারে না। তাই বিভিন্ন বিষয়গুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক আছে, তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে শিক্ষা অনেকখানি সম্পূর্ণতা পায়। যেমন, একটি মাটির বুদ্ধমূর্তি দিয়ে যেমন শিল্পকে ব্যাখ্যা করা যায়, তেমন তার সম্পর্কিত ইতিহাস, সংস্কৃতি, ভূগোল, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়গুলির সঙ্গে বুদ্ধমূর্তির সম্পর্ক স্থাপন করতে গিয়ে প্রকৃত পক্ষে বিভিন্ন বিষয়-এর মধ্যে অনুবন্ধ রচিত হয়ে যায়। অনুরূপভাবে কাঠের তৈরি পুতুল, বুক বা আরও অন্য কোনো বস্তু দিয়ে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সম্পর্ক রচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সামগ্রিক উপলব্ধির জগতের উন্নতি সাধন সম্ভব হয়।

(viii) **বাচনভঙ্গি ও ভাষার বিকাশ ঘটানো :** শিক্ষণ প্রদীপন শিক্ষার্থীর বাচনভঙ্গি বা কথা বলার ধরন, ভাষার বিকাশকেও ত্বরান্বিত করে। শিক্ষার্থীর সামনে যদি কোনো চিত্র বা মূর্তি বা কোনো প্রকৃত বস্তুর নমুনা দেখানো যায় তাহলে ওই প্রদীপনকে কেন্দ্র করে শিক্ষার্থীকে অনেক প্রশ্ন করে শিক্ষক অনেকগুলি উত্তর জানতে পারেন। শিক্ষার্থী এই সমস্ত উত্তর প্রদান করতে গিয়ে যে বাচনভঙ্গির সে আশ্রয় নেয় এবং যে ভাষার তাকে বর্ণনা বা ব্যাখ্যা দিতে হয়, তাতে শিক্ষক অনায়াসে তার ওই বৈশিষ্ট্য দুটি চিহ্নিত করতে পারেন। এইভাবে ধীরে ধীরে শিক্ষণ প্রদীপন ব্যবহারের মাধ্যমেই শিক্ষার্থীর ভাষাগত বিকাশের সুযোগ করে দেওয়া যায়।

(ix) **জীবনকেন্দ্রিক শিক্ষার সূচনা :** শিক্ষণ প্রদীপনগুলির সহায়তায় পাঠদান পদ্ধতির দ্বারা শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের চিন্তাশক্তিকে উদ্দীপ্ত করে মনকে অনেক বেশি বুদ্ধি নির্ভর করে তোলেন। পুঁথিগত বিদ্যার উপর নির্ভর না করে বস্তুকেন্দ্রিক এবং বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে সম্পর্ক রেখে শিক্ষার্থী পাঠের বিষয়-বস্তুকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করে, ফলে শিক্ষার্থীর জড়ীন চিন্তাশক্তির মুক্তি ঘটে। এই শিক্ষাগ্রহণে তার যেমন আগ্রহ ও মনোযোগ বাড়ে তেমনই শিক্ষাকে জীবনের বিভিন্ন পরিস্থিতির সঙ্গে মেলাবার চেষ্টা করে, শিক্ষকের নৈতিক ব্যাখ্যাদানের উপর নির্ভর করে না। শিক্ষার্থীদের নিজেদের জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি নিয়ে জ্ঞান, বোধ ও প্রয়োগের বিকাশ সাধন ঘটায়। বাস্তব জীবনে তাদের শিক্ষার যোগসূত্র রচিত হয়। অর্থাৎ শিক্ষণ প্রদীপন জীবনকেন্দ্রিক শিক্ষার সূচনা করে।

❑ ৩.৩.৩ শিক্ষণ প্রদীপনের সংজ্ঞা (Definitions of Teaching Aids) :

বিভিন্ন পণ্ডিত ব্যক্তি শিক্ষণ-প্রদীপনের বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন।

(i) **Burton** শিক্ষণ প্রদীপন-এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন যে : "those sensory objects or images which initiate or stimulate and reinforce learning" অর্থাৎ সেইসমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু অথবা প্রতিচ্ছবি যেগুলি শিখনকে উদ্দীপিত এবং উৎসাহিত করে।

(ii) **Cater. V. Good** বলেছেন যে: "those aids which help in completing the triangular process of learning i. e., motivation, classification and stimulation as audiovisual aids." অর্থাৎ সেই সমস্ত প্রদীপন যেগুলি শিখনের ত্রিমুখী প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণ করতে সহায়তা করে, যেমন—প্রেষণা, শ্রেণিবিন্যাস এবং উদ্দীপনা সঞ্চার, সেগুলিকে বলা হয় শ্রবণ-দৃষ্টি নির্ভর প্রদীপন।

(iii) **Kinder. S. James** বলেছেন যে: "audiovisual aids are those devices which make learning experiences more concrete, more realistic and more dynamic." অর্থাৎ শ্রবণদৃষ্টি নির্ভর প্রদীপন হল সেই সমস্ত উপকরণ যেগুলি শিখনের অভিজ্ঞতাকে অনেক বেশি মূর্ত, বাস্তবধর্মী এবং গতিশীল করে তোলে।

Scanned with CamScanner

❑ ৩.৩.৪ শিক্ষণ প্রদীপনের অত্যাবশ্যকীয় গুণাবলি (Essential Qualities of Teaching Aids) :

শিক্ষণ-শিখন পরিস্থিতিতে ব্যবহৃত শিক্ষণ প্রদীপনের কতকগুলি অত্যাবশ্যকীয় গুণ থাকা দরকার। **শিক্ষণ প্রদীপনের সেই গুণগুলি নিম্নে উল্লেখ করা হল—**

(i) **নির্ভুলতা** (Accuracy) : শিক্ষণ প্রদীপনের কখনো অনুপযুক্ত চিত্র বা ধারণার উপস্থাপন করা উচিত নয়। একটি চার্টে বা মানচিত্রে যদি স্কেল না দেওয়া থাকে তাহলে ওই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য চিত্র বা মানচিত্রটির আপেক্ষিক আকার শিক্ষার্থীদের ভুল ধারণা দিতে পারে। সেটি কখনোই কাঙ্ক্ষিত নয়।

(ii) **প্রাসঙ্গিকতা** (Relevancy) : ব্যবহৃত প্রদীপনগুলিকে অবশ্যই topic বা বিষয়বস্তু বা ধারণাটির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে অথবা প্রাসঙ্গিকভাবে সম্পর্কিত হতে হবে।

(iii) **বোধগম্যতা** (Comprehensibility) : শিক্ষণ প্রদীপনগুলির শিক্ষার্থীদের বোধ বা উপলব্ধির ক্ষেত্রে অত্যন্ত সহজ সরল প্রকৃতির কিংবা খুব বেশি জটিল প্রকৃতির হওয়া উচিত নয়। প্রদীপনগুলি শিক্ষার্থীদের নিকট আকর্ষণীয়ভাবে মূলত শিখনকে সহজ করে তুলবে।

(iv) **আগ্রহ সঞ্চারকারী** (Interesting) : শিক্ষণ প্রদীপনগুলি যত বেশি আকর্ষণীয় হবে শিক্ষার্থীদের শিখনে তত বেশি আগ্রহের সঞ্চার করতে পারবে। সুতরাং প্রদীপনগুলির আগ্রহসঞ্চারকারী ক্ষমতা থাকা অবশ্যই প্রয়োজন।

(v) **মূল্যমান** (Cost-Effective) : প্রদীপনগুলিকে সাধারণ এবং কার্যকরী হতে হবে এবং উপযুক্ত মূল্যের হতে হবে।

(vi) **সহজলভ্যতা** (Availability) : সময় ও প্রয়োজন অনুযায়ী প্রদীপনগুলিকে সহজলভ্য হতে হবে, যাতে বিদ্যালয়, শিক্ষক, শিক্ষার্থীরা সহজেই সেগুলি সংগ্রহ করতে পারে।

(vii) **পরিবহন যোগ্যতা** (Transportability) : একস্থান থেকে যাতে অন্য স্থানে সহজে আনা-নেওয়া যায় তার জন্য প্রদীপনগুলির সহজ পরিবহনযোগ্যতা থাকতে হবে।

(viii) **উপযুক্ততা** (Appropriateness) : শিক্ষণ প্রদীপনগুলিকে অবশ্যই শিক্ষার্থীর বয়স, পরিণমন, অভিজ্ঞতা এবং বৌদ্ধিক ক্ষমতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বা উপযোগী হতে হবে।

❑ ৩.৩.৫ শিক্ষণ প্রদীপন ব্যবহারে সীমাবদ্ধতা (Limitation in the uses of Teaching Aids) :

শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ায় শিক্ষণ প্রদীপনগুলির ব্যবহারে গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, এ নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই আবার জনপ্রিয়তাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। **কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রদীপনগুলি ব্যবহারে কিছু অসুবিধা দেখা যায়। সেগুলি হল—**

(১) **শিক্ষকের উদাসীনতা** (Apathy of teacher) : মানুষ তার নিজস্ব রক্ষণশীল প্রবণতার কারণে নতুন কোনো চিন্তাধারাকে সহজে গ্রহণ করতে চায় না, পরিবর্তনকে সহজে মেনে নিতে পারে না। শিক্ষকও তার ব্যতিক্রম নয়। একটি বড়ো অংশের শিক্ষক এখনও চিরাচরিত চক-ডাস্টার নিয়ে চক-টক (chalk-talk) পদ্ধতিতে শেখানোর কাজকে চালিয়ে যেতে চান, ঠিক যেভাবে তাঁরা নিজেরা শিক্ষালাভ করে এসেছেন। স্বাভাবিকভাবেই এইসমস্ত শিক্ষকরা পরিবর্তন বিরোধী এবং উদাসীন প্রকৃতির।

(২) **শিক্ষার্থীদের উদাসীনতা** (Indifference of students) : এ কথা ঠিক যে, শিক্ষণ প্রদীপনকে বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন হয়ে ব্যবহার করলে শিক্ষার্থীর আগ্রহকে জাগিয়ে তোলা যায়। কিন্তু তা না হলে, শিক্ষণ প্রদীপনের ব্যবহার শিক্ষার্থীদের বিরক্তি বা ক্লান্তিকর অবস্থাকে বৃদ্ধি করে তোলে। এতে শিক্ষণের কাজ ব্যাহত হয়।

(৩) **অর্থনৈতিক সমস্যা** (Financial problem) : শিক্ষণে ব্যবহার করার জন্য শিক্ষণ প্রদীপনগুলিকে কিনতে গিয়ে প্রাথমিকভাবে এককালীন অনেক বেশি অর্থের প্রয়োজন হয়। বহু বিদ্যালয়ের পক্ষে এই খরচ করার মতো আর্থিক সামর্থ্য থাকে না।

(৪) **উপযুক্ত পরিকাঠামোর অভাব** (Absence of proper infrastructure) : আজও বহু বিদ্যালয়ে দেখা যায় তাদের প্রয়োজনীয় মৌলিক কাঠামোটুকু নেই। পর্যাপ্ত শ্রেণিকক্ষ, চেয়ার, টেবিল ও সাজসরঞ্জামের যথেষ্ট অভাব দেখা যায়। বহুস্থানের বিদ্যালয়ে বিদ্যুৎ-এর সুব্যবস্থা নেই। এই সমস্ত বিদ্যালয়গুলিতে প্রক্ষেপণযোগ্য প্রদীপন (projected teaching aid) ব্যবহার করাও বেশ কঠিন। সুতরাং উপযুক্ত পরিকাঠামোর অভাবে শিক্ষণ প্রদীপনকে কাজে লাগানো সম্ভব হয় না।

(৫) **ভাষাগত বাধা** (Language barrier) : বিভিন্ন সফটওয়্যারগুলি শিক্ষণ প্রদীপন হিসেবে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। এই সমস্ত সফটওয়্যারগুলি, যেমন—বিভিন্ন ফিল্ম, সি.ডি. এবং অডিয়ো ক্যাসেটে প্রধানত ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করা হয়। ফলে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত আঞ্চলিক ভাষার মাধ্যমে পরিচালিত বিদ্যালয়গুলিতে ওই সমস্ত শিক্ষণ প্রদীপনগুলিকে ব্যবহার করা বেশ অসুবিধাজনক হয়ে পড়ে।

Scanned with CamScanner

❑ ৩.৩.৬ শিক্ষণ প্রদীপনের শ্রেণিবিভাগ (Classification of Teaching Aids) :

শিক্ষণ প্রদীপনের চিরাচরিত শ্রেণিবিভাগ (Classification Traditional type of Teaching Aids) : আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলিকে কাজে লাগিয়ে শিক্ষণ প্রদীপনকে আমরা ব্যবহারযোগ্য করে তুলি। আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল চক্ষু এবং কর্ণ। **এই চক্ষু এবং কর্ণ-এর ব্যবহারের ভিত্তিতে শিক্ষণ প্রদীপনকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায়, যেমন :** (১) শ্রবণনির্ভর প্রদীপন, (২) দৃষ্টি নির্ভর প্রদীপন এবং (৩) শ্রবণ ও দৃষ্টিনির্ভর প্রদীপন। শিক্ষণ প্রদীপনের এই শ্রেণিবিভাগকে চিরাচরিত শ্রেণিবিভাগ বলা হয়। **এই ধরনের চিরাচরিত শিক্ষণ প্রদীপনকে নিম্নলিখিতভাবে উপস্থাপিত করতে পারি।**

▲ শ্রবণনির্ভর প্রদীপন :

১. রেডিয়ো
২. টেপরেকর্ডার
৩. লিঙ্গুফোন
৪. সি.ডি
৫. মাইক্রোফোন
৬. ডিক্টাফোন
৭. হেডফোন
৮. গ্রামোফোন

▲ দৃষ্টিনির্ভর প্রদীপন :

১. চকবোর্ড
২. বুলেটিন বোর্ড
৩. চার্ট
৪. চিত্র
৫. পোস্টার
৬. ফটোগ্রাফ
৭. ফ্ল্যাশকার্ড
৮. ফ্লানেলবোর্ড
৯. ফ্লিপবই
১০. অ্যালবাম/স্ক্র্যাপ বই
১১. ম্যাগনেটিক বোর্ড
১২. মানচিত্র
১৩. গ্রাফ বা লেখাচিত্র
১৪. নির্বাক চিত্র
১৫. স্লাইড
১৬. মডেল বা প্রতিরূপ
১৭. এপিডায়াস্কোপ
১৮. ম্যাজিক ল্যান্টার্ন
১৯. ওভারহেড প্রজেক্টর

▲ শ্রবণ-দৃষ্টিনির্ভর প্রদীপন :

১. সবাক চলচ্চিত্র
২. শব্দযুক্ত ফিল্ম স্ট্রিপ
৩. টেলিভিশন
৪. ভিডিয়ো টেপ
৫. কম্পিউটার
৬. ভি.সি.ডি
৭. ডি.ভি.ডি
৮. এল. সি. ডি.

শ্রবণনির্ভর প্রদীপন : শ্রবণ অনুভূতিকে কাজে লাগিয়ে এই ধরনের প্রদীপনের দ্বারা শিক্ষার্থীরা জ্ঞান অর্জন করে।

দৃষ্টিনির্ভর প্রদীপন : দর্শন অনুভূতিকে কাজে লাগিয়ে এই ধরনের প্রদীপনের দ্বারা শিক্ষার্থীরা জ্ঞান অর্জন করে।

শ্রবণ-দৃষ্টি নির্ভর প্রদীপন : শিক্ষার্থীরা যখন শ্রবণ ও দর্শন অনুভূতিকে কাজে লাগিয়ে জ্ঞান অর্জন করে, তখন সেই সমস্ত প্রদীপনকে বলা হয় শ্রবণ-দৃষ্টি নির্ভর প্রদীপন।

২। প্রক্ষেপণের উপর ভিত্তি করে শিক্ষণ প্রদীপনকে দু-ভাগে বিভক্ত করা যায়। যেমন—

(i) প্রক্ষেপণযোগ্য প্রদীপন বা Projected teaching aid

(ii) প্রক্ষেপণযোগ্য নয় এমন প্রদীপন বা Non-projected teaching aid

নীচে টেবিলে প্রক্ষেপণযোগ্য এবং প্রক্ষেপণযোগ্য নয় এমন দৃষ্টিনির্ভর প্রদীপনগুলি দেখানো হল :

প্রক্ষেপণযোগ্য প্রদীপন	প্রক্ষেপণযোগ্য নয় এমন প্রদীপন
১. নির্বাক চলচ্চিত্র। ২. ফিল্ম স্ট্রিপ। ৩. ম্যাজিক ল্যান্টার্ন বা ম্যাজিক লণ্ঠন। ৪. মাইক্রোপ্রোজেকশন। ৫. স্লাইড প্রোজেকশন। ৬. ওপেক এবং ওভারহেড প্রোজেক্টর।	১. বিভিন্ন ধরনের বোর্ড, যেমন—ব্ল্যাকবোর্ড, ফ্লানেলবোর্ড, ম্যাগনেটিকবোর্ড বা চৌম্বক বোর্ড, বুলেটিন বোর্ড, পেগবোর্ড ইত্যাদি। ২. প্রদর্শনযোগ্য সামগ্রী, ফটোগ্রাফ, পোস্টার, মানচিত্র, চার্ট, গ্রাফ বা লেখাচিত্র, রেখাচিত্র, সময় সারণি ইত্যাদি। ৩. মডেল বা প্রতিরূপ, বাস্তববস্তু বা স্পেসিমেন। ৪. বই, ইলাস্ট্রেশন।

৩। গতিশীলতার উপর ভিত্তি করে শিক্ষণ প্রদীপনগুলিকে দু-ভাগে বিভক্ত করা যায় :

(i) স্থিতিশীল প্রদীপন (Static Aids)

(ii) গতিশীল প্রদীপন (Dynamic Aids)

(i) স্থিতিশীল প্রদীপন : শ্রেণিশিক্ষণ চলাকালীন যে সমস্ত প্রদীপনগুলি কোনোরকম সঞ্চালন করে না অর্থাৎ প্রদীপনগুলি স্থির অবস্থায় থাকে, সেই সমস্ত প্রদীপনকে বলা হয় স্থিতিশীল প্রদীপন।

(ii) গতিশীল প্রদীপন : শ্রেণি শিক্ষণ চলাকালীন যে সমস্ত প্রদীপনগুলি সঞ্চালিত হয় অর্থাৎ প্রদীপনগুলি গতিশীল অবস্থায় থাকে, সেই সমস্ত প্রদীপনকে বলা হয় গতিশীল প্রদীপন।

Scanned with CamScanner

স্থিতিশীল ও গতিশীল প্রদীপনের তালিকা :

স্থিতিশীল প্রদীপন	গতিশীল প্রদীপন
১. ফ্ল্যাশ কার্ড ২. চার্ট ৩. স্লাইড্ ৪. OHP, এপিডায়াস্কোপ ৫. মাইক্রোস্কোপ বা অণুবীক্ষণ যন্ত্র	১. ওয়ার্কিং মডেল ২. চলচ্চিত্র ৩. টেলিভিশন বা দূরদর্শন ৪. কম্পিউটার

৪। বস্তুর মাত্রার উপর নির্ভর করে শিক্ষণ-প্রদীপনকে দুইভাগে বিভক্ত করা যায় :

(i) দ্বি-মাত্রিক প্রদীপন (Two Dimensional Aids)

(ii) ত্রি-মাত্রিক প্রদীপন (Three Dimensional Aids)

(i) দ্বি-মাত্রিক প্রদীপন : যে সমস্ত শিক্ষণ প্রদীপন দুটি মাত্রা বিশিষ্ট যেমন—দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ বিশিষ্ট অথবা দৈর্ঘ্য ও উচ্চতা দৃষ্টিগ্রাহ্য, সেইসমস্ত প্রদীপনগুলিকে বলা হয় দ্বি-মাত্রিক প্রদীপন।

(ii) ত্রি-মাত্রিক প্রদীপন : যে সমস্ত শিক্ষণ প্রদীপনের তিনটি মাত্রাই দেখা যায় যেমন—দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা; তাদের ত্রিমাত্রিক প্রদীপন বলা হয়।

দ্বি-মাত্রাবিশিষ্ট ও ত্রি-মাত্রাবিশিষ্ট প্রদীপনের তালিকা :

দ্বি-মাত্রিক প্রদীপন	ত্রি-মাত্রিক প্রদীপন
চার্ট, চিত্র, ফটোগ্রাফ, গ্রাফ, মানচিত্র, বিভিন্ন ধরনের বোর্ড	মডেল, গ্লোব, বাস্তব বস্তু, পুতুল, স্পেসিমেন

৫। এন. সি. ই. আর. টি নির্ধারিত শিক্ষণ প্রদীপনের শ্রেণিবিভাগ—ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশনাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং সংক্ষেপে NCERT তাদের বুলেটিনে শিক্ষণ প্রদীপনকে ছ-টি ভাগে বিভক্ত করেছেন। সেগুলি হল—

(i) প্রক্ষেপণযোগ্য প্রদীপন (Projected Aids)
(ii) গ্রাফিক বা চিত্রণ সম্বন্ধীয় প্রদীপন (Graphic Aids)
(iii) প্রদর্শনী বোর্ডস (Display Boards)
(iv) ত্রি-মাত্রিক প্রদীপন (3-Dimensional Aids)
(v) শ্রবণ-নির্ভর প্রদীপন (Audio Aids)
(vi) সক্রিয়তাধর্মী প্রদীপন (Activity Aids)

→ প্রক্ষেপণযোগ্য নয় এমন প্রদীপন (Non Projected Aids)

নিম্নে NCERT নির্ধারিত শ্রেণিবিভাগের প্রতিটি ক্ষেত্রে শিক্ষণ প্রদীপনগুলিকে তালিকাবদ্ধ করে দেখানো হল :

NCERT নির্ধারিত শ্রেণিবিভাগে তালিকা বদ্ধ প্রদীপন

প্রক্ষেপণযোগ্য প্রদীপন	প্রক্ষেপণযোগ্য নয় এমন প্রদীপন				
	চিত্রণ সম্বন্ধীয় বা গ্রাফিক প্রদীপন	প্রদর্শণীবোর্ড ডিস্‌প্লেবোর্ড	ত্রি-মাত্রিক প্রদীপন	শ্রবণ নির্ভর প্রদীপন	সক্রিয়তা ধর্মী প্রদীপন
১. ফিল্‌ম	১. কার্টুন	১. ব্ল্যাকবোর্ড	১. প্রতিরূপ বা মডেল	১. রেডিয়ো বা বেতার	১. প্রদর্শন বা ডেমনস্ট্রেশন
২. ফিল্‌ম স্ট্রিপ	২. চার্ট	২. বুলেটিন বোর্ড	২. প্রকল্পিত যন্ত্রাদির মডেল	২. টেপ-রেকর্ডার	২. নাটকীয়-ভঙ্গি বা ড্রামাটিক্‌স
৩. ওপেক প্রোজেক্টর	৩. কমিক্‌স	৩. ফ্লানেল বোর্ড	৩. বস্তু	৩. দূরদর্শন	৩. পরীক্ষণ বা এক্সপেরিমেন্ট
৪. ওভারহেড প্রোজেক্টর (O.H.P)	৪. রেখাচিত্র বা ডায়াগ্রাম	৪. চৌম্বক বোর্ড বা ম্যাগনেটিক বোর্ড	৪.ননুনাবস্তু বা স্পেসিমেন	৪. ফিলম্-ট্রিপস	৪. কম্পি-উটার সহায়ক নির্দেশনা (CAI)
৫. স্লাইড	৫. ফ্ল্যাশকার্ড	৫. পেগবোর্ড	৫. পুতুল		৫. পরিক-ল্পিত নির্দে-শনা বা প্রোগ্রাম্‌ড ইনস্ট্রাকশন
	৬. লেখচিত্র বা গ্রাফ				৬. শিক্ষণ যন্ত্র বা টিচিং মেশিন
	৭. মানচিত্র				
	৮. ফটোগ্রাফ				
	৯. ছবি				
	১০. পোস্টার				

Scanned with CamScanner

প্রক্ষেপণযোগ্য প্রদীপন এবং প্রক্ষেপণযোগ্য নয় এমন প্রদীপনের পার্থক্য

প্রক্ষেপণযোগ্য প্রদীপন	প্রক্ষেপণযোগ্য নয় এমন প্রদীপন
১. এই ধরনের প্রদীপন দৃষ্টিগ্রাহ্য বিষয়কে স্ক্রিন বা পর্দার উপর প্রক্ষেপিত করে।	১. এই ধরনের প্রদীপনগুলির দৃষ্টিগ্রাহ্য বিষয়কে প্রক্ষেপিত করার দরকার হয় না।
২. দৃষ্টিগ্রাহ্য বিষয়কে প্রক্ষেপিত করার জন্য অন্ধকার কক্ষ, বিদ্যুৎশক্তি, স্ক্রিন বা পর্দা ইত্যাদি অতিরিক্ত বস্তুর প্রয়োজন হয়।	২. বিদ্যুৎশক্তি, স্ক্রিন বা পর্দা, অন্ধকার কক্ষ প্রভৃতি কোনো অতিরিক্ত কিছুর দরকার হয় না।
৩. এই ধরনের প্রদীপন বেশ শক্তপোক্ত এবং সহজে স্থানান্তরিত করা যায়।	৩. এই ধরনের প্রদীপন নরম ও দুর্বল প্রকৃতির। কিছু সূক্ষ্মও হয় কোনো কোনো ক্ষেত্রে। স্থানান্তরিত করতে অসুবিধা হয়।
৪. এগুলিকে ব্যবহার করতে প্রযুক্তিগত দক্ষতার প্রয়োজন হয়।	৪. এগুলি ব্যবহার করতে প্রযুক্তিগত দক্ষতার দরকার হয় না। শুধুমাত্র অভিজ্ঞতা থাকলেই হয়।
৫. শুধুমাত্র দৃষ্টিনির্ভর প্রদীপন যেগুলি দ্বি-মাত্রিক প্রকৃতির সেগুলি প্রক্ষেপিত হয়।	৫. দ্বি-মাত্রিক এবং ত্রি-মাত্রিক উভয় প্রকার শিক্ষণ প্রদীপন ব্যবহার করা যায়।
৬. এই প্রদীপনগুলি তুলনামূলকভাবে বেশ দামি এবং তৈরি করা খুব কঠিন। সুতরাং এই প্রদীপনগুলি ব্যবহার করা বেশ খরচ সাপেক্ষ।	৬. তুলনামূলকভাবে কম দামি বা সস্তা এবং কেনা সম্ভব। এগুলিকে নিজের হাতে তৈরি করা সম্ভব।

❑ ৩.৩.৭ কিছু শিক্ষণ প্রদীপনের বিবরণ (Description of some Teaching Aids) :

❖ ৩.৩.৭.১ বেতার (Radio) :

বেতার যেমন জনসমাজে গণমাধ্যম, তেমনই শিক্ষকের শ্রেণিকক্ষে সেটি শ্রবণনির্ভর একটি উল্লেখযোগ্য প্রদীপন। মার্কিনযুক্তরাষ্ট্রে **পিট্‌স বার্গ শহরে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে ২ নভেম্বর** প্রথম বেতার সম্প্রচার শুরু হয়। ভারতে বেতার সম্প্রচার শুরু হয় **বোম্বাইতে ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে।** বোম্বাইতে প্রথম বেতারকেন্দ্র চালু হয় **১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের ২৩ জুলাই। ইন্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানি** কলকাতায় চালু করেন তাদের দ্বিতীয় কেন্দ্রটির **১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের ২৬ আগস্ট।** সরকারি পরিচালনায় পরে এই কোম্পানিটির নাম হয় **ইন্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং সার্ভিস।** ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে বেতার সম্প্রচার ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো হয়। এর **পরেও নাম পরিবর্তন হয় এবং নাম হয় অল ইন্ডিয়া রেডিয়ো** (AIR)। ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে বেতার

dascoaching.in

সম্প্রচার কেন্দ্রের সংখ্যা একশো ছাড়িয়ে গেছে। ২০০৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মোট ২০টি ভাষায় এবং ১৪৬টি উপভাষায় দৈনিক ১৬০০ ঘণ্টা বেতার অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছে।

বেতার বর্তমানে ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করছে। সামাজিক শিক্ষা, বিদ্যালয় শিক্ষা, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা সর্বত্র তার ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। প্রথাহীন, প্রথাগত ও প্রথামুক্ত সব ধরনের শিক্ষাব্যবস্থায় তার বিচরণ। বেতারের এই গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে **জর্জ ওয়াটসন** (George Watson) বলেন, "Radio is not an addition to education, Radio is not something to be placed on top of education, Rather, radio is education."

রেনল্ডস, আর. জি. (Renolds, R.G.) লিখেছেন, "Radio is the most significant medium for education in its broadest sense that has been introduced since the begining of the 20th century. As a supplement to class teaching, its possibilities are almost unlimited. ....."

(ক) বেতারের সাধারণ গুরুত্ব (General Importance of Radio) :

(i) **সাম্প্রতিক ঘটনার সম্প্রচার :** বেতার আমাদের সারা পৃথিবীর সাম্প্রতিক সংবাদকে এনে হাজির করে। বেতারের সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানগুলি মানুষকে যেমন সাম্প্রতিক ঘটনার পরিচিতি দান করে তেমনই মানুষের কৌতূহলের নিবৃত্তি ঘটিয়ে সারা পৃথিবীর নানা দেশ বিদেশের ভালোমন্দ সম্পর্কে অবহিত করে বিচারবুদ্ধিকে সজাগ করে তোলে। বেতার সম্প্রচারে মন দিলেই কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে আমাদের পৌঁছে দেয় পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে।

(ii) **বাস্তব সম্মত অনুষ্ঠান সম্প্রচার :** বেতারের মাধ্যমে যে সব অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হয়, তা অতীব বাস্তবসম্মত। মানুষের অন্তরের সঙ্গে সহজেই তা সংযোগ ঘটাতে সক্ষম। বেতারের সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানগুলি শুনতে শুনতে শ্রোতার মধ্যে বাস্তবধর্মী অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র প্রশস্ত হয়। পারিবারিক জীবন থেকে জীবনের বহু ক্ষেত্রের সঙ্গে সাদৃশ্য খুঁজে পায় বলে মানুষের নিকট সহজেই গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে।

(iii) **সমাজ সচেতনকারী অনুষ্ঠান সম্প্রচার :** বেতার-এর মাধ্যমে এমন কিছু অনুষ্ঠান সম্প্রচার হয় যেগুলি ব্যক্তিকে সমাজ সচেতন হতে সহায়তা করে। সমাজ পরিবর্তনের জন্য দরকারি বিষয়গুলি মানুষের সামনে তুলে ধরে সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে মানুষকে উৎসাহিত করে। সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করতে বিভিন্ন কথিকা, সমীক্ষা, আলোচনামূলক অনুষ্ঠান, নাটক প্রভৃতি সম্প্রচারিত হয়। এই সমস্ত অনুষ্ঠানগুলি অংশগ্রহণ করেন সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞগণ।

(iv) **চিত্ত বিনোদন :** বেতার চিত্ত বিনোদনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। আবার এই বিনোদনের মধ্য দিয়ে উন্নয়নের বার্তাকে সাধারণ জন-জীবনের নিকট স্বচ্ছন্দে পৌঁছে দেওয়া

Scanned with CamScanner

যায়। বিভিন্ন লোক সংগীত, যাত্রাপালা, কবিগান, নাটক ইত্যাদির মাধ্যমে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গে মানুষকে যেমন আনন্দ দেয়, তেমনই উন্নয়ন-এর সম্পর্কে অবহিত করে।

(খ) বেতারের শিক্ষামূলক গুরুত্ব (Educational Importance of Radio) :

(i) বেতারের মাধ্যমে অনেক সময় বক্তৃতা, কথোপকথন, আলোচনা, সেমিনার প্রভৃতি সম্প্রচারিত হয়। এইসব অনুষ্ঠান সম্প্রচারের ক্ষেত্রে অংশ নিয়ে থাকেন বিভিন্ন বিখ্যাত সব লেখক, শিক্ষাবিদ, গবেষক এবং অন্যান্য ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষ। শিক্ষার্থীদের নিকট উপরোক্ত অনুষ্ঠানগুলির যেমন শিক্ষাগত গুরুত্ব যথেষ্ট তেমনই মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে সেগুলি অনেকখানি মূল্যবান।

(ii) নির্দিষ্ট পরিকল্পনা এবং সুবিন্যস্ত ব্যবস্থাপনার দ্বারা বেতারের সম্প্রচার শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের সময়ও যথেষ্ট কার্যকরী। বিদ্যালয়ে পাঠ্যবিষয়ের অন্তর্গত বিভিন্ন বিষয়বস্তু (topic) প্রথিতযশা সব শিক্ষকদের দ্বারা যখন সম্প্রচারিত হয়, তখন তার প্রভাবে বহু শিক্ষার্থী অনুপ্রাণিত এবং উৎসাহিত হয়। এতে শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা পেয়ে থাকেন।

(iii) বেতারের সম্প্রচারিত বহু অনুষ্ঠান শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবনের সঙ্গে বাস্তবজীবনের একটি সমন্বয় গড়ে তোলে। এতে শিক্ষার্থীদের নিকট যেমন বাস্তবধর্মী শিক্ষালাভের সুযোগ হয় তেমনই সুস্থ চিত্তবিনোদন তাদের আনন্দ দান করে। বেতারের মাধ্যমে তখন বাস্তবধর্মী শিক্ষাদান যথার্থভাবে কার্যকরী হয়ে ওঠে শিক্ষার্থীদের নিকট।

(iv) বেতার সম্প্রচারের মাধ্যমে বর্তমানে শিক্ষার্থীরা প্রথাহীন, প্রথাগত এবং প্রথামুক্ত শিক্ষার সুযোগ পায়। প্রথাহীন শিক্ষা পাওয়া যায় বিভিন্ন আলোচনা, বক্তৃতা, কথিকা প্রভৃতি থেকে। প্রথাগত শিক্ষা পাওয়া যায়, কোনো একজন বিশেষজ্ঞ শিক্ষকের কাছ থেকেই। বর্তমানে স্টুডিয়োতে বিখ্যাত শিক্ষকের সঙ্গে দু-তিনজন শিক্ষার্থীকে নিয়ে প্রথাগত শিক্ষার কোনো বিষয়ের পাঠ্যক্রমের অন্তর্গত বিষয় আলোচনা করা হয়। এইসব আলোচনা যখন শিক্ষার্থীরা শোনে তখন তাদের প্রথাগত শিক্ষার পাঠও অর্জিত হয়ে যায়। আবার এমন কিছু অনুষ্ঠান আছে যেগুলি প্রথামুক্ত শিক্ষার অঙ্গ, যেমন কম্পিউটারের ওপর কোনো আলোচনা শিক্ষার্থীর কম্পিউটারের জ্ঞানকে বৃদ্ধি করে তোলে।

(v) আধুনিক চাহিদা নির্ভর শিক্ষালাভের ক্ষেত্রেও বেতারের সম্প্রচার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। বর্তমান যুগের বিজ্ঞান-প্রযুক্তির জগতে যে সব নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হচ্ছে, প্রথামুক্ত শিক্ষায় তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়। এমনকি শিক্ষার্থীদের সামাজিক চাহিদা নির্ভর কিছু কিছু প্রশিক্ষণও প্রথামুক্ত শিক্ষায় দেওয়া হয়, যা অনেক ক্ষেত্রে বেতার সম্প্রচারের দ্বারা সম্ভব হয়।

(vi) একথা ঠিক যে ভালো পাঠ্যবই, সুপরিকল্পিত নির্দেশনা প্রোগ্রাম, উপযুক্ত নির্দেশনামূলক যন্ত্র ও উপকরণের প্রাচুর্য এবং সর্বোপরি দক্ষ শিক্ষকের অভাব আজকের দিনে আছে। অথচ শিক্ষার্থীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। নির্দেশনার কোর্স ক্রমশ বিস্তারলাভ করেই চলেছে। এই অবস্থায় শিক্ষার্থীদের সুবিধার কথা চিন্তা করে তাদের ক্ষমতা ও চাহিদা অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা করা অসম্ভব। সুতরাং এই পরিস্থিতিতে সমস্যার সমাধান করতে পারে বেতার সম্প্রচারের মতো আধুনিক ব্যবস্থাই।

(গ) শ্রেণিকক্ষে বেতার সম্প্রচারকে ব্যবহার :

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষা নির্দেশনায় AIR বা **অল ইন্ডিয়া রেডিয়ো** এবং অন্যান্য বেতার চ্যানেল শ্রেণিকক্ষে নির্দেশনার ক্ষেত্রে মূল্যবান সহায়তা দান করতে পারে। প্রয়োজন এবং চাহিদা অনুযায়ী সেগুলিকে যত্ন সহকারে শ্রেণিকক্ষে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে শিক্ষকের বিশেষ ভূমিকা আছে। সংক্ষেপে সেগুলিকে নিম্নে উল্লেখ করা হল :

(i) বেতারের মাধ্যমে শিক্ষার সঙ্গে প্রসাঙ্গিক যে বিষয়টি সম্প্রচারিত হবে তার ভাষা, কথা, বিষয়-বিন্যাস এবং সম্প্রচারের সময় ও অনুশীলনসূচি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকতে হবে।

(ii) শিক্ষক অবশ্যই তাঁর শ্রেণি শিক্ষণের সঙ্গে নির্ধারিত বেতার সম্প্রচারের অনুষ্ঠানের সমন্বয় ঘটাবার জন্য চিন্তাভাবনা ও পরিকল্পনা করবেন।

(iii) বেতার সম্প্রচারের যে অনুষ্ঠান শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানমূলক বিকাশ তথা অভিজ্ঞতা প্রদানের কমিটি করবে, সেই অনুষ্ঠানে বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের পরিচিতি ঘটানো দরকার। শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগত দিক থেকে প্রয়োজন এবং মানসিকতা বা দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে কতটা উপযুক্ত তাও শিক্ষককে ভেবে দেখতে হবে এবং সেই অনুসারে তাদের শিক্ষাগত ও মনস্তাত্ত্বিক প্রস্তুতি তৈরি করবেন। যে পরিবেশে বেতার সম্প্রচার করা হবে, সেই পরিবেশ পরিস্থিতিতে শিক্ষকের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকা দরকার। শ্রেণিকক্ষের প্রাকৃতিক পরিবেশগত অবস্থা, শিখন উপযোগী পরিবেশ এমন হওয়া দরকার যেখানে বেতার সম্প্রচারকে সঠিকভাবে ব্যবহার করা যায়। রেডিয়ো সেটটি এমন স্থানে রাখতে হবে যেখান থেকে উৎপন্ন শব্দ, কথা প্রভৃতি শ্রেণিকক্ষের সমস্ত শিক্ষার্থীরাই স্বচ্ছন্দে এবং পরিষ্কারভাবে শুনতে পায়। শ্রেণিকক্ষের বাইরের চারপাশের পরিবেশ যেন কোনোভাবেই অসুবিধা সৃষ্টি না করে তার প্রতি লক্ষ রাখা শিক্ষকের অতি প্রয়োজনীয় কর্তব্য।

❖ ৩.৩.৭.২ টেপ-রেকর্ডার (Tape Recorder) :

শ্রুতিনির্ভর অন্য আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রদীপন হল টেপ-রেকর্ডার। টেপ-রেকর্ডার মূলত তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত। মাইক্রোফোন, অ্যাম্প্লিফায়ার এবং রিপ্রোডিউসার। দুটি প্রধান প্রক্রিয়ায় এটি কার্য করে, যেমন— রেকর্ডিং এবং শব্দ উৎপাদন। এই টেপ-রেকর্ডারকে শিক্ষক শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিতভাবে ব্যবহার করতে পারেন।

Scanned with CamScanner

(i) সংগীত, নাটক, আবৃত্তি, ভাষা শিখনের ক্ষেত্রে টেপ-রেকর্ডার-এর শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ উপযোগিতা আছে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিক্ষক উপযুক্তভাবে ব্যবহার করতে পারলে শিক্ষার্থীর শিখন সাফল্যলাভ করে।

(ii) যে সমস্ত শিক্ষার্থীর খুব কম কথা বলার অভ্যাস থাকে তাদের কথা বলার মধ্যে স্বাচ্ছন্দ্য আনা এবং কথা বলার অভ্যাসটিতে অনুশীলনের সুযোগ দেওয়া যায়। আবার কিছু শিক্ষার্থী আছে যাদের কথা বলার ক্ষেত্রে ত্রুটি থাকে, ঠিকমতো কথা বলতে পারে না অথবা উচ্চারণে বেশ কিছু ত্রুটি থাকে। এই সমস্ত ত্রুটি দূর করার ক্ষেত্রে টেপ-রেকর্ডারকে কাজে লাগাতে পারেন শিক্ষক।

(iii) নাটকের মতো বিষয় কথাবার্তার দক্ষতা, প্রকাশ ক্ষমতা, কথা বলার কৌশল ও ধরনের বিকাশ ঘটাতে টেপ-রেকর্ডার যথেষ্ট কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে।

(iv) কোনো বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির একটি বিশেষ বিষয়ে বক্তৃতা কিংবা আলোচনা রেকর্ড করে পরে সেটিকে শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপিত করে প্রয়োজন মতো শিক্ষার্থীদের সহায়তা করতে পারেন শিক্ষক। এতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয় পক্ষই সমৃদ্ধ হওয়ার সুযোগ লাভ করে।

(v) রেকর্ড করা কোনো বিষয় যেমন শিক্ষার্থীদের সামনে বারংবার উপস্থাপন করে বিষয়ের প্রতি শিক্ষার্থীদের গভীরে যেতে সাহায্য করে তেমনই আলোচিত অংশগুলিকে ফিরে ফিরে শিক্ষার্থীদের উপলব্ধিতে শিক্ষক পুনরাবৃত্তি ঘটাতে পারেন।

(vi) শিক্ষার্থীদের নিজেদের বক্তব্যের কথা, শব্দ ব্যবহার, উপকরণ রীতি, মুদ্রাদোষ সবকিছু বিশ্লেষণ করে সংশোধনের সুযোগ পায়।

(vii) অনেক সময় শিক্ষার্থীদের কোনো সেমিনার, ওয়ার্কশপ, কনফারেন্স-এ হাজির করানো হয় কিন্তু অনুষ্ঠান চলাকালীন সবকিছু তাদের উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না; পরবর্তীকালে সেগুলির রেকর্ড শিক্ষার্থীদের শোনার সুযোগ দিলে তারা যেমন উৎসাহিত হয়, তেমনই পুনরাবৃত্তিতে আলোচনার সুযোগ পায়।

(viii) শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের আচরণ ধারাকে অনেক সময় রেকর্ড করে তাদের আচরণ ধারা বিশ্লেষণ ও সংশোধন-এর সুযোগ থাকে।

(ix) শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে যেভাবে শিক্ষণের কার্য-পরিচালনা করলেন তার রেকর্ডিং করা থাকলে শিক্ষক নিজের কাজের বিচারবিশ্লেষণ করে মূল্যায়নের সুযোগ পান, যা ভবিষ্যতে শিক্ষার্থীদেরই উপকারে আসে।

❖ ৩.৩.৭.৩ গ্রামোফোন (Gramophone) :

শ্রবণমূলক শিক্ষণপ্রদীপণ হিসেবে অন্যতম উল্লেখযোগ্য যান্ত্রিক ব্যবস্থাটি হল গ্রামোফোন। গ্রামোফোনে ব্যবহার হয় একটি পরিপূরক উপাদান হিসেবে 'রেকর্ড' নামে বস্তুটি। শিক্ষাক্ষেত্রে

এটিও যথেষ্ট কার্যকরী ক্ষমতা রাখে। শিক্ষণীয় বিষয় এর উপর বেশ কিছু রেকর্ড প্রস্তুত করা হলে বিখ্যাত ব্যক্তিদের কণ্ঠস্বর, শিল্পীকণ্ঠের সঙ্গীত, আবৃত্তিকারের আবৃত্তি, বক্তৃতাদানকারী খ্যাতনামা ব্যক্তির বক্তৃতাকে শিক্ষার্থীদের নিকট প্রাসঙ্গিক ও পরিস্থিতি অনুসারে উপস্থাপিত করতে পারলে শিক্ষার্থীদের নিকট শিখনের বিষয়বস্তু সহজ ও স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে। বিখ্যাত ব্যক্তিত্বদের সম্পর্কে এবং তাঁদের জীবন ও কর্মপদ্ধতির সঙ্গে শিক্ষার্থীরা পরিচিত হওয়ার সুযোগ পায়। গ্রামোফোনের সাহায্যে এইভাবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আগ্রহ ও প্রেষণা সঞ্চার করা যায়। যেমন— স্বামী বিবেকানন্দের নিজের কণ্ঠস্বর এ শিক্ষার তাৎপর্য, শিক্ষাসম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য তাঁর নিজের কণ্ঠস্বরে যদি শিক্ষার্থীদের নিকট তুলে ধরা যায় তাহলে তার গুরুত্ব অনেকখানি। এইভাবে গ্রামোফোনকে শ্রেণি শিক্ষণে শিক্ষক ব্যবহার করে শিক্ষণের কাজকে ত্বরান্বিত করতে পারেন। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলিতে শিক্ষণ প্রদীপন হিসেবে গ্রামোফোনকে ভাষা শিক্ষায় উচ্চারণভঙ্গি, সঙ্গীত শিক্ষায় সঙ্গীতের সুর, তাল কিংবা সাহিত্য শিক্ষায় রসবোধ, হাস্যরস, করুনরস, বীররস সঞ্চার করে শিক্ষণকার্যকে যথার্থ সফল করে তোলার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশে শিক্ষণ প্রদীপন হিসাবে গ্রামোফোনের ব্যবহার কম। তাছাড়া পর্যাপ্ত শিক্ষামূলক রেকর্ড এর অভাবও আছে।

(ক) গ্রামোফোন কী এবং কেন (What and why Gramophone) :

প্রকৃতপক্ষে গ্রামোফোন একটি বাণিজ্যিক নাম। এটি প্রকৃতপক্ষে একটি রেকর্ড বাজানোর জন্য যন্ত্র। ১৮৮৭ সনের ৮ই নভেম্বর এমিল বারলাইনার প্রথম গ্রামোফোন পেটেন্ট করেন। তিনিই প্রথম সিলিণ্ডারের বদলে পাতলা ডিস্কের উপর রেকর্ড করার পদ্ধতি বার করেন।

প্রথম রেকর্ড করা হয় কাঁচের উপর; পরবর্তীকালে দস্তা এবং বর্তমানে প্লাস্টিকের উপর রেকর্ড করার ব্যবস্থা করা হয়।

শিক্ষা সাহায্যকারী উপাদান হিসাবে গ্রামোফোন কতটা ব্যবহার করা যায় তা আলোচনার আগে জানা দরকার শিক্ষা সাহায্যকারী উপাদান ব্যবহারের নীতি ও কৌশল। মরিশ, পি. মোকার্ট একজন বিখ্যাত শিক্ষাবিদ। তিনি যে নীতিগুলি উল্লেখ করেছেন তা হল :

উদ্দেশ্যের নীতি— অর্থাৎ কী কাজে ব্যবহার হবে। গ্রামোফোন এক্ষেত্রে শোনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করতে পারে।

উপায়ের নীতি— অর্থাৎ কী উপায়ে ব্যবহার করা যাবে। গ্রামোফোনের মাধ্যমে ব্যবহৃত বিষয় একাধিকবার ব্যবহার করে শেখানো যেতে পারে।

নির্বাচনের নীতি— অনেকগুলি শিখন সাহায্যকারী উপাদানের মধ্যে গ্রামোফোন নির্বাচন করার ক্ষেত্রে অসুবিধা কম, খরচ কম এবং ব্যবহার সহজ।

কার্যকারীতার নীতি— অনেক মাধ্যমের মত গ্রামোফোনও শিক্ষণের ক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে।

Scanned with CamScanner

উদ্দীপকের নীতি— গ্রামোফোন একটি উদ্দীপক হিসাবে শিক্ষণের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে।

কাজেই ঐ সমস্ত দিক বিবেচনা করে গ্রামোফোনকে একটি শিক্ষণ মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা যায়। কিন্তু বর্তমানে তথ্য-প্রযুক্তির ক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটেছে; ফলে গ্রামোফোনের ব্যবহার ক্রমেই কমে আসছে। তবে নানা রকম আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে গ্রামোফোনেরও নানা পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব হয়েছে।

(খ) **গ্রামোফোন ব্যবহারের সুবিধা :** গ্রামোফোন নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যায় :

- সঙ্গীত, নাটক এবং ভাষাশিক্ষা মত বিষয় শিক্ষণের কাজে ব্যবহার করা যায়;
- ভাষার উচ্চারণের ত্রুটি বা সঙ্গীত শিক্ষার ত্রুটি দূর করার জন্যও ব্যবহার করা যায়;
- কথা বার্তা বলার দক্ষতা বারানোর জন্য এটি ব্যবহার করা যায়;
- এমন কি শিক্ষণ শিখন মূল্যায়ণের জন্যও ব্যবহার করা যায়;
- বিভিন্ন সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলির সংগঠন এবং মূল্যায়ন করার জন্যও গ্রামোফোন ব্যবহার করা যায়;
- শিক্ষামূলক বিষয়কে রেকর্ড করে শিক্ষণের কাজে ব্যবহার করা যায়;
- রেডিও, টেলিভিশণের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামোফোনকেও শিক্ষণেরকাজে ব্যবহার করা যাবে;
- আচরণ পরিবর্তনের জন্য শ্রেণিকক্ষের প্রয়োজন মত বিষয়বস্তু প্রস্তুত করা যেতে পারে।

❖ ৩.৩.৭.৪ চার্ট (Chart) :

শ্রেণিশিক্ষণে চার্ট একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টিনির্ভর প্রদীপন। এডগার ডেলের মতে, পাঠ্য বিষয়বস্তুর মূল বক্তব্যকে শিক্ষার্থীর নিকট স্পষ্ট করে তোলার জন্য দৃষ্টিমূলক যে কৌশল অবলম্বন করা হয় তাকে চার্ট বলা যায়। **Wittich** এবং **Schuller**, ১৯৫৩ চার্টকে ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে "As a combination of graphic and pictorial media designed for the orderly and logical visualizing of relationship between key facts or ideas."

- **শিক্ষাক্ষেত্রে চার্টের গুরুত্ব (Importance of Chart in education) :**

(i) বিভিন্ন ধরনের সম্পর্ক বোঝাতে যেমন তুলনা, আপেক্ষিক পরিমাণ, উন্নয়ন পদ্ধতিসমূহ, শ্রেণিবিন্যাস এবং ঘটনা, ছক, পরিসংখ্যান প্রভৃতি উপলব্ধি করাতে চার্ট ব্যবহৃত হয়।

(ii) সংক্ষেপে তথ্য পরিবেশনে চার্ট সহযোগী ভূমিকা পালন করে।

(iii) বিমূর্ত ভাব বা ধারণাকে পরিবেশন করতে অনেক সময় চার্টের সাহায্য নিতে হয়।

(iv) কোনো জটিল শব্দ বা বাক্যের দ্রুত অর্থ উপলব্ধিতে বা ব্যাখ্যাকরণে চার্ট বিশেষভাবে সহায়ক।

(v) চিন্তন প্রক্রিয়াকে একটি নির্দিষ্ট রীতিতে অগ্রসর করতে এবং বুদ্ধিদীপ্ত উপলব্ধির ক্ষেত্রে চার্ট সহযোগিতা করে।

(vi) শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ এবং প্রেষণা সঞ্চারের ক্ষেত্রেও চার্ট বিশেষভাবে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে।

চার্ট বিভিন্ন ধরনের হতে পারে যেমন বৃক্ষচার্ট (tree chart), সময় চার্ট (time chart), প্রবাহ বা ধারাবাহিক চার্ট (flow chart), তালিকা চার্ট (table chart), বিষয় বা সমস্যা চার্ট (issue chart), চিত্রযুক্ত চার্ট (pictorial chart) ও বৃত্তীয় চার্ট (pie chart)।

❖ ৩.৩.৭.৫ মডেল (Model) :

প্রকৃত বস্তুর বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হয় মডেল (model) প্রকৃত বস্তুর ত্রিমাত্রিক প্রতিরূপ হল মডেল। **মঙ্গল ও মঙ্গল** তাঁদের 'Essentials of Educational Technology' নামক গ্রন্থে মডেলের সংজ্ঞা হিসেবে বলেছেন "models can be defined as a replica, imitation or copy of the real things or objects with a suitable change in size, complexity, timing, safety and cost factors for carrying out the desired instructional purpose."

মডেল বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে। শ্রেণিশিক্ষণে প্রয়োজন ও চাহিদা অনুসারে কখনো প্রকৃত বস্তুর সমান মাপের হতে পারে যেমন—একটি ব্যাটারির মডেল; প্রকৃত বস্তু অপেক্ষা বড়ো আকারের যেমন—বিভিন্ন কীট-পতঙ্গ, ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস প্রভৃতি; ছোটো আকারের হতে পারে যেমন—বিভিন্ন বাড়ি, গাড়ি, পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদি। মডেল হতে পারে কঠিন, ফাঁপা, আবার বাহ্যিক রূপ মাত্র। কোনো জীবজন্তুর দেহাভ্যন্তরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছাড়াই বাইরের কাঠামোটি মডেল হিসেবে ব্যবহৃত হলে তাকে বলা হয় 'scale model', আবার মানব দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রস্থচ্ছেদ দেখানোর জন্য মডেল প্রস্তুত করা হয়। যেমন—চোখ, কান, হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, মস্তিষ্ক ইত্যাদির মডেল। আবার (ডায়নামো), জলের পাম্প, আগ্নেয়গিরি ইত্যাদিরও মডেল হতে পারে।

- **শিক্ষণ প্রদীপন হিসেবে মডেলের গুরুত্ব :**

(i) শ্রেণিশিক্ষণে অনেক সময় এমন পরিস্থিতি তৈরি হয় যেখানে শিক্ষণকার্যে প্রকৃত বস্তু ও তার কার্যকারিতাকে ছবি, চার্ট-এর সাহায্যে বোঝানো যায় না আবার প্রকৃত বস্তুটিকে শ্রেণিকক্ষে হাজিরও করানো যায় না। সেক্ষেত্রে কার্যকরী মডেল প্রদর্শনের মাধ্যমে শিক্ষণকে সার্থক করে তোলা যায়। যেমন—চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ-এর ঘটনা, পৃথিবীতে দিনরাত্রির ঘটনা, আগ্নেয়গিরির ঘটনা ইত্যাদি।

Scanned with CamScanner

(ii) প্রকৃত বস্তুকে শ্রেণিকক্ষে হাজির করানো যায় না আরও একটি কারণে। কখনো সেটি আকারে বিশাল আবার কখনো সেটি আকারে ক্ষুদ্র। উভয় ক্ষেত্রটিতে শিক্ষক তার শিক্ষণের কাজকে সফল ও শিক্ষার্থীদের শিখনে সাহায্য করার জন্য শ্রেণিকক্ষে হাজির করেন। প্রকৃত বস্তুর ছোটো প্রতিরূপ যেমন—পৃথিবীর গঠন বোঝাবার জন্য পৃথিবীর মডেল এবং প্রকৃত বস্তুর বড়ো প্রতিরূপ যেমন— কীট-পতঙ্গের মডেল।

(iii) শ্রেণিকক্ষে এমন পরিস্থিতিও সৃষ্টি হয় যখন কোনো একটি বিষয়ের প্রকৃত ঘটনা বস্তু সামগ্রী, ফলাফল কখনোই উপস্থাপিত করা যায় না, বিশেষ করে অতীতের বিভিন্ন ঘটনা, সভ্যতা বিকাশের ধারা, অতীতের মানুষের পোশাক পরিচ্ছদ, জীবনযাপন প্রণালী, বিভিন্ন ব্যক্তি, মহাপুরুষ সম্পর্কের বিষয়বস্তুকে সহজবোধ্য করে তোলার ক্ষেত্রে মডেল বিশেষভাবে কার্যকরী।

(iv) দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারা আলোচনা পর্বে শিক্ষককে অনেক সময় প্রকৃত বস্তুর পরিবর্তে মডেল ব্যবহার করতে হয় যেমন— কোনারকের সূর্যমন্দির, মীনাক্ষীমন্দির, কুতুবমিনার, তাজমহল, বিভিন্ন জলাধার প্রকল্প ইত্যাদি।

(v) প্রকৃত বস্তুর, বিভিন্ন অংশের গঠন, একটি অংশের সঙ্গে অন্য একটি অংশের সম্পর্ক এবং তাদের কার্যকারিতা বোঝানোর ক্ষেত্রেও শিক্ষক মডেল ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিক্ষণকে ফলপ্রসূ করে তোলা যায়। যেমন মানবদেহের জ্ঞানেন্দ্রিয় চোখ, কান, প্রভৃতি, মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ, মানুষের পরিপাক তন্ত্র ইত্যাদি।

❖ ৩.৩.৭.৬ বাস্তব বস্তু/নমুনা (Real object/Specimen) :

শ্রেণিকক্ষে পাঠ-পরিচালনা বা শিক্ষণমূলককার্যে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে বাস্তব বস্তু বা নমুনা। পাঠ্য-বিষয়বস্তুকে বাস্তব বস্তুর উপস্থাপনের দ্বারা শিক্ষার্থীদের শিখনকে অনেক বেশি আকর্ষণীয় এবং প্রকৃত উপলব্ধিতে সাহায্য করা যায়। শিক্ষক নিজেও বেশ স্বচ্ছন্দ অনুভব করেন। ইতিহাস পাঠে মুদ্রা, মুদ্রিত গ্রন্থ, ব্যবহৃত বস্তু কিংবা অস্ত্র ইত্যাদি; ভূগোল পাঠে মৃত্তিকা, বিভিন্ন প্রকার শিলার অংশ বা খণ্ড; জীববিজ্ঞানে বিভিন্ন জীবজন্তুর Specimen, উদ্ভিদের Specimen; ভৌতবিজ্ঞানে বিভিন্ন যন্ত্র বা যান্ত্রিক অংশ রাসায়নিক বস্তু ইত্যাদি। এই সমস্ত বাস্তব বস্তুর উপস্থাপন বা নমুনা প্রদর্শনের দ্বারা শিক্ষার্থীর বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের গুরুত্ব উপলব্ধিতে প্রেরণা পায়।

❖ ৩.৩.৭.৭ ছবি (Picture) এবং ফটোগ্রাফ (Photograph) :

শিক্ষণ প্রদীপন হিসেবে ছবি বা ফটোগ্রাফের ব্যবহারও বেশ উপযোগী। শিক্ষার্থীর শিখনের ক্ষেত্রে-এর গুরুত্ব এবং আকর্ষণ বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত। বিভিন্ন বিষয়ে ছবির ব্যবহার করা

যেতে পারে। এই ছবিগুলি হতে পারে অঙ্কিত, মুদ্রিত অথবা ক্যামেরার সাহায্যে তোলা। বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত ছবিগুলি শিক্ষার্থীদের বিষয়বস্তুর উপলব্ধিতে যথেষ্ট কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। **শিক্ষার্থীদের সামনে ছবি প্রদর্শনের ক্ষেত্রে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখা দরকার সংশ্লিষ্ট শিক্ষককে। সেগুলি হল :**

(i) ছবি নির্বাচিত হবে শিক্ষার্থীদের দৃষ্টিভঙ্গিতে গ্রহণযোগ্যতার ভিত্তিতে।

(ii) ছবি অবশ্য পাঠ্যবিষয়ের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক হবে।

(iii) যতখানি সম্ভব ছবিতে প্রয়োজন মতো রঙের ব্যবহার থাকা দরকার।

(iv) ছবি হবে যথাযথ, সঠিক এবং উপযুক্ত আকার ও আয়তনের।

(v) শিক্ষক নিজে ছবি এঁকে নিতে পারেন, অথবা শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নিয়ে তাদেরকে নিয়ে আঁকিয়ে নিতে পারেন।

(vi) শিক্ষক নিজে বোর্ডে ছবি এঁকে নিতে পারেন। তবে অবশ্যই শ্রেণির সমস্ত শিক্ষার্থী যেন ভালোভাবে দেখতে পায়।

(vii) প্রসঙ্গ বদলের সঙ্গে সঙ্গে ছবিকে শিক্ষার্থীদের চোখের সামনে থেকে দূরে সরিয়ে নিতে হবে।

(viii) ছবি ও পাঠ্য-বিষয়বস্তুর বর্ণনা সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

(ix) উৎসাহী শিক্ষার্থীদের ছবি আঁকতে উৎসাহিত করতে হবে।

(x) প্রয়োজনে বাড়িতে গৃহ কাজ হিসেবে ছবি আঁকতে দিতে হবে।

(xi) ফটোগ্রাফিতে উৎসাহিত করাও যেতে পারে।

❖ ৩.৩.৭.৮ মানচিত্র (Map) :

শ্রেণিকক্ষের পাঠ-পরিচালনার ক্ষেত্রে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষণমূলক প্রদীপন হল মানচিত্র। ভূগোল, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞানের মতো বিষয়গুলি, কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের মতো বিষয়গুলিতেও মানচিত্র উপযোগী ভূমিকা পালন করে। মানচিত্রকে সামনে রেখে শিক্ষার্থীদের সামনে বক্তব্য রাখলে বা পাঠ্যবিষয় ব্যাখ্যা করলে শিক্ষক সহজেই শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হন। মানচিত্র থেকে অনেকগুলি তথ্য পাওয়া যায়। **Jarolimek এবং পার্কার ১৯৩৩ নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে তথ্য প্রদানের কথা উল্লেখ করেছেন, যেগুলি শিক্ষণ শিখন কার্যে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।**

(i) পৃথিবীর স্থল ও জলভাগ সম্পর্কে ধারণা লাভে মানচিত্র সাহায্য করে। বিভিন্ন মহাদেশ, মহাসাগর, সাগর, হ্রদ, উপসাগর, দ্বীপ, উপদ্বীপ সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়।

(ii) পৃথিবীর বিভিন্ন সমতল ভূমি, পাহাড় ও পর্বত, মালভূমি, সমভূমি, নদনদী, উপত্যকার অবস্থান বুঝতে সাহায্য করে মানচিত্র।

Scanned with CamScanner

(iii) বিভিন্ন স্থানের অবস্থানগত তুলনামূলক দূরত্ব সম্পর্কে ধারণা প্রদান করে।
(iv) জনঘনত্ব, দেশের প্রধান প্রধান শহর, নগর ও বন্দরের অবস্থান বুঝতে সাহায্য করে।
(v) কৃষি ও শিল্প সংক্রান্ত উৎপাদন, মৃত্তিকার উর্বরতা ও প্রকৃতি, বাণিজ্য সংক্রান্ত তথ্য, বিভিন্ন শিল্পকেন্দ্রের অবস্থান উপলব্ধিতে সহায়ক।
(vi) দেশের রাজনৈতিক বিভাজন, সীমারেখা, রাজধানীর অবস্থান, রাজনৈতিক বিভিন্ন তথ্য প্রদানযুক্ত মানচিত্র সংশ্লিষ্ট ধারণা গঠন করতে সাহায্য করে।
(vii) সমুদ্রস্রোত, খনিজ সম্পদের অবস্থান, খনিজতেল ও অন্যান্য খনিজ সম্পদের ভাণ্ডারের সঞ্চয়, বায়ুপ্রবাহ ও তার কার্যকারিতার পরিচয় দান করে।
(viii) দেশের বিভিন্ন শহর, রাস্তাঘাট, পরিবহণব্যবস্থা, টেলিযোগ ব্যবস্থা, সেতু, জলাধার, পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনকেন্দ্র সম্পর্কে পরিচয় দেয় মানচিত্র।

মানচিত্রগুলি প্রকৃতিতে বিভিন্ন প্রকার হতে পারে—যেমন রাজনৈতিক মানচিত্র, প্রাকৃতিক মানচিত্র, প্রাকৃতিক ও রাজনৈতিক মানচিত্র।

প্রদর্শনের মাধ্যমে শিক্ষণকার্যকে অধিক ফলপ্রসূ করে তোলার জন্য শিক্ষককে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি মনে রাখা দরকার।

(i) শ্রেণিকক্ষের পাঠ পরিচালনায় পাঠ্য-বিষয়বস্তুর শিক্ষণের প্রয়োজন ও চাহিদা অনুসারে কোন্ ধরনের মানচিত্র ব্যবহার করা হবে তার সঠিক নির্বাচন করা দরকার। অর্থাৎ মানচিত্রটি রাজনৈতিক, না প্রাকৃতিক না কি রাজনৈতিক-প্রাকৃতিক অথবা বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তা ঠিক করতে হবে শিক্ষককে।
(ii) মানচিত্র নির্বাচনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের মানসিক ক্ষমতা, আগ্রহ, তাদের পরিণমনের স্তরকে গুরুত্ব দিতে হবে।
(iii) শ্রেণিতে মানচিত্রকে এমনভাবে স্থাপন করতে হবে যাতে সমস্ত শিক্ষার্থী স্বচ্ছন্দে তা দেখতে পায়। দূরবর্তী স্থানে যে সমস্ত শিক্ষার্থী অবস্থান করে তারাও যাতে ঠিক ঠিক বুঝতে পারে, তার জন্য লেখাগুলি যেন স্পষ্ট এবং মোটা অক্ষরের হয়।
(iv) মানচিত্রের গুণগত মানের ক্ষেত্রে proper scaling গুরুত্বপূর্ণ। আপেক্ষিক আকার, দূরত্ব এবং অঞ্চলকে নির্দেশ করার জন্য মানচিত্রে অবশ্যই proper scaling থাকা জরুরি।
(v) মানচিত্রে বিভিন্ন বিষয় যেমন পাহাড়-পর্বত, নদনদী, সাগর, হ্রদ, গুরুত্বপূর্ণ স্থান নির্দেশকারী প্রতীক (symbols) এবং রং (colours) ব্যবহার করা দরকার। এ বিষয়ে শিক্ষক অবশ্যই সচেতন থাকবেন।
(vi) শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য শিক্ষক মানচিত্রের বিভিন্ন বিষয় নির্দেশ করার জন্য একটি লম্বা ছড়ি বা pointer ব্যবহার করবেন।

(viii) মানচিত্রের নির্দিষ্ট বিষয়গুলির দেখানোর সময় প্রয়োজনে তা ব্যাখ্যা করে দেবেন শিক্ষক।

❖ ৩.৩.৭.৯ স্লাইড (Slide) :

শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের সময় পাঠ্য-বিষয়বস্তু আরও বেশি জীবন্ত ও নিখুঁত ভাবে শিক্ষার্থীদের নিকট পৌঁছে দেবার জন্য শিক্ষক স্লাইড (slide) ব্যবহার করতে পারেন। সাধারণত কোনো স্বচ্ছ বস্তুর উপর কোনো প্রতিবিম্ব স্থাপন করানোকে বলা হয় স্লাইড প্রদর্শন। পাঠ্য বিষয়বস্তুকে কীভাবে উপস্থাপন করা হবে সেই অনুসারে পরিকল্পনা করে স্লাইড প্রস্তুত করা হয়। আবার, অতিসূক্ষ্ম আণুবীক্ষণিক জীবকে দেখার জন্যও কাচের খণ্ডের উপর বিশেষ উপায়ে mount করে slide প্রস্তুত করা হয়। শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ার এই স্লাইডের শিক্ষাগত মূল্য অনেকখানি। নিম্নে তা উল্লেখ করা হল—

(i) বড়ো আকারের পর্দায় বস্তুর প্রতিবিম্ব হলে শিক্ষার্থীদের তা সহজেই মনোযোগ আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়, শিক্ষার্থী সংশ্লিষ্ট পাঠ্য-বিষয়বস্তুতে আগ্রহী হয়ে ওঠে।
(ii) শ্রেণিকক্ষে পাঠ্যবিষয়ের অবতারণা, বিষয়বস্তুর উপস্থাপন এবং পাঠের ধারাবাহিক আলোচনায় সঠিক বিন্যাস ও ব্যাখ্যাকরণে শিক্ষককে সহায়তা করে এই স্লাইডগুলি।
(iii) পাঠ্যবিষয়ের পুনরাবৃত্তি, পুনরালোচনার সুযোগ এবং অনুশীলনের সুযোগ দিয়ে স্লাইডগুলি শিক্ষার্থীদের জ্ঞান অর্জনে ও দক্ষতালাভে সহায়তা করে।
(iv) শিক্ষাদানকালে বা পাঠ-পরিচালনার সময় শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জ্ঞান ও বোধমূলক মূল্যায়ন করতে পারেন।
(v) শিক্ষক যখন দীর্ঘসময় ধরে কোনো ব্যাখ্যা করেন অথবা শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মিথষ্ক্রিয়ায় আবদ্ধ থাকেন তখন slide-কে শিক্ষার্থীদের সামনে রাখা যায়, এতে শিক্ষার্থীরা বিষয়ে নিবদ্ধ থাকতে পারে। প্রয়োজনে পিছনেও যাওয়া যায়।
(vi) সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আণুবিক্ষণিক জীবগুলিকে শিক্ষার্থীদের সামনে স্পষ্ট এবং মূর্ত করে তোলা এবং সংশ্লিষ্ট জ্ঞান অর্জনে অতীব সহায়তা করে থাকে slide-গুলি। শিক্ষার্থীদের চিন্তনপ্রক্রিয়াকে আরও বেশি অগ্রবর্তী করে তোলে।

❖ ৩.৩.৭.১০ রেখাচিত্র (Diagram) :

শ্রেণিকক্ষে পাঠদানকালে এমন বহু বিষয় থাকে যেগুলি মৌখিক বর্ণনার সাহায্যে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সম্পূর্ণভাবে বোঝাতে সক্ষম হন না। সেক্ষেত্রে শিক্ষক কিছু রেখা এবং জ্যামিতিক আকৃতির সাহায্যে বিষয়বস্তুকে শিক্ষার্থীদের সামনে বোধগম্য করে তোলেন। **Mangal and Mangal** তাঁদের 'Essentials of Educational Technology' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। "A diagram may be defined as a graphic visual and in the form

Scanned with CamScanner

of some simplified but explanatory drawing to show inter-relationships as well as explain ideas, events or process by means of lines, geometrical forms and symbols."

এই রেখাচিত্রের সবচেয়ে বেশি ব্যবহার দেখা যায় জীববিদ্যা, ভৌতবিজ্ঞান, গণিত, ভূগোল, ইতিহাস, শিক্ষাবিজ্ঞান ও অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানগুলিতে। **শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে রেখাচিত্র ব্যবহারের সময় কতকগুলি বিষয় সম্পর্কে সচেতন থাকবেন,** যেমন—

(i) রেখাচিত্র স্পষ্ট, পরিচ্ছন্ন ও বড়ো আকৃতির হতে হবে, যাতে শ্রেণিকক্ষের শেষ বেঞ্চের শিক্ষার্থীরাও স্পষ্ট দেখতে পায়।

(ii) রেখাচিত্র নির্ভুল হওয়া দরকার এবং তথ্যের বাহুল্য বর্জিত হওয়া দরকার।

(iii) পাঠ্য-বিষয়বস্তুর সঙ্গে অবশ্যই সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

(iv) রেখাচিত্রের বিভিন্ন অংশকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করে দেখানো দরকার।

❖ ৩.৩.৭.১১ লেখচিত্র বা গ্রাফ (Graph) :

লেখচিত্র হল এমন এক চিত্ররূপ যার সাহায্যে সংখ্যাগত ও পরিসংখ্যানগত রাশি তথ্যগুলিকে সহজে বোধগম্য করে তোলা হয়। এই ধরনের লেখচিত্র অর্থনীতি, রাশিবিজ্ঞান, গণিতশাস্ত্র, শিক্ষাবিজ্ঞান, পদার্থবিদ্যা, ভূগোল প্রভৃতি বিষয়ে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। **Mangal** এবং **Mangal** গ্রাফকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এইভাবে—"Graphs are defined as those visual graphic aids which help in the visual representation of numerical data with the objectives of providing a gist of informations along with revealing any important relationship (such as trends and variations from normal), contained in the dates as quickly and effectively as possible."

গ্রাফ বা লেখচিত্র বিভিন্ন প্রকার হতে পারে, যেমন— রেখা গ্রাফ (line graph), স্তম্ভ লেখচিত্র (Bar graph), বৃত্তীয় লেখচিত্র (Circle graph, Pie-graph) চিত্রমূলক লেখচিত্র (Pictorial graph)। শিক্ষাবিজ্ঞান বিষয়ে পরিসংখ্যা বহুভুজ, ওজাইভ, আয়তলেখ, পাই গ্রাফ, বারচিত্র এবং রেখাচিত্র বা Line graph-এর ব্যবহার খুব বেশি। **এই সমস্ত গ্রাফ বা লেখচিত্রের শিক্ষামূলক গুরুত্ব যথেষ্ট, যেমন—**

(i) লেখচিত্র বা গ্রাফ দ্বারা প্রকাশিত রাশিমালার গুরুত্ব বা তাৎপর্য সহজেই বোধগম্য হয়।

(ii) বিভিন্ন রাশি তথ্যগুলির মধ্যে তুলনা করে তাদের তুলনামূলক অলোচনা করা সহজ হয়।

(iii) রাশি তথ্যমালার মধ্যে কোনো বিশেষ প্রবণতা থাকলে তা সহজেই উপলব্ধি করা যায়।

(iv) বিভিন্ন চলকের মানসমূহ কীভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে তা সহজেই জানা যায়।

❖ ৩.৩.৭.১২ গ্লোব (Globe) :

জনপ্রিয় এবং বহুল প্রচলিত যে সমস্ত শিক্ষামূলক উপকরণ আমাদের শ্রেণিকক্ষগুলিতে দেখা যায় তাদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হল গ্লোব। ভূগোল বিষয়ে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হলেও ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিদ্যা ও আরও অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানগুলিতে গ্লোবের ব্যবহার দেখা যায়। **গ্লোবের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষামূলক দিকগুলি হল—**

(i) গ্লোবের সাহায্যে বোঝানো যায় পৃথিবী গোলাকার বস্তু।

(ii) গ্লোবের সাহায্যে শিক্ষার্থীদের বোঝানো সহজ হয় যে, পৃথিবী স্থির নয় ঘূর্ণমান বস্তু।

(iii) পৃথিবীর সবচেয়ে বেশির ভাগ অংশই জল দ্বারা আবৃত তা সহজেই শিক্ষার্থীদের বোঝানো সহজ হয়।

(iv) গ্লোবের সাহায্যে অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ ও কোনো দেশ ও স্থানের অবস্থান শিক্ষার্থীদের বোঝানো সহজ হয়।

(v) পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মানুষের সঞ্চরণ ও সম্পর্ক উপলব্ধি সহজ হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে মানুষের ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতির বিকাশ ও বিস্তার উপলব্ধি সহজ হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান ও দেশগুলিতে আবিষ্কার ও সভ্যতার আবিষ্কার গ্লোবের থেকে স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া সম্ভব।

❖ ৩.৩.৭.১৩ ফিল্ম স্ট্রিপ (Film strips) :

পৃথক পৃথক চিত্র সম্বলিত ফিল্মের ছোটো ছোটো খণ্ড সম্মিলিতভাবে একটি বিশেষ ধারণাকে শিক্ষার্থীদের সামনে হাজির করে এই ফিল্ম স্ট্রিপ। চিত্র সম্বলিত ছোটো ছোটো খণ্ডগুলি ক্রমানুসারে সাজানো থাকে এবং শ্রেণিকক্ষে একটি পাঠের ধারণাকে স্পষ্ট করে তোলে। চিত্রগুলির সঙ্গে শব্দ সংযোজিত থাকতেও পারে, আবার নাও থাকতে পারে। এগুলি রঙিন হতে পারে আবার সাদা-কালোও হতে পারে। একটি পূর্ণাঙ্গ ফিল্ম স্ট্রিপের মধ্যে সাধারণত ২০ থেকে ৫০টি চিত্র থাকে এবং ২ থেকে ৫ ফিটের মধ্যে দীর্ঘ হয়। একটি চিত্রের দৈর্ঘ্য ১.৬ ইঞ্চির মতো। যেহেতু ফিল্মগুলি নির্দিষ্ট রীতিতে সজ্জিত থাকে, তাই ফিল্ম স্ট্রিপ পাঠ্য-বিষয় বস্তুকে শ্রেণিকক্ষে সুবিন্যস্তভাবে উপস্থাপন করতে সাহায্য করে। শিক্ষার্থীদের মনোযোগের আকর্ষণ ঘটিয়ে সহজেই তাদের পাঠে প্রেষণা সঞ্চারে সক্ষম হয়।

উপরোক্ত দৃষ্টিনির্ভর প্রদীপনগুলি ছাড়া আরও কতকগুলি দৃষ্টিনির্ভর প্রদীপন ব্যবহার করতে দেখা যায়, সেগুলি হল—ম্যাজিক লণ্ঠন, পোস্টার, সংবাদপত্র এবং কম্পিউটারে ব্যবহৃত পাওয়ার পয়েন্ট-এর স্লাইড ইত্যাদি।

❖ ৩.৩.৭.১৪ চলচ্চিত্র (Cinema) :

রূপালি পর্দায় চলমান চিত্রের এক আশ্চর্য জাদু সমগ্র বিশ্বের মানুষকে মোহিত করে রেখেছে। মানুষের মনোরঞ্জনের সঙ্গে সঙ্গে চলচ্চিত্র মানুষের জীবন বোধের সন্ধান দেয় আর

Scanned with CamScanner

শিক্ষাক্ষেত্রে হয়ে ওঠে এক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষামূলক উপকরণ। আলাদা আলাদা আলোক চিত্র পর পর সাজিয়ে নির্দিষ্ট গতিতে মানুষের চোখের সামনে হাজির করলে চলমান চিত্রের উদ্ভব হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে এক একটি ধারণাকে মূর্ত করে তোলে শিক্ষার্থীর সামনে। পূর্ণাঙ্গ সবাক চলচ্চিত্রের প্রাণ শুরু ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে হলেও চার ও পাঁচের দশকের পর থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেই উচ্চমানের চলচ্চিত্র নির্মাণ হতে থাকে।

বিভিন্ন গবেষণায় চলচ্চিত্রের শিক্ষামূলক উপযোগিতাগুলি জানা গেছে। নিম্নে সেগুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল :

(i) **বাস্তবধর্মী অভিজ্ঞতা :** শ্রেণিকক্ষে পাঠ্য-বিষয়বস্তুকে চলচ্চিত্র শিক্ষার্থীদের সামনে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও বাস্তবসম্মত বিভিন্ন অভিজ্ঞতাকে তুলে ধরে। এর ফলে শিক্ষার্থীদের অর্জিত জ্ঞান অনেকখানি ফলপ্রসূ হয়ে ওঠে।

(ii) **আগ্রহ ও প্রেষণা সঞ্চার :** চলচ্চিত্রের দ্বারা উপস্থাপিত বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের শিক্ষার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে, আগ্রহ বৃদ্ধি করে এবং সর্বোপরি প্রেষণার সঞ্চার করে।

(iii) **ইতিবাচক মনোভাব :** চলচ্চিত্রের ঘটনাবলির প্রভাবে শিক্ষার্থীর মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে। জীবনবোধ গড়ে ওঠে এবং ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনের তাৎপর্য উপলব্ধির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ইতিবাচক মনোভাবের সৃষ্টি করে।

(iv) **প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ :** চলচ্চিত্রের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। শিখন সঞ্চালনের দ্বারা এই পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা প্রকৃত পর্যবেক্ষণের চেতনাকে জাগ্রত করে তোলে।

(v) **অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি :** চলচ্চিত্রের প্রদর্শিত বিষয়বস্তুর পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি ঘটানো যায়, ফলে শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা লাভে অসম্পূর্ণতা দূর হয় এবং শিক্ষার্থীদের ধারণা গঠন স্থায়ী হয়।

(vi) **নতুন মূল্যবোধ সৃষ্টি :** বহুক্ষেত্রে চলচ্চিত্রের প্রদর্শিত স্থান, কাল, পাত্র শিক্ষার্থীদের মনে এক সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তারের দ্বারা পুরাতন মূল্যবোধগুলির পরিবর্তন ঘটিয়ে নতুন মূল্যবোধ গঠনে সহায়তা করে।

চলচ্চিত্রের যেমন ভালো দিক আছে তেমনি তার কিছু ক্ষতিকর দিকও আছে। চলচ্চিত্রের এই ক্ষতিকর দিকটি নিয়ন্ত্রিত করে সচেতনভাবে যদি শিক্ষণমূলক উপকরণ হিসেবে ভালো দিকগুলিকে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনুসৃত করা যায়, তবে শিক্ষার উদ্দেশ্য অনেকাংশে সার্থকতা লাভ করে।

❖ ৩.৩.৭.১৫ দূরদর্শন (Television) :

চলচ্চিত্রের মতো দূরদর্শনও একটি শ্রবণ ও দৃষ্টিমূলক উপকরণ। একইসাথে শ্রবণ ও দর্শনের মতো কাজ সম্পন্ন হয় বলে দূরদর্শন সহজেই সকলকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়। **শিক্ষণমূলক উপকরণ হিসেবে দূরদর্শনের গুরুত্ব নিম্নে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল :**

(i) **মূর্ত ও বাস্তবধর্মী জ্ঞান :** পাঠ্যবিষয়ের এমন অনেক বিষয়বস্তু আছে যেগুলি শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপিত করা বেশ কঠিন, ফলে শিক্ষার্থীদের কাছে তা অনেক সময় বোধগম্য হয় না, কিন্তু দূরদর্শনের মাধ্যমে সেই বিষয়টি সহজেই বাস্তবসম্মতভাবে উপস্থাপন করা সম্ভব এবং শিক্ষার্থীদের কাছে তা সহজেই মূর্ত হয়ে ওঠে।

(ii) **অত্যাধুনিক জ্ঞান :** পাঠক্রমের অন্তর্গত অনেক বিষয়বস্তু আছে যেগুলি দূরদর্শনের দ্বারা প্রদর্শিত হলে অনেক বেশি তথ্যবহুল ও অত্যাধুনিক রূপ লাভ করে।

(iii) **মনোযোগ আকর্ষণ :** দূরদর্শন যে-কোনো বিষয়বস্তু বা ঘটনাকে শিক্ষার্থীদের কাছে প্রাণবন্ত করে উপস্থাপিত করে, ফলে তা যেমন একদিকে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে তেমনই বাস্তবধর্মী হয়ে ওঠে। এই বৈশিষ্ট্যের জন্য দূরদর্শনের অনুষ্ঠান সহজেই শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করে।

(iv) **প্রেষণা সঞ্চার :** দূরদর্শনে অনেক সময় বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। এই ধরনের বক্তব্য রাখার সময় বা আলোচনা কালে অনেক শিক্ষার্থীও হাজির থাকে। এই দৃশ্য দেখতে দেখতে শিক্ষার্থীরা নিজেরাও দূরদর্শনের অনুষ্ঠানের অংশগ্রহণে আগ্রহী হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে প্রেষণা লাভ করে।

(v) **বয়স্ক শিক্ষার সুযোগ :** দূরদর্শনকে বয়স্ক শিক্ষার ক্ষেত্রে কাজে লাগানোর জন্য বর্তমানে নানা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। যেহেতু এই মাধ্যমটি সহজেই মানুষের মনকে আকর্ষণ করে, তাই নিরক্ষর মানুষকে তাদের কর্মজগতের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রথামুক্তভাবে নানা ধরনের শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে সহায়তা করে থাকে।

(vi) **জনশিক্ষার বিস্তার :** দূরদূর্শনের দ্বারা জনগণকে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সচেতন করে তোলা যায়। প্রথমত শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা মানুষের জীবনে কতখানি তার উপলব্ধিতে দূরদর্শন খুব কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে। প্রথামুক্ত শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত করার ক্ষেত্রে জনগণকে যেমন উৎসাহিত করে, তেমনি বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জনগণকে সচেতন করে তোলে, যেমন—কৃষি, শিল্প, পরিবেশ চেতনা, পরিবেশ দূষণ, রোগ ও তার প্রতিকার-এর প্রসঙ্গ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক নানা প্রসঙ্গ।

❖ ৩.৩.৭.১৬ কম্পিউটার (Computer) :

বর্তমান একুশ শতকে কম্পিউটার এক অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে মানুষের জীবনে স্থান করে নিয়েছে। অফিস, আদালত, কলকারখানা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং গবেষণাগারগুলিতে তার

Scanned with CamScanner

প্রতিষ্ঠা এবং মর্যাদা এক বিশেষ স্তরে পৌঁছেছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিশেষ করে শিক্ষণ-শিখন পরিস্থিতিতে কম্পিউটার Teaching Aid বা শিক্ষণ সহায়ক উপকরণ বা প্রদীপন হিসেবে কী ভূমিকা পালন করে তা এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল :

(i) শিক্ষাক্ষেত্রে কম্পিউটার জ্ঞান ও তথ্যের এক সঞ্চয় ভাণ্ডার :

শিক্ষণ-শিখনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পাঠ্য-বিষয়বস্তুর অন্তর্গত সমস্তরকম প্রাসঙ্গিক জ্ঞান ও তথ্যের সঞ্চয়ভাণ্ডার হিসেবে কাজ করে কম্পিউটার প্রযুক্তি। একজন শিক্ষার্থী তার প্রয়োজন অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহের জন্য কম্পিউটারে ইন্টারনেট সংযোগের দ্বারা উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারে। এই সমস্ত সংগৃহীত তথ্যগুলিকে শিক্ষার্থী তার নিজস্ব ব্যক্তিগত কম্পিউটারের হার্ডডিস্কে সঞ্চয় করে রাখতে পারে। আবার, অন্যদিকে, ফ্লপি, CD রম, পেনড্রাইভ ইত্যাদির মাধ্যমে অতিরিক্ত তথ্য সঞ্চয় করে রাখতে পারে। এইভাবে শিক্ষার্থীরা স্বচ্ছন্দে নিজস্ব ব্যক্তি লাইব্রেরি নির্মাণ করতে পারে।

(ii) শিক্ষার্থীদের নিকট কম্পিউটার আত্মনির্দেশনার একটি ভালো উৎস :

বর্তমান যুগে কম্পিউটার শিক্ষক, টিউটর এবং শিক্ষানির্দেশক-এর সমন্বিত রূপ। একজন শিক্ষার্থী তার নিজের চেষ্টাতে কম্পিউটারের সাহায্যে জ্ঞান আহরণ, ধারণা গঠন, দক্ষতা অর্জন এবং প্রয়োগের বিভিন্ন দিকে সার্থকভাবে সাফল্যলাভ করতে পারে। কম্পিউটার একটা স্বল্প পরিমাণ নির্দিষ্ট সময়ে একজন অথবা একদল শিক্ষার্থীকে শিক্ষার নানা দিকে সাহায্য করতে সক্ষম। বস্তুত, কম্পিউটার আধুনিক যুগে এমন এক যান্ত্রিক ব্যবস্থা যা একজন শ্রেণি-শিক্ষক, বিষয় বিশেষজ্ঞ, উত্তর প্রদর্শনকারী এবং পরিচালক বা নির্দেশক-এর ভূমিকা পালন করতে সক্ষম।

(iii) প্রতিকল্প ও খেলাচ্ছলে শিক্ষাদান :

আধুনিক কালে কম্পিউটার জগতে বহু রকমের software programme সহজলভ্য হয়ে গেছে যেগুলি শিক্ষার্থীদের নানাভাবে সাহায্য করে। শিক্ষার্থীদের শিক্ষণ অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানলাভের পথ প্রশস্ত করেছে। শিক্ষার্থীরা তাদের নিজেদের চাহিদা এবং প্রয়োজন অনুসারে জ্ঞান-বোধ প্রয়োগ-দক্ষতা অর্জনে সক্ষম হয়। এইভাবে বাস্তব অবস্থার সঙ্গে পুরোপুরি সামঞ্জস্য বা সাদৃশ্য বজায় রেখে মূল বিষয়ের কিছু অংশ কাটছাঁট করে প্রতিকল্পের (simulation)- আকারে উপস্থাপন করার মাধ্যমে শিখন সংঘটিত হচ্ছে। এই ধরনের শিখন প্রতিকল্প-শিখন বা simulated learning নামে পরিচিত। অনুরূপভাবে নানা রকম খেলাচ্ছলেও শিক্ষার্থীরা শিখনের সুযোগ পাচ্ছে।

(iv) শিক্ষকের শিক্ষাদান প্রক্রিয়া এবং পেশাগত উন্নয়নে কম্পিউটার :

বর্তমানে কম্পিউটার প্রযুক্তির সুবাদে প্রচুর পরিমাণ তথ্য, পঠন সামগ্রী, শিক্ষণ পদ্ধতির নানা বিষয় সহজলভ্য হয়েছে। শিক্ষক ইচ্ছা করলে তাঁর শিক্ষাদান প্রক্রিয়াকে আরও বেশি আধুনিক ও তথ্য সমৃদ্ধ করার জন্য, পেশাগত উন্নয়ন ঘটাবার লক্ষ্যে সর্বাধুনিক তথ্য,

পদ্ধতি-প্রকরণ সামগ্রী, গবেষণার ফলাফল সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে পারেন কম্পিউটারের সাহায্য নিয়ে।

(v) গতানুগতিক শিক্ষণমূলক প্রদীপনের বিকল্প ব্যবস্থা নির্মাণ :

এই একুশ শতকের গোড়াতেও আধুনিক শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষণ প্রদীপন হিসেবে যে সমস্ত সামগ্রী ব্যবহৃত হচ্ছে সেগুলি প্রাচীন এবং গতানুগতিক প্রকৃতির। অথচ এই সমস্ত গতানুগতিক শিক্ষণ প্রদীপনের স্থানে নতুন নতুন প্রদীপনের আমদানি ঘটাতে সক্ষম কম্পিউটার প্রযুক্তি। শিক্ষক তার শিক্ষাদান কার্যে প্রয়োজন মতো ভিডিয়ো, অডিয়ো সিডি, স্লাইড ও টেক্সট-এর পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন, লিখিত সামগ্রীর প্রক্ষেপণ ইত্যাদির দ্বারা বড়ো আকারের স্ক্রিনে প্রদর্শন ঘটিয়ে শিক্ষার্থীদের শিখনে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারেন।

উপরোক্ত ক্ষেত্রগুলি ছাড়াও শিক্ষক তাঁর শিক্ষণ-শিখন কার্যকালে আরও অন্যান্য বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষার্থীদের সহযোগিতা করতে কম্পিউটারকে কাজে লাগাতে পারেন, যেমন—শিক্ষার্থীদের সংশোধনমূলক শিখন, শিক্ষার্থীদের স্বশিখন, দলগত শিখন, লাইব্রেরি ও প্রোজেক্ট ওয়ার্ক কমিউনিটি রিসোর্সকে ব্যবহার করার জন্য কম্পিউটারের সাহায্য নিতে পারেন।

❖ ৩.৩.৭.১৭ ট্রান্সপারেন্সি (Transperency) :

ট্রান্সপারেন্সি হল এমন একটি স্বচ্ছ সেলোফেন অথবা ট্রাই অ্যাসিটেট সিট যার উপর কিছু চিত্র অথবা কোনো কিছু লিখিত রূপ অবস্থান করে। ট্রান্সপারেন্সি ওই সিটের উপর অবস্থিত চিত্র বা লিখিত রূপটি ওভারহেড প্রোজেক্টর নামক প্রক্ষেপণ যন্ত্রের সাহায্যে একটি সাদা স্ক্রিন বা দেওয়ালের উপর প্রক্ষেপিত করা যায়। চিত্র অথবা লিখিত রূপটি হাতে আঁকা যায় অথবা মেসিনে প্রস্তুত করা যায়।

স্বচ্ছ পর্দাগুলি বিভিন্ন রকমের হতে পারে। যেমন– একক স্বচ্ছপর্দা, স্বচ্ছ অ্যাসিটেট রোল কাগজ, ওভারলেস, সিলিউট এফেক্টস, অংশীকৃত মডেল, অ্যানিমেশন এফেক্ট ইত্যাদি।

❖ ৩.৩.৭.১৮ ভিডিয়ো (Video) :

বর্তমান শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি প্রয়োজনীয় এবং কার্যকরী উপকরণ হল ভিডিয়ো। ভিডিয়ো টেপের মাধ্যমে যে-কোনো বিষয় খুব সহজেই উপস্থাপন করা সম্ভব। ভিডিয়োর মাধ্যমে এই যে শিক্ষা প্রদান বা গহণ করা হয়, তাকেই ভিডিয়ো শিক্ষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে চলচ্চিত্র এবং এর সঙ্গে সাউন্ড টেকনোলজির দ্রুত উন্নতি হওয়ার পর সেলুলয়েডের ওপর জিলেটিনের সাহায্যে আলোকচিত্র শিল্পীদের দিয়ে ???? ফিলম্-এর ব্যবহারকে পিছনে ফেলে ষাটের দশকে ম্যাগনেটিভ টেপে স্বল্প সময়ে সহজভাবে চিত্রধারণ ও শব্দগ্রহণ সম্ভব হওয়ার ফলে ভিডিয়োর ব্যবহার এবং শিক্ষাক্ষেত্রে তার প্রয়োগ বস্তুত শিক্ষাব্যবস্থাকে করেছেন অনেকবেশি আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত। ১৯৮১-এ ওয়ার্ল্ডভিউ

Scanned with CamScanner

ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর প্রফেশনাল ভিডিয়োর ওপর প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ শুরু হয়। ভিডিয়োর মাধ্যমে শিক্ষাবিষয়ক নানান কর্মসূচি সম্প্রচার করা এবং শিক্ষার্থীদের ভিডিয়ো দেখে পড়াশোনা করার সুযোগ রয়েছে। আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষা সংক্রান্ত নানান কাজ, গণসচেতনতা বৃদ্ধি, তথ্যচিত্র নির্মাণে, তথ্যের আদান-প্রদান, সংরক্ষণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ভিডিয়ো ব্যবহার খুবই কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করেছে। ভিডিয়ো ক্যাসেট যেমন বর্তমানে সহজলভ্য তেমনি ব্যবহারী ব্যক্তি ক্যাসেট প্রেয়ারকে নিজের টি.ভি.র সেটের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয় এবং পছন্দমতো তাকে ব্যবহাররও করা যায়। শিক্ষামূলক ভিডিয়ো প্রস্তুত করার জন্য কতকগুলি নীতি মেনে চলা দরকার। সেগুলি হল–

(১) **উদ্দেশ্য স্থিরকরণ :** যে সব শিক্ষার্থীদের ভিডিয়োর মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে তাদের জেনে নিয়ে শিক্ষার উদ্দেশ্য স্থির করা দরকার।

(২) **শ্রোতা বা দর্শকের প্রকৃতি :** যে সব শিক্ষার্থীদের ভিডিয়ো দেখিয়ে, শিক্ষার উদ্দেশ্যপূরণ করার চেষ্টা হবে, তাদের পরিণমন, শ্রোতা বা দর্শকের বয়স ও পরিণমন এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সেই মুহূর্তে অতীত অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান কতটুকু আছে, তা জানা খুবই দরকারী।

(৩) **পাঠ্যবিষয় বস্তু :** শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট পাঠ্যবিষয়বস্তুর যতখানি ভিডিয়োর মাধ্যমে উপস্থাপন করা যাবে তা নির্ধারণ করতে দরকার।

(৪) **উপস্থাপনের ধরন :** ভিডিয়ো উপস্থাপনের জন্য নির্ধারিত পাঠ্য বিষয় বস্তু কীভাবে উপস্থাপন করা হবে তা নিয়ে পূর্বেই চিন্তাভাবনা করা দরকার। পরিকল্পনার সময় যে পাঠ্যবিষয়বস্তু স্থির করা হয় সেটির দৃশ্যায়নের ক্রমটির উপর জোর দেওয়া দরকার।

(৫) **ধারাবাহিকতা ও বিরতি :** ভিডিয়ো স্ক্রিপটি যুক্তিসম্মতভাবে সজ্জিত করতে হবে এবং প্রতিটি অংশে কতখানি সময় দেওয়া হবে তা স্থির করতে হবে। দেখতে হবে সমগ্র অংশটির মধ্যে যেন একটা ধারাবাহিকতা বজায় থাকে।

(৬) **পর্যালোচনা :** নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুটির প্রতিযাতে যথাযথ মনোযোগ আকর্ষণ সম্ভব হয় তারজন্য পর্যালোচনার সুযোগ রাখা দরকার।

(৭) **নির্দেশনা সহায়ক পুস্তিকা :** ভিডিয়ো ক্যাসেটের সঙ্গে একটি নির্দেশনা সহায়ক পুস্তিকা থাকা দরকার। যেখানে ভিডিয়োটির নির্মাণে, প্রদর্শনের প্রয়োজনীয় উপকরণ এবং পদ্ধতির উল্লেখ থাকবে।

(৮) **মূল্যায়ণ :** সমগ্র ভিডিয়োর বিষয়বস্তুটি তার নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য পূরণে সক্ষম হয়েছে কিনা, বিষয়বস্তু যথাযথ উপস্থাপন ও প্রাসঙ্গিকতা বজায় রয়েছে কিনা, যে

গ্র্যাফিক্স ব্যবহার করা হয়েছে তার কার্যকারিতা কতখানি সেসব নিয়ে একটি মূল্যায়ণ-এর ব্যবস্থা করা দরকার। প্রয়োজন যেগুলির সংশোধন ও পরিমার্জন এর ব্যবস্থা থাকা দরকার।

❖ ৩.৩.৭.১৯ অ্যানিমেশন (Animation) :

ইংরেজি Animation শব্দের উৎপত্তি হয়েছে ল্যাটিন শব্দ 'Anima' থেকে, যার অর্থ হল 'প্রাণ' বা 'আত্মা'। এর থেকে 'অ্যানিমেশন' শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ হয়েছে 'প্রাণ সঞ্চারী চিত্রায়ণ'। এটি হল এমন একটি শিল্পপদ্ধতি যা একই সঙ্গে বিনোদনমূলক এবং শিক্ষামূলক উভয়ক্ষেত্রে চলচ্চিত্র নির্মাণে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এর মূল বিষয়বস্তু হল অঙ্কিত চিত্ররাশিকে সচল এবং জীবন্ত করে উপস্থাপন। এই ধরনের অঙ্কিত চিত্ররাশিতে (সাধারণ কোনো ব্যঙ্গচিত্র বা কার্টুন) একটি গল্প বা কাহিনীকে তুলে ধরা হয়। অ্যানিমেশনের মাধ্যমে কোনো চরিত্র বা চরিত্রসমূহকে অভিব্যক্ত করা হয়। একটি নির্দিষ্ট গতিতে ধারাবাহিকভাবে এই ছবিগুলিকে উপস্থাপিত করা হয় যাতে মনে হয় প্রদর্শিত চিত্রগুলি জীবন্ত বা প্রাণবন্ত। অঙ্কত চিত্ররাশিতে এইভাবে সুনির্দিষ্ট গতিতে উপস্থাপনের মাধ্যমে কৃত্রিমভাবে প্রাণ সঞ্চার করা হয় বলে, এই চিত্ররাশিকে 'প্রাণসঞ্চারী চিত্রায়ণ' বলা হয়। বেশ কিছুদিন আগে পর্যন্ত ছবিগুলি হাতে আঁকতে হলেও বর্তমানে কম্পিউটারের বহুল ব্যবহারের যুগে অ্যানিমেশনকে কার্যকরী করে, তুলতে কম্পিউটারকে কাজে লাগানো হচ্ছে। ফলে 'প্রাণসঞ্চারী চিত্রায়ণ'এর উপস্থাপন অনেকখানি সহজ হয়েছে। টি.ভি.র পর্দায় সহজেই উপস্থাপন করে প্রাণসঞ্চারের কাজটি সমাধাও করা যায়। বস্তুত অনেকগুলি কাজ যেমন ওয়েব ডিজাইনিং, ফ্যাশন ও ইন্টেরিয়ার ডিজাইনিং, কম্পিউটার গেমস ডেভেলপিং, চলচ্চিত্র, দূরদর্শন, কম্পিউটার ভিত্তিক টিউটোরিয়াল, গ্রাফিক্স এরাও প্রিন্টিং ইত্যাদি অ্যানিমেশন শিল্পের সঙ্গে সংযুক্ত। সাধারণ খালি চোখে অদৃশ্য কোনো বিষয় বা কাজ অ্যানিমেশনের দ্বারা প্রযুক্তি সমৃদ্ধ হয়ে আমাদের দৃষ্টিশক্তিতে ধরা দেয়। এই পদ্ধতিতে নির্মিত চিত্রের জনপ্রিয়তার আলোকে এই যুগে একে গণশিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহারের ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। প্রকৃত পক্ষে আমেরিকান শিল্পী ওয়াল্টার ডিজলী'র সাফল্য অ্যানিমেশনের কাজকে ব্যাপক জনপ্রিয়তা প্রদান করেছে। এই অ্যানিমেশনের সাহায্যে বিভিন্ন জীবজন্তু, মানুষ প্রভৃতির শরীরের অভ্যন্তরস্থ অঙ্গের কার্যপ্রণালী সহজে শিক্ষার্থীদের শিখনকে কার্যকরী করে তোলে। পৃথিবীর বেশ কিছু দেশে অ্যানিমেশান ফিলম্ শিশুদের নিকট খুব জনপ্রিয়।

❑ ৩.৩.৮ শ্রবণ-দৃষ্টি নির্ভর প্রদীপনের নির্বাচন, প্রস্তুতি ও ব্যবহার (Selection, Preparation and uses of Audio-visual Aids) :

পূর্বেই আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা জেনেছি যে শিক্ষা সহায়ক প্রদীপনগুলি শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ার অপরিহার্য উপাদান। শিক্ষককেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থায়

Scanned with CamScanner

রূপান্তরিত হওয়ার শিক্ষা সহায়ক প্রদীপনগুলির গুরুত্ব বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে একথা অনস্বীকার্য। সুতরাং শিক্ষা সহায়ক প্রদীপনগুলিকে যদি সঠিকভাবে নির্বাচন, প্রস্তুত ও ব্যবহার করা যায় তবে শিখনের মানও অনেকবেশি হয়। শিক্ষক-হিসেবে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য হল উপযুক্ত প্রদীপন নির্বাচন, প্রস্তুতি, এবং শিক্ষণ-শিখনে সেগুলির ব্যবহারের নীতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়া। **নীতিগুলি নিম্নে উল্লেখ করা হল—**

(১) নির্বাচনের নীতি (Principles of selection)

(২) প্রস্তুতির নীতি (Principles of preparation)

(৩) উপস্থাপনার নীতি (Principles of Presentation)

(৪) ব্যবহারের নীতি (Principles of uses)

উপরোক্ত নীতিগুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে নিম্নে আলোচনা করা হল—

(১) নির্বাচনের নীতি (Principles of selection) :

শিক্ষাসহায়ক প্রদীপনগুলির সঠিক ব্যবহারের জন্য পর্যাপ্ত সময় এবং চিন্তা ভাবনার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া দরকার। শিক্ষণ কার্যকালে যে সমস্ত প্রদীপনগুলি ব্যবহার করা হয়, সেগুলির প্রস্তুতির জন্য সময় ও মনোযোগ যদি না দিই তাহলে সেগুলি ব্যবহার না করাই ভালো। সুতরাং শিক্ষামূলক প্রদীপন নির্বাচন করার সময় কতকগুলি শর্ত বা বিষয়ের কথা আমাদের মাথাতে রাখতেই হবে। সেগুলি হল—

(i) **পরিস্থিতি** (Circumstances)—শিক্ষামূলক প্রদীপনগুলি নির্বাচনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর বয়স, বৌদ্ধিক বা মানসিক ক্ষমতা, অভিজ্ঞতার প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। **এগুলি ছাড়াও আরো কতকগুলি বিষয় সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। সেগুলি হল—**

(a) কোন্ শিক্ষণ পদ্ধতিতে এটি ব্যবহার করা হবে; বক্তৃতা পদ্ধতি, প্রদর্শন পদ্ধতি, নাকি সেমিনারে।

(b) প্রদীপনটি কতবার ব্যবহার করা হবে, একবার নাকি বহুবার।

(c) প্রদীপনটি ব্যবহার করার জন্য প্রয়োজনমতো পরিকাঠামোগত ব্যবস্থা আছে কি না তা দেখতে হবে, যেমন— আসবাবপত্র, প্লাগ পয়েন্ট, কিংবা বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহের সুব্যবস্থা আছে কি না তা ভেবে দেখতে হবে।

(ii) **বিষয়বস্তু** (Subject matter)—

(a) যে বিষয় এবং তার অন্তর্গত যে topic বা বিষয়বস্তুটি পড়ানো হবে সেখানে প্রদীপন ব্যবহারের প্রয়োজন আছে কি না তা দেখতে হবে।

(b) প্রদীপনটির ব্যবহার বিশেষভাবে প্রভাব শিক্ষার্থীদের উপর রাখতে পারবে কি না তার বাস্তবতা নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে হবে।

ebook.dascoaching.in

(c) প্রদীপনটি বিষয়বস্তুর উপস্থাপনার ঠিক কোন্ পর্যায়ে প্রদর্শিত হবে এবং তার কোনো উপযুক্ত সুযোগ আছে কি না তা ভেবে দেখতে হবে।

(iii) **মূল্য** (Cost)— বেশিরভাগ শিক্ষা সহায়ক প্রদীপন বা যান্ত্রিক উপকরণগুলি বেশি ব্যয় সাপেক্ষ। সুতরাং ওভারহেড প্রোজেক্টর (OHP) অথবা কম্পিউটারের মতো যন্ত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে খুব সতর্কভাবে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে সেগুলি ব্যবহারের প্রয়োজন বা প্রাসঙ্গিকতা কতটা জরুরি। যদি ওই একই বিষয়বস্তু বা topic আরো কম বেশি যন্ত্র বা প্রদীপন ব্যবহার করে কার্যসম্পাদন সম্ভব হয় তবে তাই করতে হবে।

(iv) **সহজলভ্যতা** (Availability)— যদি কোনো প্রদীপনকে প্রয়োজনমতো এবং সময়মতো না পাওয়া যায় তাহলে সেই প্রদীপন ব্যবহারের কথা না ভাবাই উচিত।

(v) **যান্ত্রিকগুণ বা সুবিধা** (Technical Quality)— শিক্ষাসহায়ক প্রদীপন ব্যবহারের ফলে তার থেকে যান্ত্রিক সুবিধা পাওয়ার সুযোগ আছে কি না এবং কতখানি তা ভেবে দেখতে হবে।

(vi) **উপযুক্ততা** (Appropriateness)— শিক্ষা-সহায়ক প্রদীপনটি ব্যবহার করে শিক্ষণের যে উদ্দেশ্য পূরণ করতে শিক্ষক চাইছেন তা কি সম্ভব অর্থাৎ প্রদীপনটি শিক্ষার্থীর কাছে কতখানি উপযোগী হয়ে উঠতে পারে সে সম্পর্কে শিক্ষককে নিশ্চিত হতে হবে।

(২) প্রস্তুতের নীতি (Principles of preparation) :

(i) **শিক্ষকের প্রস্তুতি** (Teacher Preparation)—

(a) শিক্ষক ব্যবহারযোগ্য উপকরণ বা প্রদীপনটির গুরুত্ব এবং উদ্দেশ্যপূরণের ক্ষমতা সম্পর্কে অবহিত থাকবেন।

(b) শিক্ষার্থীদের চাহিদা এবং আগ্রহ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হবেন।

(c) সমস্যার প্রকৃতি বা যোগাযোগ প্রক্রিয়ার প্রকৃতি নির্বাচন করতে পারবেন।

(d) প্রদীপনটিকে কতখানি সর্বোচ্চ পর্যায়ে ব্যবহার করা যাবে সে সম্পর্কে শিক্ষকের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

(e) প্রয়োজনে ব্যবহারযোগ্য প্রদীপনটিকে শিক্ষক পরিবর্তন ও পরিমার্জন করে নেবেন।

(ii) **শ্রেণিকক্ষের প্রস্তুতি** (Prepare the classroom)— শ্রেণিকক্ষের প্রস্তুতির ব্যাপারে শিক্ষককে যথেষ্ট সচেতন হতে হবে। **তাঁকে দেখতে হবে শ্রেণিকক্ষে—**

(a) প্রয়োজনীয় সমস্ত উপকরণ আছে কি না এবং সেগুলির ব্যবস্থাপনা সম্ভব কি না।

(b) শ্রেণিকক্ষে প্রয়োজনমতো পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা আছে কি না।

(c) শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত বসার ব্যবস্থা এবং ভেন্টিলেশনের ব্যবস্থা আছে কি না ইত্যাদি।

Scanned with CamScanner

(১০) উপস্থাপন ও প্রশ্নকরণের দক্ষতা সম্পন্ন : শিক্ষাবিজ্ঞান শিক্ষককে শ্রেণিকক্ষে বিষয়বস্তুর উপস্থাপন করার সুনীতি এবং পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটাতে হবে। আবার উপস্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্তভাবে শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করার কৌশলগুলি সম্পর্কে অবহিত থাকতে হবে। প্রশ্নকরণের দক্ষতা সম্পন্ন শিক্ষক স্বাভাবিক ভাবেই শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণে সফল হতে পারেন।

(১১) উদ্ভাবনী ক্ষমতা ও সৃজনশীলতার অধিকারী। শ্রেণিকক্ষে শ্রেণি পরিচালনার গতিকে বজায় রাখতে হলে শিক্ষাবিজ্ঞান শিক্ষককে উদ্ভাবনী ক্ষমতা সম্পন্ন এবং সৃজনশীল ব্যক্তিত্বের অধিকারী হওয়া দরকার। সৃষ্টিশীলতার দৃষ্টিভঙ্গিতে তিনি স্বচ্ছন্দে শিক্ষার্থীদেরকে পাঠে মনোযোগী করে তুলতে সক্ষম হতে পারেন।

(১২) পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ও গবেষণামূলক মনোভাব : শিক্ষার্থীরা সকলেই একইরকম মেধাসম্পন্ন নয়, আবার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র অনুযায়ী একজন শিক্ষার্থী অন্যজনের তুলনায় আলাদা। শিক্ষাবিজ্ঞান শিক্ষক এই বৈচিত্রপূর্ণ শিক্ষার্থীদের প্রত্যেককেই সযত্নে পর্যবেক্ষণ করবেন এবং শ্রেণিশিক্ষণকে যথার্থভাবে কার্যকরী করে তুলতে গবেষণামূলক মনোভাব নিয়ে তাদের সমস্যার সমাধানের পথে অগ্রসর হবেন।

❖ ৪.১.১.৩ ন্যাশনাল নলেজ কমিশনের মতে শিক্ষকের গুরুত্বপূর্ণ গুণাবলি (Important Qualities of Teacher According to National Knowledge Commission, 2008) :

ন্যাশনাল নলেজ কমিশন (২রা মে, ২০০৮), ভারত সরকার একজন সুশিক্ষকের গুরুত্বপূর্ণ গুণাবলি প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত দিকগুলি উল্লেখ করেছেন—

(১) **সমঅনুভূতি সম্পন্ন** (Empathy) : শিক্ষাবিজ্ঞান শিক্ষককে শিক্ষার্থীদের সমভূতি অনুভূতি সম্পন্ন হবেন। শিক্ষার্থীদের সঠিকভাবে উপলব্ধি করার জন্য তাদের আবেগ ও অনুভূতিকে শিক্ষকের নিজের অনুভূতির মেলানোর জন্য তাঁকে হতে হবে নমনীয়। শিক্ষার্থীদের ভালো মন্দ, সুখ-দুঃখের অংশীদার হতে হবে।

(২) **ইতিবাচক মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি** (Positive mental attitude) : শিক্ষকের মধ্যে থাকতে হবে ইতিবাচক মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি। নেতিবাচক মানসিকতা বর্জন করে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে বস্তু এবং ঘটনাবলিকে দেখতে হবে। সবকিছুর মধ্যে ভালো দিকও যে আছে তা উপলব্ধি করতে হবে শিক্ষার্থীদের। এই সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষমতা শিক্ষকের থাকতে হবে।

(৩) **পরিবর্তনে মুক্তমনা** (Open to change) : জীবন ও জগত স্থিতিশীল নয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সবকিছুরই পরিবর্তন ঘটে। এই বস্তুজগতে এবং মানবজীবনেও সেই পরিবর্তনের ধারা অব্যাহত। গতিশীলতাই জীবন। একজন শিক্ষাবিজ্ঞান শিক্ষক সেই সত্যটি মেনে নিয়ে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে মনে রেখেও নতুন ধ্যান-

ধারণা, নতুন ব্যবস্থা, নতুন দৃষ্টিভঙ্গিকে তিনি সবসময় স্বাগত জানাবেন মুক্তমন নিয়ে।

(৪) **সৃজনশীল** (Creative) : সৃজনশীল এবং প্রেরণা সঞ্চারকারী শিক্ষণ পদ্ধতির সাহায্যে শিক্ষক তাঁর শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রেরণা সঞ্চারে উদ্বুদ্ধ করবেন। শিক্ষকের স্বাতন্ত্রপূর্ণ বৈশিষ্ট্য নিয়ে শিক্ষার্থীদের নিকট এমনভাবে উপস্থাপিত করবেন যাতে বহু মানুষের ভিড়ের মধ্যে শিক্ষার্থীরা তাঁকে অনায়াসে খুঁজে নিতে পারে।

(৫) **রসবোধ সম্পন্ন** (Sense of humour) : একথা সকলেরই জানা যে রসবোধ সম্পন্ন শিক্ষক সহজেই শ্রেণিকক্ষের বাধাবিঘ্ন দূর করে পঠনপাঠনের পরিবেশকে অনুকূল পরিস্থিতিতে আনতে সক্ষম। বিশেষ করে কঠিন ও দুর্বোধ্য বিষয়বস্তু উপস্থাপনের ক্ষেত্রে মাঝে মধ্যে সূক্ষ্ম রসবোধের পরিচয় দিতে হবে শিক্ষককে।

(৬) **উপস্থাপনে দক্ষতা** (Presentation skills) : শিক্ষকের এটা জানা আছে যে, শিক্ষার্থীদের দর্শনেন্দ্রিয়, শ্রবণেন্দ্রিয় যথেষ্ট ক্রিয়াশীল এবং সংবেদনশীল, সেই সঙ্গে তারা গতিধর্মী। শিক্ষক তাঁর পাঠ-উপস্থাপন কালে এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে ব্যবহার করার চেষ্টা করবেন। তাঁর বাচনভঙ্গি এবং ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি শিক্ষকের দেহের ভাষায় ফুটে উঠবে।

(৭) **প্রশান্তভাব সম্পন্ন** (calmness) : শিক্ষার্থীদের মধ্যে কেউ কেউ বেশ আগ্রাসী, নেতিবাচক মনোভাব সম্পন্ন এবং এমন সব আচরণ সম্পাদন করে যার মূলে কতকগুলি বিশেষ কারণ থাকে। শিক্ষকের জানা দরকার যে, এইসব শিক্ষার্থীরা এমন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এসেছে যে, তার ফলশ্রুতি তাদের আচরণে প্রকাশ পায়। এ ক্ষেত্রে শিক্ষক নিজে থাকবেন শান্ত, সংযত এবং সমগ্র পরিস্থিতিকে তিনি নিয়ন্ত্রণে রাখবেন।

(৮) **শ্রদ্ধাশীল** (Respectful) : এই জগতে প্রত্যেকেরই একটা স্থান আছে। সুতরাং শিক্ষার্থীদেরও একটা নিজস্ব স্থান আছে। শিক্ষক যেমন তাঁর পেশার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবেন, তেমনি তিনি তাঁর সহকর্মী বন্ধু-বান্ধব এবং প্রিয় শিক্ষার্থীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবেন। এই শ্রদ্ধা প্রদর্শনের দ্বারা তিনি সবার নিকট শ্রদ্ধার পাত্র হবেন।

(৯) **প্রেরণা সঞ্চারকারী** (Inspirational) : প্রতিটি মানুষের মধ্যে কিছু ক্ষমতা আছে যার দ্বারা সে জগতে নিজের স্থান করে নেয়। অনুরূপে শিক্ষার্থীরা ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য অনুযায়ী আলাদা আলাদা হলেও তাদের প্রত্যেকের মধ্যে এমন কিছু ক্ষমতা থাকে যার দ্বারা তারা সাফল্য পেতে পারে। এক্ষেত্রে শিক্ষক তাঁদের নিজস্ব ক্ষমতা, প্রকৃতি, রুচিকে উপলব্ধি করে তাদেরকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবেন। তাদের মধ্যেও যে সুপ্ত প্রতিভা, দক্ষতা এবং ক্ষমতা আছে যেগুলির প্রকাশ ঘটাতে তিনি শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রেরণা সঞ্চার করবেন।

Scanned with CamScanner

❖ ৪.১.১.৪ শিক্ষাবিজ্ঞান শিক্ষকের নীতিবোধ (Ethics of an Education Teacher) :

যথার্থ শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হল নৈতিক মান সম্পন্ন মানুষ তৈরি করা। যথার্থ শিক্ষাই শিক্ষার্থীকে উচিত-অনুচিত, ন্যায়-অন্যায়, সত্য-মিথ্যা সম্পর্কে অবহিত করে নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষে পরিণত করে। স্বাভাবিকভাবেই এই ধরনের শিক্ষার্থীকে গঠন করতে পারে একমাত্র যথার্থ নীতিবোধ সম্পন্ন শিক্ষক। শিক্ষাবিজ্ঞান শিক্ষকের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। **শিক্ষাবিজ্ঞান শিক্ষকের নীতিবোধের বিষয়গুলি নিম্নে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল।**

(১) শিক্ষার্থীর দৈহিক, মানসিক, প্রাক্ষভিক, নৈতিক, উন্নতি ও কল্যাণের জন্য শিক্ষাবিজ্ঞান শিক্ষক সর্বসময় ও সর্বকাজে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন।

(২) ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য শিক্ষক কখনোই বিদ্যালয়ের নাম, যশ প্রতিষ্ঠা ও প্রভাবকে কাজে লাগাবেন না।

(৩) শিক্ষাবিজ্ঞান শিক্ষক হবেন সৎ, ন্যায়পরায়ণ, মূল্যবোধ সম্পন্ন এবং নৈতিক চরিত্রের অধিকারী। তাঁর দৃষ্টান্তযোগ্য নৈতিক আচরণ শিক্ষার্থীদের নৈতিক চরিত্রকে প্রভাবিত করবে।

(৪) শিক্ষক তাঁর অভ্যাস, আচার-আচরণ এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে সংযমী, ধীর তথা প্রশান্ত হবেন। সমস্তরকম কুঅভ্যাস ও নেশা থেকে তিনি নিজেকে দূরে রাখবেন।

(৫) শিক্ষাবিজ্ঞান শিক্ষক তাঁর পেশাগত জীবনে নিজের মর্যাদা (dignity) সংহতিবোধকে (solidarity) সকল সময় বজায় রাখার চেষ্টা করবেন।

(৬) শিক্ষক তাঁর কাজে হবেন অত্যন্ত সময় সচেতন ও নিয়মনিষ্ঠ।

(৭) শিক্ষার বিভিন্ন দিকে যে সমস্ত আধুনিক চিন্তার প্রসার, জ্ঞানের সঞ্চয়ন এবং উন্নয়ন সংঘটিত হচ্ছে সেগুলির সঙ্গে নিজেকে পরিচিত করবেন।

(৮) শুধুমাত্র শিক্ষার্থীদের নিকটই নয়, অভিভাবক, সামাজিক গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের নিকট শিক্ষক তাঁর নৈতিক আচরণকে সবসময় তুলে ধরবেন।

(৯) ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য শিক্ষাবিজ্ঞান শিক্ষক কখনোই কোনো পাঠ্যপুস্তক বা অন্য কোনো উপকরণের জন্য সুপারিশ করবেন না।

(১০) অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির টানে কখনোই একজন শিক্ষাবিজ্ঞান শিক্ষক প্রাইভেট টিউশন করবেন না।

❖ ৪.১.১.৫ আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষাবিজ্ঞান শিক্ষকের ভূমিকা (Role of Education Teacher in Modern Education) :

প্রচলিত বা সনাতন শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষা ছিল একসময় গুরুমুখী বা শিক্ষককেন্দ্রিক। আজ আধুনিক শিক্ষায় সেই ধারা পরিবর্তিত হয়েছে, শিক্ষা হয়েছে শিশুকেন্দ্রিক। কিন্তু তাই বলে শিক্ষকের ভূমিকা গুরুত্বহীন হয়ে যায়নি। বরং শিক্ষকের ভূমিকা ও দায়িত্ব বেড়েছে অনেকখানি। বস্তুত শিক্ষকের ভূমিকার ধরন পরিবর্তিত হয়েছে। আধুনিক শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষায় শিক্ষক শিক্ষার্থীর গ্রহণ ক্ষমতা, মানসিক সামর্থ্য, আগ্রহ, রুচি, চাহিদা ও প্রবলতা অনুযায়ী তার সর্বাঙ্গীণ বিকাশে দায়িত্বশীল ব্যক্তি। সেই নিরিখেই শিক্ষকের ভূমিকাকে নিম্নলিখিত দিক থেকে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল :

(১) সহায়ক (Facilitator)

(২) অভিজ্ঞ ও নির্ভরযোগ্য উপদেষ্টা (Mentor)

(৩) প্রেষণা সঞ্চারকারী (Motivator)

(৪) সমস্যা সমাধানকারী (Problem solver)

(১) **সহায়কের ভূমিকায় শিক্ষক :** সহায়কের ভূমিকায় শিক্ষক যে সমস্ত দায়িত্ব পালন করতে পারেন সেগুলিকে আমরা নিম্নলিখিত ভাবে উপস্থাপিত করতে পারি:

(i) শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে তাঁর পাঠের বিষয়বস্তুকে সহজভাবে, সুষ্ঠুভাবে শিক্ষার্থীদের নিকট তুলে ধরবেন। বিষয়বস্তুর অর্থ-উপলব্ধি, সমস্যার বর্ণনা ও সমাধানের উপায়গুলিকে পথ-নির্দেশ করবেন।

(ii) বিষয়বস্তুকে সহজবোধ্য করে উপস্থাপিত করতে হবে শিক্ষককে—আধুনিক মনস্বত্তাত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এবং যুক্তিসম্মতভাবে সংগঠিত করতে হবে।

(iii) বিষয়বস্তুর মূল ভাবকে শিক্ষার্থীর নিকট বোধগম্য করে তোলার জন্য শিক্ষক এমন পদ্ধতি ও কৌশল ব্যবহার করবেন যাতে শিক্ষার্থীর বয়স, গ্রহণক্ষমতা বা বোধগম্যতার স্তর, রুচি, চাহিদা ও প্রবণতা গুরত্ব পায়।

(iv) নির্দেশনা চলাকালীন যতখানি সম্ভব এবং প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষক মিথস্ক্রিয়াকে গুরুত্ব দেবেন। এই মিথস্ক্রিয়া মূলত শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে মিথস্ক্রিয়ার। সেক্ষেত্রে প্রশ্নকরণের সময় প্রয়োজন মতো সংকেত সরবরাহ করবেন।

(v) উপযুক্ত পর্যবেক্ষণের দ্বারা শিক্ষার্থীর দুর্বলতাগুলিকে চিহ্নিত করে শিক্ষক তাঁর শিক্ষার্থীর বিষয় উপলব্ধিগত দুর্বলতা দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় সংশোধনমূলক শিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

Scanned with CamScanner

সহায়কের ভূমিকায় শিক্ষক উপরোক্ত দায়িত্বগুলি পালন করার অবশ্যই খেয়াল রাখবেন যে, দুটি দৃষ্টিভঙ্গি সে ক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে। যেমন: শিক্ষক যখন বিষয়বস্তু উপস্থাপন করবেন, শিক্ষার্থীর নিকট বোধগম্য করতে চাইবেন তখন তিনি হবেন বিষয়ের তত্ত্বগত উপস্থাপক, ব্যাখ্যাকারী। শিক্ষণ হবে শিক্ষক কেন্দ্রিক। শিক্ষার্থীদের ভূমিকা গৌণ, কিন্তু শিক্ষকের ভূমিকা মুখ্য।

কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের শিখন হবে শিক্ষার্থীদের মিথস্ক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে। পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তত্ত্বগত দিককে প্রয়োগধর্মী অথবা বাস্তব পরিস্থিতিমূলক দিকে শিখনকে সার্থক করে তুলতে হবে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকা গৌণ, তিনি পর্যবেক্ষণ করবেন, শিক্ষার্থীদের সমস্ত কাজকে লক্ষ করবেন, শিক্ষার্থীদের ভূমিকা মুখ্য।

সহায়কের ভূমিকায় শিক্ষকের আরও একটি দায়িত্ব এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি শিক্ষার্থীদের শিখনে উৎসাহিত এইভাবে করবেন যাতে তারা লাইব্রেরির কাজ, প্রকল্পমূলক কাজ, পরীক্ষণমূলক কাজ, গৃহকাজ সম্পর্কিত বিষয়গুলি আগ্রহ সরকারে করতে পারে। এ জন্য শিক্ষক প্রয়োজনীয় সহায়তা করবেন। প্রতিটি ক্ষেত্রেই শিক্ষক পরিচালকের ভূমিকায় সহায়তা করবেন।

(২) **অভিজ্ঞ ও নির্ভরযোগ্য উপদেষ্টার ভূমিকায় শিক্ষক :** বিদ্যালয়ের শ্রেণি কক্ষে নির্দেশনা সংক্রান্ত কার্যাবলি ছাড়াও শিক্ষক আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় আরও একটি তাৎপর্যপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। বস্তুত শিক্ষক হলেন শিক্ষার্থীর মুক্তিদাতা। শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব, চিন্তাধারা, জীবনাদর্শ দ্বারা শিক্ষার্থী এমন ভাবে প্রভাবিত হয় যে, ভবিষ্যৎ জীবন ও সমাজের ক্ষেত্রে তার অবস্থানকে সে সুনিশ্চিত এক নিরাপদ করে তুলতে সক্ষম হয়। সেজন্য শিক্ষক এখানে শিক্ষার্থীর নিকট এক অভিজ্ঞ ও নির্ভরযোগ্য উপদেষ্টা। যথোপযুক্ত পরামর্শ ও উপদেশ দানের দ্বারা শিক্ষক তাঁর সন্তানতুল্য শিক্ষার্থীকে জীবনের প্রতিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত করতে এগিয়ে আসেন। এই উপদেষ্টার ভূমিকায় শিক্ষক নিম্নলিখিত ভাবে দায়িত্বপালন করেন।

(i) শিক্ষামূলক উপদেশ	(ii) বৃত্তিমূলক উপদেশ
(iii) সামাজিক উপদেশ	(iv) স্বাস্থ্যসংক্রান্ত উপদেশ
(v) মূল্যবোধ সংক্রান্ত উপদেশ	(vi) চিত্তবিনোদন সংক্রান্ত উপদেশ

উপদেষ্টার ভূমিকায় উপরোক্ত দিকগুলি খুব সংক্ষেপে এখানে উল্লেখ করা হল—

(i) **শিক্ষামূলক উপদেশ :** শিক্ষামূলক উপদেষ্টা হিসেবে শিক্ষকের কাজ হল তাঁর শিক্ষার্থীদের শিক্ষামূলক অগ্রগতির খোঁজ খবর রেখে সেদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা, পশ্চাদবর্তী কিংবা প্রতিভাবান ও উন্নত সৃজনশীল ক্ষমতা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের চিহ্নিত

করে, তাদের ক্ষমতা ও চাহিদা অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা করা, শিক্ষা সংক্রান্ত নানারকম তথ্য সরবরাহ করে শিক্ষার্থীকে সর্বাধুনিক স্থানে পৌঁছানো।

(ii) **বৃত্তিমূলক উপদেশ :** বৃত্তিমূলক উপদেশ হিসেবে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন রকম বৃত্তিমূলক দিক ও তার প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করে শিক্ষার্থীকে ভবিষ্যৎ বৃত্তি নির্বাচনে সহায়তা করেন।

(iii) **সামাজিক উপদেশ :** শিক্ষার্থী যাতে ভবিষ্যতে সমাজ জীবনের উপযোগী করে নিজেকে গড়ে তুলতে পারে তার জন্য উপযুক্ত মনোভাব তৈরিতে শিক্ষার্থীকে সহায়তা করেন শিক্ষক।

(iv) **স্বাস্থ্যসংক্রান্ত উপদেশ :** শিক্ষার্থীর দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নয়ন না ঘটলে তার শিক্ষা যথার্থ হয় না। শিক্ষার্থী কীভাবে সেই দৈহিক ও মানসিক সুস্থতা লাভ করতে পারে তার উপযুক্ত উপদেশ শিক্ষক প্রদান করেন।

(v) **মূল্যবোধ-সংক্রান্ত উপদেশ :** উপযুক্ত মূল্যবোধ ছাড়া শিক্ষার্থী নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না। মানুষের জীবনে বস্তু আর জীবনের বিভিন্ন দিকের প্রকৃত তাৎপর্য বা গুরুত্ব উপলব্ধিই হল মূল্যবোধ। শিক্ষক শিক্ষার্থীর এই মূল্যবোধ গঠনে যথার্থ সহায়তা করেন।

(vi) **চিত্তবিনোদন সংক্রান্ত উপদেশ :** শিক্ষার্থী তার অবসরকালীন সময় আনন্দদায়ক কাজকর্মের মাধ্যমে উপভোগ করবে, তার জন্যও উপদেশ দেন শিক্ষক।

(৩) **প্রেষণা সঞ্চারকারী হিসেবে শিক্ষক :** প্রেষণা সঞ্চারকারী হিসেবেও শিক্ষক যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। আধুনিক মনোবিদগণ মত প্রকাশ করেছেন যে, শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ নাগরিক জীবনের আচরণের নির্দিষ্ট গতি নির্ণয় করতে হলে তাদের মধ্যে প্রেষণার সঞ্চার করা জরুরি। শিক্ষক হিসেবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই প্রেষণা সঞ্চার করার জন্য তিনি নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করতে পারেন :

(i) **পুরস্কার প্রদান :** শিখনে শিক্ষার্থীকে সহায়তা করার জন্য শিক্ষক পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করতে পারেন। সেক্ষেত্রে পুরস্কার প্রথমদিকে মূর্তবস্তু কেন্দ্রিক হলেও পরবর্তীকালে তা বিমূর্ত রূপ গ্রহণ করে অন্তঃজ পুরস্কারে পরিবর্তিত হতে পারে।

(ii) **সাফল্যে অনুপ্রাণিত করা :** শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত প্রেষণাকে যথার্থভাবে ধরে রাখতে হলে শিক্ষককে এমন সব শিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল নির্বাচন করতে হবে যাতে শিক্ষার্থী তার সাফল্য সম্পর্কে অবগত হওয়ার সুযোগ পায়। অনুপ্রাণিত হতে পারে। সেই বিষয়টি মনে রেখে শিক্ষক বিষয়বস্তু ও শিক্ষণ পদ্ধতি নির্বাচন করবেন।

(iii) **শিক্ষার্থীদের প্রশংসা করা :** প্রতিটি শিক্ষার্থী নিজেকে শ্রদ্ধা করতে চায়, সে জন্য আত্মশ্রদ্ধার চাহিদা শিক্ষার্থীর পরিতৃপ্তি ঘটাতে সক্ষম হয়। শিক্ষার্থীদের এই আত্মশ্রদ্ধার চাহিদার পরিতৃপ্তির জন্য শিক্ষকের কাজ হল শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত ও প্রশংসা করা

Scanned with CamScanner

(iv) **যথার্থ মূল্যায়ন করা :** প্রতিটি শিক্ষার্থী একজন অন্যজনের থেকে আলাদা। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অনুযায়ী তাদের চাহিদা, রুচি, প্রবণতা ও মানসিক সামর্থ্য পৃথক পৃথক। শিক্ষার্থীদের এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে মনে রেখে চাহিদা ও সামর্থ্য অনুযায়ী মূল্যায়নের ব্যবস্থা করার মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রেষণা সঞ্চার করতে সক্ষম হন।

(v) **পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব :** শিক্ষার্থীদের নিজেদের পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব গড়ে উঠলে তাদের শিখনে প্রেষণা লাভ সম্ভব হয়। এই ব্যাপারে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব তৈরিতে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারেন।

(৪) **সমস্যা সমাধানকারী হিসেবে শিক্ষক :** শিক্ষার্থীর জীবনে শিক্ষকের ভূমিকা বহুমুখী। শিক্ষার্থীর জীবনের নানা সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে তার ভূমিকা কতখানি তা একমাত্র শিক্ষার্থীই অনুধাবন করতে পারে। শিক্ষার্থীর সমস্যা শুধুমাত্র তার শিক্ষা জীবনেই সীমাবদ্ধ নয়, তার সমস্যাও বহুমুখী। শিক্ষার্থীর সমস্যা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাক্ষেত্রে, পরিবারে, বন্ধু-বান্ধব-এর মধ্যে, স্বাস্থ্যসংক্রান্ত ব্যাপারে। তার সমস্যা সর্বব্যাপী। শিক্ষার্থীর এই সর্বব্যাপী সমস্যার সমাধানেও শিক্ষক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। এ জন্য শিক্ষক নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করতে পারেন :

(i) **সমস্যার প্রকৃতি সম্পর্কে শিক্ষার্থীকে অবহিত করা :** শিক্ষকের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হল শিক্ষার্থীকে তার সমস্যার প্রকৃতি সম্পর্কে অর্থাৎ সমস্যামূলক পরিস্থিতিকে উপলব্ধি করতে সহায়তা করা। শিক্ষক প্রত্যক্ষভাবে সমস্যার সমাধান করে দেবেন না, কিন্তু সমস্যা সমাধানের পথ নির্দেশ করে দেবেন।

(ii) **সমস্যা সমাধানের মনোভাব গঠন :** শিক্ষার্থী যাতে বাস্তব জীবন পরিবেশে উদ্ভূত নিত্য নতুন সমস্যাকে নিজের চেষ্টায় স্বাধীনভাবে সমাধানে অগ্রসর হতে পারে তার জন্য উপযুক্ত মনোভাব গঠন করা শিক্ষকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

(iii) **সমস্যা সমাধানের সচেতনতার বিকাশসাধন :** কোনো বিশেষ পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থী যখন সম্মুখীন হয়, তখন যদি সমস্যার উপাদানগুলি তাকে উদ্দীপ্ত করে, অর্থাৎ সমস্যার উপাদানগুলি যদি শিক্ষার্থীকে উদ্দীপ্ত বা বিচলিত করে তার বাস্তব জীবনের ভারসাম্য নষ্ট করে তাহলে সমস্যামূলক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থী যদি সচেতন না হয়, তাহলে তার কাছে কোনো সমস্যাই সমস্যা হবে না। সেই কারণে শিক্ষকের কাজ হল শিক্ষার্থীকে বাস্তব জীবনবোধে উদ্বুদ্ধ করে সমস্যা সম্পর্কে সচেতনতার বিকাশ ঘটানো।

৪.২সমাজবিজ্ঞান (শিক্ষাবিজ্ঞান) শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়ন [Professional Growth of Social Science (Education) Teacher] :

৪.২.১ ভূমিকা (Introduction) :

প্রচলিত বা সনাতন শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষা ছিল একসময় গুরুমুখী বা শিক্ষককেন্দ্রিক। আজ আধুনিক শিক্ষায় সেই ধারায় পরিবর্তন ঘটেছে। শিক্ষা হয়েছে শিশুকেন্দ্রিক। আধুনিক এই শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীর গ্রহণ ক্ষমতা, মানসিক সামর্থ্য, আগ্রহ, রুচি, চাহিদা, প্রবণতা অনুযায়ী তার সর্বাঙ্গীন বিকাশে দায়িত্বশীল ব্যক্তি। সেই নিরিখে শিক্ষকের ভূমিকাতেও এসেছে পরিবর্তন। আবার অন্যদিকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিজ্ঞানের সুবাদে আমাদের পরিবার, গোষ্ঠী, জীবন, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনেও এসেছে দ্রুত পরিবর্তন। শিক্ষা হল এমন একটি ক্ষমতা যা দ্রুত পরিবর্তনশীল। এই পরিস্থিতিতে একদিকে শিশুর শিক্ষার ধরন আবার অন্যদিকে পরিবার, গোষ্ঠী, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের দ্রুত পরিবর্তনকে সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবে মোকাবিলা করতে শিশু শিক্ষার্থীকে সক্ষম করে তুলতে পারে একমাত্র শিক্ষা। কিন্তু সেই শিক্ষাকে হতে হবে উন্নতমানের শিক্ষা বা গুণগতমানের শিক্ষা। স্বাভাবিকভাবেই দাবি উঠেছে উন্নতমানের শিক্ষা প্রবর্তনের। উন্নতমানের বা গুণগতমানের ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলি নির্ধারক হিসেবে কাজ করে তাদের মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য হল উচ্চমানের শিক্ষা পদ্ধতি ও উচ্চমানের শিক্ষক। আর এখানেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়নের প্রসঙ্গ। শিক্ষকদের সেই পেশাগত উন্নয়ন প্রসঙ্গেই আমরা এখানে আলোচনা করার চেষ্টা করবো।

৪.২.২ ভারতে শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়নের ঐতিহাসিক পটভূমিকা (Historical Background of Professional Development of Teachers in India) :

ভারতবর্ষে শিক্ষক-শিক্ষণের ইতিহাস অতি সাম্প্রতিক কালের। প্রাচীনভারতে শিক্ষা ছিল গুরুমুখী বা গুরুকেন্দ্রিক। জ্ঞানসমৃদ্ধ গুরুর সেজন্য কোনো প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ছিল না। সবচেয়ে জ্ঞানী শিক্ষার্থীই একদিন এই দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসতেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতেও শিক্ষক-শিক্ষণের কথা তেমনভাবে শোনা যায় না। ১৭১৬ খ্রিস্টাব্দে দিনেমার মিশনারিরা শিক্ষক প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে ট্রাঙ্কুবারে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। একে অনুসরণ করে বোম্বাই, মাদ্রাজ ও কোলকাতাতেও কতকগুলি শিক্ষক-প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে ড: অ্যান্ড্রুবেল (Dr. Andrew Bell) (মাদ্রাজ মিলিটারি অ্যাসাইলামের প্রথম সুপারিনটেনডেন্ট) 'মনিটারিয়্যাল সিস্টেম'-কে গ্রহণ করার প্রেক্ষিতে শিক্ষক-প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে 'ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানটি 'ল্যাঙ্কাস্টারিয়ান সিস্টেমে' শিক্ষক প্রশিক্ষণের প্রোগ্রাম গ্রহণ করে। মাদ্রাজে ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে স্যার টমাস মনরো (Sir Thomas Munro) পরামর্শক্রমে

Scanned with CamScanner

শিক্ষক-প্রশিক্ষণের একটি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে কোলকাতায় গড়ে ওঠে 'নর্মাল স্কুল'। আগ্রা, মীরাট এবং বেনারসেও এইভাবে তিনটি নর্মাল স্কুল গড়ে ওঠে যথাক্রমে ১৮৫২, ১৮৫৬ এবং ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে। ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে গ্র্যান্ট ইন-এড নিয়ম সংশোধিত হওয়ার প্রেক্ষিতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্যোগ দেখা যায়। এরপর প্রথম সরকারি নর্মাল স্কুল মাদ্রাজে (১৮৫৬) এবং দ্বিতীয়টি লাহোরে (১৮৭৭) স্থাপিত হয়। এরপর স্বাধীনভারতে ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে বরোদায় প্রথম শিক্ষক-শিক্ষণের বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্ব পায়। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সময়কালে (১৯১৬-৬৬) শিক্ষক-প্রশিক্ষণ-এর বিষয়টিতে অত্যন্ত জোর দেওয়া হয়। ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে NCTE স্থাপিত হওয়ার পর শিক্ষক-প্রশিক্ষণের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব পেতে থাকে। NCTE-কে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে। কার্যত এরপর থেকে শিক্ষক-শিক্ষণের কার্যাবলির সামগ্রিক দায়দায়িত্বের বড়ো অংশ NCTE-এর নিয়ন্ত্রণে চলে যায়, যা আজও বহাল আছে। NCTE বারে বারে গুরুত্ব দিয়েছে শিক্ষক-শিক্ষণের গুণগত মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে। এই প্রসঙ্গেই আমরা পরবর্তী অংশের আলোচনায় আসছি।

❑ ৪.২.৩ শিক্ষকের পেশাগত মান উন্নয়নের বিভিন্ন দিক (Different aspects of Professional Growth of Teachers) :

শিক্ষকের মান উচ্চ না হলে শিক্ষায় উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পেতে পারে না। এরজন্য যে সমস্ত মান শিক্ষকের থাকা দরকার যেগুলি হল—

- শিক্ষকের পেশাগত শিক্ষা।
- শিক্ষকের দক্ষতা
- পেশাগত উন্নয়ন
- শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিক্ষায় ধারাবাহিক সমর্থন।
- পেশায় সক্রিয় অংশগ্রহণ।
- শিক্ষকের ফিডব্যাক পদ্ধতি।
- শিক্ষার্থী সম্পর্কে ধারণা।
- শিক্ষকের কাজের পরিবেশ ইত্যাদি।

এগুলি প্রতিটি শিক্ষকের পেশাগত বিষয়ে সাহায্য করে। তথাপি আমরা এখানে শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়নের ক্ষেত্রটি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করার চেষ্টা করছি। শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়নের ক্ষেত্রটিকে আমরা তিনটি দিক থেকে আলোচনা করতে পারি।

১। কর্ম পূর্ববর্তী ও কর্মরত অবস্থায় শিক্ষক-প্রশিক্ষণ (Preservice and Inservice Training)

২। সম্প্রসারণমূলক ও সমাজ উন্নয়নমূলক কার্যাবলি (Extension and Community Development Activities)

৩। সরকার এবং শিক্ষক সংগঠনের ভূমিকা (Role of Government and Teacher Organisation)

❑ ৪.২.৪ কর্মপূর্ববর্তী ও কর্মরত অবস্থায় শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা (Pre-service and Inservice Training and Education) :

পরিবর্তিত সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতিতে আজকের আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় পাঠ্যক্রম শুধুমাত্র জ্ঞান অর্জনের জন্য নয়, শিক্ষক শুধুমাত্র তার বিষয় জ্ঞানেই সীমাবদ্ধ নন। শিশুশিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত ভবিষ্যৎ এবং সামাজিক দিক থেকে গোষ্ঠীজীবন বা রাষ্ট্রীয় ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার জন্য শিক্ষা আজ অনেক প্রসারিত ও উদার দৃষ্টিভঙ্গিতে দায়বদ্ধ। এই পরিস্থিতিতে সমাজ বা রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে শিক্ষাদানের মতো মহান কাজটির দায়িত্ব কখনোই প্রশিক্ষণহীন ব্যক্তির নিকট ছেড়ে দেওয়া যায় না এবং শিক্ষার্থীর নিকট তা আকর্ষণীয়ও হবে না। আজকের শিক্ষকের নিকট শিক্ষাদানের দায়িত্বের বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষক একাধারে সহায়ক, অভিজ্ঞ ও নির্ভরযোগ্য উপদেষ্টা, প্রেষণা সঞ্চারকারী, সমস্যা সমাধানকারী এবং সর্বোপরি শিক্ষার্থীর সামগ্রিক জীবন গঠনকারী। স্বাভাবিক ভাবেই কর্মপূর্ববর্তী ও কর্মরত অবস্থায় শিক্ষকের প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার গুরুত্বকে কোনোভাবেই অস্বীকার করা যায় না।

◆ কর্মপূর্ববর্তী অবস্থায় শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা (Pre-service Training and Education) :

কর্মপূর্ববর্তী অবস্থায় শিক্ষকের প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব নিম্নে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল—

(i) **উন্নত গুণমানের শিক্ষক:** কর্মপূর্ববর্তী অবস্থায় একজন ব্যক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত প্রধানত তার নির্দিষ্ট বিষয় জ্ঞানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেন। কিন্তু আজকের শিক্ষক শুধু তার বিষয় জ্ঞানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকলেই চলবে না। শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদানের সময় তার আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে তার ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যগুলি শিক্ষককে জানতে হয়। শিশুকে তার ব্যক্তিগত ও সমাজগত দিক থেকে উপলব্ধি করার দরকার হয়। কর্মপূর্ববর্তী অবস্থায় এই সম্পূর্ণ বিষয়টি ভাবী শিক্ষকের উপলব্ধিতে থাকে না। শিক্ষার পদ্ধতি সমেত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ সহ নানা বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হয় যা কোনো একজন ব্যক্তি তার বিষয়জ্ঞানে পেতে পারেন না। এজন্য পেশাগত প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা লাভের প্রয়োজন আছে। শিক্ষকের

Scanned with CamScanner

মান উচ্চ না হলে শিক্ষায় উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পেতে পারে না। এরজন্য যে সমস্ত বিষয় শিক্ষকের থাকা দরকার সেগুলি হল—

- শিক্ষকের পেশাগত শিক্ষা।
- শিক্ষকের দক্ষতা।
- পেশাগত উন্নয়ন।
- শিক্ষর্থীকেন্দ্রিক শিক্ষায় ধারাবাহিক সমর্থন।
- পেশায় সক্রিয় অংশগ্রহণ।
- শিক্ষকের ফিডব্যাক পদ্ধতি।
- শিক্ষার্থী সম্পর্কে ধারণা।
- শিক্ষকের কাজের পরিবেশ।

উপরোক্ত দিকগুলির প্রতিটি শিক্ষকের পেশাগত বিষয়ে সহায়তা করে। শিক্ষক তাঁর পেশায় যদি সফল না হন তাহলে শিক্ষণে উৎকর্ষতা বাড়বে এবং ফল হিসেবে উন্নতমানের শিক্ষাপ্রদান শিক্ষকের পক্ষে সম্ভব।

(ii) **শিক্ষার অধিকার আইন:** একবিংশ শতাব্দীর গোড়াতেই ভারতবর্ষে শিক্ষার অধিকার আইন বা Right to Free and Compulsory Education (RTE Act, 2009)-তে বলা হয়েছে শিক্ষাক্ষেত্রে অতি প্রয়োজনীয় বিষয় হল উন্নত গুণমানের শিক্ষক এবং উন্নত গুণমান সম্পন্ন শিক্ষক। আইনে বলা হয়েছে প্রত্যেকটি বিদ্যালয় অবশ্যই পরিকাঠামো এবং শিক্ষকগণের ছাঁচ মেনে চলবে কার্যকরী শিক্ষার পরিবেশের জন্য। প্রাথমিক স্তরে (অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত) প্রতি ৬০ জন শিক্ষার্থীর জন্য দুজন করে শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক থাকবেন। সুতরাং উচ্চমানের শিক্ষার জন্য প্রয়োজন হল উচ্চগুণমানের শিক্ষক (Quality Teacher) আর উচ্চগুণমানের শিক্ষক পেতে হলে চাই উচ্চ গুণমানের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও উচ্চ গুণমানের প্রশিক্ষণ। কিন্তু ভাবি শিক্ষকের যদি উপযুক্ত প্রশিক্ষণ না থাকে তাহলে উচ্চ গুণমানের শিক্ষক যেমন পাওয়া সম্ভব হয় না তেমনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীরাও উৎকৃষ্ট শিক্ষকের সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হয়। বাস্তব পরিস্থিতিতে দেখা যাচ্ছে আইনে নির্দেশিত উন্নত গুণমানের শিক্ষকের এখনও যথেষ্ট অভাব আছে এবং আংশিকভাবে আইনের শর্তও অমান্য করা হচ্ছে।

(iii) **শিক্ষা পদ্ধতিতে এসেছে পরিবর্তন :** শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ায় তিনটি মূল উপাদান বর্তমান শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও পাঠ্যবিষয়বস্তু। শিক্ষণ পদ্ধতির লক্ষ্য হল পাঠ্যবিষয়বস্তুর নানা উপাদানগুলিকে শিক্ষকের দ্বারা শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপন করা। আধুনিক শিক্ষায় পাঠ্যবিষয়বস্তুর যেমন— বৈচিত্র্য, গভীরতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পাচ্ছে তেমনি বেশ জটিলও হচ্ছে।

এই পরিস্থিতিতে শিক্ষাক্ষেত্রে পাঠ্যক্রমের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্য নতুন নতুন উন্নত ধরনের শিক্ষণ পদ্ধতির প্রয়োজনও অনুভূত হচ্ছে। এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে এসে পড়েছে উৎকৃষ্ট শিক্ষণ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য। পূর্বের বক্তৃতা ও ব্ল্যাকবোর্ড নির্ভর শিক্ষকতায় উৎকৃষ্ট কোনো শিক্ষণ পদ্ধতির প্রয়োজন তেমনভাবে অনুভূত না হলেও বর্তমানে কোনো শিক্ষককে শ্রেণিকক্ষে যে পাঠদান পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয় তা হল শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক, যা পূর্বে ছিল শিক্ষক কেন্দ্রিক। শিক্ষার্থীর সঙ্গে শিক্ষকের যোগাযোগ শুধু পাঠ্যপুস্তকের মধ্যেও সীমাবদ্ধ নয় বাইরের জগৎ নিয়েও আলোচনা করতে হয়। এ জন্য প্রয়োজন হয় উৎকৃষ্ট শিক্ষণ পদ্ধতির। উৎকৃষ্ট শিক্ষণ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হল—

- মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তি।
- উদ্দেশ্যভিত্তিক ও লক্ষ্য অভিমুখী।
- সুবিন্যস্ত ও সুপরিকল্পিত।
- সক্রিয়তাভিত্তিক ও কর্মকেন্দ্রিক।
- শিক্ষার্থীর সামর্থ্যভিত্তিক।
- অনুবন্ধ স্থাপনে সক্ষম।
- চিন্তন ও যুক্তিভিত্তিক।
- সৃজনশক্তির বিকাশ সহায়ক।
- সামাজিকবোধের জাগরুক
- সমন্বয়বাদী দৃষ্টিভঙ্গির অনুসারী।

শিক্ষক তাঁর পেশায় যদি সফল হতে চান তাহলে উপরোক্ত বৈশিষ্ট্য সমন্বিত শিক্ষণ পদ্ধতি মেনে চলা দরকার। স্বাভাবিকভাবে শিক্ষকতার প্রশিক্ষণ অপরিহার্য হয়ে ওঠে।

(iv) **প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষণে নির্ভরতা:** বর্তমানযুগে শিক্ষা অনেকক্ষেত্রে প্রযুক্তিনির্ভর হয়ে পড়েছে। টিভি, এডুকেশন, সাটেলাইট, ICT শিক্ষাক্ষেত্রে অনেকখানি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। শ্রেণিকক্ষে আধুনিক শিক্ষণ পদ্ধতি পরিচালিত করতে এসেছে নানা ধরনের শিখন সম্পদ যেমন— রেডিয়ো, টেপরেকর্ডার, স্লাইড, ওভারহেড প্রোজেক্টর, কম্পিউটার, ভিসিডি, এল. সি ডি ইত্যাদি। এই সমস্ত শিক্ষণ প্রদীপনগুলিকে যথাযথভাবে ব্যবহার করতে হলে অবশ্যই শিক্ষককে প্রযুক্তির জ্ঞান লাভ করতে হবে। প্রক্ষেপণযোগ্য প্রদীপনগুলিকে শিক্ষার্থীর নিকট আকর্ষণীয় করে তুলতে শিক্ষকের প্রযুক্তির জ্ঞান ও সেগুলিকে চালনা করবার মতো অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা থাকা দরকার। সেদিক থেকে শিক্ষক প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না।

(v) **মূল্যায়ন পদ্ধতিতে এসেছে পরিবর্তন:** আজকের আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় মূল্যায়ন ব্যবস্থা বেশ জটিল। মূল্যায়ন পদ্ধতি কার্যকরী হয় শ্রেণিকক্ষের অভ্যন্তরের কাজে

Scanned with CamScanner

আবার শ্রেণিকক্ষের বাইরে বিভিন্ন সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলিতে। শিক্ষার্থীর কোথায় কী মাত্রায় এবং কোন্ দক্ষতায় শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করছে তার মূল্যায়ন করতে হয়। তা ছাড়া Formative এবং Summative মূল্যায়নের প্রসঙ্গেও জ্ঞান থাকা দরকার। শিক্ষকতার পেশায় প্রবেশের পূর্বে মূল্যায়নের এই ধারণা ও পদ্ধতি সম্পর্কে জানা ও শেখা থাকলে শিক্ষকতার পেশায় সাফল্য পাওয়া যায়।

(vi) **নির্মিতিবাদের দৃষ্টিভঙ্গি:** আধুনিক শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ায় নির্মিতিবাদ একটি নতুন মতবাদ। এই নতুন মতবাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে আজ ভারতসহ বিভিন্ন দেশ শিক্ষাক্ষেত্রে সাদরে গ্রহণ করেছে। ভারতে সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত দুটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে এই মতবাদটি স্থান পেয়েছে। National Curriculum Frame Work 2005 এবং National Curriculum Frame Work for Teacher Education 2009-তে নির্মিতিবাদকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। নির্মিতিবাদের বক্তব্য হল—(i) ব্যক্তি বা শিক্ষার্থী নিজেই জ্ঞানের নির্মাণকর্তা। এই জ্ঞান সে নির্মাণ করে সম্পূর্ণ সক্রিয়ভাবে, (ii) শিক্ষার্থী তার জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় এবং স্নায়বিক সংবেদনকে সক্রিয়ভাবে কাজে লাগিয়ে বস্তু বা ঘটনার অর্থ উপলব্ধি করে, (iii) শিক্ষার্থীর এই জ্ঞান নির্মিত হয় শিক্ষার্থীর পূর্ব অভিজ্ঞতা, মানসিক ক্ষমতা, চাহিদা, সৃজনক্ষমতা, উল্লম্ব ও সমান্তরাল চিন্তন এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে। নির্মিতি এই দৃষ্টিভঙ্গিতে শিক্ষার্থীদের শিখনকে কার্যকরী করে তুলতে হলে চাই উপযুক্ত শিক্ষকতার প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় আজকের দিনে শিক্ষককে অনেক বেশি জ্ঞান এবং দক্ষতা সম্পন্ন হতে হয়। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক যে-কোনো স্তরের শিক্ষককে সফল হওয়ার জন্য প্রতিনিয়ত পাঠপরিকল্পনা করতে হয়, শিক্ষণ-প্রদীপন ব্যবহার করতে হয়, বিভিন্ন উন্নত শিক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করতে হয়।

পরিশেষে উল্লেখ করা যায় যে, যুগের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ শিক্ষক-প্রশিক্ষণ, জনসংখ্যা শিক্ষণ, জীবনশৈলী শিক্ষা, শান্তির জন্য শিক্ষা, HIV/AIDS সহ বিভিন্ন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে উপযুক্ত মনোভাব গড়ে তোলা, পরিবেশ বান্ধব আচরণ গড়ে তোলার জন্যও শিক্ষকতার পেশায় পূর্ববর্তী প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। আবার, শিক্ষার পদ্ধতি বিশ্লেষণ বা বিষয়বস্তুর বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ (Pedagogical Analysis), অনুপাঠ (Micro Lesson) প্রস্তুতির মাধ্যমে শিক্ষকের শিক্ষণ দক্ষতা বৃদ্ধি করা সম্ভব। পাঠপরিকল্পনা (Lesson Plan), বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ (Content Analysis), শিক্ষণ-শিখন উপকরণ (TLM) প্রস্তুতি এবং তাদের ব্যবহার, মূল্যায়নের জন্য উন্নতমানের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ সহ অভীক্ষাপত্র প্রস্তুতি ও উত্তরপত্রের যথাযথ বিশ্লেষণ প্রভৃতি কার্যাবলির মাধ্যমেই শিক্ষা ব্যবস্থারও মানের উন্নতি ঘটে। আর এর জন্য প্রয়োজন অবশ্য কর্ম পূর্ববর্তী প্রশিক্ষিণ।

শিক্ষকের প্রশিক্ষণের প্রয়োজনের কারণেই একজন ব্যক্তি যখন শিক্ষকতার পেশায় প্রবেশ করার পূর্বেই উপযুক্ত শিক্ষক প্রশিক্ষণ নিতে সক্ষম হবেন তখন এমন কতকগুলি গুণ তিনি অর্জন করতে পারবেন যাতে তাঁর শিক্ষকতার কর্মজীবনে একজন দক্ষ শিক্ষকের শিরোপা লাভে সমর্থ হবেন। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত সেই সমস্ত গুণগুলিকে আমরা নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করতে পারি :

১। শিক্ষার্থীর শিক্ষার স্তর অনুযায়ী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন হতে পারবেন।

২। শিক্ষার্থীর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণের পরিপ্রেক্ষিতে পাঠ্যক্রমের বিষয়বস্তু, কার্যপ্রণালী এবং পাঠ্যসূচি যথোপযুক্ত বিন্যাসে সমর্থ হয়ে উঠতে পারবেন।

৩। শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশের লক্ষ্যকে সামনে রেখে পাঠ্যক্রমিক এবং সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে সুন্দরভাবে বিন্যাসের দ্বারা পাঠদান প্রক্রিয়ার ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়ে উঠবেন।

৪। উপযুক্তভাবে ভাষার মধ্যে শব্দ চয়ন, বাক্যের ব্যবহার, পরিভাষার ব্যবহার, বোর্ডের ব্যবহার, কম খরচে শিক্ষণ প্রদীপন প্রস্তুত এবং উপযুক্ত ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর নিকট বিষয়বস্তুর জটিলতাকে সহজবোধ্য এবং আকর্ষণীয় করে তুলতে সক্ষম হবেন।

৫। শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পূরণের পাঠদান প্রক্রিয়া কতখানি কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারল তা যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সক্ষম হবেন।

৬। সামগ্রিক শিক্ষার কোনো স্তরে যদি কোনো ভুলভ্রান্তি বা ত্রুটি বিচ্যুতি হয়ে যায় তাহলে তা প্রশাসনিক, পাঠ্যক্রমিক, পরিকাঠামোগত মূল্যায়নগত পাঠদান প্রক্রিয়াগত তা বিচার বিশ্লেষণ করে চিহ্নিতকরণ ও সংশোধনের জন্য উপযুক্ত মতামত দিতে সক্ষম হবেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, সাম্প্রতিককালে যে বিষয়গুলি শিক্ষক-প্রশিক্ষণের পুনর্নবীকরণের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্ব সহকারে যুক্ত হওয়া প্রয়োজন সেগুলি হল—

(১) শিক্ষায় অন্তর্ভুক্তিকরণ (Inclusive Education)
(২) শিক্ষায় সমান অধিকার (Equality in Education)
(৩) দেশজ সংস্কৃতির সংরক্ষণ (Preservation of Indian Culture)
(৪) শিক্ষাক্ষেত্রে ICT-এর ব্যবহার (Use of ICT in Eduactiton)
(৫) বৈদ্যুতিন শিখন (e-Learning)
(৬) ভিন্নধর্মী ক্ষমতা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের শিক্ষা (Education of Differently Abled Children)

Scanned with CamScanner

◆ কর্মরত অবস্থায় শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা (Inservice Training and Education of Teacher) :

শিক্ষা একটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়া। সমাজ আর সংস্কৃতির প্রতিনিয়ত পরিবর্তনের প্রভাবে শিক্ষা প্রক্রিয়ার মধ্যে ঘটেছে পরিবর্তন। এই প্রসঙ্গে ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের (1964-1966) চেয়ারম্যান **ড. ডি. এস. কোঠারি** তৎকালীন ভারতীয় শিক্ষামন্ত্রীকে লিখেছিলেন—আজকের যে শিক্ষা পদ্ধতি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় আগামীকাল তা অকেজো হয়ে যেতে পারে। আজকের যে শিক্ষা ব্যবস্থা আগামীকাল তা অর্থহীন হয়ে যেতে পারে। অর্থাৎ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যুগের চাহিদার পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা তার প্রাসঙ্গিকতা হারাতেই পারে। এই পরিস্থিতিতে একজন শিক্ষক তাঁর ছাত্রজীবনে যে বিষয়গত জ্ঞান লাভ করেছিলেন তা পুনর্নবীকরণের প্রয়োজন হয়। ঠিক একইভাবে শিক্ষকতার পেশায় আসার পূর্বে তিনি যে প্রশিক্ষণ নিয়ে ছিলেন তার প্রতিনিয়ত পরিবর্তন ঘটে চলেছে। এই ব্যাপক পরিবর্তনের মধ্যে অবস্থান করে শিক্ষক নিজের রক্ষণশীলতাকে ভেঙে নিজেকে সমৃদ্ধ করার মানসিকতা পোষণ করবেন। জ্ঞান আর দক্ষতার পুনর্নবীকরণ প্রসঙ্গে শিক্ষকের মধ্যে যে চাহিদার সৃষ্টি হয় তাকে মেটাবার দায় নিয়ে গড়ে উঠেছে কর্মরত অবস্থায় প্রশিক্ষণ (Inservice Teachers Training) বা Inservice Education of Teachers (INSET)

(ক) **রিফ্রেশার কোর্সের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ** (Inservice through Refresher Course): বেশ কিছুকাল পূর্বে এইসব ক্ষেত্রে শিক্ষকদের প্রতি পাঁচ বছর অন্তর রিফ্রেশার কোর্স করতে হত। এই রিফ্রেশার কোর্সে বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নতুন নতুন জ্ঞান, নতুন প্রশিক্ষণ পদ্ধতি, নতুন মূল্যায়ন ব্যবস্থা শিখতে হত। সাধারণভাবে এই ধরনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হত জেলা স্তরে কোনো প্রতিষ্ঠানে বা ব্লকে। কর্মরত শিক্ষকদের জন্য কতকগুলি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে নিত্য নতুন জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের আয়োজন করা হত Extension Service-এর মাধ্যমে।

প্রাথমিক শিক্ষকদের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের শিক্ষা দপ্তরের Sub-Inspector of Schools (SI) এই রিফ্রেশার কোর্সের ব্যবস্থা করতেন। অন্যদিকে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের ক্ষেত্রে দেখা গেছে প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, আঞ্চলিক মহাবিদ্যালয় অথবা রিজিওন্যাল কলেজ অফ এডুকেশন, NCERT প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে রিফ্রেশার কোর্সের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে এইসব রিফ্রেশার কোর্সগুলি অত্যন্ত অনিয়মিত এবং শিক্ষকদের বিপুল চাহিদা মেটাতে তা অসমর্থ। এই পরিস্থিতির চাহিদা মেটাতে সরকারি সহযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গে বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। এগুলির মধ্যে আছে—State Institute of Education বাণীপুর, জলপাইগুড়ি, কল্যাণী, হুগলি এবং কোলকাতায় ডেভিডহেয়ার ট্রেনিং কলেজের এডুকেশন এক্সটেনশন ডিপার্টমেন্ট। এই সমস্ত প্রশিক্ষণকেন্দ্রগুলিতে

প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে কর্তব্যরত শিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে নতুন তথ্য ও দক্ষতাগুলি সঞ্চালিত করবার ব্যবস্থা করা হত।

(খ) **নবতর পর্যায়ে প্রশিক্ষণ** : সাধারণ শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ প্রাপ্তির পরও একজন শিক্ষককে নিরন্তর তাঁর শেখার কাজ চালিয়ে যেতে হয়। বস্তুত একজন শিক্ষক সারা জীবনই শিক্ষার্থীর মতো জ্ঞান লাভের ক্ষেত্রটিকে সমৃদ্ধ করে যাবেন। একদা **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর** বলেছিলেন "The teacher can never truely teach, unless he is still learning himself. A lamp can never light an other lamp unless it continues to burn its own flame." সুতরাং একজন শিক্ষক অন্য একজন শিক্ষার্থীকে শিক্ষিত করতে পারবেন তখনই যতক্ষণ তিনি নিজে শিক্ষা চর্চার মধ্যে নিজেকে নিবদ্ধ রাখবেন। অতএব শিক্ষককে তাঁর শিক্ষা চর্চা চালিয়ে যেতেই হবে। তাঁর পেশাগত উন্নয়নের জন্য যে সমস্ত উপায়গুলিকে তিনি অবলম্বন করতে পারেন, সেগুলি হল—

১। কর্মপূর্ববর্তী এবং কর্মরত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ।
২। গবেষণামূলক কাজ চালিয়ে যাওয়া।
৩। বিদ্যালয় বহির্ভূত সামাজিক কার্যাবলি সম্পাদন।
৪। শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে প্রশিক্ষণ।
৫। শিক্ষামূলক বিভিন্ন কার্যাবলিতে অংশগ্রহণ।
৬। পেশাগত নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রত করা ইত্যাদি।

ebook.dascoaching.in

উপরোক্ত উপায়গুলি সম্পর্কে এবার সংক্ষেপে আলোচনা করা হল—

১। **কর্মপূর্ববর্তী এবং কর্মরত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ** : এই ধরনের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত দিকগুলি হল নিম্নরূপ—

(i) শিক্ষকতার পেশায় প্রবেশের পূর্বে শিক্ষকতার প্রশিক্ষণের জন্য কয়েকটি ব্যবস্থা আছে। প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য আছে D.L.Ed. কোর্সের ব্যবস্থা, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষকদের জন্য আছে B.T, P.G.B.T., B.Ed প্রভৃতি কোর্স।

(ii) পেশায় প্রবেশের পরও শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। এক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে NCERT, SCERT, NUEPA, CTE, IASE, DIET প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান।

(iii) পেশা পরবর্তী প্রশিক্ষণ দানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন NGO উদ্যোগী হয়ে থাকেন।

(iv) কলেজ স্তরে UGC অনুমোদিত Academic Staff College বা বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই, তিন বা চার সপ্তাহের Orientation এবং Refresher কোর্সের ব্যবস্থা আছে।

Scanned with CamScanner

(v) সর্বশিক্ষা মিশনের উদ্যোগে প্রাইমারি শিক্ষকদের জন্য বছরে অন্তত ২০ দিনের ব্লক সার্কেল (BRC এবং CRC) স্তরে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে। BRC বলতে বোঝায় Block Resource Centre এবং CRC বলতে বোঝায় Cluster Resource Centre।

২। **গবেষণামূলক কাজ চালিয়ে যাওয়া :** মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের বিদ্যালয় এবং উচ্চ শিক্ষায় নিয়োজিত বহু শিক্ষক বিভিন্ন ধরনের গবেষণামূলক কাজের সুযোগ লাভ করেন। এই সমস্ত গবেষণামূলক কাজ প্রোজেক্ট ধর্মী (Project Research) অথবা ছোটো ছোটো গবেষণা প্রকল্প (Minor Research Project) অথবা পি. এইচ. ডি. গবেষণাও (PH.D. Research) হতে পারে। শিক্ষক তাঁর গবেষণা থেকে প্রাপ্ত ফলাফল বা সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করে গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ লিখে প্রসিদ্ধ কোনো গবেষণা পত্রিকা বা জার্নালে প্রকাশ করতে পারেন। এইসব ক্ষেত্রে শিক্ষকের জ্ঞানের ও দক্ষতার পরিধি বিস্তৃত হতে পারে।

৩। **বিদ্যালয় বহির্ভূত সামাজিক কার্যাবলি সম্পাদন :** বিদ্যালয় পরিস্থিতিতে যে সামাজিক কার্য তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শিক্ষক বিদ্যালয় বহির্ভূত নানা ধরনের সামাজিক কার্যের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রেখে তাঁর পেশাগত অভিজ্ঞতা ও দক্ষতাকে আরও বেশি সমৃদ্ধ করতে পারেন। বয়স্ক শিক্ষা প্রকল্প, জনশিক্ষা বিস্তার, পরিবেশ পরিচ্ছন্নতার শিক্ষাগুলি NSS বা National Service Scheme-এর সঙ্গে যুক্ত। বিদ্যালয়ের বাইরে এইসব কার্যের মাধ্যমে শিক্ষক যে বাস্তব এবং বিস্তৃত অভিজ্ঞতা লাভের মাধ্যমে নিজেকে সমৃদ্ধ করার যে সুযোগ পান তাতে তাঁর পেশাগত জীবনকে উন্নত করে তোলে।

৪। **শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে প্রশিক্ষণ :** শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে যে সমস্ত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় তার দ্বারাও শিক্ষকরা নিজেদের পেশাগত উন্নতি, পেশার মর্যাদা বৃদ্ধি, পেশাগত অধিকার এবং শিক্ষকের আচরণ সমৃদ্ধ হতে পারে।

৫। **শিক্ষামূলক বিভিন্ন কার্যাবলিতে অংশগ্রহণ :** বিভিন্ন ধরনের শিক্ষামূলক কার্যাবলিতে অংশগ্রহণের দ্বারাও শিক্ষক তাঁর পেশাগত উন্নয়ন ঘটাতে পারেন। এই সমস্ত শিক্ষামূলক কার্যাবলিতে আছে—শিক্ষা পরিকল্পনায় পরামর্শ দান, সম্পাদনায় অংশগ্রহণ, পাঠ্যক্রম রচনা, সৃজনধর্মী কর্ম সম্পাদন, শিক্ষণ পদ্ধতির উন্নয়ন, মূল্যায়ন ব্যবস্থায় যুগোপযোগী পরিবর্তন সাধন, পরিচালন সমিতিতে অংশগ্রহণ এবং অভিভাবকদের সঙ্গে মিটিং ইত্যাদি প্রয়োজনীয় কার্যাবলি। এই কার্যাবলিগুলি সম্পন্ন করলে শিক্ষকের দক্ষতা বাড়ে।

৬। **পেশাগত নৈতিক মূল্যবোধ জাগরণ :** শিক্ষকতার পেশা একটি মহান পেশা। শিক্ষকের সততা, নিষ্ঠা, তৎপরতা নৈর্ব্যক্তিকতা এবং মূল্যবোধ ইত্যাদি জাগ্রত করা একান্তভাবে জরুরি। শিক্ষককে যোগাযোগ রক্ষা করতে হয় শিক্ষার্থী, পরিচালন সমিতি, অভিভাবক সমিতি, আঞ্চলিক গোষ্ঠী এবং বৃহত্তর ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান প্রভৃতিতে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই শিক্ষকের নৈতিক আচরণ ও মূল্যবোধ যদি যথাযথ না হয় তাহলে তাঁর পেশায় তিনি কখনোই সাফল্য পাবেন না। ১৯৮৬ সালে NCERT হায়দরাবাদে একটি কর্মশালার ব্যবস্থা করে। উক্ত কর্মশালায় শিক্ষকদের জন্য একটি আচরণ বিধি রচনা করেছিল। শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়নের ক্ষেত্রে সেই আচরণ বিধি মেনে চলা অবশ্যই দরকার। শিক্ষকের সেই আচরণবিধির প্রথম প্রধান কয়েকটি উল্লেখ করা হল—

● **শিক্ষকদের আচরণবিধির প্রথম অংশ—**

◈ **শিক্ষার্থী-শিক্ষক সম্পর্ক :**

১। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, স্ত্রী-পুরুষ, স্তর, ভাষা ও জন্মস্থান নির্বিশেষে সকল শিক্ষার্থীদের প্রতি সমদৃষ্টি সম্পন্ন হতে হবে।

২। শিক্ষার্থীদের বৈজ্ঞানিকবোধ, অনুসন্ধিৎসার মনোভাব, গঠনমূলক আত্মবিকাশ ও সৌন্দর্য অনুভূতি জাগ্রত করতে হবে এবং প্রশ্নের মাধ্যমে কৌতূহল মেটাতে উৎসাহিত করতে হবে।

৩। শিক্ষার্থীদের মধ্যে শ্রম ও শ্রমিকের প্রতি মর্যাদাবোধের স্ফূরণ ঘটাতে হবে।

৪। নিজের ছাত্রকে পড়ানো বা সাহায্যের বিনিময়ে কোনো অতিরিক্ত পারিশ্রমিক গ্রহণ করা যাবে না।

৫। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথায় ও আচরণে সম্মানবোধের প্রকাশ থাকতে হবে।

৬। সাজপোশাক, কথাবার্তা, আচার-আচারণের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের কাছে দৃষ্টান্ত স্বরূপ হতে হবে।

dascoaching.in

● **আচরণ বিধির দ্বিতীয় অংশ :**

◈ **পিতা-মাতা বা অভিভাবক ও শিক্ষকের সম্পর্ক—**

১। শিক্ষার্থীর পিতা-মাতা বা অভিভাবকদের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার সম্পর্ক তৈরির চেষ্টা করবেন।

২। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার্থীদের বাড়ির সঙ্গে হৃদ্যতার সম্পর্ক স্থাপনের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবেন।

Scanned with CamScanner

৩। শিশুদের অগ্রগতি ও পশ্চাদপদতার বিষয়ে তাদের পিতা-মাতাকে খোঁজখবর দেবেন।

৪। বিদ্যালয়ের উন্নয়ন প্রকল্পের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পিতা-মাতাকে যুক্ত করার চেষ্টা করবেন।

● **আচরণ বিধির তৃতীয় অংশ :**

◆ **সমাজ জাতি ও শিক্ষক**

১। জ্ঞান ও তথ্যের সম্প্রসারণ জাগিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে একটি সমাজ ও জনশক্তি উন্নয়নের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে চেষ্টা করতে হবে।

২। ধর্ম, অঞ্চল ও ভাষা ভিত্তিক ঐক্যনাশক শক্তি এবং বিচ্ছিন্নতাবাদ ও রাষ্ট্রাতীত আনুগত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে।

৩। জাতীয় সংহতিকে সুসংহত করতে হবে এবং গণতন্ত্র, ধর্ম নিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রের আদর্শকে সমুন্নত করতে হবে।

৪। শতকরা একশো জনকে বিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত করা এবং পাঠ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত তাদের ধরে রাখার জন্য জন সহযোগিতা লাভের চেষ্টা করতে হবে।

৫। বালিকা ও সমাজের দুর্বলতর অংশের শিক্ষা প্রসারের জন্য এবং স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকারের চেতনা সৃষ্টি করতে বিশেষ আগ্রহ দেখাতে হবে।

● **আচরণ বিধির চতুর্থ অংশ :**

◆ **সহকর্মীগণ, বৃত্তিমূলক সংগঠন ও শিক্ষক**

১। শিক্ষাগত ও বৃত্তিগত বিষয়ে উচ্চমানে উপনীত হবেন ও তা ধরে রাখবেন।

২। কার্যকালীন শিক্ষা, সেমিনার, সিম্পোসিয়াম, কর্মশালা, অধিবেশন প্রভৃতির মতো অবিরাম বৃত্তিগত কর্মধারায় উদ্যোগ ও অংশগ্রহণ করবেন।

৩। নিজের অধিকারে গবেষণা, পঠনপাঠন ব্যাপারে নতুন ধারায় অনুসন্ধান চালিয়ে যাবেন।

৪। শিক্ষার্থী, অন্যান্য শিক্ষক, আধিকারিকবর্গ বা অন্য কারো সামনে নিজের সহকর্মীদের সম্পর্কে কোনো অসম্মানজনক কথাবার্তা বলা থেকে বিরত থাকবেন।

৫। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক ভাবমূর্তি রক্ষার যে সমষ্টিগত দায় দায়িত্ব আছে, তাতে সাহায্য করবেন।

৬। শিক্ষক বৃত্তিগত সংগঠনের সদস্য হবেন এবং নিয়মিতভাবে দেয় অর্থাদি শোধ করবেন।

৭। বৃত্তিগত সংগঠনের প্রতি নিজের কর্তব্যকে তাঁর বৃত্তিগত দায়িত্ব বলে স্বীকার করতে হবে।

● **আচরণ বিধির পঞ্চম অংশ :**

১। শিক্ষক আইনগত বিধি নিয়মগুলি সম্যকভাবে অবহিত হবেন এবং সরকারের শিক্ষানীতির দ্বারা তাঁদের চাকরির সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণার মধ্যে আনতে পারবেন।

২। পেশাগত জীবনে বা ব্যক্তিগত জীবনে বিদ্যালয়ের কার্য পরিচালন কর্তৃপক্ষের বা সরকারি প্রশাসন যন্ত্রের অংশ বিশেষের সুবিধা নেওয়া থেকে বিরত থাকবেন।

৩। ছাত্র, সমাজ বা জাতির স্বার্থের পরিপন্থী কোনো কিছু শিক্ষকের মাধ্যমে প্রচার করতে চাইলে তা প্রত্যাখ্যান করবেন।

৪। শিক্ষার্থী, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা জাতির কাছে নিজের দায়িত্ব পালন থেকে পশ্চাদপসরণ করবেন না।

● **বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা :** শিক্ষকতা চলাকালীন প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে একটি নতুন রূপরেখার সৃষ্টি করল জাতীয় শিক্ষানীতি ১৯৮৬। পূর্ববর্তী রিফ্রেশার ট্রেনিংকে এখন বলা হল—Inservice Training। পিছিয়ে পড়া জেলাগুলির প্রাথমিক শিক্ষকদের কর্মরত অবস্থায় প্রশিক্ষণ দেবার জন্য তৈরি হল Direct Primary Education Programme (DPEP, 1995-2003)। এই প্রোগ্রামে সারা দেশে ব্লক পর্যায়ে (BRC) এবং ক্লাস্টার পর্যায়ে (CRC) শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষণ পদ্ধতিতে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এরপর পুনরায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের (প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত) শিক্ষকদের ধারাবাহিক ভাবে প্রশিক্ষণ দানের জন্য একটি প্রকল্প তৈরি হল। এর নাম হল সর্বশিক্ষা অভিযান (সংক্ষেপে SSA-2001)। প্রোগ্রামে প্রত্যেক শিক্ষককে ব্লক ও ক্লাস্টার মিলিয়ে বছরে অন্তত পক্ষে ২০ দিন প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা করা হয়।

বেশকিছু NGO (Non Government Organization) ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

আমাদের রাজ্যের ১৬টি প্রাইমারি শিক্ষক-প্রশিক্ষণ সংস্থাকেও উন্নীত করে তাদের নিকট প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের দায়িত্ব অর্পণ করা হল। এই সমস্ত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রকে বলা হল DIET বা District Institute of Education and Training। প্রতিটি জেলায় একটি করে উনিশটি জেলায় মোট ১৬টি এই DIET রাখার কথা বলা হল।

একই রকম ভাবে, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে রাজ্যের ছয়টি সরকারি এবং সরকারি অনুমোদন প্রাপ্ত বি.এড. কলেজকে CTE বা College of Teacher Education স্তরে উন্নীত করা হয়। কর্মরত অবস্থায় শিক্ষক-শিক্ষিকারা এক, দুই বা তিন

Scanned with CamScanner

সপ্তাহ পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয় ভিত্তিক বা দক্ষতা ভিত্তিক কর্মশালায় যোগদান করে শিক্ষার আধুনিক পদ্ধতি ও বিষয়গত অগ্রগতি সম্বন্ধে সম্যক ধারণা লাভের সুযোগ পেয়ে নিজেদের সমৃদ্ধ করার পথকে প্রশস্ত করেন।

কর্মরত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের সবার উপরে অবস্থান করছে IASE বা Institute of Advanced Study in Education। রাজ্যের যথেষ্ট মর্যাদা সম্পন্ন কয়েকটি উন্নত প্রতিষ্ঠানকে এই IASE-তে উন্নীত করা হয়েছে। এইসব IASE-গুলির মধ্যে আছে, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বিভাগ, ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ এইসব IASE-গুলিতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয় ভিত্তিক সেমিনার, ওয়ার্কসপ প্রভৃতির মাধ্যমে বি.এড. কলেজের শিক্ষক প্রশিক্ষকদের কর্মরত অবস্থায় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ রাখা হয়েছে।

এইসব প্রতিষ্ঠানগুলির কাজকর্মের সঙ্গে রাজ্যের শিক্ষাগবেষণা পর্ষদ State Council of Educational Research and Training সংক্ষেপে SCERT প্রয়োজনে যুক্ত থাকতে পারেন। তাছাড়া DIET-গুলির তদারকির এবং মানোন্নয়নের দায়িত্বও SCERT-এর উপর অর্পিত হয়েছে।

❑ ৪.২.৫ শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়নে সম্প্রসারণমূলক ও সমাজ উন্নয়নমূলক কার্যাবলি (Extension and Community Development Activities for Professional Development of the Teachers) :

বৃহত্তর সমাজ জীবনের একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ হল বিদ্যালয় জীবন। তাই শিক্ষকতার পেশায় শিক্ষকের ভূমিকা বিদ্যালয়ের ক্ষুদ্র গন্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে বিস্তৃত হয় বৃহত্তর সমাজ জীবনের গন্ডির মধ্যে। শিশু শিক্ষার্থীরা যে সমাজ থেকে আসে সেই সমাজের চিন্তা-ভাবনা, রীতিনীতি, আর্থসামাজিক পরিস্থিতি, অভিভাবক ও অভিভাবিকাদের মানসিক অবস্থা ইত্যাদি জানা এবং তার উন্নয়ন ঘটানোর মধ্যে দিয়ে বিদ্যালয়ের যে সম্পর্ক স্থাপিত হয় তাতে শিক্ষাও উপকৃত হয়। সুতারং পারিপার্শ্বিক সমাজ উন্নয়ন এবং সেবার ক্ষেত্রে শিক্ষকের পেশাগত বিশেষ দক্ষতা থাকা দরকার। আর সেজন্যই প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে বিশেষ প্রশিক্ষণের। শিক্ষার্থীকে সঙ্গে নিয়ে শিক্ষক যখন এই সমাজ উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণ করার ফলে শিক্ষকের দৃষ্টিভঙ্গিও শিক্ষার্থীকে ভবিষ্যৎ সুনাগরিকতার পথকে প্রশস্ত করে তোলে।

সমাজ উন্নয়ন প্রসঙ্গে শিক্ষকদের আর একটি বড়ো কাজ হল শিক্ষার্থীদের মধ্যে কুসংস্কার বিরোধী মানসিকতা গড়ে তুলে শিক্ষার্থী যে সমাজ সম্প্রদায়ের অংশীদার সেখানে গিয়ে কুসংস্কার-এর বিরুদ্ধে নানা সামাজিক আন্দোলনে সামিল করে তোলার ক্ষেত্রে শিক্ষক অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারেন। শিক্ষকের পেশাগত দিককে উন্নত করে তুলতে এই ধরনের কার্যাবলি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। সমাজ উন্নয়ন ও সেবামূলক আরো কিছু কার্যাবলি এই

প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন—জলদূষণ, বায়ুদূষণ, মৃত্তিকা দূষণ-এর বিরুদ্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি, অরণ্য সপ্তাহ পালন, স্থানীয় অঞ্চলে পরিচ্ছন্নতা দিবস ও সপ্তাহ পালন, বয়স্ক শিক্ষা প্রকল্প, স্বাস্থ্য সচেতনতা শিবির, রক্তদান শিবির ইত্যাদি। এছাড়া আছে বিশেষ বিশেষ মহাপুরুষদের জন্মদিন পালন ও স্বাধীনতা দিবস পালন ইত্যাদি। যেগুলি সামগ্রিকভাবে শিক্ষকের পেশাগত জীবনকে সমৃদ্ধ করে তুলতে সাহায্য করে।

❑ ৪.২.৬ শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়নে সরকার এবং শিক্ষক সংগঠনের ভূমিকা (Role of Government and Teacher Organisation in Professional Growth of Teacher) :

(ক) **সরকারের ভূমিকা :**

শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়নের ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা নিম্নরূপ—

১। শিক্ষকের শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় বা পর্ষদ থেকে উত্তীর্ণ পরীক্ষায় ন্যূনতম পঞ্চাশ শতাংশ (50%) নম্বর এবং মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার ক্ষেত্রে ন্যূনতম প্রাপ্ত পঞ্চান্ন শতাংশ (55%) হতে হবে। সরকার তা সুনিশ্চিত করবেন।

২। প্রশিক্ষণহীন কোনো ব্যক্তি শিক্ষকতার পেশায় প্রবেশ করতে পারবেন না।

৩। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষক-প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলির পরিকাঠামোগত উন্নয়ন ঘটাতে হবে।

৪। শিক্ষকতার পেশায় প্রবেশ করার ক্ষেত্রে বা নিয়োগের জন্য Teacher's Eligibility Test বা TET পরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৫। বর্তমানে কর্মরত প্রশিক্ষণহীন শিক্ষকদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের MHRD এর অধীনে National Institute of Open School বা NIOS এবং Indira Gandhi National Open University বা IGNOU-এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ এবং নেতাজি সুভাষমুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে শিক্ষকদের যোগ্যতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(খ) **শিক্ষক সংগঠনের ভূমিকা :**

১। শিক্ষকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করার চেষ্টা করে এবং ভবিষ্যতে করতে হবে।

২। বিভিন্ন সেমিনার, ওয়ার্কশপ ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

Scanned with CamScanner

৩। সংগঠন প্রকাশিত পত্রিকার মাধ্যমে নতুন শিক্ষণ পদ্ধতি ও বিষয়গত আলোচনার সুযোগ সৃষ্টি করা।

৪। সারা দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিখ্যাত ব্যক্তিদের এনে শিক্ষকদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন ও শিক্ষা সংক্রান্ত আলোচনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৫। সরকারকে শিক্ষামূলক পরিকল্পনা গ্রহণ ও রূপায়ণে সাহায্য করে শিক্ষক ও শিক্ষার উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা।

বস্তুত শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়নের ক্ষেত্রে পাঠ্যক্রমের ভিতরে এবং বাইরের বহু ক্ষেত্র আছে যেগুলিতে সরকার ও শিক্ষক সংগঠন যেমন বেশ কিছু গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে তেমনি এমন কিছু দিক আছে যেগুলিতে সরকারের ভূমিকা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সহযোগিতা বিশেষভাবে আশা করা যেতে পারে। অন্যদিকে শিক্ষক সংগঠনের দায়িত্বও আরো প্রসারিত করে শিক্ষকের স্বার্থ, শিক্ষার্থীর স্বার্থ, সর্বোপরি শিক্ষা এবং সমাজের স্বার্থকে পূরণ করতে কার্যকরী ভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের অঙ্গীকারে আবদ্ধ হতেই পারেন।

Visit Our Educational Website
Regularly For More Update:
https://www.dascoaching.in/

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর
(Short Questions & Answers)

❑ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর (Objective type questions & answers) :

Marks – 2

১। শিক্ষাবিজ্ঞান শিক্ষকের চারটি ব্যক্তিগত গুণাবলি উল্লেখ করুন। (State four individual qualities of Education Teacher.)

উত্তর : শিক্ষাবিজ্ঞান শিক্ষকের যে সমস্ত ব্যক্তিগত গুণাবলি থাকা দরকার যেগুলি হল—

(i) শিক্ষাবিজ্ঞান শিক্ষক সুব্যক্তিত্বের অধিকারী হবেন। তাঁর আচরণ ধারায় এবং চিন্তা ভাবনায় সুসংহত ব্যক্তিত্বের রূপ প্রকাশিত হবে।

(ii) শিক্ষাবিজ্ঞান শিক্ষক উন্নত ও নির্মল চরিত্রের অধিকারী হবেন। তাঁর উন্নত জীবনাদর্শ শিক্ষার্থীদের প্রভাবিত করবে।

(iii) শিক্ষাবিজ্ঞান শিক্ষক হবেন সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। তাঁর নীরোগ, সুস্থ দৈহিক বৈশিষ্ট্য অন্যের নিকট দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে।

(iv) একজন শিক্ষাবিজ্ঞান শিক্ষকের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও বিচার ক্ষমতা থাকা দরকার। আধুনিক মনোবিদদের মতানুসারে তাঁর বুদ্ধ্যাঙ্ক ১২০-এর বেশি হলে ভালো হয়।

২। শিক্ষাবিজ্ঞান শিক্ষকের চারটি পেশাগত গুণাবলি উল্লেখ করুন। (State four professional qualities of Education Teacher.)

উত্তর : পেশাগত সমস্ত যে সমস্ত গুণাবলি শিক্ষাবিজ্ঞান শিক্ষকের থাকা দরকার যেগুলি সংক্ষেপে নিম্নে উল্লেখ করা হল—

(i) শিক্ষাবিজ্ঞান শিক্ষকের নিজের বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকতে হবে। সেই জ্ঞানের গভীরতা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন, পরিমার্জনও করা দরকার।

(ii) শিক্ষাবিজ্ঞান একটি স্বতন্ত্র বিষয় হলেও নানা বিষয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান। সেই কারণে একজন শিক্ষাবিজ্ঞান শিক্ষক শুধু তাঁর নিজের বিষয় জ্ঞানে সীমাবদ্ধ থাকবেন না। ভাষামূলক বিষয়, গণিত বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি বিষয়ের জ্ঞান তাঁর থাকা আবশ্যক।

(iii) শিক্ষাবিজ্ঞান শিক্ষক বিদ্যালয়ের বিষয়গুলি ছাড়াও দর্শন, মনোবিদ্যায়, সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, অর্থনীতি, রাষ্ট্রতত্ত্ব, রাশিবিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিজ্ঞানের মতো বিষয়গুলির পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকা দরকার।

Scanned with CamScanner

(iv) প্রকৃত অর্থে একজন শিক্ষাবিজ্ঞান শিক্ষককে তাঁর পেশাগত সাফল্য পেতে হলে অবশ্যই হতে হবে জ্ঞানপিপাসু এবং নিয়মিত পাঠে অভ্যস্ত। শিক্ষক নিজে হবেন একজন শিক্ষার্থী স্বরূপ।

৩। ন্যাশনাল নলেজ কমিশনের মতানুসারে শিক্ষকের যে-কোনো দুটি গুরুত্বপূর্ণ গুণাবলি লিখুন। (Write any two important qualities of teacher according to National Knowledge Commission.)

উত্তর : ন্যাশনাল নলেজ কমিশনের মতানুসারে শিক্ষকের যে-কোনো দুটি গুরুত্বপূর্ণ গুণাবলি হল :

(i) সম অনুভূতি সম্পন্ন (Empathy) : শিক্ষাবিজ্ঞান শিক্ষককে শিক্ষার্থীদের সম অনুভূতি সম্পন্ন হবেন। শিক্ষার্থীদের সঠিকভাবে উপলব্ধি করার জন্য তাদের আবেগ ও অনুভূতিকে শিক্ষকের নিজের অনুভূতির মেলানোর জন্য তাঁকে হতে হবে নমনীয়। শিক্ষার্থীদের ভালো মন্দ, সুখ-দুঃখের অংশীদার হতে হবে।

(ii) ইতিবাচক মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি (Positive mental attitude) : শিক্ষকের মধ্যে থাকতে হবে ইতিবাচক মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি। নেতিবাচক মানসিকতা বর্জন করে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে বস্তু এবং ঘটনাবলিকে দেখতে হবে। সবকিছুর মধ্যে ভালো দিকও যে আছে তা উপলব্ধি করতে হবে শিক্ষার্থীদের। এই সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষমতা শিক্ষকের থাকতে হবে।

৪। শিক্ষাবিজ্ঞান শিক্ষকের নীতিবোধের চারটি দিক লিখুন। (Write four aspects of ethics of an Education Teacher.)

উত্তর : শিক্ষাবিজ্ঞান শিক্ষকের নীতিবোধের বিষয়গুলি নিম্নে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল—

(i) শিক্ষার্থীর দৈহিক, মানসিক, প্রাক্ষভিক, নৈতিক, উন্নতি ও কল্যাণের জন্য শিক্ষাবিজ্ঞান শিক্ষক সর্বসময় ও সর্বকাজে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন।

(ii) ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য শিক্ষক কখনোই বিদ্যালয়ের নাম, যশ, প্রতিষ্ঠা ও প্রভাবকে কাজে লাগাবেন না।

(iii) শিক্ষাবিজ্ঞান শিক্ষক হবেন সৎ, ন্যায়পরায়ণ, মূল্যবোধ সম্পন্ন এবং নৈতিক চরিত্রের অধিকারী। তাঁর দৃষ্টান্তযোগ্য নৈতিক আচরণ শিক্ষার্থীদের নৈতিক চরিত্রকে প্রভাবিত করবে।

(iv) শিক্ষক তাঁর অভ্যাস, আচার-আচরণ এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে সংযমী, ধীর তথা প্রশান্ত হবেন। সমস্তরকম কুঅভ্যাস ও নেশা থেকে তিনি নিজেকে দূরে রাখবেন।

৫। সহায়কের ভূমিকায় শিক্ষাবিজ্ঞান শিক্ষকের ভূমিকা কী? (What is the role of Education Teacher as a facilitator?)

উত্তর : সহায়কের ভূমিকায় শিক্ষক যে সমস্ত দায়িত্ব পালন করতে পারেন সেগুলিকে আমরা নিম্নলিখিত ভাবে উপস্থাপিত করতে পারি :

(a) শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে তাঁর পাঠের বিষয়বস্তুকে সহজভাবে, সুষ্ঠুভাবে শিক্ষার্থীদের নিকট তুলে ধরবেন। বিষয়বস্তুর অর্থ উপলব্ধি, সমস্যার বর্ণনা ও সমাধানের উপায়গুলিকে পথ-নির্দেশ করবেন।

(b) বিষয়বস্তুকে সহজবোধ্য করে উপস্থাপিত করতে হবে শিক্ষককে—আধুনিক মনসত্ত্বাত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এবং যুক্তিসম্মতভাবে সংগঠিত করতে হবে।

(c) বিষয়বস্তুর মূল ভাবকে শিক্ষার্থীর নিকট বোধগম্য করে তোলার জন্য শিক্ষক এমন পদ্ধতি ও কৌশল ব্যবহার করবেন যাতে শিক্ষার্থীর বয়স, গ্রহণক্ষমতা বা বোধগম্যতার স্তর, রুচি, চাহিদা ও প্রবণতা গুরত্ব পায়।

(d) নির্দেশনা চলাকালীন যতখানি সম্ভব এবং প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষক মিথস্ক্রিয়াকে গুরুত্ব দেবেন। এই মিথস্ক্রিয়া মূলত শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে মিথস্ক্রিয়ার। সেক্ষেত্রে প্রশ্নকরণের সময় প্রয়োজন মতো সংকেত সরবরাহ করবেন।

৬। উপদেষ্টার ভূমিকায় শিক্ষাবিজ্ঞান শিক্ষকের ভূমিকা কী? (What is the role of Education Teacher as a mentor?)

উত্তর : যথোপযুক্ত পরামর্শ ও উপদেশ দানের দ্বারা শিক্ষক তাঁর সন্তানতুল্য শিক্ষার্থীকে জীবনের প্রতিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত করতে এগিয়ে আসেন। এই উপদেষ্টার ভূমিকায় শিক্ষক নিম্নলিখিত ভাবে দায়িত্বপালন করেন :

(ক) শিক্ষামূলক উপদেশ
(খ) বৃত্তিমূলক উপদেশ
(গ) সামাজিক উপদেশ
(ঘ) স্বাস্থ্যসংক্রান্ত উপদেশ
(ঙ) মূল্যবোধ সংক্রান্ত উপদেশ
(চ) চিত্তবিনোদন সংক্রান্ত উপদেশ

৭। প্রেষণা সঞ্চারকারী হিসেবে শিক্ষাবিজ্ঞান শিক্ষকের ভূমিকা কী? (What is the role of Education Teacher as a motivator?)

উত্তর : শিক্ষক হিসেবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই প্রেষণা সঞ্চার করার জন্য তিনি নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করতে পারেন :

Scanned with CamScanner

(a) **সাফল্যে অনুপ্রাণিত করা :** শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত প্রেষণাকে যথার্থভাবে ধরে রাখতে হলে শিক্ষককে এমন সব শিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল নির্বাচন করতে হবে যাতে শিক্ষার্থী তার সাফল্য সম্পর্কে অবগত হওয়ার সুযোগ পায়। অনুপ্রাণিত হতে পারে। সেই বিষয়টি মনে রেখে শিক্ষক বিষয়বস্তু ও শিক্ষণ পদ্ধতি নির্বাচন করবেন।

(b) **শিক্ষার্থীদের প্রশংসা করা :** প্রতিটি শিক্ষার্থী নিজেকে শ্রদ্ধা করতে চায়, সে জন্য আত্মশ্রদ্ধার চাহিদা শিক্ষার্থীর পরিতৃপ্তি ঘটাতে সক্ষম হয়। শিক্ষার্থীদের এই আত্মশ্রদ্ধার চাহিদার পরিতৃপ্তির জন্য শিক্ষকের কাজ হল শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত ও প্রশংসা করা।

৮। শিক্ষকের পেশাগত মান উন্নয়নের বিভিন্ন দিকগুলি কী কী? (What are the different aspects of professional growth of teachers.)

উত্তর : শিক্ষকের মান উচ্চ না হলে শিক্ষায় উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পেতে পারে না। এরজন্য যে সমস্ত মান শিক্ষকের থাকা দরকার যেগুলি হল—

★ শিক্ষকের পেশাগত শিক্ষা।
★ শিক্ষকের দক্ষতা।
★ পেশাগত উন্নয়ন।
★ শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিক্ষায় ধারাবাহিক সমর্থন।
★ পেশায় সক্রিয় অংশগ্রহণ।
★ শিক্ষকের ফিডব্যাক পদ্ধতি।
★ শিক্ষার্থী সম্পর্কে ধারণা।
★ শিক্ষকের কাজের পরিবেশ ইত্যাদি।

৯। উৎকৃষ্ট শিক্ষণ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী? (What are the characterisitics of good teaching method?)

উত্তর : উৎকৃষ্ট শিক্ষণ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হল—

★ মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তি।
★ উদ্দেশ্যভিত্তিক ও লক্ষ্য অভিমুখী।
★ সুবিন্যস্ত ও সুপরিকল্পিত।
★ সক্রিয়তাভিত্তিক ও কর্মকেন্দ্রিক।
★ শিক্ষার্থীর সামর্থ্যভিত্তিক।
★ অনুবন্ধ স্থাপনে সক্ষম।
★ চিন্তন ও যুক্তিভিত্তিক।

★ সৃজনশক্তির বিকাশ সহায়ক।
★ সামাজিকবোধের জাগরুক
★ সমন্বয়বাদী দৃষ্টিভঙ্গির অনুসারী।

১০। শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়নের ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা কী? (What is the role of Government in professional growth of teachers?)

উত্তর : শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়নের ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা নিম্নরূপ—

(a) শিক্ষকের শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় বা পর্ষদ থেকে উত্তীর্ণ পরীক্ষায় ন্যূনতম পঞ্চাশ শতাংশ (50%) নম্বর এবং মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার ক্ষেত্রে ন্যূনতম প্রাপ্ত পঞ্চান্ন শতাংশ (55%) হতে হবে। সরকার তা সুনিশ্চিত করবেন।

(b) প্রশিক্ষণহীন কোনো ব্যক্তি শিক্ষকতার পেশায় প্রবেশ করতে পারবেন না।

(c) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষক-প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলির পরিকাঠামোগত উন্নয়ন ঘটাতে হবে।

(d) শিক্ষকতার পেশায় প্রবেশ করার ক্ষেত্রে বা নিয়োগের জন্য Teacher's Eligibility Test বা TET পরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(e) বর্তমানে কর্মরত প্রশিক্ষণহীন শিক্ষকদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের MHRD এর অধীনে National Institute of Open School বা NIOS এবং Indira Gandhi National Open University বা IGNOU-এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ এবং নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে শিক্ষকদের যোগ্যতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

Visit Our Educational Website
Regularly For More Update:
https://www.dascoaching.in/

Scanned with CamScanner

সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি

❑ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (Objective type questions) : Marks – 2

১। শিক্ষাবিজ্ঞান শিক্ষকের চারটি ব্যক্তিগত গুণাবলি উল্লেখ করুন। (State four individual qualities of Education Teacher.)

২। শিক্ষাবিজ্ঞান শিক্ষকের চারটি পেশাগত গুণাবলি উল্লেখ করুন। (State four professional qualities of Education Teacher.)

৩। ন্যাশনাল নলেজ কমিশনের মতানুসারে শিক্ষকের যে-কোনো দুটি গুরুত্বপূর্ণ গুণাবলি লিখুন। (Write any two important qualities of teacher according to National Knowledge Commission.)

৪। শিক্ষাবিজ্ঞান শিক্ষকের নীতিবোধের চারটি দিক লিখুন। (Write four aspects of ethics of an Education Teacher.)

৫। সহায়কের ভূমিকায় শিক্ষাবিজ্ঞান শিক্ষকের ভূমিকা কী? (What is the role of Education Teacher as a facilitator?)

৬। উপদেষ্টার ভূমিকায় শিক্ষাবিজ্ঞান শিক্ষকের ভূমিকা কী? (What is the role of Education Teacher as a mentor?)

৭। প্রেষণা সঞ্চারকারী হিসেবে শিক্ষাবিজ্ঞান শিক্ষকের ভূমিকা কী? (What is the role of Education Teacher as a motivator?)

৮। শিক্ষকের পেশাগত মান উন্নয়নের বিভিন্ন দিকগুলি কী কী? (What are the different aspects of professional growth of teachers.)

৯। উৎকৃষ্ট শিক্ষণ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী? (What are the characterisitics of good teaching method?)

১০। শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়নের ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা কী? (What is the role of Government in professional growth of teachers?)

❑ সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্নাবলি (Short answer type questions) : Marks – 5

১। শিক্ষাবিজ্ঞান শিক্ষকের ব্যক্তিগত গুণাবলি সংক্ষেপে বর্ণনা করুন। (Describe in brief the individual qualities of Education Teacher.)

২। শিক্ষাবিজ্ঞান শিক্ষকের পেশাগত গুণাবলির বিভিন্ন দিকগুলি উল্লেখ করুন। (Write the different aspects of professional qualities of Education Teacher.)

৩। ন্যাশনাল নলেজ কমিশনের মতানুসারে শিক্ষকের গুরুত্বপূর্ণ গুণাবলির দিকগুলি কী কী? (What are the different aspects of important qualities of teacher according to National Knowledge Commission?)

৪। শিক্ষাবিজজ্ঞান শিক্ষকের নীতিবোধ সংক্ষেপে উল্লেখ করুন। (Write in brief the ethics of an Education Teacher.)

৫। আধুনিক শিক্ষায় উপদেষ্টা হিসেবে শিক্ষাবিজ্ঞান শিক্ষকের ভূমিকা কী? (What is the role of Education Teacher in modern education as a mentor?)

❑ রচনাভিত্তিক প্রশ্নাবলি (Essay type questions) : Marks – 10

১। শিক্ষাবিজ্ঞান শিক্ষকের গুণাবলি সংক্ষেপে বর্ণনা করুন। (Describe in brief the qualities of Education Teacher.)

২। শিক্ষাবিজ্ঞান শিক্ষকের যোগ্যতা ও গুণাবলি সংক্ষেপে আলোচনা করুন। (Discuss in brief qualification and qualities of Education Teacher.)

৩। সংক্ষেপে শিক্ষাবিজ্ঞান শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়ন বর্ণনা করুন। (Describe in brief professional growth of Education Teacher.)

Visit Our Educational Website

Regularly For More Update:

https://www.dascoaching.in/

Upload By DASCoaching.in

Scanned with CamScanner

অধ্যায় ৫

সমাজবিজ্ঞান (শিক্ষাবিজ্ঞান) শিক্ষণে মূল্যায়ন (Evaluation in Social Science Education)

বিষয়বস্তুর রূপরেখা :

৫.০ ভূমিকা (Introduction)

৫.১ সমাজবিজ্ঞানে (শিক্ষাবিজ্ঞান) মূল্যায়নের হাতিয়ার ও মূল্যায়নের কর্মসূচি [Evaluation devices, evaluation programme in social studies (Education)]

৫.১.১ মূল্যায়নের ধারণা (Concept of Evaluation)

৫.১.২ মূল্য নিরূপণের ধারণা (Concept of Assessment)

৫.১.৩ পরিমাপের ধারণা (Concept of Measurement)

৫.১.৪ মূল্যায়ন ও পরিমাপের মধ্যে পার্থক্য (Difference between Evaluation and Measurement)

৫.১.৫ মূল্য নিরূপণ ও পরিমাপের সঙ্গে মূল্যায়নের সম্পর্ক (Relation of Evaluation with Assessment and Measurement)

৫.১.৬ মূল্যায়নের উদ্দেশ্য (Purpose of Evaluation)

৫.১.৭ মূল্যায়নের পরিধি (Scope of Explanation)

৫.১.৮ মূল্যায়নের গুরুত্ব (Importance Explanation)

৫.১.৯ মূল্যায়নের কৌশলসমূহ (Evaluation Devices)

৫.১.৯.১ পর্যবেক্ষনমূলক কৌশল (Observational Teachnique)

৫.১.৯.২ আত্মবিবৃতিমূলক কৌশল (Self-Reporting Techniques)

৫.১.৯.৩ পরীক্ষামূলক কৌশল (Experimental Technique)

৫.২ সামর্থভিত্তিক মূল্যায়ন, নিরবচ্ছিন্ন ও সার্বিক মূল্যায়ন, গঠনধর্মী ও সামগ্রিক বা চূড়ান্ত মূল্যায়ন, নির্ণায়ক ও প্রতিকারধর্মী মূল্যায়ন, মূল্যায়নকারী হাতিয়ার গঠন : পারদর্শিতার অভীক্ষা (Competency based evaluation, continuous and comprehensive evaluation, formative and summative evaluation, diagnose and remediation, construction of assessment tools like achievement test.)

Scanned with CamScanner

৫.২.১ শিক্ষাবিজ্ঞানে মূল্যায়ন কর্মপরিকল্পনা (Evaluation Programme in Education)
৫.২.২ সামর্থভিত্তিক মূল্যায়ন (Competency based evaluation)
৫.২.৩ নিরবচ্ছিন্ন ও সার্বিক মূল্যায়ন (Continuous and Comprehensive Evaluation or CCE)
৫.২.৪ গঠনমূলক ও সমষ্টিগত মূল্যায়ন (Formative and Summative Evaluation)
৫.২.৫ নির্ণায়ক ও প্রতিকারধর্মী মূল্যায়ন (Diagnos and Remediation)
৫.২.৬ আদর্শ মান ভিত্তিক অভীক্ষা এবং কৃতিত্ব ভিত্তিক অভীক্ষা (Norm-reference test and criterion reference test)
৫.২.৭ পারদর্শিতার অভীক্ষা গঠন (Construction of Achievement Test)

dascoaching.in

✪ ৫.০ ভূমিকা (Introduction) :

শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল মূল্যায়ন (Evaluation)। শিক্ষণ এবং শিখনের ক্ষেত্রে মূল্যায়ন যথেষ্ট সাহায্য করে। মূল্যায়ন হল একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। শিক্ষাক্ষেত্রে বিচারকরণ, শিক্ষার বিভিন্ন অবস্থা এবং শিক্ষার্থীর সাফল্য নিরূপণ-এর বিষয়ে মূল্যায়ন অনেকখানি সহায়ক ভূমিকা গ্রহণ করে। শিক্ষার প্রতিটি ক্ষেত্রের কার্যাবলিকে যথার্থভাবে মূল্যায়িত করতে না পারলে শিক্ষার সার্থকতা উপলব্ধি করা বেশ কঠিন। আর এই জন্যই শিক্ষকের নিকট মূল্যায়ন-এর ধারণা এবং শ্রেণিকক্ষে তার বিভিন্ন দিকের প্রয়োগ সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা অত্যন্ত জরুরি বিষয়। শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ায় মূল্যায়নের ভূমিকাকে উপলব্ধি করে তার প্রয়োজন, গুরুত্ব, ধারণা এবং বৈশিষ্ট্যগুলি এই অধ্যায়ে আলোচনা করার চেষ্টা হয়েছে।

✪ ৫.১ সমাজবিজ্ঞানে (শিক্ষাবিজ্ঞান) মূল্যায়নের হাতিয়ার ও মূল্যায়নের কর্মসূচি [Evaluation devices, evaluation programme in social studies (Education)] :

❑ ৫.১.১ মূল্যায়নের ধারণা (Concept of Evaluation) :

মানবজীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল পরিবর্তনশীলতা। জন্মের পর বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যেমন মানুষের অভিজ্ঞতার পরিবর্তন ঘটে তেমনই তার পরিবর্তন ঘটে আচরণ ধারায়। পরিবর্তনের এই পথ ধরে এগিয়ে যেতে যেতে মানবশিশুর দৈহিক, মানসিক, প্রাক্ষোভিক এবং সামাজিক ও সেইসঙ্গে নৈতিক পরিবর্তনগুলি সাধিত হয়। এই পরিবর্তনের সূত্র ধরেই মানবশিশুর বিকাশ প্রক্রিয়া চলতে থাকে। ব্যক্তি শিশুর বিকাশশীল এই পরিবর্তনের বিভিন্ন

দিকগুলির প্রকৃতি ও মাত্রা নির্ধারিত হয় মূল্যায়নের দ্বারা। আধুনিক শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ায় শিক্ষকের কাজ হল এই মূল্যায়নকে সঠিকভাবে জানা এবং উপলব্ধি করা।

প্রকৃত পক্ষে মূল্যায়ন প্রক্রিয়া হল বিচারকরণের প্রক্রিয়া বিশেষ। ব্যক্তি শিশুর পরিমাণ এবং গুণগত পরিবর্তনের মূল্যনির্ধারণ বা বিচারকরণের প্রক্রিয়াই হল মূল্যায়ন প্রক্রিয়া। শ্রেণিকক্ষের পাঠদানের প্রধান উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীদের আচরণকে কাঙ্ক্ষিত অভিমুখে প্রভাবিত করা। কাঙ্ক্ষিত অভিমুখ পরিচালিত হয় শিক্ষার উদ্দেশ্যের দ্বারা, নির্মিত হয় বিদ্যালয় এবং শিক্ষক দ্বারা। আরও নির্দিষ্ট করে বলা যেতে পারে শিক্ষক বিভিন্ন পাঠের জন্য বিভিন্ন নির্দেশনামূলক উদ্দেশ্যাবলি গঠন করেন। বিষয় অধিগত করার জন্য শিক্ষককে পাঠগুলিকে নির্দিষ্ট স্মৃতিতে বিন্যস্ত করে নিতে হয়। এরপর শিক্ষার্থীদের শিখনের উপর ভিত্তি করে গঠন করতে হয় শিখন অভিজ্ঞতা। শেষপর্যন্ত শিক্ষককে স্থির করতে হয়, নির্দেশনামূলক উদ্দেশ্যগুলি সার্থকভাবে অর্জিত হয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখতে হয়। সুতরাং একথা স্বচ্ছন্দে বলা যেতে পারে যে, শিক্ষা প্রক্রিয়ায় তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল—(i) উদ্দেশ্যাবলি, (ii) শিখন অভিজ্ঞতা এবং (iii) শিক্ষার্থীর মূল্যবিচার।

আবার মূল্যায়নের কাজ শুধুমাত্র অতীত বা বর্তমানেও সীমাবদ্ধ নয়। এর কাজের দ্বারা ভবিষ্যতের কথাও চিন্তা করা যায় বা বিবেচনা করা যায়। ব্যক্তি শিশু বা শিক্ষার্থী ভবিষ্যতে কোন্ ধরনের আচরণ সম্পাদন করতে সক্ষম হবে, সেটিও মূল্যায়নের বিচার্যের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং মূল্যায়নের ধারণাটিকে একটু বিস্তৃতভাবে বলা যেতে পারে অতীতের পটভূমিকায় বিচার করে ব্যক্তি শিশু বা শিক্ষার্থীর দ্বারা সম্পাদিত কোনো আচরণকে ভবিষ্যতে সম্ভাবনার বিচারে মূল্য আরোপ করার প্রক্রিয়া হল মূল্যায়ন।

বিভিন্ন শিক্ষাবিদ ও মনোবিজ্ঞানী মূল্যায়নের যে সমস্ত সংজ্ঞা দিয়েছেন সেগুলি হল নিম্নরূপ:—

কার্টার.ভি.গুড (Carter. V. Good, 1959) বলেছেন, "Evaluation is the process of ascertaining or judging the value or amount of something by use of a standard of appraisal."

স্টাফিল বিম এবং অন্যান্যরা (Stuffle beam and others, 1971) মূল্যায়নের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, "Evaluation is the process of delineating, obtaining and providing useful information for judging decision alternatives."

রাইটস্টোন (Wright-stone, 1956) মূল্যায়ন প্রসঙ্গে বলেছেন, "Evaluation is relatively new teachnical term introduced to designate a more comprehensive concept of measurement that is applied in conventional tests and examination.....The emphasis is upon broad personality changes and major objectives of educational programme. These include not only subject matter achievements but also attitudes, intersts, ideas, ways of thinking, work habits and personal and social adaptibility."

Scanned with CamScanner

টরগারসন এবং **অ্যাডামস** (Torgerson and Adams, 1955) বলেছেন, "To evaluate is to ascertain the value of a process or a thing, thus educational evaluation is the passing of judgement on the degree of worth whileness of a teaching process or learning experience."

কুইল্যান এবং **হ্যান্না** (Quillen and Hanna, 1961) মূল্যায়ন এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন, "Evaluation is the process of gathering and interpreting evidences on changes in the behaviour of the students as they progress through school."

ভারতীয় শিক্ষাকমিশন (Indian Education commission, 1966) মূল্যায়ন প্রসঙ্গে বক্তব্য রেখেছেন এইভাবে, "It is now agreed that evaluation is a continuous process, form and integral part of the total system of education and is ultimately related to educational objectives. It exercises a great influence on the pupil's study habits and the teacher's method of instruction and thus helps not only to measure educational achievements but also improves it."

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলিকে বিশ্লেষণ করলে আমরা মূল্যায়নের প্রকৃতি এবং বৈশিষ্ট্যগুলিকে জানতে পারি। নীচে সেগুলি উল্লেখ করা হল :

১. মূল্যায়নের পরিধি বিশাল বিস্তৃত। এর দ্বারা শিক্ষার্থীর সকল বৈশিষ্ট্য বা ক্ষমতার গুণগত মান নিরূপণ করা যায়। শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশসাধনই হল আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্য। শিক্ষার এই লক্ষ্য যথাযথভাবে অর্জিত হয়েছে কি না তা বোঝা যায় মূল্যায়নের মাধ্যমেই।

২. মূল্যায়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এটি শিক্ষার্থীর সামগ্রিক আচরণের বিচার কৌশল স্থির করে এবং শিক্ষার্থীর সতত পরিবর্তনশীল বিকাশকে গুরুত্ব দেয়।

৩. শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতিতে শিক্ষার্থীর আচরণের পরিমাণগত ও গুণগত পরিবর্তনকে বিবৃত করে।

৪. মূল্যায়নের দ্বারা শিক্ষার্থীর সামগ্রিক সত্তা বা তার বিকাশের সর্বপ্রকার অবস্থা সম্পর্কিত তথ্যাবলি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়।

৫. মূল্যায়ন যেমন গতিশীল প্রক্রিয়া তেমনই সমাজ শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ।

৬. মূল্যায়ন প্রক্রিয়া নির্ভর করে শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং অভিভাবকের পারস্পরিক সহযোগিতাপূর্ণ কর্মপ্রচেষ্টার উপর।

মূল্যায়ন প্রক্রিয়াকে অনুসন্ধান করলে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়, সেগুলি হল—(i) শিক্ষার উদ্দেশ্য, (ii) শিখন অভিজ্ঞতা এবং (iii) শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন। **বেঞ্জামিন ব্লুমের** মতে ওই তিনটি দিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় ভীষণভাবে পরস্পর

সম্পর্কযুক্ত। এদের যে-কোনো একটিকে বাদ দিয়ে মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার কথা ভাবা যায় না এবং এটি কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা বা প্রক্রিয়া নয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার যে মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে মূল্যায়নকারীর ব্যক্তিগত বিচারকরণের প্রশ্নটিও বিশেষভাবে সম্পর্কিত। শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ার প্রভাবে শিক্ষার্থীর মধ্যে পরিবর্তিত আচরণ শিক্ষার উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে কতখানি যথার্থ তার বিচারকরণের প্রয়োজন আছে। সেদিক থেকে মূল্যায়ন বিচারকরণের কাজ মূল্যায়ন প্রক্রিয়াকে ত্রি-মাত্রিক করে তোলে।

মূল্যায়ন ত্রিভুজের ত্রিমাত্রিক ধারণা

মূল্যায়নের ক্ষেত্রে মূল্যমান বিচারকরণের কাজটি অত্যন্ত মূল্যবান এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই মূল্যমান বিচারকরণ ব্যক্তি নিরপেক্ষ নয়। যিনি মূল্যমান বিচারকরণের কাজটি করেন তাঁর ব্যক্তিগত বিচার বিবেচনা মূল্যায়নকে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলে। এজন্য অধ্যাপক Bloom-এর ত্রিমুখী মূল্যায়নের ধারণায় মনোবিজ্ঞানী Gronland আরও একটি মাত্রা সংযুক্ত করেছেন, সেটি হল মূল্যবিচারকরণ বা Value Judgement। এই প্রসঙ্গে **Gronlund** উল্লেখ করেছেন—"Evaluation includes both qualitative and quantitative description of behaviour plus value judgement concerning the desirability of that behaviour."

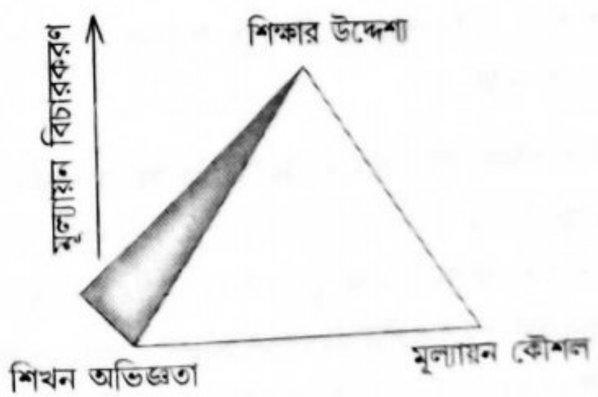

মূল্যায়ন ত্রিভুজের চতুর্মাত্রিক ধারণা

Scanned with CamScanner

❑ ৫.১.২ মূল্য নিরূপণের ধারণা (Concept of Assessment) :

মূল্য নিরূপন বা মূল্যনির্ধারণ বা অ্যাসেস্‌মেন্ট হল মূল্যায়নের একটি অংশ যার মাধ্যমে আমরা শিক্ষার কোনো একটি বিশেষ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অগ্রগতি নিরূপণ করি। কোনো একজন শিক্ষার্থীকে সামগ্রিকভাবে পরিমাপের চেষ্টা এখানে হয় না, কিন্তু বিষয়ের বিশেষ কোনো ক্ষেত্রে (area) তার নির্দিষ্ট ক্ষমতাকে পরিমাপ করা হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়—পাঠ্য-বিষয়বস্তুর কিছু জ্ঞান, যেমন—শিক্ষার সংজ্ঞা ও ধারণা, শিক্ষার উপাদান হিসেবে শিশু শিক্ষায় আধুনিক শিক্ষকের ভূমিকা, আধুনিক পাঠ্যক্রমের বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি। অ্যাসেসমেন্ট সাধারণত পরিমাপ করে কোনো একজন শিক্ষার্থী একটি নির্দিষ্ট সময় পরিসরে একটি বিশেষ বিষয়বস্তু বা টপিক কতখানি উপলব্ধি করতে পেরেছে। এটি হল শিখনের পর্যবেক্ষণ এবং পরিমাপন প্রক্রিয়া। শিক্ষার্থীরা কতখানি এবং কত ভালোভাবে শিখতে পেরেছে তা উপলব্ধি করতে বা জানতে শিক্ষককে সহায়তা করে এই অ্যাসেসমেন্ট। প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের আরও গভীরভাবে পাঠ্যবিষয়বস্তুর কোনো একটি বিশেষ ক্ষেত্রকে শিখতে নিবন্ধ করেন। অ্যাসেসমেন্ট প্রক্রিয়াকে আরও বেশি ব্যবহারযোগ্য এবং কার্যকরী করে তুলতে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করা যেতে পারে। সেগুলি হল—

১। প্রতিটি শিক্ষার্থীকে শিক্ষাবিজ্ঞান বিষয়ে অগ্রগতি ঘটাতে বেশি বেশি প্রতিবার্তা (feedback) প্রদান করা।

২। যতখানি সম্ভব শিক্ষার্থীদের প্রদত্ত উত্তরপত্রকে নৈর্ব্যক্তিকভাবে পরিমাপ বা মূল্য নিরূপণ করা।

৩। শিক্ষার্থীদের কার্যকরী শিখনে সহায়তা করতে শিক্ষাবিজ্ঞান শিক্ষকদেরকে প্রতিবার্তা বা feedback প্রদান করা।

৪। শিক্ষাবিজ্ঞান বিষয়ে আরও বেশি আগ্রহী করে তুলতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রেষণা সঞ্চার করা।

৫। শিক্ষাবিজ্ঞান শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষাবিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ দিকগুলি সম্পর্কে সর্বাধুনিক তথ্যপ্রদান করা এবং সেই সঙ্গে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তার গুরুত্ব এবং কর্মক্ষেত্রের দিককে তুলে ধরা।

❑ ৫.১.৩ পরিমাপ-এর ধারণা (Concept of Measurement) :

মূল্যায়ন প্রসঙ্গে আমরা অনেক সময় পরিমাপ কথাটিকে ব্যবহার করে ফেলি। সেক্ষেত্রে মূল্যায়ন আর পরিমাপ প্রায় সমার্থক শব্দ হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মূল্যায়ন আর পরিমাপকে একই অর্থে ব্যবহার করা যায় না। কারণ সমাজবিজ্ঞানের অন্তর্গত বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষ করে শিক্ষাবিজ্ঞানে মূল্যায়ন ও পরিমাপ শব্দ দুটিকে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা সমীচীন। সাধারণভাবে পরিমাপকে বস্তুনিষ্ঠ রূপে বর্ণনা করা যায়। কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী কোনো বিষয় বা বস্তুর সংখ্যাগত মান নির্দেশ করাকে বলা হয় পরিমাপ। এই

প্রসঙ্গে Tylor বলেছেন, "পরিমাপ হল নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী বস্তু বা বিষয়-এর সংখ্যাগত বিভাজন নির্দেশ করে।" পরিমাপ প্রসঙ্গে অন্যান্য মনোবিজ্ঞানী বা শিক্ষাবিজ্ঞানীগণ যে সমস্ত সংজ্ঞা দিয়েছেন সেগুলি হল নিম্নরূপ—

১। **কার্টার ভি. গুড** (Carter V. Good, 1959) : পরিমাপকে এইভাবে বোঝা যেতে পারে, "the comparison of a quantity (exhibited in a particular case) with an appropriate scale for the purpose of determining (within the limits of accuracy imposed by the nature of the scale) the numerical value on the scale that corresponds to the quantity to be measured."

২। **রেমার্স, গেজ এবং রুমেল** (Remmers, Gage and Rummel, 1960) : "Measurement refers to observations that can be expressed quantitatively and answers the questions 'how much'."

৩। **মহেশ ভার্গব** (Mahesh Bhargava, 1987) : "Measurement is the process of assigning symbols or numerals to observations, objects or events in some meaningful or consistent manner according to rule."

৪। **গ্রোনল্যান্ড অ্যান্ড লিন** (Gronland and Linn, 1990) "The term measurement is limited to quantitative description of pupils; that is the results of measurement are always expressed in number. It does not include qualitative descriptions nor does it imply judgement concerning the worth or value of the obtained results."

৫। পরিমাপ সম্পর্কে **Nunnally** যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা হল, "Measuremnt consists of rules for assigning numbers to objects in such a way as to represent quantities of attributes."

Nunnally প্রদত্ত সংজ্ঞাকে বিশ্লেষণ করলে আমরা পরিমাপের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য পাই—

১। পরিমাপের পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী প্রদত্ত সংখ্যা একটি পরিমাণগত দিককে নির্দেশ করে।

২। পরিমাপ বলতে বস্তুর বৈশিষ্ট্য বা গুণকে পরিমাপ করা বোঝায়।

৩। পরিমাপে ব্যবহৃত সংখ্যাগুলি বস্তুর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বা গুণের পরিমাণগত দিককে নির্দেশ করে।

❑ ৫.১.৪ মূল্যায়ন ও পরিমাপের মধ্যে পার্থক্য (Difference between Evaluation and Measurement) :

মূল্যায়ন ও পরিমাপের বৈশিষ্ট্যগুলির আলোচনার ভিত্তিতে আমরা মূল্যায়ন ও পরিমাপের মধ্যে একটি পার্থক্য নির্দেশ করতে পারি—

Scanned with CamScanner

মূল্যায়ন (Evaluation)	পরিমাপ (Measurement)
১। মূল্যায়ন হল উদ্দেশ্যমুখী প্রক্রিয়া। শিক্ষার সামগ্রিক উদ্দেশ্যের বিষয়টি গুরুত্ব পায়।	১। পরিমাপের ক্ষেত্রে কিছু উদ্দেশ্য থাকলেও সেটি তেমনভাবে উল্লেখযোগ্য নয়।
২। মূল্যায়ন হল সামগ্রিক প্রকৃতির, এখানে শিক্ষার্থীর সামগ্রিক অগ্রগতির বিচার করা হয়।	২। পরিমাপ সামগ্রিক প্রকৃতির নয়, বিচ্ছিন্ন প্রকৃতির। পরিমাপের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয়ের বৈশিষ্ট্য পৃথক পৃথক ভাবে বিবেচনা করা হয়।
৩। মূল্যায়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া।	৩। পরিমাপ হল একটি সাময়িক প্রক্রিয়া।
৪। মূল্যায়নে শিক্ষার্থীর আচরণগত বৈশিষ্ট্যের পরিমাণগত এবং গুণগত উভয় দিকই বিবেচনা করা হয়।	৪। পরিমাপের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর শুধুমাত্র আচরণগত বৈশিষ্ট্যের পরিমাণগত দিককেই বিবেচনা করা হয়।
৫। মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নির্ধারিত সময় অনেক বেশি লাগে।	৫। পরিমাপের ক্ষেত্রে নির্ধারিত সময় তুলনামূলকভাবে কম লাগে।
৬। মূল্যায়নের দ্বারা শিক্ষার্থীর ক্রমোন্নতিকে নির্দেশ করা যায়।	৬। পরিমাপের দ্বারা শিক্ষার্থীর ক্রমোন্নতিকে নির্দেশ করা সম্ভব নয়।
৭। মূল্যায়ন একটি জটীল প্রক্রিয়া।	৭। পরিমাপ তুলনামূলক ভাবে সহজ প্রক্রিয়া।

❑ ৫.১.৫ মূল্য নিরূপণ ও পরিমাপের সঙ্গে মূল্যায়নের সম্পর্ক (Relation of Evaluation with Assessment and Measurement) :

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি—

১. মূল্যায়ন পরিমাপের ফলের উপর নির্ভরশীল হতে পারে কিন্তু পরবর্তী ক্ষেত্রে পরিমাপের ফলের বিচারকরণের প্রশ্ন থাকে।

২. মূল্যায়ন অপরিমাণযোগ্য বিষয়ের উপর নির্ভরশীল হতে পারে, অর্থাৎ (testing device) যেমন—পর্যবেক্ষণ, রেটিং এবং সাক্ষাৎকার প্রভৃতির উপর নির্ভর করে। তবে, সেগুলিরও একটি প্রদত্ত পরিস্থিতিতে বিচারকরণের প্রশ্ন জড়িত।

৩. মূল্যায়ন শিক্ষার্থীদের অগ্রগতিতে পরিমাণগত এবং গুণগত দিকের বিবরণকে অন্তর্ভুক্ত করে।

মূল্যায়নের এই সুসমন্বিত প্রকৃতির উপর নির্ভর করে পরিমাপের সঙ্গে তার সম্পর্ককে নির্দেশ করা যায়—

১. মূল্যায়ন = অগ্রগতির পরিমাণগত বিবরণ (পরিমাপ) + নিরূপিত মূল্য (বিচারকরণ)

২. মূল্যায়ন = অগ্রগতির পরিমাণগত বিবরণ (অ-পরিমাপ) + নিরূপিত মূল্য (বিচারকরণ)

ebook.dascoaching.in

৩. মূল্যায়ন = অগ্রগতির পরিমাণগত + গুণগত বিবরণ (পরিমাপ ও অ-পরিমাপ) + নিরূপিত মূল্য (বিচারকরণ)

সুতরাং উপরের সামগ্রিক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দেখতে পাই মূল্যায়নের অন্তর্গত বিষয় হল অ্যাসেসমেন্ট বা মূল্য নির্ধারণ এবং পরিমাপ। পরিমাপ (measurement) এবং মূল্যনির্ধারণ (assessment)-এর তুলনায় মূল্যায়ন অনেকখানি ব্যাপক। **এই তিনটি বিষয়কে আমরা নিম্নে প্রদত্ত রেখাচিত্রে স্থাপন করতে পারি :**

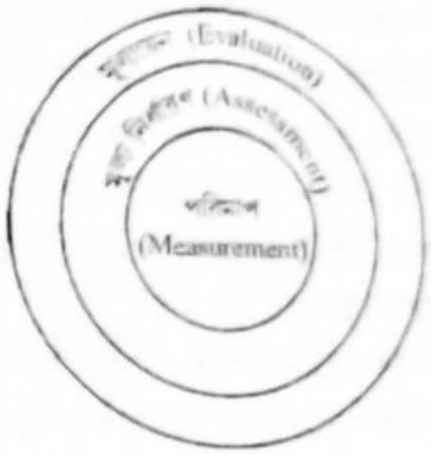

পরিমাপ, মূল্যনির্ধারণ এবং মূল্যায়নের পারস্পরিক সম্পর্কের রেখাচিত্র।

❑ ৫.১.৬ মূল্যায়নের উদ্দেশ্য (Purpose of Evaluation) :

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে মূল্যায়ন শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা। শিক্ষণ-শিখন কার্যাবলি তো বটেই এমনকি শিক্ষার নানা দিকগুলিতে তার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবকে অস্বীকার করা যায় না। এজন্যই শিক্ষাক্ষেত্রে মূল্যায়নকে কাজে লাগানোর জন্য শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্ত ব্যক্তিরই সচেতন প্রচেষ্টা থাকে। **এই প্রেক্ষিতে মূল্যায়নের উদ্দেশ্যগুলি আমরা নীচে আলোচনা করার চেষ্টা করছি :**

১। **শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর প্রেষণা সঞ্চার :** মূল্যায়ন প্রক্রিয়া শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষককেও শিক্ষণ-শিখন কার্যাবলির ফলশ্রুতির সঙ্গে পরিচিতি ঘটিয়ে যে ধারণা প্রদান করে তা শিক্ষার্থী ও শিক্ষক উভয়কেই শিক্ষণ-শিখন কার্যের মূল স্রোতে নিবদ্ধ রাখতে সহায়তা করে। শিক্ষার্থীর সাফল্যকে নির্দেশ করে শিক্ষকের প্রশংসাসূচক মন্তব্য যেমন শিক্ষার্থীকে প্রেষিত করে তেমনই শিক্ষক নিজেও তাঁর কাজে উৎসাহ পান।

২। **প্রতিবার্তা ও সংশোধন প্রক্রিয়া সম্পাদন :** শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করে তাদেরকে প্রয়োজনীয় প্রতিবার্তা (feed back) প্রেরণ এবং প্রাসঙ্গিক সংশোধন প্রক্রিয়া চালিয়ে শিক্ষার্থীদের শিখনকার্যকে নতুন করে উদ্দীপিত করা সম্ভব। মূল্যায়ন যথার্থভাবে এই কার্যটি সম্পন্ন করে।

Scanned with CamScanner

৩। **শিক্ষকের পারদর্শিতার উন্নয়ন ঘটানো :** শিক্ষণ কার্যের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশলগুলির কার্যকারিতা বিচার করা এবং শিক্ষককে প্রাসঙ্গিক প্রতিবার্তা (feed back) প্রেরণ করে শিক্ষণ কার্যের সংশোধন, পরিমার্জন ঘটিয়ে শিক্ষকের পারদর্শিতাকে আরো উন্নত করে তুলতে মূল্যায়ন সাহায্য করে থাকে।

৪। **প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি ও অবদানকে জনসমাজে তুলে ধরা :** শিক্ষার্থীদের অগ্রগতির ধারা জানিয়ে তাদেরকে বিভিন্ন স্তর বা গ্রেডে বিভক্ত করা, বিস্তারিত তথ্যাবলি অভিভাবকদের সামনে তুলে ধরে প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি ও অবদানকে এক ঝলকে পৌঁছে দেওয়া যায় মূল্যায়নকেই কাজে লাগিয়ে।

৫। **শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্ত ব্যক্তিদের দায়িত্ব সচেতনতা বৃদ্ধি :** মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন পদাধিকারী ব্যক্তি, দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক ও শিক্ষা সহায়ক কর্মীদের তথ্যসমৃদ্ধ করে ভবিষ্যতে দায়িত্ব পালন করতে এবং কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ করতে বিশেষভাবে সহায়তা করে মূল্যায়ন।

৬। **জনগণকে শিক্ষা সম্পর্কে সচেতন করে তোলা :** বৃহত্তর ক্ষেত্রে সামগ্রিক মূল্যায়ন ব্যবস্থার দ্বারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাদপ্তর, সরকারি শিক্ষাবিভাগের, রাজ্য ও দেশের শিক্ষার সাফল্য ও কর্মকাণ্ডকে ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে জনগণকে শিক্ষার ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন করে তোলা যায়, যা শিক্ষার গুরুত্বকে প্রতিষ্ঠিত করে।

৭। **উদ্দেশ্য নির্ধারণ ও গঠনে সাহায্য করা :** শিক্ষণ-শিখন কার্যের ধারা বা অগ্রগতিকে বজায় রাখতে যেসব উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে হয় সেগুলিকে গঠন করতে মূল্যায়ন সাহায্য করে।

৮। **শিখন অভিজ্ঞতা, পাঠ্যসূচি ও সামগ্রিক পাঠ্যক্রম গঠনে সাহায্য করা :** শিক্ষার্থীদের শিখন-অভিজ্ঞতা নির্বাচন ও সংগঠিত করতে, পাঠ্যসূচি গঠন করতে এবং সামগ্রিক পাঠ্যক্রম উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সাহায্য করে থাকে এই মূল্যায়ন ব্যবস্থাই।

৯। **শিক্ষণ-প্রদীপন ব্যবহারে সংশোধন ও পুনঃপরিকল্পনা গঠনে সহায়তা করা :** শিক্ষণ-প্রদীপনের ব্যবহার পরিবর্তিত ক্ষেত্রে কীভাবে করা যেতে পারে, কিংবা কোনো সংশোধন বা পরিমার্জন ঘটানোর প্রয়োজন আছে কি না, তাকে বাস্তবায়িত করে তোলা এবং সেই বিষয়ে পুনঃপরিকল্পনা প্রস্তুত করতে মূল্যায়ন যথার্থভাবে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে, ফলে শিক্ষার যথার্থ উন্নয়ন ঘটানোও সম্ভব হয়।

১০। **সংশোধনী শিক্ষণ, ব্যক্তিগত শিক্ষণ, দলগত শিক্ষণ ও বিশেষ শিক্ষায় সহায়তা করা :** শিক্ষার আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষিতে সংশোধনমূলক শিক্ষণ (remedial teaching), ব্যক্তিগত শিক্ষণ (individual teaching), দলগত কার্যাবলি (group activities) এবং বিশেষ শিক্ষা (special education programme) ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা, পরিকল্পনা গ্রহণ এবং কার্যকরী করে তুলতে মূল্যায়ন ব্যবস্থা এক যুগান্তকারী ভূমিকা আজ গ্রহণ করে।

১১। **শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত বৈষম্যকে গুরুত্ব প্রদান করা :** শিক্ষার্থী শিখবে তার আপন সামর্থ্য, চাহিদা, রুচি, পছন্দ অনুসারে। স্বাভাবিকভাবে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত বৈষম্যকে গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্র বা দিকগুলিতে তাদেরকে সঠিকভাবে নির্বাচিত করে একটি উপযুক্ত পথ নির্দেশ করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়। মূল্যায়ন এই ব্যাপারে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষার সঙ্গে দায়িত্বপ্রাপ্ত পদাধিকারীকে বিশেষভাবে সাহায্য করে।

১২। **শিক্ষার পরবর্তী স্তরে উন্নয়ন, অনুন্নয়ন ও শংসাপত্র প্রদানে সহায়তা দান :** শিক্ষার্থীদের পরবর্তী স্তরে উত্তীর্ণ করা কিংবা আটকে রাখা, নির্দিষ্ট স্তরে বা ক্ষেত্রে বিন্যস্ত করা, মেধাগত অবস্থান নির্ণয় করা, প্রাসঙ্গিক ডিগ্রি ও ডিপ্লোমা প্রদানের নিমিত্ত শংসাপত্রে ব্যবস্থা করার ক্ষেত্রে মূল্যায়ন সমগ্র শিক্ষাদপ্তর সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা করে থাকে।

❑ ৫.১.৭ মূল্যায়নের পরিধি (Scope of Evaluation) :

মূল্যায়নে শিক্ষার্থীর সম্পাদিত আচরণগুলির উপর মূল্য আরোপ করা হয়ে থাকে, অর্থাৎ শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর পরিবর্তিত আচরণগুলির যথাযোগ্যতা যাচাই করা হল মূল্যায়ন কার্যের অন্তর্ভুক্ত বিষয়। যেহেতু শিক্ষার্থীর আচরণ বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং ব্যাপক, স্বাভাবিকভাবেই মূল্যায়নের কর্মপরিধির ক্ষেত্রও বিশাল ও ব্যাপক। নীচে এগুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল—

১। **শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন :** কিছু সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে সামনে রেখে শিক্ষার কার্যাবলি পরিচালিত হয়। শিক্ষার এই কার্যাবলি পরিচালিত হওয়ার একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর শিক্ষার্থী কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য অর্জনে কতখানি সফল অর্থাৎ তার অগ্রগতি যাচাই করা দরকার হয়। কীভাবে সেই যাচাইকরণের কাজ করা যেতে পারে, কোন্ কোন্ পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করা যায়, কী কী উপকরণ এজন্য প্রয়োজন সে-সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা মূল্যায়নের কর্মপরিধির অন্তর্ভুক্ত।

২। **পাঠক্রম, শিক্ষণ পদ্ধতি ও শিক্ষকের মূল্যায়ন :** কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য অর্জনে বা লক্ষ্যপূরণে শিক্ষার্থী কতখানি সফল, তার যেমন মূল্যায়নের প্রয়োজন হয়, তেমনই শিক্ষার্থীর অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে অনুসৃত পাঠ্যসূচি ও পাঠক্রম, শিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশলের যথাযোগ্যতা, শিক্ষকের পারদর্শিতা ও দায়বদ্ধতারও মূল্যায়নের আলোচনার পরিধিভুক্ত। কার্যত সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার বিচারকরণ মূল্যায়নের কর্মপরিধির অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে।

Scanned with CamScanner

৩। **শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশের দৃষ্টিভঙ্গি :** দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষার্থীর জ্ঞানমূলক বা বৌদ্ধিক বিকাশ নিয়েই সকলে ব্যস্ত ও চিন্তিত থাকতেন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষকের প্রধান দায়বদ্ধতা হয়ে দাঁড়িয়েছিল শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক বিকাশের ব্যবস্থাগ্রহণে ও তার যথার্থ বিচার বিবেচনা করা; কিন্তু আধুনিক শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার একটি প্রধান দিকই হল শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশ অর্থাৎ শিক্ষার্থীর দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, প্রাক্ষোভিক, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বিকাশ। শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশের এই দৃষ্টিভঙ্গি গঠন ও তার আলোচনা করা মূল্যায়নের কর্মপরিধিরই অন্তর্ভুক্ত।

৪। **শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের কর্মপ্রচেষ্টা ও দায়িত্ববোধ :** শিক্ষার্থীর যথার্থ সার্বিক বিকাশ শুধুমাত্র শিক্ষার্থীর নিজের উপর এবং শিক্ষকের কাজের উপর নির্ভর করে না। শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশের সঙ্গে জড়িত অন্যান্য দিক বা ক্ষেত্রগুলির মধ্যে আছেন অভিভাবক, প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ, পরিবারের অন্যান্য আত্মীয়স্বজন, পারিপার্শিক প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ বা অবস্থা, জনসচেতনতা, রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, সরকারের গৃহীত কার্যনীতি প্রভৃতি। কার্যত সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি হিসেবে শিক্ষার্থী তার সার্বিক বিকাশের পথে অগ্রসর হতে থাকে। সেদিক থেকে বলা যায় মূল্যায়ন শুধুমাত্র শিক্ষক বা শিক্ষার্থীর ভূমিকা নিয়েই আলোচনা করে না, আলোচনা করে উপরিউক্ত অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের কর্মপ্রচেষ্টা ও দায়িত্ববোধ নিয়েও।

৫। **ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনার দিক নির্দেশ :** শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন প্রসঙ্গ শুধুমাত্র তার অতীত ও বর্তমানের শিক্ষাগত অবস্থাকেই সূচিত করে না এবং ভবিষ্যতের কর্মপ্রচেষ্টা ও পরিকল্পনা কী হবে তার পূর্বাভাষ প্রদান এবং উপযুক্ত দিক নির্দেশ করে মূল্যায়ন।

৬। **বৃত্তিমূলক নির্দেশনার প্রসঙ্গ :** বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষক এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাজ কেবলমাত্র শিক্ষাদান কার্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বৃত্তিমূলক নির্দেশনাদানের কাজটিও করতে হয়। এই ধরনের কার্য-সম্পাদনের ক্ষেত্রে শিক্ষামূলক বিভিন্ন অত্যাধুনিক কোর্স সম্পর্কে, বৃত্তি ও পেশাগত দিক সম্পর্কে, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের নানা দিক সম্পর্কে জানতে গিয়ে শিক্ষক ও প্রতিষ্ঠানকে নানান তথ্য সংগ্রহ করতে হয়। শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন প্রসঙ্গ বৃত্তিমূলক নির্দেশনার ক্ষেত্রে শিক্ষককে যথেষ্ট সহযোগিতা করে। সুতরাং মূল্যায়নের আলোচনার পরিধিও বিস্তৃতি লাভ করে।

❑ ৫.১.৮ মূল্যায়নের গুরুত্ব (Importance of Evaluation) :

শিক্ষাক্ষেত্রের প্রতিটি দিকে মূল্যায়নের প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ প্রভাব সুস্পষ্ট। এই মূল্যায়ন হতে পারে শিক্ষার্থীর অগ্রগতির, শিক্ষকের পারদর্শিতা বা দায়বদ্ধতার, শিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশলের, পাঠ্যসূচি তথা পাঠক্রমের, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের, সর্বোপরি শিক্ষার সামগ্রিক

ব্যবস্থাপনার। স্বাভাবিকভাবেই এর গুরুত্ব সংশ্লিষ্ট সমস্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নিকট। শিক্ষার প্রকৃত সার্থকতা বা সাফল্যের অনেকখানি প্রতিফলিত মূল্যায়ন ব্যবস্থায়। মূল্যায়নের এই গুরুত্বের দিকগুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল :

১। **উদ্দেশ্যের প্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীর অগ্রগতির বিচার :** শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সঙ্গে মূল্যায়নের গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার প্রথম পর্যায়ে যেমন শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলিকে নির্ধারণ করা হয় তেমনই শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলি কতখানি বাস্তবায়িত হয়েছে বা উদ্দেশ্যের প্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীর অগ্রগতি কতখানি সম্পন্ন হয়েছে তার বিচার করা হয় মূল্যায়নের দ্বারা। সুতরাং মূল্যায়ন যেমন শিক্ষার উদ্দেশ্য স্থির করে তেমনই শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলির পর্যালোচনা করে।

২। **পাঠক্রমের যথাযোগ্যতা যাচাই করা :** শিক্ষার উদ্দেশ্য অর্জনে তথা লক্ষ্যে পৌঁছোনোর পরিকল্পিত পথনির্দেশ হল 'পাঠক্রম'। পাঠ্যসূচি হল তার একটি অংশ মাত্র। শিক্ষার্থী তার শিক্ষাগ্রহণের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন পাঠ্য-বিষয়বস্তু বা পাঠ্যসূচি অনুসরণ করে অগ্রসর হয়। পূর্ব নির্ধারিত এই উদ্দেশ্যগুলির ভিত্তিতে পাঠ্যসূচি অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর যে আচরণগত পরিবর্তন ঘটার কথা, তা যদি না ঘটে তাহলে অন্যান্য বিষয়গুলির সঙ্গে পাঠ্যসূচি তথা পাঠক্রমেরও যথাযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে এবং অনেক ক্ষেত্রে তার ত্রুটিও ধরা পড়ে। সুতরাং অনুসৃত পাঠক্রমের যথাযোগ্যতা যাচাই করাও মূল্যায়নের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

৩। **শিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশলের কার্যকারিতা বিচার করা :** মূল্যায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল শিক্ষক কর্তৃক অনুসৃত শিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশলের কার্যকারিতা বিচার করা। শিক্ষার উদ্দেশ্য অর্জন বা লক্ষ্য পূরণে পাঠক্রম অর্থাৎ শিক্ষার বিষয়বস্তুকে শিক্ষার্থীর নিকট পৌঁছে দেবার দায়িত্ব হল শিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশলের। শিক্ষার উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করতে শিক্ষকের অনুসৃত শিক্ষণ পদ্ধতি কতখানি সফল বা ব্যর্থ তার বিচারও করে এই মূল্যায়ন।

৪। **শিক্ষার্থীদের শ্রেণিবিভাগ সম্পাদন করা :** শিক্ষার যে-কোনো স্তরে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক পার্থক্য অর্থাৎ ব্যক্তিগত বৈষম্য বর্তমান। ব্যক্তিগত বৈষম্যের এই নীতি অনুসারে শিক্ষার্থীদের পক্ষে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর দৈহিক, মানসিক, প্রাক্ষোভিক ও সামাজিক বৈশিষ্ট্য যেমন একরকম নয়, তেমনই তাদের চাহিদা, রুচি, পছন্দও আলাদা আলাদা, বুদ্ধি ও সৃজনশীলতার দিক থেকে একজন অন্যজনের থেকে ভিন্ন। স্বাভাবিক কারণেই একই শ্রেণিকক্ষে বিভিন্নরকম শিক্ষার্থীদের একই পাঠক্রম, একই পদ্ধতি অনুসরণ করে সকলেই সমানভাবে সফল হবে এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। সেই কারণে

Scanned with CamScanner

একই ধরনের শিক্ষার্থীদের এক একটি নির্দিষ্ট শ্রেণিতে বিন্যস্ত করার দরকার হয়, সেক্ষেত্রে মূল্যায়ন শিক্ষার্থীদের সমধর্মী শ্রেণি বিন্যস্ত করতে সাহায্য করে।

৫। **বৃত্তিগত নির্দেশনা দান করা :** শিক্ষাক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যৎ জীবনে কোন্ বৃত্তি বা পেশা গ্রহণ করবে। এই বৃত্তি ও পেশাগত দিক নির্দেশের ক্ষেত্রে যেমন বিষয় অধ্যায়, বৃত্তি ও পেশার বর্তমান অবস্থা, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিকগুলি গুরুত্বপূর্ণ তেমনই শিক্ষার্থীর সাফল্য পরিচায়ক মূল্যায়নও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ওই সমস্ত বিষয়গুলির পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীকে উপযুক্ত পরামর্শ ও নির্দেশনা দানের দ্বারা তার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণে সহায়তা করা শিক্ষক-এর পক্ষে সম্ভব। শিক্ষক এই কাজটি যথার্থভাবে সম্পাদন করতে পারেন মূল্যায়ন ব্যবস্থার মাধ্যমে।

৬। **পারস্পরিক অগ্রগতির তুলনা করা :** প্রচলিত সনাতন রীতিতে শিক্ষার্থীর অগ্রগতির ধারাবাহিক পরিচয় পাওয়া সম্ভব ছিল না। শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশের পরিবর্তে বৌদ্ধিক বিকাশের পরিচয় শুধুমাত্র আংশিকভাবে জানা সম্ভব হত। কিন্তু আধুনিক মূল্যায়ন ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর সমগ্র দিকের বিস্তৃত বিবরণ ধারাবাহিকভাবে সংগ্রহ করে যেমন রাখা হয়, তেমনি বিভিন্ন দিকগুলি নিয়ে পর্যালোচনা করা যায়। মূল্যায়নের এই আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষিতে শিক্ষার যে-কোনো স্তরে শিক্ষার্থীর অগ্রগতির পরিচয় পাওয়া যায় এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়ের অগ্রগতির তুলনামূলক বিচার বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়।

৭। **সংশোধনমূলক শিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ :** মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত ফলাফলকে বিচারবিশ্লেষণ করে শিক্ষার্থীদের অগ্রগতির মাত্রা জানতে গিয়ে তাদের বিভিন্ন সুবিধা ও অসুবিধার দিকগুলি যেমন নির্ণয় করা হয়, তেমনই শিক্ষাক্ষেত্রে কোনো কোনো বিষয়ে তাদের পিছিয়ে পড়ার দিকগুলিকে চিহ্নিত করা যায়। শিক্ষার্থীদের এইসমস্ত সুবিধা, অসুবিধা, পশ্চাদ্‌পদতার ভিত্তিতে তাদের সংশোধনমূলক শিক্ষণ-এর (remedial teaching) যথোপযুক্ত পরিকল্পনা গঠন করা সম্ভব হয়। সেদিক থেকে বলা যায়, সংশোধনমূলক শিক্ষণের কার্যকারিতাকে সার্থক করে তুলতে মূল্যায়ন বিশেষভাবে সহায়তা করে।

৮। **শিক্ষকের পারদর্শিতা ও দায়বদ্ধতা বিচার করা :** শিক্ষকের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হল শিক্ষার্থীদের সাফল্যকে উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে সার্থক করে তোলা। শিক্ষার্থীরা যদি কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য অর্জনে সফল না হয়, তাহলে শিক্ষার্থীদের ব্যর্থতার দায় শিক্ষকের উপরেও বর্তায়। সেক্ষেত্রে শিক্ষকের পারদর্শিতা ও দায়বদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। শিক্ষক তার কাজে কতখানি সাফল্য অর্জন করেছেন তার আভাষ পাওয়া যায় মূল্যায়নের দ্বারাই। অর্থাৎ মূল্যায়ন শুধুমাত্র শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা ও সাফল্য পরিমাপ করে না, শিক্ষকের পারদর্শিতা ও দায়বদ্ধতাকে বিচার করে।

৯। **শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের যোগ্যতা ও দায়বদ্ধতার বিচার করা :** শিক্ষার্থীর অগ্রগতির সাফল্য যেমন নির্ভর করে শিক্ষার্থীর সচেতন প্রয়াস, উপযুক্ত পাঠক্রম, সঠিক শিক্ষণ পদ্ধতির প্রয়োগ-এর উপর তেমনই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের যথার্থ অনুকূল শিক্ষা পরিবেশের উপরেও। স্বাভাবিকভাবেই ঠিক ঠিক পরিকল্পনা গ্রহণের পরও যদি শিক্ষার্থীর অগ্রগতি কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে না-পৌঁছোয় তাহলে তার আংশিক দায় বর্তায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপরেও। শিক্ষার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তার সেই দায়বদ্ধতাকে অস্বীকার করতে পারে না। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের যোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এই যোগ্যতা ও দায়বদ্ধতাকে চিহ্নিত করে মূল্যায়ন ব্যবস্থা।

১০। **পরিমাপ কৌশলগুলির যথার্থতা বিচার করা :** পরিমাপ মূল্যায়নের একটি প্রাসঙ্গিক অংশ। মূল্যায়নের জন্য এই পরিমাপেরও প্রয়োজন হয়। বিভিন্ন পরিমাপ কৌশল মূল্যায়ন ব্যবস্থায় যেভাবে ব্যবহৃত হয়, তার যথার্থতাও বিচার করার দরকার হয়। শিক্ষার্থীর সাফল্য বা ব্যর্থতা বা শিক্ষার উদ্দেশ্য সার্থকতা লাভের ক্ষেত্রে কোনো অসঙ্গতি বা অভাব দেখা গেলে স্বাভাবিকভাবে পরিমাপ কৌশলগুলিরও প্রসঙ্গ এসে পরে সুতরাং মূল্যায়ন-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল পরিমাপ কৌশলগুলির যথার্থতা বিচার করা।

❑ ৫.১.৯ মূল্যায়নের কৌশলসমূহ (Evaluation Devices) :

❖ ৫.১.৯.১ পর্যবেক্ষণমূলক কৌশল (Observational Teachnique) :

স্বল্প সময়ে এবং স্বল্প ব্যয়ে একটি বৃহত্তর অংশের শিক্ষার্থীদের নিরপেক্ষ পরিমাপ অভীক্ষণের সাহায্যে সম্ভব হলেও বিস্তারিত মূল্যায়নের জন্য কিছু বিশেষ কৌশল শিক্ষককে গ্রহণ করতে হয়। এইরকম একটি কৌশল হল পর্যবেক্ষণ বা নিরীক্ষণ। এর শব্দগত অর্থ ছিল অভিনিবেশ সহকারে দর্শন। কিন্তু ব্যবহারিক অর্থে পর্যবেক্ষণ বা নিরীক্ষণ হল কোনো কার্যক্রমের ধারাবাহিক কর্মতৎপরতাগুলিকে দেখা এবং তা নৈর্ব্যক্তিকভাবে লিপিবদ্ধ করে রাখা। বস্তুত শিক্ষার্থীর আচরণকে নিখুঁতভাবে লক্ষ করে তা লিপিবদ্ধ করে রাখার প্রক্রিয়াই হল পর্যবেক্ষণমূলক মূল্যায়ন কৌশল। **এই মূল্যায়ন কৌশলের অন্তর্ভুক্ত উল্লেখযোগ্য উপকরণগুলি হল :**

(ক) অতীত সংক্রান্ত তথ্য লিপিবদ্ধ (Anacdotal Record)

(খ) চেক লিস্ট (Check list)

(গ) রেটিং স্কেল (Rating Scale)

(ঘ) সমাজমিতি (Sociometry)

Scanned with CamScanner

(ক) **অতীত সংক্রান্ত তথ্য লিপিবদ্ধ** (Anecdotal Record) :

অনেক সময় বিশেষ কোনো ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীদের জীবনে ঘটে-যাওয়া অনেক তথ্য বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করা থাকে। এগুলির বিশ্লেষণের মাধ্যমে বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করা যায় বা জানা যায়। এই ধরনের লিপিবদ্ধ তথ্যকে বলা হয় অ্যানেকডোটাল রেকর্ড। যেমন বন্যাত্রাণের উদ্দেশ্যে বন্যা দুর্গতদের পাশে দাঁড়িয়ে সহযোগিতা করার সময় শিক্ষার্থীদের কর্মতৎপরতা, উপস্থিত বুদ্ধিমত্তা, দয়াশীলতা, স্বার্থপরতা, নেতৃত্বদানের ক্ষমতা সম্পর্কে মূল্যায়ন করা সম্ভব। বিদ্যালয়ের কোনো দুর্ঘটনার সময় অনুরূপভাবে শিক্ষার্থীদের সম্পর্কে বহু তথ্য সংগ্রহ করা যায়।

(খ) **চেকলিস্ট (Check list) :**

চেকলিস্টের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য বা আচরণগুলিকে চিহ্নিত করা যায়। শিক্ষার্থীকে শিক্ষক যখন ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করেন তখন তিনি তার বৈশিষ্ট্যগুলির পরিপ্রেক্ষিতে সহজেই মূল্যায়ন করতে পারেন। এখানে শিক্ষার্থীর আচরণ বা বৈশিষ্ট্যগুলির ভিত্তিতে কতকগুলি প্রশ্নের বা পদের তালিকা প্রস্তুত করা হয়।

(গ) **রেটিং স্কেল (Rating Scale) :**

চেকলিস্টের সাহায্যে শিক্ষার্থীর কোনো বৈশিষ্ট্য বর্তমান কি না তা দেখা হয়, কিন্তু রেটিং স্কেলে সেই বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতির মাত্রা কতখানি তা পরিমাপ করে দেখা হয়। অর্থাৎ কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্য শিক্ষার্থীর মধ্যে কী পরিমাণে বিকাশ লাভ করেছে তা পরিমাপ করার জন্য ক্রমবর্ধমান স্কেলের উপর তার অবস্থান চিহ্নিত করা হয়। সাধারণত শিক্ষক তাঁর শিক্ষার্থীর কোনো বৈশিষ্ট্যের গুণগত বা পরিমাণগত অবস্থাকে বিচার করেন তিন/পাঁচ/সাত পয়েন্ট স্কেলে। যেমন কোনো বিশেষ শিক্ষার্থী লেখাপড়ায় খুব ভালো, ভালো, মাঝারি, খারাপ, খুব খারাপ—শব্দের মাধ্যমে বর্ণনামূলক, এই দিকগুলিকে আবার সাংখ্যমানের সাহায্যেও প্রকাশ করা যায়। যেমন ৪, ৩, ২, ১, ০ ইত্যাদি। এই প্রসঙ্গে বলা যায় অনেক সময় ব্যক্তি বা শিক্ষার্থী নিজেই পর্যবেক্ষকের ভূমিকা পালন করে, তখন তাকে বলা হয় self rating।

(ঘ) **সমাজমিতি (Sociometry) :**

কোনো একজন শিক্ষার্থী সমাজের চোখে কীরূপ বা তার অবস্থান কী তার পরিমাপ করার কৌশলই হল সমাজমিতি বা সোসিয়োমেট্রি। একটি শ্রেণি বা দলের অন্তর্গত বিভিন্ন শিক্ষার্থীদের মধ্যে একের প্রতি অন্যের পছন্দ অথবা অপছন্দকে চিহ্নিতকরণের দ্বারা দলটির বা শ্রেণিটির অন্তর্গঠনের রূপ সামাজিক অবস্থান এবং ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণের পরিমাণকে বলা হয় সমাজমিতি। শিক্ষার্থী সদস্যদের পছন্দ অথবা অপছন্দগুলি যে রেখাচিত্রের দ্বারা প্রকাশ করা যায় তাকে বলা হয় সোসিয়োগ্রাম। সোসিয়োমেট্রির অভীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্যগুলিকে

যখন টেবিলের আকারে প্রদান করা হয় তখন তাকে বলা হয় সোসিয়োমেট্রিক ম্যাট্রিকস। **সোসিয়োমেট্রিক ম্যাট্রিক্স থেকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানা যায় :**

১। দলের সবচেয়ে জনপ্রিয় সদস্যকে।

২। দলের সবচেয়ে অপছন্দের সদস্যকে।

৩। দলের মধ্যে বিভিন্ন উপদলের অস্তিত্বকে।

৪। দলের মধ্যে বিচ্ছিন্ন (isolated) সদস্যকে।

● **পর্যবেক্ষণের ব্যবহার (Uses of observation) :**

১। পর্যবেক্ষক (এখানে শিক্ষক) শিক্ষার্থী দলের স্বাভাবিক তৎপরতাগুলি ধারণ করে সুবিস্তৃতভাবে তথ্যাবলি সংগ্রহ করতে পারেন।

২। শিক্ষক শিক্ষার্থীদলের আচরণের প্রেক্ষাপটে অনুসন্ধান করে বিভিন্নভাবে যাচাই-এর মাধ্যমে প্রকৃত তথ্য খুঁজে বের করতে পর্যবেক্ষণকে ব্যবহার করেন।

৩। পর্যবেক্ষণ কৌশলের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বিশেষ কিছু গোপন, সহজাত ও অর্জিত ব্যক্তিগত তথ্যাবলি সংগ্রহ করা যায়।

৪। শিক্ষার্থীদের বেশ কিছু জটিল আচরণ এবং অভ্যাস উপযুক্ত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট তথ্য সংগ্রহ করা যায়। যেমন—নির্দিষ্ট কোনো সম্প্রদায়ের বা উপদলের কৃষ্টিমূলক আচার-আচরণ, নীতি ও মূল্যবোধ।

৫। সামাজিক বিশেষ কিছু আচরণ সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ একমাত্র পর্যবেক্ষণের মাধ্যমেই যথাযথভাবে সম্ভব এবং তা উপযুক্ত কৌশল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। শিশু শিক্ষার্থীদের আচরণ, ভিন্নধর্মী সক্ষমতা বিশিষ্ট শিক্ষার্থীদের (differently abled children) আচরণ সম্পর্কে সুগভীর তথ্য সংগ্রহ একমাত্র পর্যবেক্ষণ-এর দ্বারাই সম্ভব।

৬। মানবজীবনের বিভিন্ন সামাজিক ও প্রাক্ষোভিক আচরণগুলিকে সুগভীরভাবে অনুসন্ধান করে বহু তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ কৌশলকে অন্যান্য কৌশলের তুলনায় অনেক বেশি উপযোগী হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব। এখানে পর্যবেক্ষক বা অনুসন্ধানকারীর নিজের অংশগ্রহণের সুযোগ রয়েছে, স্বাভাবিকভাবে শিক্ষক তাঁর শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সহজেই অংশগ্রহণকারী সদস্য হিসেবে পর্যবেক্ষণকে বর্তমান যুগে অনেক বেশি কাজে লাগাতে পারেন।

❖ ৫.১.৯.২ আত্মবিবৃতিমূলক কৌশল (Self-Reporting Techniques) :

মূল্যায়ন সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য যখন শিক্ষার্থীর নিজস্ব বিবৃতির মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয় তখন সেই কৌশলটিকে বলা হয় আত্মবিবৃতিমূলক কৌশল। মূল্যায়নের এই গুরুত্বপূর্ণ

Scanned with CamScanner

কৌশলটিতে তথ্য সংগ্রহের জন্য যে সমস্ত উপকরণ ব্যবহার করা হয় যেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—

(১) প্রশ্নমালা বা প্রশ্নগুচ্ছ (Questionnaire) এবং

(২) সাক্ষাৎকার (Interview)।

নিম্নে উপরোক্ত উপকরণ দুটি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

● প্রশ্নমালা বা প্রশ্নগুচ্ছ (Questionnaire) :

আত্মবিবৃতিমূলক মূল্যায়ন কৌশলের অন্তর্গত অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপায় হল শিক্ষার্থীদের নিকট প্রশ্নমালা বা প্রশ্নগুচ্ছের ব্যবহার এবং এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা। শিক্ষণ-শিখন অথবা শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোনো সমস্যা বা ঘটনার অনুসন্ধান করে যখন তথ্য সংগ্রহ করার প্রয়োজন হয় তখন প্রশ্নমালা অত্যন্ত উপযোগী ভূমিকা গ্রহণ করে। কতকগুলি প্রশ্নের সমন্বয়ে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে উত্তর সংগ্রহের নিমিত্ত প্রশ্ন সংবলিত পত্রকে বলা হয় প্রশ্নমালা বা প্রশ্নগুচ্ছ। সমস্যা বা ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিত উত্তরদাতা (শিক্ষার্থীর) অভিজ্ঞতা, অনুভূতি, বিশ্বাস এবং ধারণার বিষয়ে বিস্তারিতভাবে তথ্য সংগ্রহ করা প্রশ্নমালার মাধ্যমে সম্ভব। প্রশ্নপত্রের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে Bogardus বলেছেন : "A Questionnaire is a list of questions sent to a number of persons for them to answer." সুতরাং একথা সহজেই বলা যেতে পারে যে, প্রশ্নপত্র হল একটি লিখিত ব্যবস্থা যেখানে অনেকগুলি প্রশ্ন অথবা বিবৃতি (statement) অন্তর্ভুক্ত থাকে এবং প্রশ্নগুলি কোনো শিক্ষার্থীর নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য ব্যবহৃত হয়। পরবর্তীকালে যার থেকে মূল্যায়নের কার্য-সম্পাদন করা যায়।

প্রশ্নমালা বা প্রশ্নগুচ্ছের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of a questionnaire) :

১। **শিরোনাম :** প্রশ্নমালার একটি শিরোনাম অবশ্যই থাকতে হবে, যাতে তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্য ও প্রকৃতিকে বোঝা যায়।

২। **নির্দেশাবলি :** প্রশ্নমালার প্রথম অংশে অর্থাৎ শুরুতেই উত্তরদাতার জন্য কতকগুলি নির্দেশ দেওয়া থাকে।

৩। **ক্রমিক সংখ্যা :** প্রশ্নমালায় প্রশ্ন বা বিবৃতিগুলি নির্দিষ্ট ক্রমিক সংখ্যা অনুসারে সন্নিবেশিত থাকে।

৪। **ভাষার স্পষ্টতা :** প্রশ্নপত্র বা প্রশ্নমালায় ব্যবহৃত প্রশ্নগুলির বা বিবৃতিগুলির ব্যবহৃত ভাষা হবে স্বচ্ছ, স্পষ্ট এবং সহজ-সাবলীল প্রকৃতির।

৫। **সহজবোধ্যতা :** প্রশ্নগুলি সহজেই শিক্ষার্থীর নিকট বোধগম্য হতে হবে। এতে শিক্ষার্থীদের পক্ষে উত্তর দেওয়া সহজ হয়।

৬। **প্রাসঙ্গিকতা ও সংক্ষিপ্ততা :** প্রশ্নগুলি হবে বিষয়-এর সঙ্গে সম্পর্কিত তথা প্রাসঙ্গিক এবং তা সংক্ষিপ্ত আকারে সন্নিবেশিত হবে।

৭। **পক্ষপাতহীন :** প্রশ্নমালায় সংযোজিত প্রশ্নগুলিতে কোনোভাবে শিক্ষকের ব্যক্তিগত প্রভাব, আবেগ স্থান পাবে না, সেগুলি হবে পক্ষপাতহীন অর্থাৎ নৈর্ব্যক্তিক। কোনোরকম বিভ্রান্তিও থাকা ঠিক নয়।

৮। **আকর্ষণীয় :** প্রশ্নগুলি যে প্রশ্নমালা বা প্রশ্নপত্রে সন্নিবেশিত হবে তার কাগজের গুণগত মান উন্নত হতে হবে, ছাপা হবে আকর্ষণীয়ভাবে এবং সুন্দরভাবে বিন্যস্ত হবে।

● প্রশ্নমালার প্রকারভেদ (Types of questionnaire) :

প্রশ্নমালা প্রধানত দুই প্রকারের হয় যেমন—

(ক) উন্মুক্ত বা খোলা প্রশ্নমালা (Open ended question)

(খ) আবদ্ধ বা নির্ধারিত প্রশ্নমালা (Closed ended question)

(ক) **উন্মুক্ত প্রশ্নমালা :** যে সমস্ত প্রশ্নমালায় উত্তরদাতা (শিক্ষার্থী) স্বাধীনভাবে খোলা মনে ইচ্ছামতো তার উত্তর দিতে পারে তাদের বলা হয় উন্মুক্ত প্রশ্নমালা বা খোলা প্রশ্নমালা। এখানে উত্তর দেওয়ার ক্ষেত্রে উত্তরদাতা বা শিক্ষার্থী যথেষ্ট স্বাধীনতা ভোগ করে। যেমন—কোনো শিক্ষার্থীকে প্রশ্ন করা হয় এইভাবে—গণিত তোমার কাছে কঠিন বলে মনে হয় কেন?

(খ) **আবদ্ধ প্রশ্নমালা :** যে সমস্ত প্রশ্নমালায় উত্তরদাতা (শিক্ষার্থী) স্বাধীনভাবে উত্তর দেওয়ার সুযোগ পায় না, প্রশ্নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নির্ধারিত উত্তরগুলির মধ্যে যে-কোনো একটি নির্বাচিত করতে হয়, সেই সমস্ত প্রশ্নমালাকে বলা হয় আবদ্ধ প্রশ্নমালা। যেমন—কোনো শিক্ষার্থীকে প্রশ্ন করা হল—তোমার পছন্দের বিষয়টি ✓ চিহ্ন দিয়ে নির্বাচিত করো : বাংলা, ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান, ভূগোল।

● প্রশ্নমালা গঠন— প্রশ্নমালা গঠন বা প্রণয়নের জন্য প্রথমে শিক্ষককে বিষয়টি সম্পর্কে প্রচুর পড়াশোনা করতে হবে এবং সেই সঙ্গে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করতে হবে। শিক্ষার্থীদের কোন্ কোন্ বিষয়গুলি সম্পর্কে জানতে চান এবং উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে কোন্ কোন্ তথ্যগুলিকে সংগ্রহ করতে চান তা স্থির করতে হবে। এজন্য প্রশ্নমালা গঠনের পূর্বে তাঁর সহকর্মী, বন্ধুবান্ধব এবং মূল্যায়ন সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ উপদেষ্টাদের সঙ্গে এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করতে হবে।

প্রশ্নপত্রের একটি খসড়া প্রস্তুত করে তার সবল ও দুর্বল দিকগুলি নিয়ে বিভিন্ন সহকর্মী এবং বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে। আলোচনা-সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে দুর্বল দিকগুলিকে পরিহার করে পরিবর্তন ও পরিমার্জন করতে হবে। ত্রুটিপূর্ণ অংশগুলিকে চিহ্নিত করে সেগুলির সংশোধন ও পরিমার্জন ঘটাতে হবে।

শিক্ষক প্রশ্নমালাটিকে বার বার পড়বেন এবং প্রশ্নগুলিকে নমনীয় করে তুলবেন। যাদের জন্য প্রশ্নমালাটি প্রস্তুত করা হয়েছে তাদের বয়স, সামাজিক ক্ষমতা, ভাষার বিকাশ,

Scanned with CamScanner

বুদ্ধিমত্তা অনুযায়ী উপযুক্ত কি না তার বিচার করে দেখতে হবে।

প্রশ্নমালার প্রশ্নগুলি অবশ্যই ধারাবাহিকভাবে সহজ থেকে কঠিন-এর দিকে সাজানো থাকবে। প্রশ্নগুলি এমনভাবে সংযোজিত থাকবে যাতে শিক্ষার্থীর আগ্রহের সঞ্চার হয়, এতে শিক্ষক তাঁর উদ্দেশ্যের প্রেক্ষিতে কাঙ্ক্ষিত তথ্যগুলি সহজেই পেতে পারেন।

প্রশ্নমালার চূড়ান্ত রূপ দেওয়ার পূর্বে যে ধরনের উত্তরদাতা বা শিক্ষার্থীদের জন্য প্রশ্নমালা তৈরি করা হচ্ছে তাদের অনুরূপ একটি ক্ষুদ্র দলকে (৫/৬ জন) পাইলট টেস্টের জন্য আনা দরকার। এদের নিকট প্রশ্নমালা উত্তরদানের জন্য বিতরণ করা হবে। প্রশ্নমালার প্রশ্নের ভাষা, গঠন প্রভৃতি বোঝার ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা হচ্ছে কি না তা দেখতে হবে। প্রয়োজনে সংশোধন করে শিক্ষার্থীদের উপযোগী সহজে বোধগম্য করে তুলতে হবে। এবার চূড়ান্ত প্রশ্নমালা টাইপ করার ব্যবস্থা করা হবে।

চূড়ান্ত প্রশ্নপত্র প্রস্তুত করার পর তা উপদেষ্টা এবং বিশেষজ্ঞের নিকট মতামতের জন্য পাঠাতে হবে। উপদেষ্টাদের অনুমোদন পেলে বাস্তব পরিস্থিতিতে প্রয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে।

সবশেষে সমস্ত উত্তরপত্র সংগ্রহ করে তথ্য সংগ্রহের কার্য সম্পাদন করতে হবে।

● **প্রশ্নমালার সুবিধা** (Advantages of Questionnaire) : **প্রশ্নমালার মাধ্যমে তথ্য-সংগ্রহের ক্ষেত্রে কতকগুলি বিশেষ সুবিধা রয়েছে। সেগুলি হল—**

১। প্রশ্নমালার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের কাজ বেশ সহজ। উপযুক্তভাবে প্রস্তুত করা সম্ভব হলে উন্নতমানের প্রক্রিয়া হিসেবে প্রশ্নমালাকে বিবেচনা করা যেতে পারে।

২। ডাকযোগে অথবা প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তির মারফৎ যে-কোনো স্থানে প্রশ্নমালা প্রেরণ করে অল্প সময় এবং অর্থ ব্যয় করে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব।

৩। শিক্ষার্থীদের প্রদত্ত উত্তর বা প্রতিক্রিয়াকে লিপিবদ্ধ করা যায় বলে সহজেই সেগুলিকে সাংখ্যমানে পরিবর্তিত করে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়।

৪। প্রশ্নমালা প্রয়োগের জন্য অত্যন্ত দক্ষ বা অভিজ্ঞ ব্যক্তির প্রয়োজন হয় না।

৫। তথ্য-সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রশ্নমালায় পক্ষপাতিত্বের সম্ভাবনা কম থাকে।

৬। প্রশ্নমালার মাধ্যমে তথ্য-সংগ্রহের প্রক্রিয়ায় সকল উত্তরদাতার নিকট একই রকম প্রশ্ন বিতরণ করা হয় বলে, শিক্ষার্থীদের প্রতিক্রিয়া বা উত্তর অনেকখানি যথার্থ হয়।

৭। প্রশ্নমালার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যাবলিকে সহজেই বিশ্লেষণ করা যায়, ফলে মূল্যায়নে অনেক সুবিধা পাওয়া যায়।

▲ সাক্ষাৎকার (Interview) :

ইংরেজি 'Interview' কথাটির বাংলা প্রতিশব্দ হল সাক্ষাৎকার। এটি হল মূলত উদ্দেশ্যমূলক

কথোপকথন। শিক্ষাক্ষেত্রে মূল্যায়নের জন্য তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে অনুসন্ধানকারী (শিক্ষক) এবং তথ্যপ্রদানকারীর (শিক্ষার্থীর) মধ্যে কথোপকথনই হল সাক্ষাৎকার। মানুষের সমাজজীবনে তার চিন্তা-চেতনা এবং আচরণ সম্পাদনের অন্যতম প্রধান মাধ্যম হল তার মৌখিক ভাষা বা কথোপকথন। শিক্ষাবিজ্ঞানী এবং অন্যান্য সমাজ বিজ্ঞানীরা উদ্দেশ্যমূলক ভাবে সামনাসামনি বাক্যালাপের মাধ্যমে মানুষের ব্যক্তিত্ব, চিন্তাভাবনা, দৃষ্টিভঙ্গি, বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা ইত্যাদি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভের জন্য সাক্ষাৎকারকে ব্যবহার করে থাকেন। এই ধরনের তথ্যসংগ্রহের কৌশল অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ, ফলপ্রসূ এবং সংগৃহীত তথ্যগুলি অতিমাত্রায় যথার্থ এবং নির্ভরযোগ্য। ঘনিষ্ঠ এবং বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে তথ্য সংগ্রহ করা হয় বলে সাক্ষাৎকারে বিষয়-এর সম্পর্কিত এমন সব গুরুত্বপূর্ণ এবং গোপনীয় তথ্য সংগ্রহ করা যায় যা অন্য কোনো প্রকার কৌশলে সম্ভব হয় না।

সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে **C.A. Moser** এবং **Kalton**-এর বক্তব্য হল যে, সাক্ষাৎকার হল উত্তরদাতার নিকট থেকে নির্দিষ্ট কিছু তথ্য বের করে আনার লক্ষ্যে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী এবং উত্তরদাতার মধ্যে কথোপকথন।

Norman K. Denzir-এর মতানুসারে, সাক্ষাৎকার হল যে-কোনো ধরনের মুখোমুখি আলাপ-আলোচনার বিনিময়, যেখানে একজন অন্যজনের কাছ থেকে তথ্য বের করে আনে।

সাক্ষাৎকার নানা প্রকারের হতে পারে, যেমন–

১। সংগঠিত বা কাঠামোগত সাক্ষাৎকার (Structured Interview)

২। অসংগঠিত বা কাঠামোহীন সাক্ষাৎকার (Unstructured Interview)

৩। অর্ধসংগঠিত বা অর্ধ-কাঠামোগত সাক্ষাৎকার (Semistructured Interview)

৪। ক্লিনিক্যাল সাক্ষাৎকার (Clinical Interview)

● সাক্ষাৎকার-এর পর্যায়সমূহ :

১। সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য সিডিউল গঠন এবং তা ব্যবহার-এর জন্য উপযুক্ত নিয়ম নির্বাচন। সিডিউলগুলি হল—প্রশ্নমালা, বিবৃতি অথবা উত্তরদাতাকে আগ্রহী করে তোলার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

২। প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি অনুসন্ধানের জন্য সাক্ষাৎকার পরিচালনা করা।

৩। সংগৃহীত তথ্য বা প্রতিক্রিয়া (উত্তর) গুলিকে সংরক্ষিত করা। সংরক্ষণের জন্য কাগজ, কলম, ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ব্যবহার করা।

৪। বিভিন্ন স্কেল বা পরিমাপের মাধ্যম গঠন করা এবং তারজন্য উপযুক্ত ব্যবহার প্রক্রিয়ার উদ্ভাবন করা।

৫। সাক্ষাৎকারে সংগৃহীত তথ্যগুলিকে সাংকেতিকভাবে প্রকাশ করা।

Scanned with CamScanner

সাক্ষাৎকারকে মূল্যায়নের জন্য ব্যবহার করার ক্ষেত্রে বেশ কতকগুলি সুবিধা পাওয়া যায়। **সেগুলি হল নিম্নরূপ :**

১। সাক্ষাৎকার কৌশলের সাহায্যে যথেষ্ট সংখ্যক উত্তর লাভ করা যায় বলে সংগৃহীত তথ্যের সংখ্যা অনেক বেশি হয়, এমনকি অনিচ্ছুক ব্যক্তি বা শিক্ষার্থীদের কাছ থেকেও উত্তর পাওয়া সম্ভব কারণ দুর্বোধ্য প্রশ্নের ব্যাখ্যা দিয়ে এবং সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উচ্চহারে প্রেষিত করে উত্তরদানে আগ্রহী করে তুলতে পারেন।

২। সাক্ষাৎকার একটি অত্যন্ত নমনীয় কৌশল। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থী বহুরকমভাবে প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীর অন্তরে প্রবেশ করে কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য পূরণের জন্য তথ্যগুলি পেতে পারেন এবং বারে বারে প্রশ্ন করে সঠিক উত্তরটি নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

৩। সাক্ষাৎকার কৌশলে শিক্ষক একদিকে যেমন শিক্ষার্থীর কাছ থেকে মৌখিক উত্তরের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন তেমনই অন্যদিকে তার আচরণকে সহজেই পর্যবেক্ষণ করতে পারেন। এর ফলে শিক্ষার্থীর আচরণ, ভাবভঙ্গি প্রভৃতি নিরীক্ষণ বা পর্যবেক্ষণ করে সঠিক উত্তরটিকে নিশ্চিত করতে পারেন।

৪। সাক্ষাৎকার কৌশলের দ্বারা শিক্ষক সরাসরি এবং দ্রুততার সঙ্গে শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি সংগ্রহ করতে সক্ষম হন।

৫। ছোটো ছোটো শিশু শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহের কৌশল হিসেবে সাক্ষাৎকার অত্যন্ত উপযোগী। মৌখিকভাবে সহজেই শিক্ষক তাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হতে পারেন বলে তথ্যসমূহ অনেক বেশি যথার্থ এবং নির্ভরযোগ্য হয়।

৬। সাক্ষাৎকার কৌশলে উত্তরদাতার (শিক্ষার্থীর) আস্থা প্রতিষ্ঠা, গোপনীয়তা রক্ষা, একান্ত নির্জন স্থান নির্বাচন এবং কাঠামোগত প্রশ্নপত্র অনুসরণ করে পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

● **সাক্ষাৎকারের অসুবিধা :** সাক্ষাৎকার-এর ব্যবহারিক বেশ কিছু সুবিধা থাকলেও কিছু অসুবিধাও আছে, **সেগুলি হল নিম্নরূপ—**

১। সাক্ষাৎকার পদ্ধতি যথেষ্ট ব্যয়বহুল এবং সময়সাপেক্ষ ব্যাপার।

২। সাক্ষাৎকারে অনেক ক্ষেত্রে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর (শিক্ষক) পছন্দ-অপছন্দ, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, নৈতিকতা, মূল্যবোধ, সামাজিক-রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা সাক্ষাৎদানকারী বা উত্তরদাতা (শিক্ষার্থী) সহজেই প্রভাবিত হতে পারে।

৩। সাক্ষাৎকার প্রক্রিয়ায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে উত্তরদাতা (শিক্ষার্থী) অত্যন্ত মিতভাষী হয়, কিংবা সত্যকে গোপন করে অথবা অন্য কোনোভাবে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে ফলে প্রতিকূল অবস্থায় সাক্ষাৎকারটি যথার্থ হতে পারে না।

৪। উপযুক্তভাবে সাক্ষাৎকার সম্পন্ন করতে গেলে সাক্ষাৎকার গ্রহণ
প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হওয়ার প্রয়োজন আছে তা ছাড়া যে বিষয়ে সাক্ষাৎকার
তার সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান ও সঠিক উপলব্ধি থাকা দরকার কিন্তু বাস্তবে অনেক ক্ষেত্রে অভাব ঘটে। এর ফলে সাক্ষাৎকারটি অনেক সময় নিম্নমানের পর্যায়ে নেমে আসে।

❖ ৫.১.৯.৩ পরীক্ষণমূলক কৌশল (Experimental Technique) :

মূল্যায়নের কৌশল হিসেবে পরীক্ষামূলক কৌশল অত্যন্ত কার্যকরী। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থী কোনো বিশেষ বিষয় সম্পর্কিত কাজ সম্পাদন করার পর তার প্রকৃতি ও গুণগত মান বিশ্লেষণ করে শিক্ষার্থী সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। তবে পরীক্ষামূলক কৌশলে তথ্য সংগ্রহ করার উপকরণ (tool) হিসেবে অভীক্ষার (test) ব্যবহার উল্লেখযোগ্য।

অভীক্ষাকে আমরা সাধারণত দুইভাগে ভাগ করতে পারি—

(i) মনোবৈজ্ঞানিক অভীক্ষা (Psychological test)

(ii) শিক্ষাগত অভীক্ষা (Educational test)

❖ মনোবৈজ্ঞানিক অভীক্ষা (Psychological Test) :

কোনো শিক্ষার্থীর মূল্যায়নে অভীক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। কোনো শিক্ষার্থী তথা ব্যক্তির মানসিক বৈশিষ্ট্যাবলি পরিমাপ করার জন্য কিছু অভীক্ষা প্রস্তুত করা হয়েছে। এই ধরনের অভীক্ষাকে **মনোবৈজ্ঞানিক অভীক্ষা** বলে। মনোবৈজ্ঞানিক অভীক্ষার কয়েকটি উদাহরণ হল বুদ্ধির অভীক্ষা, প্রবণতার অভীক্ষা, ব্যক্তিত্বের অভীক্ষা, মনোভাব বা প্রতিন্যাসের অভীক্ষা, সৃজনশীলতার অভীক্ষা, আগ্রহের অভীক্ষা ইত্যাদি। শিক্ষার্থীর বিভিন্ন মানসিক বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে এই অভীক্ষাগুলি ব্যবহার করা হয়। এই সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করার পর শিক্ষার্থী সম্পর্কে সম্যক ধারণা সৃষ্টি হয় এবং সেই শিক্ষার্থীকে তদনুযায়ী ফলপ্রসূ শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক নির্দেশনা দেওয়া সহজ হয়।

মনোবৈজ্ঞানিক অভীক্ষাগুলিকে প্রয়োগগত প্রকৃতির দিক থেকে **ব্যক্তিগত অভীক্ষা** (Individual test) ও **দলগত অভীক্ষা** (Group test) এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

যে অভীক্ষাটি একসময়ে কোনো একজন ব্যক্তির ওপর প্রয়োগ করা যায় তাকে **ব্যক্তিগত অভীক্ষা** বলে। এর উদাহরণ হিসেবে **বিনে সাইমন** টেস্ট উল্লেখ করা যেতে পারে।

আবার যে অভীক্ষাটি একসঙ্গে একাধিক ব্যক্তির উপর প্রয়োগ করা যায় তাকে **দলগত অভীক্ষা** বলে। দলগত অভীক্ষার উদাহরণ হিসেবে **আর্মি আলফা** টেস্টের উল্লেখ করা যায়।

তবে কার্যকারিতার দিক থেকে ব্যক্তিগত অভীক্ষা দলগত অভীক্ষার থেকে অনেক বেশি নির্ভর যোগ্য।

Scanned with CamScanner

মনোবৈজ্ঞানিক অভীক্ষার মাধ্যমে পরিমাণগত ও গুণগত উভয় পরিমাপ সম্ভব। মনোবৈজ্ঞানিক অভীক্ষাগুলিকে সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—(i) মানসিক ক্ষমতা (উদাহরণ— বুদ্ধি, বিশেষ প্রবণতা, সৃজনশীলতা ইত্যাদি)। (ii) ব্যক্তিত্ব, (iii) অর্জিত মানসিক বৈশিষ্ট্য (উদাহরণ—আগ্রহ, প্রতিন্যাস ইত্যাদি)

■ বুদ্ধির অভীক্ষা, প্রবণতার অভীক্ষা, আগ্রহ উন্মোচনী, মনোভাবের অভীক্ষা, সৃজনশীলতা ও ব্যক্তিত্বের অভীক্ষার প্রাথমিক ধারণা (Preliminary Idea about Intelligence Test, Aptitude test, Interest Inventory, Attitude Test, Creativity and Personality) :

○ বুদ্ধির অভীক্ষা (Intelligence test) :

বুদ্ধির পরিমাপ করার জন্য বুদ্ধি অভীক্ষার প্রয়োজন। শিক্ষার ক্ষেত্রে বুদ্ধি অভীক্ষার গুরুত্ব সর্বজন স্বীকৃত। বুদ্ধির পরিমাপের জন্য নানারকম অসংখ্য অভীক্ষা নির্মিত ও ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এই সমস্ত বুদ্ধি অভীক্ষাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়— (i) ভাষাগত (verbal) বুদ্ধির অভীক্ষা (ii) ভাষাহীন (non-verbal) বুদ্ধির অভীক্ষা।

○ ভাষাগত বুদ্ধির অভীক্ষা (Verbal Intelligence test) :

ভাষাগত অভীক্ষাপদের প্রয়োগের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর বুদ্ধির পরিমাপ করা হয় বলে এই ধরনের অভীক্ষাকে ভাষাগত বুদ্ধির অভীক্ষা বলে। ১৯০৫ সালে **Alfred Binet** এইরকম একটি ভাষাগত বুদ্ধি অভীক্ষা প্রথম প্রকাশ করেন। তারপর থেকে এই অভীক্ষার অনেক পরিমার্জন ও পরিবর্তন হয়েছে। ১৯১৬ সালে স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে **Terman** এই অভীক্ষার পূর্ণাঙ্গ সংস্কার করেন। তখন থেকে এই অভীক্ষার নাম Stanford Revision of Binet Simon Intelligence Scale বলা হয়। এই অভীক্ষাটি ৩ থেকে ১৪ বছর পর্যন্ত বুদ্ধি পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত হয়। এই বয়সের ব্যক্তিদের তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করে প্রত্যেক শ্রেণির জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক অভীক্ষাপদ নির্ধারিত করা হয়। যেমন—৩ থেকে ১০ বছরের সকল ব্যক্তির প্রতি বছরের জন্য ৬টি করে প্রশ্ন সংখ্যা বা অভীক্ষাপদ থাকে। এই অভীক্ষাটি যে বয়সের ব্যক্তির বুদ্ধির পরিমাপ করা হবে তার থেকে কম বয়সের জন্য তৈরি অভীক্ষা প্রয়োগ করা হয়। এইভাবে দেখা যায় যে ওই ব্যক্তি কোন বয়সের জন্য তৈরি অভীক্ষাতে সব প্রশ্নের উত্তর করতে পারছে। ওই ব্যক্তির সেই বয়সকে **ভূমি বয়স** (basal age) ধরা হয়। উদাহরণ হিসেবে ধরা যাক যে একটি ৭ বছরের শিশু ৪ বছর বয়সের জন্য তৈরি অভীক্ষাতে সব প্রশ্নের উত্তর করতে পারল। তাহলে এক্ষেত্রে তার ভূমি বয়স হবে ৪ বছর। এরপর ওই শিশুকে ৫, ৬ ও ৭ বছর বয়সের জন্য নির্দিষ্ট অভীক্ষার উত্তর করতে

বলা হবে এবং দেখা হবে যে সে কতগুলি সঠিক উত্তর করতে পারছে। ধরা যাক, ওই শিশু ৫ বছরের জন্য অভীক্ষাতে ৫টি, ৬ বছরের জন্য অভিক্ষাতে ৪টি ও ৭ বছরের অভীক্ষাতে ২টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর করতে পারল। এক্ষেত্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ৩-১০ বছরের জন্য অভীক্ষাতে প্রতি প্রশ্নের সঠিক উত্তরের জন্য ২ মাস মানসিক বয়স ধরা হয়, তাহলে এক্ষেত্রে শিশুটির মানসিক বয়স হবে—

৪ বছর ৫ × ২ + ৪ × ১ + ২ × ২) মাস
= ৪ বছর ২২ মাস
= ৫ বছর ১০ মাস

$$\therefore \text{এক্ষেত্রে শিশুটির বুদ্ধ্যাঙ্ক (IQ)} = \frac{\text{মানসিক বয়স}}{\text{সাধারণ বয়স}} \times ১০০$$

$$= \frac{\text{৫ বছর ১০ মাস}}{\text{৭ বছর}} \times ১০০ = ৮৩.৩৩$$

○ ভাষাবিহীন বুদ্ধির অভীক্ষা (Non verbal Intelligence test) :

বুদ্ধির এই ধরনের অভীক্ষাতে ভাষাবিহীন কর্ম সম্পাদনের দ্বারা বুদ্ধির পরিমাপ করা হয়। অভিক্ষার্থীর কর্ম সম্পাদনের দ্রুততা ও স্বতঃস্ফূর্ততা এক্ষেত্রে বুদ্ধি পরিমাপের মাপকাঠি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। **আর্মি বিটা টেস্ট, আলেকজান্ডারের পাস** এবং টেস্ট, **ডিয়ারবর্নের ফর্মবোর্ড টেস্ট** ইত্যাদি হল ভাষাবিহীন বুদ্ধি অভীক্ষার উদাহরণ।

ডিয়ারবর্নের ফর্মবোর্ড অভীক্ষা থেকে কীভাবে শিশুর বুদ্ধির পরিমাপ করা যায় তা আলোচনা করা হল। এই অভীক্ষায় বিভিন্ন আকারের গর্ত যুক্ত একটি চৌকো ফর্মবোর্ড ব্যবহার করা হয়। অভীক্ষার্থীকে বলা হয় প্রদত্ত নক্সা (৪টি নক্সা) অনুযায়ী ওই গর্তগুলিতে কাঠের টুকরো যথাযথভাবে বসাতে এবং সবকটি ব্যবহার করতে। এই কর্ম সম্পাদন করতে অভিক্ষার্থীর কতটা সময় লেগেছে এবং কতটা স্বতঃস্ফূর্ততার সাথে এই কর্মটি সম্পাদিত হয়েছে তার ভিত্তিতে স্কোর প্রদান করে অভীক্ষাটির বুদ্ধির পরিমাপ করা হয়।

বর্তমানে কিছু নতুন বুদ্ধির অভীক্ষাতে ভাষাগত ও ভাষাবিহীন উভয় প্রকার অভীক্ষা পদের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন—**ওয়েকসলারের** (Wechsler) দুটি স্কেল—প্রথমটি হল শিশুদের জন্য বুদ্ধির অভীক্ষা (Wechsler's Intelligence Scale for Children–WISC) এবং দ্বিতীয়টি হল সাবালকদের জন্য বুদ্ধির অভীক্ষা (Wechsler's Adult Intelligence Scale–WAIS)। শিশুদের জন্য স্কেলটি ১৩০ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের উপর প্রয়োগ করা হয় এবং সাবালকদের জন্য স্কেলটি ৭০ বছর বয়স পর্যন্ত ব্যক্তির উপর ব্যবহার করা যায়।

Scanned with CamScanner

Wechsler-এর এই স্কেলগুলির সাহায্যে বাচনিক পদ দ্বারা বাচনিক বুদ্ধ্যাঙ্ক (Verbal IQ), অবাচনিক পদ দ্বারা অবাচনিক বুদ্ধ্যাঙ্ক (non-verbal IQ) নির্ণয় করা হয়। এছাড়া দুই প্রকার স্কোরের (Verbal ও non-verbal) সাহায্যে পূর্ণ স্কেল বুদ্ধ্যাঙ্ক (Full Scale I Q) নির্ণয় করা যায়। যদিও ওয়েকসলারের অভীক্ষা সময় সাপেক্ষ তথাপি বলা যায় যে এই অভীক্ষাটি অত্যন্ত কার্যকরী।

বুদ্ধি অভীক্ষার ব্যবহার : শিক্ষা লাভে বুদ্ধির ভূমিকা অনস্বীকার্য। তাই শিক্ষার্থীর বুদ্ধির পরিমাপ অত্যন্ত জরুরি। শিক্ষার্থীর বুদ্ধির মান জানা থাকলে শিক্ষক মহাশয় শিক্ষার্থীর কাছ থেকে প্রত্যাশার মান নির্দিষ্ট করতে পারবেন।

- শিক্ষার্থীর শিখনে অক্ষমতার কারণ নির্ণয়ে বুদ্ধির পরিমাপ সাহায্য করে।
- বুদ্ধি পরিমাপের দ্বারা শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার আভাস পাওয়া যেতে পারে।
- শিক্ষার্থীকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও পরামর্শ দেওয়ার জন্য বুদ্ধি পরিমাপ দরকার।
- বুদ্ধির পরমাপ করে অতিবুদ্ধিমান ও স্বাভাবিকের চেয়ে কম বুদ্ধি সম্পন্ন শিক্ষার্থী আলাদা করা সম্ভব। এই সকল ব্যতিক্রমী শিক্ষার্থীর শিখনের জন্য আলাদা ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।
- প্রশাসনিক কাজকর্মের জন্যও বুদ্ধির পরিমাপ করা প্রয়োজন।

○ প্রবণতার অভীক্ষা (Aptitude test) :

○ প্রবণতার সংজ্ঞা (Definition of Aptitude) :

Freeman-এর মতে "An aptitude is combination of characteristics indicative of an individual's capacity to acquire (with training) some specific knowledge, skill, or set of organised responses, such as the ability to speak a language, to become a musician, to do mechanical work."

Bingham বলেন "Aptitude refers to those qualities characterising person's ways of behaviour which serve to indicate how well he can learn to meet and solve certain specific kinds of problems."

প্রবণতা হল কোনো কাজে সফলতা অর্জনের পূর্বাভাস। বুদ্ধির সাথে এর পার্থক্য রয়েছে। বুদ্ধির অভীক্ষা দ্বারা কোনো ব্যক্তির সাধারণ মানসিক ক্ষমতার পরিমাপ করা যায় কিন্তু প্রবণতা হল বিশেষ ধরনের সক্ষমতা। যেমন—একজন শিক্ষার্থী শ্রেণিকক্ষে তেমন পারদর্শিতা (Achievement) প্রদর্শন করতে না পারলেও গানবাজনার প্রতি দারুন প্রবণতা লক্ষ করা যেতে পারে এবং পরবর্তীকালে দেখা যেতে পারে যে সে গানবাজনাতে দারুণ সাফল্য অর্জন করেছে। স্পিয়ারম্যান তাঁর বুদ্ধির উপাদান তত্ত্বে সাধারণ উপাদান G ও বিশেষ উপাদান S-এর কথা বলেছিলেন। এই বিশেষ উপাদানগুলি বিশেষ সক্ষমতা বা

ebook.dascoaching.in

প্রবণতা হিসেবে আমাদের আচরণে প্রকাশ পায়। বুদ্ধির অভীক্ষাগুলি সাধারণ ভাবে G পরিমাপ করে।

বিশেষ প্রবণতা কতটা সহজাত এবং কতটা পরিবেশ থেকে আয়ত্ত করা তা নির্ণয় করা কঠিন। যখন ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষার বিভিন্ন শাখায় বিশেষ বিশেষ পাঠক্রমে পড়ার জন্য প্রস্তুত হয় তখন প্রবণতা অভীক্ষার দ্বারা তাদের সাহায্য করা যায়। ছাত্রের কোন বিষয়ে প্রবণতা আছে জানা থাকলে পাঠক্রম নির্বাচনে সুবিধা হয় এবং পরবর্তীকালে এই বিষয়ে তার সফল হওয়ার সম্ভাবনা অনেকগুণ বেড়ে যায়।

○ প্রবণতার পরিমাপ (Measurement of Aptitude) :

প্রবণতা পরিমাপের জন্য অনেক অভীক্ষা পাওয়া যায়। এই অভীক্ষার দ্বারা একটি মাত্র বিশেষ প্রবণতা পরিমাপ করা যায়। আবার অনেক অভীক্ষা আছে যার দ্বারা একগুচ্ছ প্রবণতা পরিমাপ করা যায়। কোনো একটি নির্দিষ্ট প্রবণতা পরিমাপের ক্ষেত্রে যেমনভাবে পদনির্বাচন করা হয় যাতে ওই সমস্ত পদগুলি ওই প্রবণতা সম্পর্কিত বিষয় ও ক্রিয়াকলাপের সাথে যুক্ত। সাধারণভাবে নীচে কয়েকটি প্রবণতার অভীক্ষার উদাহরণ দেওয়া হল—

(i) যান্ত্রিক প্রবণতার অভীক্ষা (Mechanical aptitude test)

(ii) সংগীত প্রবণতার অভীক্ষা (Musical aptitude test)

(iii) করণিক প্রবণতার অভীক্ষা (Clerical aptitude test)

(iv) চারুশিল্প প্রবণতার অভীক্ষা (Art aptitude test)

(v) বৃত্তিমূলক প্রবণতার অভীক্ষা (Professional aptitude test)

উপরের যে সমস্ত প্রবণতার অভীক্ষার কথা বলা হল প্রতিটি অভীক্ষা নির্দিষ্ট বিষয়ের প্রবণতা পরিমাপের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। যেমন—যান্ত্রিক প্রবণতার অভীক্ষাতে যন্ত্র সম্বন্ধীয় বিভিন্ন পদ নির্বাচন করে অভীক্ষাটি তৈরি করা হয়েছে। কয়েকটি অভীক্ষার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল—

○ যান্ত্রিক প্রবণতার অভীক্ষা (Mechanical Aptitude test) :

Freeman-এর মতে "The capacity designed by the term 'mechanical capacity is not a single, unitary function. It is a combination of sensory and moter capacities plus perception of spatial reletions, the capacity to acquire information about mechanical matters and the capacity to comprehend mechanical relationships."

তাই বলা যায়, যান্ত্রিক প্রবণতার অভীক্ষার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তির উপরিউক্ত গুণ ও ক্ষমতাগুলির যাচাই করা যায়। কয়েকটি অতিপরিচিত যান্ত্রিক প্রবণতার অভীক্ষা হল—

Scanned with CamScanner

(i) Minnesota Mechanical Assembly Test
(ii) Minnesota Spatial Relations Test
(iii) S.R.A. Mechanical Aptitude Test
(iv) Bennet Tests of Mechanical Comprehension
(v) Stenquist Mechanical Aptitude Test

○ করণিক বৃত্তির প্রবণতার অভীক্ষা (Clarical Aptitude test) :

এই ধরনের প্ররণতার অভীক্ষাতে কোনো ব্যক্তির করণিক হওয়ার কতটা প্রবণতা তা যাচাই করা যায়। **Bingham**-এর মতে করণিক প্রবণতার অভীক্ষাতে কতকগুলি বিশেষ সক্ষমতার পদ থাকবে। যেমন—

(a) Perceptual ability (b) Intellectual ability (c) Motor ability.

○ সংগীত প্রবণতার অভীক্ষা (Musical Aptitude test) :

এই অভীক্ষাটি সংগীতের প্রতি বিশেষ, ক্ষমতার পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত হয়। দুটি শব্দের মধ্যে কোনটির তীক্ষ্ণতা (Pitch) বেশি, কার প্রবল্য (loudness) বেশি, কোনটি কী জাতে (timbre), কোনটি বেশি ছন্দযুক্ত (rhythm) ইত্যাদি বিচার করার সক্ষমতা দ্বারা কোনো ব্যক্তির সংগীত প্রবণতার অভীক্ষা তৈরি হয়েছে। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য একটি অভীক্ষা হল **Seashore Measure of Musical Talent.**

○ আগ্রহ উন্মোচনী (Interst Inventory) :

শিক্ষক মহাশয় শিক্ষার্থীদের পাঠে মনোযোগী হওয়ার কথা বলেন। অর্থাৎ শিক্ষালাভের প্রাথমিক শর্ত হল মনোযোগ। কিন্তু শিক্ষার্থীদের আগ্রহ (interest) না থাকলে সে বিষয়ে তাদের মনোযোগ থাকে না। তাই শিক্ষার্থীদের আগ্রহ সম্পর্কিত তথ্য মূল্যায়নের জন্য খুবই প্রয়োজন।

○ আগ্রহের সংজ্ঞা (Definition of Interst) :

Crow এবং **Crow**-এর মতে "Interest may refer to the motivating force that impels us to attend to a person, thing, or on activity or it may be the effective experience that has been stimulated by the activity itself. In other words, interest can be the cause of an activity and the result of particiaption with activity (1973)।

তাহলে দেখা যাচ্ছে কোনো ব্যক্তির কার্যকলাপের মুল কারণ হল যে বিষয়ে তার আগ্রহ।

○ আগ্রহের পরিমাপ (Measurement of Interst) :

কোনো শিক্ষার্থীর শুধুমাত্র একটি বিষয়ে আগ্রহ নাও থাকতে পারে। তার একাধিক বিষয়ে

আগ্রহ থাকতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয়ে আগ্রহের তারতম্য থাকতে পারে। আগ্রহের পরিমাপ একটি বিষয়ে কতটা আগ্রহ আছে শুধুমাত্র তা নির্ণয় করে না, বরং কোন বিষয়ে কতটা আগ্রহ আছে তা স্থির করে। আগ্রহ পরিমাপের নানা অভীক্ষা আছে। তার মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য হল—

○ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের আগ্রহ প্রশ্নগুচ্ছ (সাইমন্ড) [Interest questionnaire for High School Students (Symonds)] :

এটি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের আগ্রহ পরিমাপের জন্য একটি প্রশ্নগুচ্ছ। এখানে ৬৮টি অভীক্ষাপদ থাকে। শিক্ষার্থীরা প্রতিটি প্রশ্নে 'পছন্দ', 'কোনো মন্তব্য নয়' কিংবা 'অপছন্দ'—এই তিন মন্তব্যের যে-কোনো একটি মন্তব্য দ্বারা তার মতামত ব্যক্ত করে। এইভাবে শিক্ষার্থীর কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে ফলাফল বিশ্লেষণ করে পাঠক্রমের কোন বিষয়ে কেমন আগ্রহ তা স্থির করা যায়। এক্ষেত্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এই ব্যাপারে সাধারণ বুদ্ধির অভীক্ষা ততটা কার্যকরী নয়।

○ স্ট্রং-এর বৃত্তিমূলক আগ্রহের ব্যাঙ্ক (Strong's Vocational Interest Blank):

এটি একটি বহুল প্রচলিত আগ্রহ উন্মোচনী (Interest inventory)। এই আগ্রহ উন্মোচনীটি মহিলা ও পুরুষদের জন্য আলাদাভাবে তৈরি করা হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এটি কেবলমাত্র 15 বছর যা তার বেশি বয়সের ব্যক্তির উপর প্রয়োগ করা যায়। এই আগ্রহ উন্মোচনীতে :

(A) **প্রথমে 5টি বিভিন্ন বিষয়ের** উপর প্রশ্নগুচ্ছ আছে। এই পাঁচটি বিষয় হল—
(i) বৃত্তি সংক্রান্ত (প্রশ্ন সংখ্যা 100টি)।
(ii) পাঠ্যবিষয় সংক্রান্ত (প্রশ্ন সংখ্যা 86টি)।
(iii) আমোদ-প্রমোদ সংক্রান্ত (প্রশ্ন সংখ্যা 49টি)।
(iv) মানুষের বৈশিষ্ট্য সংক্রান্ত (প্রশ্ন সংখ্যা 47টি)।
(v) বিবিধ (প্রশ্ন সংখ্যা 48টি)।

প্রতিটি অভীক্ষাপদের উত্তর 'পছন্দ' 'জানি না', 'অপছন্দ'—এই তিনটির মধ্যে একটি বিকল্প বেছে নিতে হবে।

(B) **তারপর অভীক্ষার্থীকে তার পছন্দ অনুযায়ী কতকগুলি বৃত্তিকে সজ্জিত করতে বলা হবে।**
(C) **তারপর অভীক্ষার্থীকে দুটি বিষয়ের মধ্যে একটিকে বেছে নিতে বলা হবে।**
(D) **এবং শেষে অভীক্ষার্থীকে তার বর্তমান ক্ষমতা ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের মূল্যায়ন করতে বলা হবে।**

Scanned with CamScanner

এই অভীক্ষাটির জন্য সময় দেওয়া হয় 40 মিনিট। তবে অভীক্ষাটি প্রয়োগ করে প্রাপ্ত তথ্যের স্কেরের মান নির্ণয় করা জটিল কাজ। প্রত্যেকটি বৃত্তির জন্য আলাদা আলাদা স্কোরিংকি (Scoring key) আছে। একটি বৃত্তির Scoringkey সেই বৃত্তিতে অনেকজন সফল ব্যক্তির অভীক্ষাটি প্রয়োগ করে তাদের উত্তরের ভিত্তিতে করা হয়। শুধু সংক্ষেপে এটুকু বলা যায় যে Strong-এর এই আগ্রহ উন্মোচনী দ্বারা বৃত্তিতে ব্যক্তির আগ্রহ জানা সম্ভব। এছাড়া বিভিন্ন বৃত্তিতে ব্যক্তির স্কোর থেকে এটাও জানা সম্ভব যে কোন বৃত্তিতে তার আগ্রহ বেশি।

○ কুডের আগ্রহ উন্মোচনী রেকর্ড - বৃত্তিমূলক (Kuder Preference Record-Vocational) :

এটিও একটি প্রচলিত আগ্রহ উন্মোচনী। এই উন্মোচনীর দ্বারা বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন বৃত্তির উপর আগ্রহ পরিমাপ করা যায়। এখানে যে ৯টি বিভিন্ন ক্ষেত্রের উপর প্রশ্ন রাখা হয় সেগুলি হল—Mechanical, Computational, Scientific, Persuasive, Aritistic, Literary, Musical, Social Service ও Clerical।

এছাড়াও আরও কয়েকটি আগ্রহ উন্মোচনীর উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, যেমন—Occupational Orientation Inquiry, Miner's Analysis of work Interest এবং ভারতবর্ষে Dr. S.P. Kulshrestha -এর তৈরি Vocational interest test।

○ মনোভাব বা প্রতিন্যাস অভীক্ষা (Attitude test) :

আমাদের চারপাশে নানারকম ঘটনা ঘটে। প্রতিন্যাস (Attitude) হল এমন একটি অনুভবমূলক সংগঠন যা কোনো ব্যক্তি ওই ঘটনাগুলিকে ইতিবাচক (Positive) বা নেতিবাচক (Negative) দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করে এবং সেই মতো তথ্য সংগ্রহ করে ও নিজের দৃষ্টিভঙ্গি অন্যদের উপর প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে। তাই প্রতিন্যাস হল একটি আবৃত বা গোপন (Covert) প্রবণতা (tendency)। প্রতিন্যাস সবসময় একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে সংগঠিত হয়। যেমন—Attitude towards women education"—অর্থাৎ নারীশিক্ষার প্রতি প্রতিন্যাস। এই প্রতিন্যাস কারো ক্ষেত্রে ইতিবাচক হবে আবার কারো নেতিবাচক হবে। তবে প্রতিন্যাস হল পরিবর্তনশীল। কারণ এটি হল অর্জিত অনুভবমূলক সংগঠন। শিক্ষার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তির প্রতিন্যাস গঠিত হয়।

○ প্রতিন্যাস পরিমাপের পদ্ধতি (Method of Attitude test) :

(1) প্রত্যক্ষ পদ্ধতি (Direct Method)

(2) অপ্রত্যক্ষ পদ্ধতি (Indirect Method)

○ প্রতিন্যাস পরিমাপের প্রত্যক্ষ পদ্ধতি (Direct method of Attitude test) :

এই পদ্ধতিতে কোনো একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে কোনো অভীক্ষার্থীর মৌখিক ভাবে মতামত নেওয়া হয় এবং এই তথ্যের ভিত্তিতে ওই নির্দিষ্ট বিষয়ে তার প্রতিন্যাস পরিমাপ করা হয়।

এক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল—attitude scale. কারণ প্রতিন্যাস পরিমাপের ক্ষেত্রে attitude scale সব থেকে বেশি প্রচলিত।

সাধারণত : দুই ধরনের মনোভাব বা প্রতন্যাস স্কেল প্রচলিত (i) লিকার্টের প্রতিন্যাস স্কেল (Likert attitude scale) এবং (ii) **থারস্টোনের** প্রতিন্যাস স্কেল (Thurstone attitude scale)। থারস্টোনের স্কেলের তুলনায় লিকার্টের স্কেলটি সহজ এবং বেশি জনপ্রিয়।

লিকার্টের প্রতিন্যাস স্কেল : যে বিষয়ের উপর প্রতিন্যাস বা মনোভাব মাপা হবে সে সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য দেওয়া হয়। এই বক্তব্যগুলির মধ্যে ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় প্রকার বক্তব্যই থাকে। অভীক্ষাপদগুলির Internal consistency অর্থাৎ প্রতিটি বক্তব্য একই বিষয়ের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা তা মাপা হয়। এইভাবে প্রতিন্যাস স্কেলটি তৈরি করা হয়। এই স্কেলটি একটি five-point scale, অর্থাৎ এক্ষেত্রে প্রতিটি বক্তব্যে অভীক্ষার্থীর মনোভাব জানার জন্য সম্পূর্ণ সহমত (Strongly agree), সহমত (agree), কোনো মন্তব্য নয় (undecided), অসহমত (disagree) ও সম্পূর্ণ অসহমত (Strongly disagree)-এই পাঁচটি বিকল্প উত্তর দেওয়া যায়। অভিক্ষার্থী কোনো বক্তব্যে তার মনোভাব প্রকাশ করার জন্য পাঁচটি বিকল্পের মধ্যে কোনো একটিতে দাগ দেয়। এইভাবে সম্পূর্ণ স্কেলের সমস্ত বক্তব্যে অভীক্ষার্থীর মনোভাব জানার পর স্কোর করা হয়। স্কোর করার একটি নির্দিষ্ট নিয়ম আছে। ইতিবাচক বক্তব্যের ক্ষেত্রে 'সম্পূর্ণ সহমত'-এর জন্য 5, 'সহমত'-এর জন্য 4, 'কোনো মন্তব্য নয়'-এর জন্য 3, 'অসহমত'-এর জন্য 2, এবং 'সম্পূর্ণ অসহমত'-এর জন্য 1, নম্বর দেওয়া হয়। আবার নেতিবাচক বক্তব্যের জন্য এর ঠিক উল্টো স্কোরিং করা হয়। অর্থাৎ সেক্ষেত্রে 'সম্পূর্ণ অসহমত'-এর জন্য 5, 'অসহমত'-এর জন্য 4, 'কোনো মন্তব্য নয়'-এর জন্য 3, 'সহমত'-এর জন্য 2, এবং 'সম্পূর্ণ সহমত'-এর জন্য 1 দেওয়া হবে। একটি উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটি বোঝা যাক।

নারীশিক্ষার প্রতি কোনো ব্যক্তির মনোভাব বা প্রতিন্যাস পরিমাপ করার জন্য প্রতিন্যাস স্কেলে একটি বক্তব্য আছে এইরূপ—"সমাজের উন্নতি সাধনে নারীশিক্ষার প্রয়োজন"। এটি একটি ইতিবাচক বক্তব্য। তাই এই বক্তব্যে যে ব্যক্তি 'সম্পূর্ণ সহমত' বলবেন তার স্কোর হবে 5 কিন্তু যিনি 'সম্পূর্ণ অসহমত' বলবেন তার স্কোর হবে 1।

"নারীরা শুধু সাংসারিক কাজে লিপ্ত থাকবে, তাদের শিক্ষার প্রয়োজন নেই"—এই ধরনের বক্তব্যটি একটি নেতিবাচক। এই বক্তব্যে যে অভীক্ষার্থী 'সম্পূর্ণ সহমত' বলবেন তার স্কোর হবে 1 নম্বর যিনি 'সম্পূর্ণ অসহমত' বলবেন তার স্কোর হবে 5।

Scanned with CamScanner

সম্পূর্ণ স্কেলে সমস্ত বক্তব্যের জন্য এইভাবে স্কোরিং করার পর অভীক্ষার্থীর একটি মোট নম্বর দেওয়া হবে এবং তার থেকে সেই নির্দিষ্ট বিষয়ে তাঁর মনোভাব বা প্রতিন্যাসের পরিমাপ করা যাবে।

○ মনোভাব বা প্রতিন্যাস পরিমাপের অপ্রতক্ষ্য পদ্ধতি (Indirect method of Attitude test) :

প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে প্রতিন্যাস পরিমাপ করার সব থেকে বড়ো অসুবিধা হল যে কোনো ব্যক্তি কোনো বিষয়ে তার মতামত প্রকাশ করার সময় প্রকৃত মনোভাব লুকিয়ে রাখতে পারে। এই অসুবিধে দুর করার জন্য অপ্রতক্ষ্য পদ্ধতির ব্যবহার করা হয়। এক্ষেত্রে অভিক্ষার্থীকে আসল উদ্দেশ্য গোপন রেখে কোনো বিষয়ে তার নিজের মন্তব্য জানতে চাওয়া হয়। ব্যক্তিত্ব পরিমাপের ক্ষেত্রে প্রক্ষেপণমূলক অভীক্ষা হল এর একটি উদাহরণ।

প্রতিন্যাস পরিমাপের প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ পদ্ধতির দুটিই ভালো। কিন্তু দুটি পদ্ধতির কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। তাই, কোনো বিষয়ের মনোভাব বা প্রতিন্যাস মাপার ক্ষেত্রে দুটি পদ্ধতি আলাদাভাবে প্রয়োগ করে প্রাপ্ত ফলাফল থেকে সিদ্ধান্ত নিলে সবথেকে ভালো হয়।

○ সৃজনশীলতার অভীক্ষা (Creativity test) :

○ সৃজনশীলতার সংজ্ঞা (Definition of Creativity) :

Stagner এবং **Karwoski**-এর মতে "Creativity implies the production of a totally or partially novel identity."

> **Drevdahl বলেন "Creativity is the capacity of a person to produce compositions, products or ideas which are essentially new or novel and previously unknown to the producer."**

অর্থাৎ সৃজনশীলতা হল কোনো ব্যক্তির এমন একটি সক্ষমতা যার দ্বারা সে একটি নতুন বা মৌলিক ধারণা বা বিষয় সৃষ্টি বা আবিষ্কার করতে পারে। প্রত্যেকটি মানুষই কমবেশি সৃজনশীল। কিন্তু সৃজনশীলতার মাত্রা সমান হয় না বলে কম মাত্রাযুক্ত সৃজনশীল ব্যক্তি চিহ্নিত হয় না। তবে সৃজনশীলতা ও বুদ্ধি এক জিনিস নয়। যদিও সৃজনশীলতার জন্য কিছুমাত্রার বুদ্ধি প্রয়োজন তথাপি দেখা গেছে যে অত্যন্ত সৃজনশীল ব্যক্তির বুদ্ধি সাধারণ মানের হতে পারে অথবা অত্যন্ত প্রখর বুদ্ধির ব্যক্তির সৃজনশীলতার মাত্রা খুবই কম।

এই বৈষম্যের কারণ হল বুদ্ধিমত্তার মুলে আছে অভিসারী চিন্তন অর্থাৎ convergent thinking যেখানে সৃজনশীলতার মুলে আছে divergent thinking অর্থাৎ অপসারী চিন্তন। শিশুদের সৃজনশীলতা পরিমাপ করে তাদের চিহ্নিত করার প্রয়োজন আছে, কারণ, প্রতিকূল

শিক্ষাতে অনেক সময় সৃজনশীলতা নষ্ট হতে পারে। আবার উপযুক্ত শিক্ষার দ্বারা সৃজনশীলতা বিকশিত করা যায়।

○ সৃজনশীলতার পরিমাপ (Measurement of Creativity) :

সৃজনশীলতা হল কয়েকটি সক্ষমতা ও সংলক্ষণের মিশ্রণ। তাই সৃজনশীলতার অভীক্ষাতে বাচনিক ও অবাচনিক অভীক্ষাপদের সাহায্যে ওই সমস্ত সক্ষমতা ও সংলক্ষণের পরিমাপের ব্যবস্থা করা হয়। যে সমস্ত উপাদানের ভিত্তি করে সৃজনশীলতার পরিমাপ করা যায় সেগুলি হল—

(i) সাবলীলতা (fluency)—কত দ্রুত ও কত বেশি একজন নতুন ধারণার জন্ম দিতে পারে।
(ii) নমনীয়তা (flexibility)—কত বৈচিত্র্যপূর্ণ ধারণা সৃষ্টি করতে পারে।
(iii) মৌলিকতা (originality)—সৃষ্ট ধারণাগুলি আগের ধারণা থেকে কতটা নতুন।
(iv) বিস্তার (elaboration)—ধারণাগুলি কতটা বিস্তৃতভাবে প্রকাশ করতে পারে।

নীচে কতকগুলি আদর্শায়িত সৃজনশীলতার অভীক্ষার উদাহরণ দেওয়া হল—

(i) Minnesota test of creative thinking
(ii) Remote Associate test
(iii) Torrance tests of creative thinking
(iv) Guilford's divergent thinking instrument
(v) Wallach and Kogan creativity instrument

ভারতবর্ষে কয়েকটি আদর্শায়িত সৃজনশীলতার অভীক্ষা হল—

(i) Passi's tests of creativity
(ii) Baquer Mendi's tests of creative thinking
(iii) Sharma's divergent production abilities test.
(iv) Saxena's tests of creativity.

নীচে একটি আদর্শায়িত সৃজনশীলতার অভীক্ষা আলোচনা করা হল—

○ টরেন্স সৃজনী চিন্তন অভীক্ষা (Torrance tests of creative thinking) :

আমেরিকার মনোবিজ্ঞানী E. Paul Torrance এই অভীক্ষাটি তৈরি করেন। এই অভীক্ষাতে দুটি সেট আছে—একটি বাচনিক (Verbal) এবং একটি অবাচনিক (Non-verbal)।

অবাচনিক সেট : এই অভীক্ষাতে অভীক্ষার্থীকে কিছু অবাচনিক ক্রিয়াকলাপে যুক্ত হতে হয়। এই সেটের আবার তিনটি সাব সেট আছে যেমন—

(i) **চিত্র সম্পূর্ণকরণ অভীক্ষা** (Figure or picture completion test) : এখানে কিছু অসম্পূর্ণ চিত্র দেওয়া থাকে। অভীক্ষার্থীকে এই চিত্রগুলিকে তার ইচ্ছামতো

Scanned with CamScanner

সম্পূর্ণ করতে বলা হয়।

(ii) **চিত্র গঠন অভীক্ষা** (Picture or figural construction test) : এখানে অভীক্ষার্থীকে কতকগুলি বিভিন্ন আকার ও আকৃতির কতকগুলি রঙিন কাগজের টুকরো দেওয়া হয় এবং অভীক্ষার্থীকে এমন কিছু ছবি বা চিত্র চিন্তা করতে বলা হয় যেখানে ওই রঙিন কাগজের টুকরোগুলি তাদের অংশ হবে।

(iii) **সমান্তরাল রেখা অভীক্ষা** (Parallel line test) : এই অভীক্ষাতে অনেকগুলি জোড়া জোড়া সমান্তরাল রেখা থাকে। অভীক্ষার্থীকে এই সকল জোড়া জোড়া সমান্তরাল রেখা ব্যবহার করে যতগুলি সম্ভব ছবি বানাতে বলা হয়।

বাচনিক সেট : এই অভীক্ষাতে অভীক্ষার্থীকে লিখিত ভাবে তার উত্তর জানাতে হয়। এর আবার ছয়টি সাব সেট আছে। যেমন—

(i) **জিজ্ঞাসা সংক্রান্ত** (Asking type) : এক্ষেত্রে অভীক্ষার্থীকে সাধারণভাবে অন্যদের থাকে না এরকম সক্ষমতার দিকগুলি ব্যক্ত করতে বলা হয়।

(ii) **কারণ ও ফলাফল অনুমান সংক্রান্ত** (Guess couse & consequence types): কার্য-কারণ ও ফলাফল সম্পর্কিত এই অভীক্ষাতে একটি ছবি দেখিয়ে অভিক্ষার্থীকে এর কারণ ও পরে ফলাফল কী হতে পারে তা লিখতে বলা হয়।

(iii) **উৎপাদনের উন্নতি সাধন সংক্রান্ত** (Product improvement type) : এই অভীক্ষাতে অভীক্ষার্থীকে কোনো খেলনা বা যন্ত্র বা অন্যান্য সামগ্রীর আরো কীভাবে উন্নতি করা যায় তা জিজ্ঞাসা করা হয়।

(iv) **অপ্রচলতি ব্যবহার সংক্রান্ত** (Unusual uses type) : এখানে অভিক্ষার্থীকে কোনো সামগ্রী দেখিয়ে সেটিকে যথা সম্ভব কতরকম অপ্রচলিত ভাবে ব্যবহার করা যায় তা লিখতে বলা হয়।

(v) **অপ্রচলিত প্রশ্ন সংক্রান্ত** (Unusual questions type) : এখানে কোনো বাচনিক বিবরণের পর অভীক্ষার্থীকে ওই বিষয়ে যথাসম্ভব যতখুশি অপ্রচলিত প্রশ্ন করতে বলা হয়।

(vi) **আনন্দ সংক্রান্ত (Just suppose type) :** এখানে বিশেষ কোনো অস্বাভাভিক অবস্থাতে কী ফল হতে পারে সে বিষয়ে অভীক্ষার্থীকে আন্দাজ করতে বলা হয়।

এইভাবে বাচনিক ও অবাচনিক অভীক্ষাতে অভীক্ষার্থীকে স্কোর প্রদান করা হয় এবং তার প্রাপ্ত মোট স্কোরের দ্বারা তার সৃজনশীলতার পরিমাপ করা হয়।

○ ব্যক্তিত্বের অভীক্ষা (Personality Test) :

শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীর সুসংহত পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিত্ব গঠনে সাহায্য করা। তাই

কোনো শিক্ষার্থী তথা ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের সাংগঠনিক রূপ উপযুক্ত অভীক্ষার সাহায্যে পরিমাপ করা খুবই প্রয়োজন। ব্যক্তিত্বের পরিমাপ শিক্ষার ব্যবহারিক ও তাত্ত্বিক উভয় উদ্দেশ্য পূরণে সাহায্য করে। কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের দুর্বল দিকগুলি চিহ্নিত করা যতটা প্রয়োজন, ঠিক একই সঙ্গে অন্তর্নিহিত শক্তি সম্পর্কেও জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। এছাড়া ব্যক্তিগত বৈষম্য (individual difference) অনুযায়ী শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব বিকাশের ধারা সম্বন্ধে শিক্ষকের জানা দরকার।

ব্যক্তিত্ব পরিমাপের পদ্ধতিগুলিকে আমরা মূলত দুই ভাগে ভাগ করতে পারি। যথা—

(i) **প্রক্ষেপণমূলক অভীক্ষা** (Projective test) : উদাহরণ—

Word Association Test (WAT), Rorschach Ink Blot Test, Thematic Apperception Test (TAT), Children's Apperception Test (CAT), Sentence Completion Test ইত্যাদি।

(ii) **আত্মবিবৃতিমূলক অভীক্ষা** (Self-reporting) : উদাহরণ—Personality Inventory (Eysenck Personality Inventory, Minnesota Multiphase Personality Invertory etc.), Observation, Interview, Rating scale ইত্যাদি।

○ প্রক্ষেপণমূলক অভীক্ষা (Projective test) :

এই ধরনের অভীক্ষার দ্বারা ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য, মনোভাব, সন্দেহ, যোগ্যতা, ভয় ইত্যাদির পরিমাপ করা সম্ভব। অস্পষ্ট, দ্ব্যর্থবোধক উদ্দীপকের উপস্থাপনের মাধ্যমে ব্যক্তির অবচেতন মনের জটিলতা, চাহিদা, সমস্যা ইত্যাদি জানার চেষ্টা করা হয়। নিম্নে কিছু উল্লেখযোগ্য প্রক্ষেপণমূলক অভীক্ষা সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হল।

রসার্কের কালি ছাপ অভীক্ষা (Rorschach Ink Blot Test) : লুইস মনোবিজ্ঞানী Rorschach এই অভীক্ষাটি তৈরি করেন। অভীক্ষাতে কালির ছাপ সম্বলিত দশটি কার্ড ব্যবহার করা হয়। দশটি কার্ডের মধ্যে পাঁচটি কালো ও সাদা বর্ণের ও পাঁচটি বিবিধ বর্ণের হয়। কালির ছাপগুলির নির্দিষ্ট কোনো আকার বা আকৃতি থাকে না। কিংবা নির্দিষ্ট কোনো অর্থ বহন করে না। নিম্নলিখিত ভাবে অভীক্ষাটি প্রয়োগ করা হয়।

(i) অভীক্ষার্থীর কাছে একটি একটি করে কার্ড নির্দিষ্ট ক্রমে উপস্থাপিত করা হয়। একটি কার্ড দেওয়ার পর প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হয় এবং অভীক্ষার্থী কী দেখল জিজ্ঞাসা করা হয়। তারপর পরবর্তী কার্ড দেওয়া হয়।

(ii) অভিক্ষার্থীকে প্রতিক্রিয়া দেওয়ার জন্য যথেষ্ট সময় দেওয়া হয় এবং সে তার ইচ্ছানুযায়ী অনেকরকম প্রতিক্রিয়া দিতে পারে।

(iii) প্রতিক্রিয়ার জন্য গৃহীত সময় নথিভুক্ত করা হয়। এছাড়াও প্রতিক্রিয়া দেওয়ার সময় অভীক্ষার্থীর প্রাক্ষোভিক ও ঘটনাপ্রসূত ব্যবহার লক্ষ করা হয়।

Scanned with CamScanner

(iv) সমস্ত কার্ড উপস্থাপনের পর প্রাপ্ত প্রতিক্রিয়ার বিশ্লেষণ করা হয়।

অভীক্ষার্থীর কাছ থেকে কালির ছাপ সংবলিত কার্ডগুলি থেকে প্রতিক্রিয়া পাওয়ার পর স্কোর তৈরি করা হয়। এক্ষেত্রে চার ধরনের স্কোর তৈরি করা হয়। যেমন—(a) স্থান (Location) (b) বিষয় (Contents) (c) মৌলিকত্ব (Originality) (d) নির্ধারক (Determinants)।

চার ধরনের স্কোরে বিভিন্ন প্রতীক (Symbol) ব্যবহার করা হয় এবং একটি টেবিলের চারটি স্তম্ভে (Column) অভীক্ষার্থীর প্রতিক্রিয়াগুলিকে প্রতিকের মাধ্যমে নথিভুক্ত করা হয়। তারপর বিভিন্ন প্রতীক বিশ্লেষণ করে ওই অভীক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যায়। তবে এক্ষেত্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এই অভীক্ষার ব্যবহারকারী তথা মূল্যায়নকারীকে উপযুক্ত ভাবে প্রশিক্ষিত হতে হবে।

Word Association Test : ব্যক্তিত্বের প্রক্ষেপণমূলক অভীক্ষার মধ্যে Word Association Test হল সব থেকে পুরানো। এই অভীক্ষাতে একটি তালিকা থেকে, একটি করে শব্দ অভীক্ষার্থীকে পড়ে শোনানো হয় এবং ওই শব্দ শুনে অভীক্ষার্থীর কী প্রতিক্রিয়া হচ্ছে তা জানা হয়। প্রতিক্রিয়ার জন্য গৃহীত সময় নথিভুক্ত করা হয়। এইভাবে অভীক্ষার্থীর প্রতিক্রিয়া সংক্রান্ত শব্দগুলিকে বিশ্লেষণ করে তার ব্যক্তিত্বের পরিমাপ করা হয়।

Thematic Apperception Test : 1943 খ্রিস্টাব্দে Murray এই অভীক্ষাটি তৈরি করেন। পরে Morgan এই অভীক্ষাটিকে পরিমার্জিত করে সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্ব পরিমাপক অভীক্ষা হিসেবে ব্যবহার করেন। এই অভীক্ষায় মোট ৩১টি কার্ড থাকে। তার মধ্যে একটি কার্ড সাদা এবং বাকি ৩০টি কার্ড অর্থপূর্ণ চিত্র সম্বলিত। ৩০টি অর্থপূর্ণ চিত্র সম্বলিত কার্ডের মধ্যে ১০টি ছেলেদের জন্য, ১০টি মেয়েদের জন্য এবং বাকি ১০টি উভয়ের জন্য। এক্ষেত্রেও অভীক্ষার্থীকে একটি একটি করে কার্ড দেওয়া হয়। একটি কার্ড দেওয়ার পর ওই কার্ডে যে চিত্র আছে সেটিকে কেন্দ্র করে নির্দিষ্ট সময়ে একটি গল্প বানাতে বলা হয়। কার্ড থেকে গল্প বানানোর সময় অভীক্ষার্থীর প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা হয়। অভীক্ষার্থীর দ্বারা সৃষ্ট গল্পগুলিকে বিশ্লেষণ করে তার ব্যক্তিত্বের গুণগত তথ্য পাওয়া যায়।

❖ শিক্ষাগত অভীক্ষা (Educational Test) :

মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্যগুলি পরিমাণগত ও গুণগত ভাবে কতখানি বাস্তবায়িত হয়েছে তা পরিমাপ করা হয়। এই ধরনের পরিমাপের ক্ষেত্রে নানা ধরনের উপকরণ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। অভীক্ষা হল সেই ধরনের একটি উপকরণ। সাধারণত বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যেমন বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে মূল্যায়নের জন্য যে অভীক্ষাগুলি ব্যবহার করা হয়ে থাকে যেগুলিকে শিক্ষাগত অভীক্ষা বলা হয়। শিক্ষাগত এই

অভীক্ষাগুলি বিভিন্ন প্রকারের হয়। যেমন—লিখিত অভীক্ষা, মৌখিক অভীক্ষা, পারদর্শিতার অভীক্ষা ইত্যাদি। শিক্ষাগত অভীক্ষাকে নিম্নে বর্ণিত ছকের সাহায্যে দেখানো হল—

বিভিন্ন প্রকার শিক্ষাগত অভীক্ষার সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে দেওয়া হল—

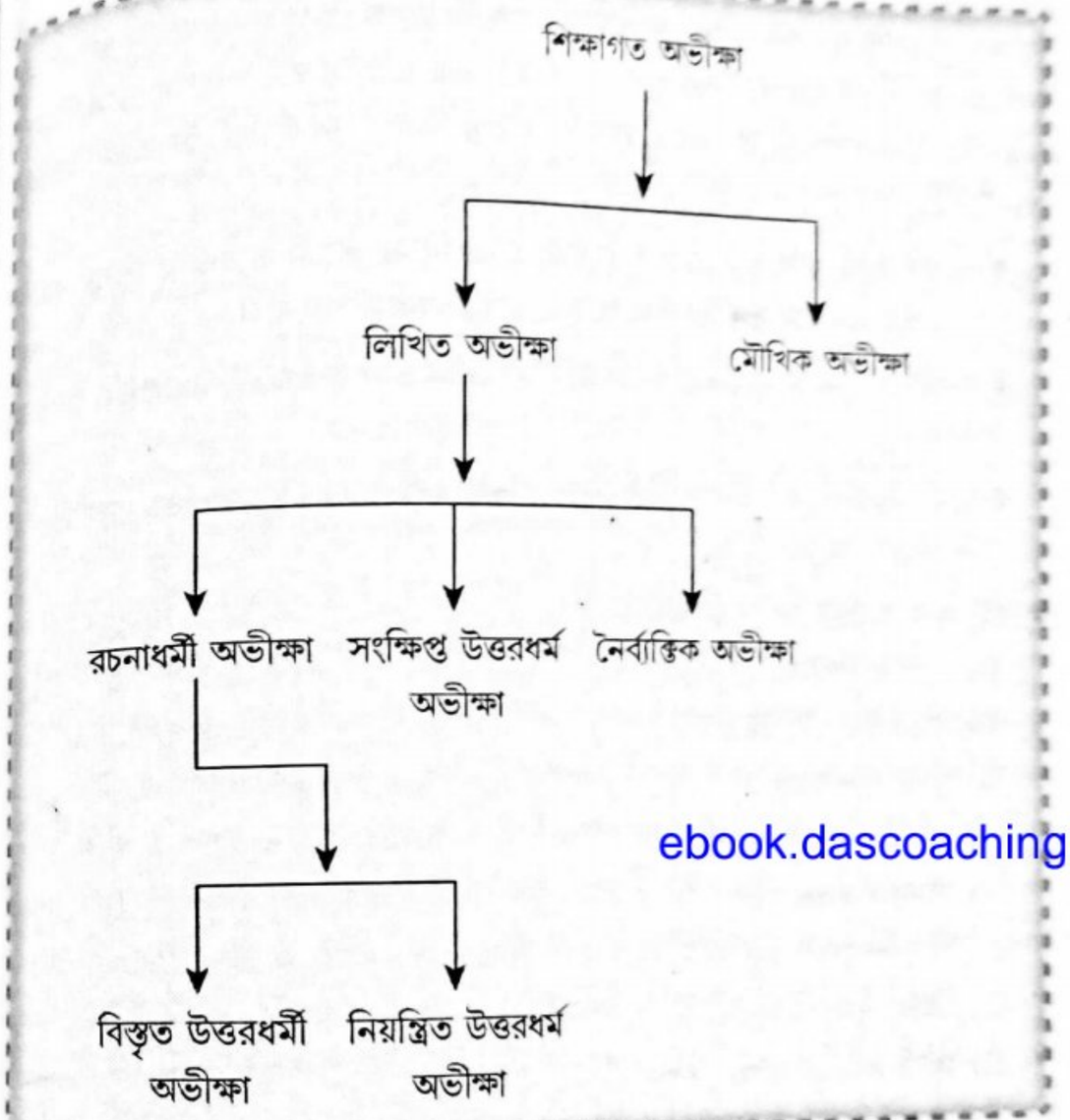

ebook.dascoaching.in

● **লিখিত অভীক্ষা :** বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে সাধারণত শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগত পরিমাপ করা হয় লিখিত অভীক্ষার সাহায্যে। লিখিত অভীক্ষাতে কতকগুলি প্রশ্ন দেওয়া থাকে, শিক্ষার্থীকে সেই প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে হয় লিখিত আকারে। লিখিত অভীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর বিশ্লেষণধর্মী চিন্তা শক্তি, ধারাবাহিক ও সুসামঞ্জস্য রচনা শক্তির মূল্যায়ন করা যায়। লিখিত অভীক্ষা দু'ভাবে নেওয়া যেতে পারে। আদর্শায়িত অভীক্ষা দ্বারা অথবা শিক্ষক নির্মিত অভীক্ষা দ্বারা। লিখিত অভীক্ষাকে নিম্নলিখিত ভাবে ভাগ করা যেতে পারে।

Scanned with CamScanner

(১) রচনাধর্মী প্রশ্নের দ্বারা অভীক্ষা
(২) সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্নের দ্বারা অভীক্ষা
(৩) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের দ্বারা

(১) **রচনাধর্মী প্রশ্নের দ্বারা অভীক্ষা :** রচনাধর্মী অভীক্ষা হল একটি গতানুগতিকপদ্ধতি। এই ধরনের অভীক্ষায় শিক্ষার্থীদের কতকগুলি রচনাধর্মী প্রশ্নের উত্তর লিখতে দেওয়া হয়। প্রশ্নের উত্তরগুলি বিস্তৃত হয়। এই ধরনের অভীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর যুক্তিসম্মত চিন্তন ক্ষমতা, ভাষাজ্ঞান, সুসংহত বক্তব্য উপস্থাপন ক্ষমতা, বিশ্লেষণী ক্ষমতা ও রচনাশৈলীর পরিমাপ করা হয়। যেমন—

- প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার পাঠক্রম সম্পর্কে ভারতীয় শিক্ষা কমিশন (১৯৬৪-৬৬) যে সুপারিশগুলি করেছে সেগুলি আলোচনা করা।
- মাধ্যমিক শিক্ষা প্রসঙ্গে ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের (১৯৬৪-৬৬) সুপারিশগুলি আলোচনা করো।
- গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশনের (১৯৪৮-৪৯) সুপারিশগুলি আলোচনা করো।

● **রচনাধর্মী প্রশ্নের শ্রেণি বিভাগ :**

(i) বর্ণনামূলক প্রশ্ন
(ii) বিচারকরণ জাতীয় প্রশ্ন
(iii) তুলনামূলক প্রশ্ন
(iv) কার্যকারণ সংক্রান্ত প্রশ্ন
(v) সৃজনাত্মক প্রশ্ন
(vi) বিশ্লেষণমূলক প্রশ্ন
(vii) শ্রেণিকরণজাতীয় প্রশ্ন
(viii) মূল্যায়নভিত্তিক প্রশ্ন

উপরিউল্লিখিতগুলি ছাড়াও আরও বিভিন্ন ধরনের রচনাধর্মী প্রশ্ন হতে পারে। **W.B. Monroe** এবং **R.E. Carter** (1993) রচনাধর্মী প্রশ্নের কার্যাবলি ও উদ্দেশ্যের পার্থক্যের ভিত্তিতে সতেরো প্রকারের নাম উল্লেখ করেছেন। সেগুলি হল—(১) তাৎপর্য নির্ণায়ক প্রশ্ন (২) বর্ণনামূলক প্রশ্ন (৩) উপায় নির্ধারণমূলক প্রশ্ন (৪) সম্পর্ক নির্ণয়মূলক প্রশ্ন (৫) সমালোচনামূলক প্রশ্ন (৬) সমস্যামূলক প্রশ্ন (৭) প্রমাণমূলক প্রশ্ন (৮) তালিকা নির্ণায়ক প্রশ্ন (৯) কার্যকারণমূলক প্রশ্ন (১০) যুক্তি নির্ভর প্রশ্ন (১১) তুলনামূলক প্রশ্ন (১২) প্রয়োগমূলক প্রশ্ন (১৩) আলোচনামূলক প্রশ্ন (১৪) সংক্ষিপ্তকরণ প্রশ্ন (১৫) ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন (১৬) উদাহরণমূলক প্রশ্ন ও (১৭) উদ্দেশ্যমূলক প্রশ্ন

● **রচনাধর্মী অভীক্ষার বৈশিষ্ট্য** (Characteristics of Essay Type Test) :

রচনাধর্মী পরীক্ষার বৈশিষ্ট্যগুলি নীচে আলোচনা করা হল —

১। রচনাধর্মী পরীক্ষা হল একটি গতানুগতিক পরীক্ষা পদ্ধতি। রচনাধর্মী প্রশ্নের উত্তরগুলি অনেক বিস্তৃত হয়।

২। রচনাধর্মী পরীক্ষার সাহায্যে শুধুমাত্র শিক্ষার্থীর বিষয় জ্ঞান পরিমাপ করা হয় না; এর সাহায্যে শিক্ষার্থীর চিন্তাশক্তি, যুক্তি ও বিচারকরণ ক্ষমতা, বোধগম্যতা, সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা, অন্যান্য শিখনলব্ধ অভিজ্ঞতা প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা যায়।

৩। এই পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ভাষামূলক জ্ঞান ও ভাষা ব্যবহারের দক্ষতার বিকাশ ঘটে।

৪। এই পরীক্ষায় প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরদানের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর পূর্ণ স্বাধীনতা থাকে। তারা স্বাধীনভাবে প্রশ্ন অনুযায়ী নিজের মতামত ব্যক্ত করতে পারে।

৫। এই পরীক্ষার প্রশ্ন সংখ্যা কম থাকে কিন্তু প্রশ্নোত্তরগুলি অনেক বেশি দীর্ঘ হয়।

৬। এই পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতা (creativity) এবং চিন্তন ক্ষমতা (thinking ability)-এর বিকাশ ঘটে।

৭। এই পরীক্ষার রচনাত্মক প্রশ্নগুলির অনেকগুলি অংশ থাকে। শিক্ষার্থী কোন্ প্রশ্নের অংশ লেখার জন্য কতটা সময় ব্যয় করবে তা বুঝতে না পারায় নির্ধারিত মোট সময়ের মধ্যে তার সব কয়টি প্রশ্নের উত্তর লিখতে পারে না।

৮। রচনাধর্মী পরীক্ষা হল এক ধরনের শিক্ষক নির্মিত অভীক্ষা। ফলে এই ধরনের অভীক্ষার বা পরীক্ষার যথার্থতা (Validity) এবং নির্ভরযোগ্যতা (Reliability) সম্পর্কে সংশয় থেকেই যায়।

৯। রচনাধর্মী পরীক্ষায় শিক্ষার্থীর লেখা উত্তরপত্রের মান নির্ণয়ের কোনো আদর্শায়িত পদ্ধতি নেই। এর ফলে পরীক্ষক তাঁর ব্যক্তিগত মতামত বা দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী শিক্ষার্থীর লিখিত প্রশ্নোত্তরের মান নির্ধারণ করে থাকেন। এই ধরনের পরীক্ষায় কোনো পরীক্ষার্থী কখনই লিখিত কোনো প্রশ্নোত্তরের জন্য পূর্ণমান পায় না। এই ধরনের অভীক্ষায় ব্যক্তিগত প্রভাব অনেক বেশি থাকে।

১০। রচনাধর্মী পরীক্ষার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট একটি সময়সীমা আগে থেকে ঠিক করা থাকে। শিক্ষার্থীকে সেই সময়ের মধ্যে সব কয়টি প্রশ্নের উত্তর লিখতে হয়।

১১। এই ধরনের পরীক্ষায় কোনোরকম নিয়ন্ত্রণ না-থাকায় শিক্ষার্থীরা অনেকেই প্রাসঙ্গিক বিষয়ের পরিবর্তে অপ্রাসঙ্গিক বিষয় লিখে পৃষ্ঠার সংখ্যা বাড়িয়ে থাকে।

Scanned with CamScanner

১২। এই পরীক্ষায় প্রশ্ন-সংখ্যা কম হওয়ার ফলে পাঠ্যবিষয়ের সমগ্র অংশ থেকে প্রশ্ন নির্বাচন করা যায় না। ফলে শিক্ষার্থীর সমগ্র পাঠ্যবিষয়ের অর্জিত জ্ঞান এই পরীক্ষার মাধ্যমে পরিমাপ করা যায় না।

● **রচনাধর্মী অভীক্ষার সুবিধা** (Advantages of Essay Type Test) :

রচনাধর্মী পরীক্ষার সুবিধাগুলি হল নিম্নরূপ :

প্রথমত, রচনাধর্মী পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞানের পরিমাপ খুব সহজে করা যায়। যে-কোনো বিষয়ে রচনাধর্মী পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তৈরি করা এবং তার প্রয়োগ করা খুবই সহজ। পাঠ্যবিষয় থেকে কয়েকটি রচনাত্মক প্রশ্ন নির্বাচন করে শিক্ষক খুব সহজেই শিক্ষার্থীর অধীত জ্ঞানের পরিমাপ করতে পারেন।

দ্বিতীয়ত, এই পরীক্ষায় শিক্ষার্থী স্বাধীনভাবে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর লিখতে পারে। উত্তরের স্বপক্ষে বিভিন্ন যুক্তি প্রদর্শনের সাহায্যে এবং আলোচনা-সমালোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থী তার স্বাধীন মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করতে পারে।

তৃতীয়ত, রচনাধর্মী পরীক্ষায় শিক্ষার্থী তার নিজস্ব যুক্তি, বিচারশক্তি ও চিন্তাশক্তির প্রয়োগ করে থাকে। ফলে এই পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের চিন্তাশক্তি, যুক্তি ও বিচারশক্তির বিকাশ ঘটে থাকে এবং তাদের সম্ভাবনাময় প্রতিভারও বিকাশ হয়ে থাকে।

চতুর্থত, রচনাধর্মী পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ভাষামূলক জ্ঞান ও ভাষা ব্যবহার দক্ষতার বিকাশ ঘটে থাকে। কোনো রচনাত্মক প্রশ্নের উত্তর কতখানি গুছিয়ে ও পরিচ্ছন্নভাবে লিখেছে, এর মাধ্যমেই তার ভাষাজ্ঞান ও ভাষা ব্যবহারের দক্ষতা প্রকাশিত হয়। শিক্ষক-শিক্ষিকারা শিক্ষার্থীদের উত্তরপত্র মূল্যয়নের মাধ্যমে তাদের ভাষাজ্ঞান ও ভাষাপ্রকাশ দক্ষতার বিচার করতে পারেন।

পঞ্চমত, রচনাধর্মী পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সৃজনশীলতার (Creativity) বিকাশ ঘটে। এই ধরনের পরীক্ষায় শিক্ষার্থীরা যে কল্পনাশক্তি ও চিন্তনক্ষমতা ব্যবহার করে থাকে, তার মাধ্যমেই তাদের সৃজনশীলতা প্রতিফলিত হয়।

ষষ্ঠত, রচনাত্মক পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র তৈরি করতে সময় ও অর্থ যথেষ্ট কম লাগে। কারণ এই পরীক্ষায় মাত্র আট থেকে দশটা প্রশ্নের মাধ্যমেই শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবিষয়লব্ধ জ্ঞানের পরিমাপ করা হয়ে থাকে।

● **রচনাধর্মী অভীক্ষার অসুবিধা** (Disadvantages of Essay Type Test) :

রচনাধর্মী অভীক্ষার বা পরীক্ষার ত্রুটিগুলি হল নিম্নরূপ:

(১) **যথার্থতার** (Validity) **অভাব :** কোনো পরীক্ষা বা অভীক্ষা যে বৈশিষ্ট্য পরিমাপ করার জন্য তৈরি করা হয়, যদি ঠিক সেই বৈশিষ্ট্যই পরিমাপ করা হয়, তাহলে বুঝতে হবে যে অভীক্ষা বা পরীক্ষাটির যথার্থতা আছে (The validity of a test refers to how well it measures what it claims to measure)। রচনাধর্মী পরীক্ষার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, অভীক্ষাটি যে বৈশিষ্ট্য পরিমাপ করার জন্য তৈরি তা পরিমাপ না করে অন্য কোনো বৈশিষ্ট্য পরিমাপ করে থাকে। যেমন—ইতিহাসের পরীক্ষায় শিক্ষক শিক্ষার্থীর শুধু ইতিহাসের জ্ঞান পরিমাপ না করে তার হাতের লেখা, বানান ইত্যাদির মূল্যায়ন করে থাকেন। তাই রচনাধর্মী পরীক্ষা বা অভীক্ষায় যথার্থতার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। পরীক্ষার যথার্থতা না থাকলে শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞানের নির্ভুল পরিমাপ করা যায় না।

(২) **নির্ভরযোগ্যতার** (Reliability) **অভাব :** কোনো পরীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা হল সেই বৈশিষ্ট্য যা কোনো শিক্ষার্থীর বিভিন্ন সময়ে পরীক্ষায় প্রাপ্ত স্কোরের মধ্যে একটি সঙ্গতি বা সামঞ্জস্য রক্ষা করে থাকে। কিন্তু রচনাভিত্তিক পরীক্ষায় কোনো সঙ্গতিপূর্ণ স্কোর বা তথ্য (consistent scores or information) পাওয়া যায় না। কোনো বিষয়ে পরীক্ষার্থীর লেখা একই উত্তরপত্র বিভিন্ন পরীক্ষককে দিয়ে বিচার করতে দিলে বিভিন্ন নম্বর পাওয়া যায়। আবার একই পরীক্ষক কোনো পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্র দুবার পরীক্ষা করলেও নম্বরের বৈষম্য দেখা যাবে। তাই রচনাধর্মী পরীক্ষার মধ্যে নির্ভরযোগ্যতার যথেষ্ট অভাব রয়েছে।

(৩) **নৈর্ব্যক্তিকতা** (Objectivity)-**এর অভাব :** কোনো পরীক্ষার নৈর্ব্যক্তিকতা বলতে বোঝায় যে, পরীক্ষাটি পরীক্ষকের ব্যক্তিগত প্রভাব থেকে মুক্ত হবে এবং বিষয়মুখী হবে। কিন্তু রচনাধর্মী পরীক্ষায় পরীক্ষকের ব্যক্তিগত প্রভাব যথেষ্ট বেশি থাকে। কোনো বিষয়ে পরীক্ষায় শিক্ষার্থী কত নম্বর পাবে তা নির্ভর করে পরীক্ষকের ব্যক্তিগত রুচি, মেজাজ ও খেয়ালখুশির ওপর। তাই রচনাভিত্তিক পরীক্ষার যথেষ্ট নৈর্ব্যক্তিকতার অভাব রয়েছে।

(৪) **প্রয়োগশীলতার** (Administrability) **অভাব :** কোনো বিষয়ে পরীক্ষার সাফল্য নির্ভর করে তার প্রয়োগশীলতার ওপর। প্রয়োগশীলতা বলতে বোঝায় সহজ, সরল-প্রয়োগ পদ্ধতি। রচনাভিত্তিক পরীক্ষার প্রয়োগ-পদ্ধতি মোটেই সহজসাধ্য নয়। কোনো প্রশ্নের উত্তর কী হবে তা অনেক সময় নির্দিষ্ট করা থাকে না। তাই রচনাধর্মী পরীক্ষায় প্রয়োগশীলতার অভাব রয়েছে।

(৫) **তুলনীয়তার** (Comparability) **অভাব :** রচনাভিত্তিক পরীক্ষার সঠিক কোনো নর্ম (Norm) নেই। ফলে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের একই শ্রেণির শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার ফলাফলের মধ্যে কোনো তুলনা করা যায় না। বিভিন্ন বিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় বিভিন্ন রকম নম্বর দেওয়া হয়ে থাকে। এর ফলে তাদের প্রাপ্ত নম্বরের মধ্যে তুলনা করে পারদর্শিতার সঠিক হার নির্ণয় করা যায় না। তাই রচনাধর্মী পরীক্ষার মধ্যে তুলনীয়তার অভাব রয়েছে।

(৬) **মুখস্থ-নির্ভর** (Stress on rote learning) : রচনাধর্মী পরীক্ষা অনেকখানি মুখস্থ নির্ভর। এই ধরনের পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের 5 থেকে 6টি প্রশ্নের রচনাত্মক উত্তর লিখতে হয়। শিক্ষার্থীরা কতকগুলি বাছাই করা প্রশ্নের উত্তর মুখস্থ করে পরীক্ষায় পাশের চেষ্টা করে থাকে। এই ধরনের পরীক্ষায় শিক্ষার্থীরা যুক্তি, বোধগম্যতার চেয়ে মুখস্থবিদ্যাকে কাজে লাগিয়ে পরীক্ষায় বেশি নম্বর পাওয়ার চেষ্টা করে।

Scanned with CamScanner

(৭) **অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা** (Unhealthy Competition) : রচনাভিত্তিক পরীক্ষা সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থাকে পরীক্ষাকেন্দ্রিক (Examination oriented) করে গড়ে তোলে। পরীক্ষায় পাশ করা কিংবা ভালো নম্বর পাওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে অস্বাস্থ্যকর প্রতিযাগিতামূলক মনোভাব দেখা দেয়। পরীক্ষায় সাফল্যের জন্য কোনো কোনো শিক্ষার্থী অসৎ উপায় অবলম্বন করতেও কুণ্ঠিত হয় না। শিক্ষার্থীদের মধ্যে সহযোগিতার পরিবর্তে হিংসার মনোভাব দেখা দেয়। এর ফলে এই ধরনের প্রচলিত পরীক্ষা-পদ্ধতির সাহায্যে শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞানের যথাযথ পরিমাপ করা সম্ভব হয় না।

(৮) **সামগ্রিক বিকাশের** (Total development) **পরিমাপ অসম্ভব** : রচনাভিত্তিক পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর পাঠ্য বিষয়গত অর্জিত জ্ঞানের আংশিক পরিমাপ করা যায় মাত্র; তার চারিত্রিক ও অন্যান্য মানসিক গুণের পরিমাপ করা যায় না।

(৯) **সামগ্রিক পারদর্শিতার** (Total achievement) **পরিমাপ অসম্ভব** : রচনাভিত্তিক পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর কোনো বিষয়ের সামগ্রিক পারদর্শিতা পরিমাপ করা যায় না। নির্দিষ্ট একটি সময়ের মধ্যে নির্বাচিত কয়েকটি প্রশ্নের লিখিত উত্তরের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের কোনো বিষয়ের সামগ্রিক পারদর্শিতা পরিমাপ করা যায় না।

(১০) **সময়সীমার ত্রুটি** (Defects of Time limit) : রচনাভিত্তিক পরীক্ষায় প্রশ্নের উত্তর অনুযায়ী সময়সীমা নির্ধারণ মোটেই বিজ্ঞানসম্মত হয় না। অনেক সময় পরীক্ষা দেওয়া প্রশ্নগুলির উত্তর এত বেশি বিস্তৃত বা রচনাত্মক হয় যে নির্দিষ্ট তিন কিংবা চার ঘণ্টার মধ্যে শিক্ষার্থীরা সমস্ত প্রশ্নের উত্তর লিখতে অসমর্থ হয়।

(১১) **নম্বর দানের ত্রুটি** (Defect of Marking or Scoring) : রচনাভিত্তিক পরীক্ষায় নম্বর দানের কোনো সঠিক নির্দেশনামা থাকে না। শিক্ষক তাঁর ব্যক্তিগত প্রবণতা ও পছন্দ অনুযায়ী শিক্ষার্থীর লিখিত উত্তরের সংখ্যামান নির্ধারণ করে থাকেন। শিক্ষকভেদে শিক্ষার্থীর উত্তরপত্রের সংখ্যামান বিভিন্ন হয়ে থাকে। নম্বরদানের ত্রুটির ফলে এই পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞানের সঠিক পরিমাপ সম্ভব হয় না।

উপরিলিখিত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় যে, রচনাধর্মী পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অর্জিত জ্ঞানের সঠিক পরিমাপ করা সম্ভব নয়। তবে রচনাধর্মী পরীক্ষায় এইসব ত্রুটি থাকলেও এই পরীক্ষাকে শিক্ষাব্যবস্থা থেকে পুরোপুরি বাদ দেওয়া যাবে না। পরীক্ষা হল শিক্ষার একটি প্রয়োজনীয় অথচ ক্ষতিকারক (Necessary evil) অংশ। যে-কোনো দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে এই পরীক্ষাব্যবস্থা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তাই আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌গণ এই প্রচলিত পরীক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারের ওপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন।

● **রচনাধর্মী অভীক্ষার সংস্কারের জন্য পরামর্শ** (Suggestions for Improvement of Essay Type Test) :

আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌গণ রচনাধর্মী পরীক্ষা-পদ্ধতির সংস্কারের জন্য যেসব নির্দেশাবলি (guideliness) দিয়েছেন, সংক্ষেপে সেগুলি নীচে উল্লেখ করা হল :

প্রথমত, কোনো রচনাত্মক প্রশ্নের উত্তরে কতটা কী লিখতে হবে তা সেই প্রশ্নের মধ্যেই পরিষ্কারভাবে শিক্ষার্থীদের কাছে ব্যাখ্যা করে দিতে হবে (Write the essay question so its clear and explains to students what should be covered in the answer)।

দ্বিতীয়ত, প্রতিটি প্রশ্ন শিক্ষার্থীদের কাছে বোধগম্য হতে হবে এবং প্রশ্নের ভাষা সহজ হতে হবে।

তৃতীয়ত, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রতিটি প্রশ্নের নমুনা উত্তর লেখা এবং উত্তরের প্রতিটি অংশের জন্য পৃথক Points ও নম্বর নির্দিষ্ট করে দেওয়া প্রয়োজন (Write a sample answer to the question ahead of time and assign points to various parts of the answer.)।

চতুর্থত, রচনাধর্মী পরীক্ষার প্রত্যাশামূলক ত্রুটি দূর করার জন্য (To reduce expectance effects) পরীক্ষকদের দলবদ্ধভাবে শিক্ষার্থীদের উত্তরপত্র মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। (Teachers are working in terms, checking each other's grading.)

পঞ্চমত, প্রচলিত রচনাধর্মী পরীক্ষাকে ব্যক্তিগত প্রভাব থেকে মুক্ত করার জন্য নৈর্ব্যক্তিক বা বিষয়মুখী পরীক্ষা (Objective examination) প্রবর্তনের প্রয়োজন।

ষষ্ঠত, শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক বিকাশের মূল্যায়নের জন্য আদর্শায়িত অভীক্ষা (Standardized test) গঠন করা এবং বিদ্যালয়ে ধারাবাহিক পরিমাপ পত্রের (Cumulative Record Card) প্রচলন করা প্রয়োজন।

(২) **সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী অভীক্ষা** (Short Answer Type Test) :

সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী অভীক্ষার জন্য প্রশ্ন তৈরি ও উত্তরের মূল্যায়ন সম্পর্কিত মূল নীতিগুলি রচনাধর্মী অভীক্ষার মতো একইরকম। শুধুমাত্র অল্প কয়েকটি বিষয় স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা দরকার। সেগুলি হল—

(ক) সংক্ষিপ্ত উত্তর কতখানি সংক্ষিপ্ত হবে তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে দেওয়া দরকার। যেমন—১০০ থেকে ১৫০টি শব্দে বা ৩-৪টি বাক্যে ইত্যাদি।

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী অভীক্ষার একটি প্রশ্নে যথা সম্ভব একটি ধারণা বা একটি ছোটো বিষয়কে অবলম্বন করা দরকার।

(গ) নির্ধারিত বিস্তারের চেয়ে অতিরিক্ত বড়ো উত্তর লিখলে যদি তা শাস্তি যোগ্য হয় তবে প্রশ্নের নির্দেশাবলিতে তা স্পষ্ট করে উল্লেখ করে দেওয়া দরকার।

(ঘ) উত্তর প্রদান যদি প্রশ্নপত্রেই করতে হয়, তবে উত্তরের জন্য প্রয়োজনীয় স্থান বরাদ্দ করা দরকার।

(ঙ) কোনো বিষয়কে সংক্ষিপ্ত অথচ সম্পূর্ণ আকারে প্রকাশ করার দক্ষতাকে যথাযথ স্বীকৃতির প্রদান বা মূল্য দেওয়ার কথাও প্রশ্নপত্রে উল্লেখ থাকা দরকার।

Scanned with CamScanner

(৩) নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা (Objective Type Test) :

প্রচলিত ব্যক্তিনির্ভর রচনাধর্মী পরীক্ষার অসুবিধাগুলি দূর করতে গিয়েই নৈর্ব্যক্তিক বা বিষয়াত্মক পরীক্ষার (Objective test) উদ্ভব হয়। প্রচলিত রচনাধর্মী পরীক্ষা অনেকখানি ব্যক্তিনির্ভর (subjective) এবং এর নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতারও যথেষ্ট অভাব রয়েছে। এই ধরনের পরীক্ষার সাহায্যে শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞানের সামগ্রিক পরিমাপ করা যায় না। নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা বা পরীক্ষা হল বিষয়াত্মক (objective) এবং এই পরীক্ষা শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতার একটি নির্ভরযোগ্য ও যথার্থ পরিমাপ দিতে পারে। নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার নম্বরদান-পদ্ধতিও বিজ্ঞানভিত্তিক ও নির্ভুল হয়। অনেকে এই পরীক্ষাকে নতুন ধরনের পরীক্ষা (New type test) বলে উল্লেখ করেছেন।

নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা হল এমন এক ধরনের পরীক্ষা যেখানে পরীক্ষার্থীর শিক্ষাগত পারদর্শিতার মান ব্যক্তি-নিরপেক্ষভাবে পরিমাপ করা যায়। মনোবৈজ্ঞানিক ও শিক্ষাগত পরিমাপের ক্ষেত্রে এই ধরনের পরীক্ষা যথেষ্ট উপযোগী।

▲ নৈর্ব্যক্তিক বা বস্তুধর্মী পরীক্ষার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Objective Examination) :

নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হল :

১। নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষায় পরীক্ষক ও পরীক্ষার্থী উভয়েরই কোনো ব্যক্তিগত প্রভাব থাকে না।

২। এই পরীক্ষা হল বস্তুনিষ্ঠ; ব্যক্তিনির্ভর নয়।

৩। এই পরীক্ষার প্রশ্নগুলির উত্তর খুবই সংক্ষিপ্ত হয়। এর জন্য সব সময় অতিরিক্ত উত্তরপত্র ব্যবহৃত হয় না। অনেক ক্ষেত্রে প্রশ্নপত্রেই উত্তর লেখার ব্যবস্থা থাকে।

৪। এই পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞানের সামগ্রিকভাবে পরিমাপ করা যায়। কারণ শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক যে বিশেষ বিষয়ের পাঠ দেন, তার সমগ্র অংশ থেকেই প্রশ্ন নির্বাচন করা হয়ে থাকে।

৫। এই অভীক্ষা নৈর্ব্যক্তিক বলে এর যথার্থতা (Validity) ও নির্ভরযোগ্যতা অনেক বেশি। এক্ষেত্রে রচনাভিত্তিক পরীক্ষার মতো পরীক্ষার্থীর হাতের লেখা ভাষা, বানান প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য শিক্ষকের মূল্যায়ন কার্যকে প্রভাবিত করে না।

৬। এই পরীক্ষায় প্রশ্ন সংখ্যা অনেক বেশি হয়। এই প্রশ্নাবলি রচনা ও যথেষ্ট সময়সাপেক্ষ ও শ্রমসাধ্য ও ব্যয়সাপেক্ষ।

৭। এই জাতীয় অভীক্ষায় শিক্ষার্থীর চিন্তাশক্তি, যুক্তি ও বিচারবুদ্ধি-চর্চার কোনো সুযোগ থাকে না। শিক্ষার্থীর ভাষা জ্ঞান ও রচনা দক্ষতা প্রকাশের কোনো সুযোগ থাকে না। এখানে পরীক্ষার্থীর প্রশ্নোত্তর লেখার প্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করা যায়। শিক্ষার্থী স্বাধীনভাবে যা খুশি তাই লিখতে পারে না।

৮। নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার মূল্যায়ন খুব সহজে ও তাড়াতাড়ি করা যায়। এই জাতীয় অভীক্ষায় প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর ও সংখ্যামান আগেই নির্দিষ্ট করা থাকে। ফলে পরীক্ষার্থী সঠিক উত্তর লিখলে পূর্ণ সংখ্যামান পেতে পারে। পরীক্ষক খুব অল্প সময়ে অনায়াসে এই পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়ন করতে পারেন। এই অভীক্ষা গঠনের জন্য বিশেষজ্ঞ বা অভিজ্ঞ শিক্ষকের প্রয়োজন হয় ঠিকই; কিন্তু এর উত্তরপত্র মূল্যায়নের জন্য অভীক্ষা পরীক্ষকের প্রয়োজন হয় না।

৯। নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার প্রশ্নগুলি যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে নির্বাচন করা হয়। যাতে শিক্ষার্থীর চিন্তন ক্ষমতা, যুক্তি বিচারকরণ ক্ষমতা, বোধগম্যতা প্রভৃতি মানসিক বৈশিষ্ট্যগুলোকে সঠিকভাবে পরিমাপ করা যায়। তবে স্বাধীনভাবে লেখার সুযোগ এখানে না-থাকায় শিক্ষার্থীর মানসিক বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পূর্ণভাবে পরিমাপ করা যায় না। এই অভীক্ষার প্রশ্নগুলির উত্তর পরীক্ষার্থী অনেক সময় আন্দাজ বা অনুমানের মাধ্যমে লেখার চেষ্টা করে থাকে।

১০। এই অভীক্ষার প্রশ্নগুলি সমগ্র পাঠ্যসূচি থেকে নির্বাচন করা হয়। ফলে শিক্ষার্থীর কোনো বিশেষ বিষয়ের বা বিষয়াংশের ত্রুটি বা দুর্বলতা সহজে নির্ণয় করা যায় এবং পরে পুনরায় পাঠদানের মাধ্যমে সেই দুর্বলতা দূর করা যায়।

▲ নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার শ্রেণিবিভাগ :

- সত্য-মিথ্যা নির্ণায়ক প্রশ্ন বা অভীক্ষা (True-False Item)
- সামঞ্জস্য নির্ণায়ক অভীক্ষা (Matching Item)
- সম্পূর্ণকরণ অভীক্ষা (Fill in the Blanks or Completion test)
- বহু নির্বাচনী অভীক্ষা (Multiple Choice)
- হ্যাঁ/না জাতীয় অভীক্ষা (Yes-No Type)
- সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্ন (Short Answer Item)

▲ নৈর্ব্যক্তিক বা বিষয়াত্মক অভীক্ষার সুবিধা (Advantages of Objective Test) :

নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার প্রধান গুণ বা সুবিধাগুলি হল নিম্নরূপ –

প্রথমত : নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা হল বস্তুনিষ্ঠ। এই অভীক্ষায় শিক্ষকের ব্যক্তিগত কোনো প্রভাব থাকে না।

দ্বিতীয়ত : নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য। এই পরীক্ষা বিষয়াত্মক বলেই শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞানের নির্ভরযোগ্য পরিমাপ করতে পারে।

তৃতীয়ত : এই পরীক্ষায় নম্বর দান পদ্ধতি অনেক সহজ ও নির্ভুল। কারণ এই পরীক্ষায় একটি প্রশ্নের একটি নির্ভুল উত্তর থাকে। শিক্ষার্থী নির্ভুল উত্তর লিখলে শিক্ষক সঠিক নম্বর দিতে বাধ্য হন।

Scanned with CamScanner

চতুর্থত : এই পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞানের সামগ্রিকভাবে পরিমাপ করা যায়। কারণ শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক যে বিষয় পড়ান, তার সমগ্র অংশ থেকেই প্রশ্ন নির্বাচন করা হয়ে থাকে। এই পরীক্ষায় সাফল্যলাভের জন্য শিক্ষার্থীদের পাঠক্রমের সমস্ত অংশগুলোকেই ভালোভাবে পড়তে হয়।

পঞ্চমত : এই অভীক্ষা নৈর্ব্যক্তিক বা বিষয়মুখী বলে এর যথার্থতা অনেক বেশি থাকে। এক্ষেত্রে হাতের লেখা, ভাষা বানান প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য শিক্ষকের মূল্যায়ন কার্যকে প্রভাবিত করে না।

ষষ্ঠত : এই ধরনের অভীক্ষার প্রয়োগশীলতা ও তুলনীয়তাও যথেষ্ট রয়েছে। এই অভীক্ষার প্রয়োগ-পদ্ধতি কষ্টসাধ্য বা জটিল নয় এই অভীক্ষার প্রয়োগ-পদ্ধতি সহজ ও পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা থাকে এবং এই অভীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অর্জিত সামর্থ্যের তুলনা করা যায়।

সপ্তমত : এই ধরনের অভীক্ষা প্রয়োগের জন্য সময় ও শ্রম যথেষ্ট কম লাগে। খুব অল্প সময়ে এবং অনায়াসে এই পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়ন করতে পারেন। এই পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নের জন্য অভিজ্ঞ পরীক্ষকের প্রয়োজন হয় না।

▲ নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার ত্রুটি বা অসুবিধা (Defects or Disavantages of Objective Test) :

নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা বা পরীক্ষার উপরিউক্ত সুবিধাগুলি থাকলেও এর অসুবিধা বা ত্রুটিও কম নয়। এর প্রধান **অসুবিধাগুলি** হল নিম্নরূপ :

প্রথমত : এই জাতীয় পরীক্ষা অত্যধিক বস্তুনিষ্ঠ ও তথ্যনির্ভর বলে এর সাহায্যে শিক্ষার্থীদের ভাষাজ্ঞান, রচনা-দক্ষতা ও চিন্তাশক্তি প্রকাশের কোনো সুযোগ থাকে না। যুক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে স্বাধীনভাবে কিছু লেখার সুযোগও থাকে না। স্মৃতিনির্ভর এই পরীক্ষায় শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতার কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না।

দ্বিতীয়ত : যে-কোনো বিষয়ে ভালো নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা গঠন করতে হলে অনেক বেশি সময় লাগে (good objective tests take a long time to construct)। কয়েক মিনিটে বা পরীক্ষার আগের দিন রাত্রে বসে এই পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তৈরি করা যায় না।

তৃতীয়ত : এই ধরনের অভীক্ষা যথেষ্টভাবে বিশেষজ্ঞ বা অভিজ্ঞ শিক্ষক ছাড়া তৈরি করা যায় না। শিক্ষকের বিষয়ের ওপর যথেষ্ট দক্ষতা না থাকলে এই অভীক্ষা গঠন যথেষ্টই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

চতুর্থত : এই ধরনের অভীক্ষা যথেষ্ট ব্যয়সাধ্য। কারণ এই অভীক্ষার প্রশ্নপত্রগুলি অনেক বড়ো হয়। এই ধরনের প্রশ্নপত্র ছাপানোর খরচ অনেক বিদ্যালয়ই বহন করতে পারে না।

পঞ্চমত : এই অভীক্ষার প্রশ্নগুলির উত্তর শিক্ষার্থী অনেক সময় আন্দাজ বা অনুমানের মাধ্যমে লেখার চেষ্টা করে থাকে (The guessing factor associated with objective tests)। প্রশ্নের সঠিক উত্তরটি জানা না থাকলে শিক্ষার্থী অনুমানের ভিত্তিতেই সম্ভাব্য উত্তরের নীচে দাগ দিয়ে থাকে। এর ফলে তার কিছু উত্তর ঠিক যেমন হতে পারে তেমনি ভুলও হতে পারে। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক ***Sandiford*** বলেছেন— "The examiner cannot tell where knowledge stops and guessing begins."

ষষ্ঠত : এই জাতীয় অভীক্ষায় শিক্ষার্থীর চিন্তাশক্তি, যুক্তি ও বিচারবুদ্ধি-চর্চার কোনো সুযোগ থাকে না। ফলে এই অভীক্ষার দ্বারা শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞানের সঠিক পরিমাপ করা যায় না।

● রচনাধর্মী ও নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার মধ্যে পার্থক্য (Difference between Essay type Test and Objective type Test) :

পার্থকের বিষয়	রচনাধর্মী অভীক্ষা	নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা
1.অভীক্ষাপদ-এর সংখ্যা	রচনাধর্মী অভীক্ষায় অভীক্ষাপদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম।	অভীক্ষাপদের সংখ্যা অনেক।
2.উত্তরের দৈর্ঘ্য	উত্তর ক্লান্তিজনকভাবে সুদীর্ঘ।	উত্তর সাধারণত একটি শব্দ বা এক-দুটি বাক্যের আকারে লিখতে হয়।
3.প্রশ্নের ব্যাপ্তি	প্রশ্ন পড়ে শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারে না ঠিক কতটা লেখা উচিত।	উত্তর সুনির্দিষ্ট ও সুনির্ধারিত।
4.পরীক্ষকের ব্যক্তিগত প্রভাব	উত্তরপত্র মূল্যায়নে পরীক্ষকের ব্যক্তিগত মতামত, মেজাজ, খেয়াল প্রভাব ফেলে।	এই ধরনের প্রভাব মুক্ত।
5.আংশিক নম্বরদান	আংশিক নম্বরদানের সুযোগ আছে।	আংশিক নম্বরদানের সুযোগ নেই।
6.অভীক্ষার্থীর উত্তর-দানে প্রয়োজনীয় সময়	রচনাধর্মী প্রশ্নের উত্তরদানে শিক্ষার্থীদের অনেক সময় লাগে।	খুব কম সময়ে শিক্ষার্থীরা নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে।

Scanned with CamScanner

পার্থক্যের বিষয়	রচনাধর্মী অভীক্ষা	নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা
7.অভীক্ষার পরিধি	পাঠ্যসূচির সমগ্র অংশ জুড়ে প্রশ্নচয়ন করা হয় না।	পাঠ্যসূচির সমগ্র অংশ জুড়ে প্রশ্নচয়ন করা হয়।
8. অভীক্ষাপত্র প্রস্তুতির সময়	রচনাধর্মী অভীক্ষাপত্র খুব কম সময়ে ও কম পরিশ্রমে প্রস্তুত করা যায়।	নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষাপত্র প্রস্তুতি সময়সাপেক্ষ ও পরিশ্রমসাধ্য।
9.অনুমানের প্রভাব	রচনাধর্মী প্রশ্নের উত্তরদানে শিক্ষার্থীরা অনুমানের সুযোগ পায় না।	নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর জানা না থাকলে শিক্ষার্থীরা অনুমানের সাহায্যে উত্তর দেয়।
10.উত্তরপত্র মূল্যায়নে প্রয়োজনীয় সময়	উত্তরপত্র মূল্যায়নে খুব বেশি সময় লাগে।	অপেক্ষাকৃত কম সময়ে উত্তরপত্র মূল্যায়ন করা যায়।
11.ব্যয়বহুলতা	প্রশ্নপত্র ছাপাতে কম অর্থব্যয় হলেও উত্তরগুলি দীর্ঘ হওয়ায় উত্তরপত্র কেনার খরচ বেশি।	প্রশ্নপত্র সুদীর্ঘ হওয়ায় ছাপতে ব্যয় বেশি হলেও উত্তরপত্রের খরচ কম। অনেকক্ষেত্রে প্রশ্নপত্রেই উত্তরদানের সুবিধা থাকে।
12.মুখস্থবিদ্যার সুযোগ	রচনাধর্মী প্রশ্নের উত্তরদানে শিক্ষার্থীরা মুখস্থবিদ্যার সাহায্য নেয়।	নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা শিক্ষার্থীদের মুখস্থবিদ্যার সাহায্যে উত্তরদানের সুযোগ ও উৎসাহ কোনটিই দেয় না।
13.নির্ভরযোগ্যতা	রচনাধর্মী অভীক্ষার নির্ভর-যোগ্যতা অপেক্ষাকৃত কম।	নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার নির্ভর-যোগ্যতা অনেক বেশি।
14.অসদুপায় অব-লম্বনের সুযোগ	নেই বললেই চলে।	খুব বেশি।

Follow Our B.Ed Related Website>>

www.dascoaching.in

● **মৌখিক অভীক্ষা** (Oral Test) :

মৌখিক অভীক্ষাতে পরীক্ষক শিক্ষার্থীকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন এবং শিক্ষার্থীকে মৌখিক ভাবে তার উত্তর দিতে হয়। মৌখিক অভীক্ষার সাহায্যে শিক্ষার্থীর ভাষা ও উচ্চারণের ক্ষমতার মূল্যায়ন সম্ভব। এছাড়া শিক্ষার্থী সভা-সমিতিতে আলোচনায় অংশগ্রহণের পক্ষে কতটা উপযুক্ত তাও নির্ণয় করা যায়। শিক্ষার্থীর লিখিত পরীক্ষার দুর্বলতা মৌখিক অভীক্ষার মাধ্যমে চিহ্নিত করা যায়। মৌখিক অভীক্ষার অবশ্য অনেক সমালোচনা করা যায় যেমন—

(i) মৌখিক পরীক্ষার সাহায্যে শিশুর মূল্যায়ন স্থায়ীভাবে লিপিবদ্ধ করা যায় না।

(ii) এই অভীক্ষার জন্য বেশি সময় ব্যয় হয়।

(iii) এই অভীক্ষার দ্বারা বিস্তৃত ও নিখুঁত পরিমাপ সম্ভব নয়।

● **নৈর্ব্যক্তিক বা বিষয়াত্মক পরীক্ষা** (Objective Type test) :

প্রচলিত ব্যক্তিনির্ভর রচনাধর্মী পরীক্ষার অসুবিধাগুলি দূর করতে গিয়েই নৈর্ব্যক্তিক বা বিষয়াত্মক পরীক্ষার (Objective test) উদ্ভব হয়। প্রচলিত রচনাধর্মী পরীক্ষা অনেকখানি ব্যক্তিনির্ভর (subjective) এবং এর নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতারও যথেষ্ট অভাব রয়েছে। এই ধরনের পরীক্ষার সাহায্যে শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞানের সামগ্রিক পরিমাপ করা যায় না। নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা বা পরীক্ষা হল বিষয়াত্মক (objective) এবং এই পরীক্ষা শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতার একটি নির্ভরযোগ্য ও যথার্থ পরিমাপ দিতে পারে। নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার নম্বরদান-পদ্ধতিও বিজ্ঞানভিত্তিক ও নির্ভুল হয়। অনেকে এই পরীক্ষাকে নতুন ধরনের পরীক্ষা (New type test) বলে উল্লেখ করেছেন।

নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা হল এমন এক ধরনের পরীক্ষা যেখানে পরীক্ষার্থীর শিক্ষাগত পারদর্শিতার মান ব্যক্তি-নিরপেক্ষভাবে পরিমাপ করা যায়। মনোবৈজ্ঞানিক ও শিক্ষাগত পরিমাপের ক্ষেত্রে এই ধরনের পরীক্ষা যথেষ্ট উপযোগী।

✪ ৫.২ সামর্থভিত্তিক মূল্যায়ন, নিরবচ্ছিন্ন ও সার্বিক মূল্যায়ন, গঠনধর্মী ও সামগ্রিক বা চূড়ান্ত মূল্যায়ন, নির্ণায়ক ও প্রতিকারধর্মী মূল্যায়ন, মূল্যায়নকারী হাতিয়ার গঠন : পারদর্শিতার অভীক্ষা (Competency based evaluation, continuous and comprehensive evaluation, formative and summative evaluation, diagnose and remediation, construction of assessment tools like achievement test.)

❑ ৫.২.১ শিক্ষাবিজ্ঞানে মূল্যায়ন কর্মপরিকল্পনা (Evaluation Programme in Education) :

অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানগুলির সঙ্গে শিক্ষাবিজ্ঞানের গভীর সম্পর্ক শিক্ষার্থীর নিকট

Scanned with CamScanner

সহায়কের ভূমিকা পালন করে। শিক্ষার্থীকে সমাজ জীবনের উপযোগী করে গড়ে তোলার কাজে শিক্ষাবিজ্ঞানের ভূমিকা তাই অনেকখানি। উচ্চমাধ্যমিক স্তরে শিক্ষাবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্তি এজন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। উচ্চমাধ্যমিক স্তরে নিম্নে অর্থাৎ মাধ্যমিক স্তরে বা প্রাথমিক স্তরে বিষয়য়ির বোধগম্য শিক্ষার্থীর নিকট উপলব্ধির পর্যায়ে তেমনভাবে থাকে না। শিক্ষার লক্ষ্য পূরণের বিষয়টি মাথায় রেখেই কোনো একটি বিষয়ের পাঠক্রম নির্মাণ ও রূপায়ণের সাথে সাথে মূল্যায়নের প্রসঙ্গটিও যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ।

আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন প্রসঙ্গে বলা যায়, গতানুগতিক পরীক্ষা ব্যবস্থা যেমন গুরুত্বহীন হয়েছে তেমনি আধুনিক মূল্যায়নের ধারণা গুরুত্ব পেয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন মূল্যায়ন ব্যবস্থা যেমন—প্রস্তুতিকালীন বা গঠনমূলক মূল্যায়ন (Formative Evaluation), সমষ্টিগত মূল্যায়ন (Summative Evaluation) প্রভৃতি স্থান পেয়েছে। কিন্তু এই ধরনের মূল্যায়ন ব্যবস্থাটি বিশেষভাবে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে কার্যকরী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। উচ্চমাধ্যমিক স্তরে ঠিক এই ধরনের মূল্যায়ন ব্যবস্থা রাখা হয়নি। ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে নতুন পাঠক্রম চালু হয়েছে। উচ্চমাধ্যমিক স্তরের এই পাঠক্রমকে দ্বি-বিভাজিত করা হয়েছে। বর্তমানে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির জন্য পৃথক পৃথক পাঠক্রমের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। স্বাভাবিক ভাবে মূল্যায়ন ব্যবস্থাতে কিছু পরিবর্তন এসেছে। বর্তমানে একাদশ শ্রেণিতে পাঠরত শিক্ষার্থীদের বছরে দু-বার মূল্যায়ন করা হয় লিখিত পরীক্ষা ব্যবস্থা ও প্রোজেক্ট-এর মাধ্যমে। একাদশ শ্রেণিতে প্রথম পরীক্ষাটি হল অর্ধবাৎসরিক পরীক্ষা বা ষান্মাসিক পরীক্ষা এবং বছর শেষে বার্ষিক পরীক্ষা (Annual Exam)। প্রধানত একাদশ থেকে দ্বাদশ শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে বার্ষিক পরীক্ষাটিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়। শিক্ষাবিজ্ঞান বিষয়টিতে বার্ষিক পরীক্ষায় লিখিত প্রশ্ন থাকে ৮০ নম্বরের। ২০ নম্বর থাকে প্রোজেক্ট নির্মাণে। এরপর শুধুমাত্র দ্বাদশ শ্রেণির পাঠ্যসূচির ভিত্তিতে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ (West Bengal Council of Higher Secondary Education) ২০১৪ সালে সর্বপ্রথম নতুন পাঠ্যসূচি অনুযায়ী একাদশ শ্রেণির মূল্যায়ন করা হয়। একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির মূল্যায়নে উভয় ক্ষেত্রে পূর্ণমান ১০০ নম্বর। এর মধ্যে ৮০ নম্বর লিখিত পরীক্ষা (বর্হিমূল্যায়ন হিসেবে) এবং ২০ নম্বর হল প্রোজেক্ট নির্মাণ। (অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন হিসেবে)। লিখিত পরীক্ষার বিভাগ এবং Group এবং নম্বর বিভাজনের ধরনটি নিম্নে তালিকা বদ্ধ করা হল—

QUESTION PATTERN ON EDUCATION

Class XI (New Syllabus)

Group	MCQ (1 mark)	SA (1 mark)	Descriptive Type (8 mark)	Total
Group-A Concepts and Factors of Education	1 × 9 = 9	1 × 5 = 5	8 × 2 = 16	30
Group-B Psychological Perspectives	1 × 9 = 9	1 × 5 = 5	8 × 2 = 16	30
Group-C Historical Development of Indian Education	1 × 6 = 6	1 × 6 = 6	8 × 1 = 8	20
			Total	80

মূল্যায়ন ব্যবস্থায় Project Work-এর অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। শিক্ষার্থীদেরকে তাদের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত তাত্ত্বিক ধারণার অংশগুলিকে যাতে তাদের প্রকৃত বাস্তব জীবনের পরিস্থিতির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে তার সম্পর্কে ধারণা দেওয়া। জীবনকেন্দ্রিক এবং কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার অভিজ্ঞতা অর্জনেও এটি সাহায্য করবে। সেই সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সৃজনী ক্ষমতা এবং বিভিন্ন দক্ষতার বিকাশ সাধনে সহায়তাও করবে। এই ধরনের Project Work শিক্ষার্থীদের আত্ম শিখনে যথেষ্ট প্রেষণা সঞ্চারও করবে।

❑ ৫.২.২ সামর্থভিত্তিক মূল্যায়ন (Competency based evaluation) :

ভূমিকা : পাঠক্রমের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হল মূল্যায়ন। ভালো মূল্যায়ন প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের জীবনের অনেকাংশে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করে থাকে। ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় মূল্যায়নের সাথে জড়িয়ে আছে পরীক্ষার চাপ ও উদ্বেগ। প্রচলিত মূল্যায়ন ব্যবস্থায় শিক্ষক-শিক্ষিকা নম্বর দিয়ে থাকেন। এখানে শিক্ষার্থীর সক্ষমতার সুক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মূল্যায়ন সম্ভব হয় না। একইসঙ্গে মূল্যায়ন অনেকটা পরে পরে হওয়ার কারণে তা শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এছাড়া প্রচলিত পরীক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের সমস্ত দক্ষতা তথা বিকাশের সঠিক মূল্যায়ন করা সম্ভবপর ছিল না। তাই মূল্যায়ন ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তনের জন্য জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা (NCF 2005) পদ্ধতিগত সংস্কারের প্রস্তাব করে। জাতীয় পাঠক্রমের অন্যতম সুপারিশ ছিল মূল্যায়ন ব্যবস্থাকে ভয় মুক্ত, স্বচ্ছ

Scanned with CamScanner

ও নমনীয় করে তুলতে হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ২০০৭-০৮ শিক্ষাবর্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সামর্থ্য ভিত্তিক ধারাবাহিক ও নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন ব্যবস্থা (Competency Based Continuous and Comprehensives Evaluation-CCCE) ও গ্রেড ব্যবস্থা বিদ্যালয় স্তর চালু করে।

ইংরেজি Competency শব্দটির বাংলা হল সামর্থ্য। সংসদ বাংলা অভিধান মতে, সামর্থ্যের অর্থ হল ক্ষমতা বা যোগ্যতা। সাধারণ অর্থে সামর্থ্য বলতে বোঝায় ক্ষমতা, যোগ্যতা, শক্তি ইত্যাদি। শিক্ষায় সামর্থ্য বলতে বোঝায় সুনির্দিষ্ট কিছু ক্ষমতা যা অর্জন বা আয়ত্ত করতে হয় বিভিন্ন বিষয়ের শেখা-শেখানোর মাধ্যমে। অর্থাৎ কোনো নির্দিষ্ট পাঠ এককের সাহায্যে শিক্ষার্থী নির্দিষ্ট ক্ষমতা বা যোগ্যতা অর্জন করে। তাই হল শিক্ষার্থীর সামর্থ্য। বিদ্যালয় শিক্ষায় শ্রেণি বলতে কার্য ও নির্দিষ্ট কতকগুলি সামর্থ্যগুচ্ছকে বোঝায় এবং উচ্চতর শ্রেণির সামর্থ্যগুচ্ছ হল ক্রমোন্নতি।

সামর্থ্যভিত্তিক নিরবচ্ছিন্ন ও ধারাবাহিক মূল্যায়নের (CCCE)-এর গোড়ার কথা হল এতদিনের প্রচলিত ব্যবস্থা প্রকৃত মানসিকতা বা দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটানো। সামর্থ্যভিত্তিক ধারাবাহিক নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়নের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হল পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীকে চিহ্নিত করা এবং সংশোধনী পাঠ ও সঙ্গী শিখনের মাধ্যমে এই ঘাটতি পূরণের ব্যবস্থা করা। এটি শিক্ষার্থীকে ধরে রাখতে এবং পরিকল্পিতভাবে সঠিক ধারণ ক্ষমতায় ক্রম উন্নতিতে সাহায্য করে। শিক্ষার্থীরা আনন্দের সাথে পঠনপাঠনে অংশগ্রহণ করুক। লেখাপড়া বিষয়টি নিরস ও ছকে বাঁধা যান্ত্রিক প্রক্রিয়া—এ ধরনের নেতিবাচক মনোভাব সরিয়ে লেখাপড়াকে আনন্দের কর্মসূচি, সৃজনাত্মক প্রক্রিয়া, মননশীলতার আধার এই বোধ ও উপলব্ধি জাগ্রত করাই আজকের আহ্বান, শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই বোধ সঞ্চালিত করা আজ ভীষণ জরুরি। আর সামর্থ্য ভিত্তিক মূল্যায়নের মূলে রয়েছে এই ভাবনা, এই দর্শন।

সামর্থ্যের প্রাথমিক ভাগগুলি হল জ্ঞানমূলক সামর্থ্য, বোধমূলক সামর্থ্য, প্রয়োগমূলক সামর্থ্য ও দক্ষতামূলক সামর্থ্য। জ্ঞানমূলক সামর্থ্য হল তথ্য সনাক্ত করার সামর্থ্য, বোধমূলক সামর্থ্য হল তথ্য বুঝতে পারার সামর্থ্য। প্রয়োগমূলক সামর্থ্য হল তথ্য বোধকে প্রয়োগ করার সামর্থ্য এবং দক্ষতামূলক সামর্থ্য হল বংশ তালিকা প্রস্তুত। মানচিত্র অঙ্কন, নকসা চিত্র আঁকা প্রভৃতি তৈরির সামর্থ্য হল দক্ষতামূলক সামর্থ্য। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ইতিহাস তথা সমাজবিজ্ঞানের জন্য উপরোক্ত চার ধরনের সামর্থ্য অর্জনের লক্ষ্য স্থির করেছে।

সামর্থ্য ভিত্তিক মূল্যায়ন ভাবনার সঙ্গে তিনটি বিষয় ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কযুক্ত—**প্রত্যাশিত সামর্থ্য, অর্জিত সামথ্য ও ঘাটতি সামর্থ্য।**

● **প্রত্যাশিত সামর্থ্য :** যে সামর্থ্য বা যোগ্যতা বা ক্ষমতা একজন শিক্ষার্থীর কাছ থেকে প্রত্যাশা করা যায়, কামনা করা যায় বা আকাঙ্ক্ষা করা যায়—তাই হল প্রত্যাশিত বা কাম্য সামর্থ্য। প্রত্যাশিত সামর্থ্যের জন্য কতকগুলি বিষয় জানা একান্ত জরুরি। এই বিষয়গুলি হল—

- কোন্ নির্দিষ্ট বয়স বা শ্রেণিতে শিক্ষার্থী অবস্থান করছে?
- কোন্ বিষয়ে (Subject) শিক্ষার্থী অবস্থান করছে?
- কোন্ পাঠএককে (Unit) শিক্ষার্থী অবস্থান করছে?
- কোন্ সামাজিক পরিবেশে শিক্ষার্থী অবস্থান করছে?

● **অর্জিত সামর্থ্য :** একটি নির্দিষ্ট শ্রেণির নির্দিষ্ট বিষয়ে শিক্ষণ-শিখন (Teaching-Learning) প্রক্রিয়ার শেষে শিক্ষার্থীরা যে সামর্থ্য বা ক্ষমতা অর্জন করে তাকেই অর্জিত সামর্থ্য বলে। সাধারণত প্রত্যাশিত সামর্থ্য অর্জন করার লক্ষ্যই শিক্ষক-শিখন প্রক্রিয়া পরিচালিত হয়। সুতরাং অর্জিত সামর্থ্য যত বেশি প্রত্যাশিত সামর্থ্যের কাছাকাছি পৌঁছাবে তত বেশি শিক্ষণ-শিখন সফল হিসেবে চিহ্নিত হবে তথা শিক্ষার্থীরাও সফল হিসেবে গড়ে উঠবে। একজন শিক্ষক/শিক্ষিকা হলেন এই অর্জিত সামর্থ্যকে ত্বরান্বিত করার মূল কাণ্ডারী।

● **ঘাটতি সামর্থ্য :** প্রত্যাশিত সামর্থ্য (Minus)—অর্জিত সামর্থ্য = ঘাটতি সামর্থ্য। অর্থাৎ একজন শিক্ষার্থীর কাছে যে সামর্থ্য প্রত্যাশা করা হয়েছিল, সেই সামর্থ্য অর্জন থেকে শিক্ষার্থীরা যতটা পিছিয়ে থাকে সেটাই হল শিক্ষার্থীর ঘাটতি সামর্থ্য। প্রচলিত ব্যবস্থায় ঘাটতি সামর্থ্যের (অসাফল্য) জন্য শিক্ষার্থীকেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে দায়ী করা হয় এবং ফেল বা অকৃতকার্য—এ সব শব্দ দ্বারা শিক্ষার্থীদের আক্রান্ত করা হয়। তবে বাস্তব সত্য এটাই যে অসীম সম্ভাবনাময় শিক্ষার্থীরা এই ঘাটতির জন্য যদি ন্যূনতম অংশীদার হয়ে থাকে—তার থেকে অনেক বেশি দায়ী থাকে পাঠক্রম, পঠনপাঠন পদ্ধতি, মূল্যায়ন পদ্ধতি ইত্যাদি অনেক কিছুই। তাই আধুনিক শিক্ষা বিজ্ঞানে বিজ্ঞান সম্মত পাঠক্রম বা পাঠ্যসূচি নির্মাণ, শিক্ষণ পদ্ধতির প্রচলন ও মূল্যায়ন পদ্ধতির প্রবর্তনের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। যথার্থভাবে যদি উপরোক্ত বিষয়গুলি শিক্ষা ব্যবস্থায় কার্যকরী হয় তাহলে তথাকথিত অকৃতকার্য (ফেল) শব্দটি শিক্ষার্থীদের অভিধান থেকে মুছে ফেলা অসম্ভব নয়। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ইতিমধ্যে সারা বছর তিনটি সামগ্রিক মূল্যায়নের (Summative Evaluation) ব্যবস্থা করেছে (first summative, second summative and third summative evaluation)। প্রথম ও দ্বিতীয় সামগ্রিক মূল্যায়নের যেসব শিক্ষার্থী নির্দিষ্ট কাম্য সামর্থ্য অর্জন করতে পারবে না তাদের জন্য ঘাটতি পূরণের সংশোধনী অভীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

● **ভিতজরিপ :** মৌখিক ও লিখিত প্রশ্নের উত্তরের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর ভিত অর্থাৎ শিক্ষার্থী সামর্থ্যের কোন স্তরে আছে তা জেনে নেওয়ার প্রক্রিয়া। ভিত জরিপের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সামর্থ্যের স্তর চিহ্নিত করা হয়। কোনো ঘাটতি থাকলে তা পূরণ করে তাকে শ্রেণির উপযুক্ত করে নিতে ভিত জরিপ বিশেষ কার্যকর।

Scanned with CamScanner

এক নজরে চার ধরনের সামর্থ্য :

জ্ঞানমূলক সামর্থ্য	বোধমূলক সামর্থ্য	প্রয়োগমূলক সামর্থ্য	দক্ষতামূলক সামর্থ্য
➢ চিনতে পারা ➢ স্মরণ করতে পারা ➢ দেখাতে পারা ➢ সন ও তারিখ উল্লেখ করতে পারা ➢ শাসকের নাম বলতে পারা	➢ উদাহরণ দেওয়া ➢ পার্থক্য নির্ণয় করতে পারা ➢ তুলনা করতে পারা ➢ শ্রেণি বিন্যাস করতে পারা ➢ সম্পর্ক খুঁজে বের করা ➢ বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করা ➢ ভুল-ত্রুটি সনাক্ত করতে পারা	➢ যথার্থতা বিচার করতে পারা ➢ গুরুত্ব নির্ণয় করতে পারা ➢ প্রভাব বিশ্লেষণ করা ➢ সমস্যার সমাধান করতে পারা ➢ কার্যকারণ ব্যাখ্যা করতে পারা ➢ মূল্যায়ন করতে পারা	➢ তালিকা প্রস্তুত ➢ সময় তালিকা প্রস্তুত করা ➢ বংশতালিকা প্রস্তুত ➢ মানচিত্র অঙ্কন করে স্থান নির্দেশ

◆ **সামর্থ্য ভিত্তিক মূল্যায়নের বৈশিষ্ট্য :**

➢ সামর্থ্যভিত্তিক শিক্ষার লক্ষ্য হল কাঙ্ক্ষিত সামর্থ অর্জন এবং মূল্যায়ন হল এই সামর্থ্যের পরিমাপ।

➢ প্রশ্নপত্র রচিত হয় সামর্থ্য ভিত্তিক। দীর্ঘ রচনাধর্মী প্রশ্নের পরিবর্তে বস্তুনিষ্ঠ অতিসংক্ষিপ্ত, সংক্ষিপ্ত ও নির্দিষ্ট কয়েকটি বাক্যে রচনাধর্মী প্রশ্নের সুসংগত বিন্যাস ঘটানো হয় যাতে কাঙ্ক্ষিত সামর্থ্যের প্রতিফলন ঘটে।

➢ সামর্থ্যের মোটামুটি প্রাথমিক ভাগগুলি হল—জ্ঞানমূলক সামর্থ্য, বোধমূলক সামর্থ্য, প্রয়োগমূলক সামর্থ্য ও দক্ষতামূলক সামর্থ্য এবং সামর্থ্যগুলি একটি অপরটির উপর নির্ভরশীল।

➢ সামর্থ্যভিত্তিক মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সাফল্য অর্জনের সফলতা ও দুর্বলতা চিহ্নিত করা যায়। অর্থাৎ কাম্য সামর্থ্যের কতটা অর্জন করেছে এবং কতটা ঘাটতি আছে তা যাচাই করা যায়।

➢ সংশোধনী পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের দুর্বলতা বা ঘাটতি দূর করার ব্যবস্থার চেষ্টা করা হয়। অর্থাৎ পিছিয়ে থাকা শিক্ষার্থীদের উন্নতির ব্যবস্থা আছে।

➢ ঘাটতি পূরণের জন্য সংশোধনী পাঠের ব্যবস্থা করা হয় এবং সংশোধনী পাঠে সঙ্গী শিখনের উপর জোর দেওয়া হয়।

সামর্থ্য ভিত্তিক মূল্যায়নের সুবিধা :

➢ এটি সময় উপযোগী বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা।

➢ এই পদ্ধতি অনুসরণের ফলে বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার উল্লেখগোয্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

➢ শিক্ষার্থীরা আনন্দের সাথে পাঠে অংশগ্রহণ করে।

➢ সৃজনশীল ক্ষমতার বিকাশের সহায়ক।

➢ সকল শিক্ষার্থীকে কাঙ্ক্ষিত মানে উন্নীত করার চেষ্টা করা হয়।

➢ শিক্ষার্থীদের দুর্বলতা চিহ্নিত করে সংশোধনী পাঠের মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের উন্নতির সুযোগ আছে।

❑ ৫.২.৩ নিরবচ্ছিন্ন ও সার্বিক মূল্যায়ন (Continuous and Comprehensive Evaluation/CCE) :

শিক্ষণ-শিখন ব্যবস্থায় মূল্যায়ন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, সে-কথা আগেই আলোচনা করা হয়েছে। শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতিতে এই মূল্যায়ন কোনো বিচ্ছিন্ন বিষয় নয়। স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতবর্ষে এই নিয়ে বহু কমিশন পাঠক্রমের রূপরেখা তৈরি করতে গিয়ে শিক্ষার মানোন্নয়ন-এর কথা বলতে গিয়ে মূল্যায়ন প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। এই মূল্যায়ন শুধুমাত্র শিক্ষার্থীরাই নয়, মূল্যায়ন হতে পারে শিক্ষকের, হতে পারে পাঠক্রমেরও। একটি শিক্ষাবর্ষের শেষে এই মূল্যায়ন বিরাট চাপ সৃষ্টি করে শিক্ষার্থীদের উপরে তো বটেই এমনকি শিক্ষক এবং শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত সকলেরই। মূল্যায়নের চিন্তা তাই সবার।

মূল্যায়ন প্রসঙ্গে সাম্প্রতিককালে একটি ধারণা সম্প্রসারিত হচ্ছে তা হল 'নিরবচ্ছিন্ন ও সার্বিক মূল্যায়ন' বা 'Continuous and Comprehensive Evaluation সংক্ষেপে CCE। শিক্ষার অধিকার আইন, ২০০৯ তে বলা হয়েছে শিক্ষার্থী বিভিন্ন বিষয়ে তার ধারণা গঠনে সফল হয়েছে কি না এবং সে যতটুকু শিখতে পেরেছে তার ঠিক ঠিক প্রয়োগ করতে পারছে কি না-নিরবচ্ছিন্ন ও সার্বিক মূল্যায়ন এই বিষয়ে একটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করে।

'নিরবচ্ছিন্ন ও সার্বিক মূল্যায়ন' এই সমগ্র কথামালাটিতে দুটি বিষয়ে প্রতিফলিত হয়েছে—একটি হল নিরবচ্ছিন্ন (continuous) এবং অপরটি হল সার্বিক (comprehensive)। নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়নের সার কথা হল যে, মূল্যায়ন করা উচিত নিরবচ্ছিন্ন বা ধারাবাহিকভাবে। এটি শুধুমাত্র একটি সেমিস্টার বা ষান্মাসিক শিক্ষাবর্ষ বা academic session বা একটি কোর্স (Course) শেষ করার পর নয়। মূল্যায়ন হওয়া উচিত কোর্স চলাকালীন সমগ্র সময়ব্যাপী, যেমন—সারা সপ্তাহ ধরে, সারা মাস ধরে, তিনমাস ধরে অথবা একটি পাঠ-একক চলাকালীন, কিংবা একটি অধ্যায় শেষ হওয়ার পথে। এই নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন হয় অভ্যন্তরীণ মূল্য নির্ধারণ বা internal assessment-এর মাধ্যমে। শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীরা যখন উপরোক্তভাবে শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ায় এগিয়ে চলেন তখন স্বাভাবিকভাবেই সর্বোচ্চ মাত্রায় শিখনের সম্ভাবনা থাকে। সমগ্র শিক্ষাবর্ষটি (whole academic session) সঠিকভাবে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীরা তাতে সামিল হয়।

Scanned with CamScanner

আবার মূল্যায়নকে বলা হয়েছে সার্বিক বা সর্বাঙ্গীণ অর্থাৎ যা সর্বব্যাপক (comprehensive)। এর অর্থ হল—মূল্যায়নে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের সমস্ত দিকের বিকাশকে মূল্যায়িত করা উচিত, যেমন—শিক্ষাগত দিকের (Scholastic) এবং শিক্ষা বহির্ভূত বিষয়গুলি, প্রচলিত বা গতানুগতিক মূল্যায়ন ব্যবস্থায় যেগুলির উপর গুরুত্ব দেওয়া হত না এবং হয়ও না। গতানুগতিক মূল্যায়ন পদ্ধতি শুধুমাত্র শিক্ষার্থীর জ্ঞানমূলক ক্ষেত্রের (cognitive domain) গভীরতাকে মূল্যায়িত করে। সেখানে মানসিক ক্রিয়ার গতি সংক্রান্ত ক্ষেত্রের (psychomotor domain) মূল্যায়ন খুব সামান্য এবং অনুভূতিমূলক ক্ষেত্রে বা আবেগমূলক ক্ষেত্র সম্পূর্ণ অবহেলিত থাকে। কিন্তু সার্বিক মূল্যায়নে স্থান পায় শিক্ষার্থীর ব্যক্তিসত্তার সমগ্র দিকগুলি, যেমন—শিক্ষার্থীর আগ্রহ, মনোভাব, মূল্যবোধ, ব্যক্তিগত ও সামাজিক গুণাবলি, তার আবেগমূলক বা অনুভূতিমূলক ক্ষেত্রের বিভিন্ন দিকগুলি। কোনো সমস্যার সমাধানে শিক্ষার্থীর নিজের পরিবেশ এবং সমাজের নানা কর্মকাণ্ডে একক বা দলগত ভাবে সক্রিয় কি না, সচেষ্ট কি না এবং সক্ষম হচ্ছে কি না তার মূল্যায়ন করা হয়। শিক্ষার্থীর অনুসন্ধিৎসা, বিশ্লেষণী ক্ষমতা এবং সৃজনশীলতার প্রকাশ ঘটানোর জন্য উৎসাহদানের যে পরিসর থাকে সার্বিক বিকাশের ক্ষেত্রে সেগুলির মূল্যায়ন করা হয় সার্বিক মূল্যায়নের দ্বারা। একক বা সার্বিক মূল্যায়নে শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বা সর্বব্যাপক দিকগুলির মূল্যায়ন করা হয়। শিক্ষার্থীর ব্যক্তিসত্তার তিনটি দিকই—জ্ঞানমূলক ক্ষেত্র (cognitive domain), অনুভূতিমূলক ক্ষেত্র (affective domain) এবং মানসিক ক্রিয়ার গতি সংক্রান্ত ক্ষেত্র (psychomotor domain) সার্বিক মূল্যায়নে যথেষ্ট গুরুত্ব পায়।

নীচের রেখাচিত্রে নিরবচ্ছিন্ন এবং সার্বিক মূল্যায়নের একটি রূপরেখা (CCE মডেল হিসেবে) দেওয়া হল :

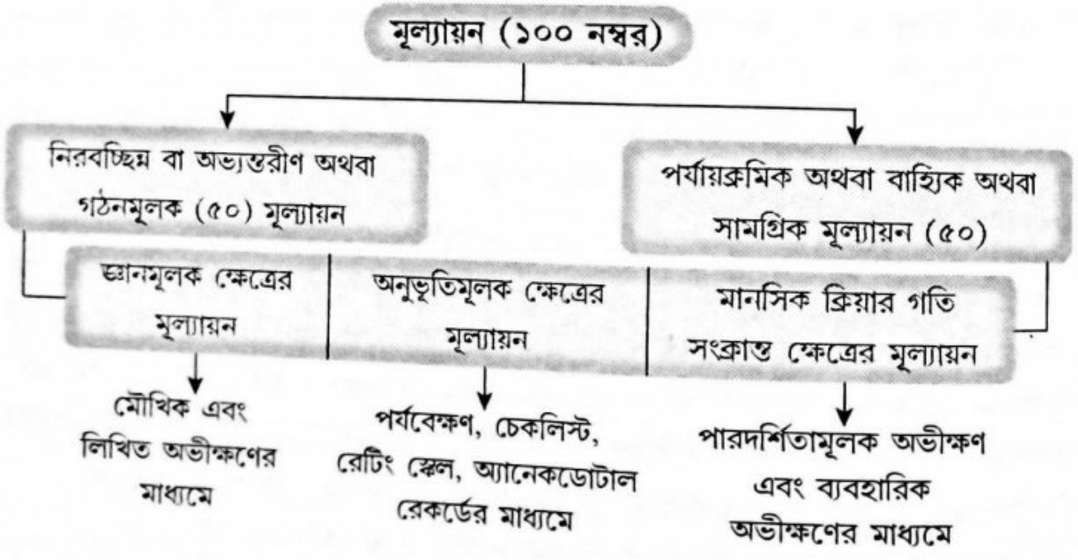

এন.সি.ই.আর.টি (NCERT)-এর মূল্যায়ন ইউনিটের প্রধান এবং প্রাক্তন অধ্যাপক **ড. এইচ. এস. শ্রীবাস্তব** (১৯৮৯) নিরবচ্ছিন্ন এবং সার্বিক মূল্যায়ন প্রসঙ্গে তাঁর লিখিত গ্রন্থে (comprehensive evaluation in schools) বিস্তারিত পরামর্শ ও তার বিবরণ দিয়েছেন।

সামগ্রিক পরিকল্পিত ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর কাম্য সার্বিক বিকাশের অগ্রগতি লক্ষ করতে হলে শিক্ষার্থীর আচার-আচরণের কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনের পরিমাপ-এর ধারণা পাওয়া দরকার যা সম্ভব নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়নের দ্বারা। এই ধরনের মূল্যায়নের পদ্ধতি বা কৌশল হবে প্রধানত শিক্ষার্থীর আচার-আচরণগত পরিবর্তনের পর্যবেক্ষণ, শিক্ষার্থীদের মৌখিক প্রশ্নকরণ, বিভিন্ন পরিবেশগত সমস্যার সম্পর্কে আলোচনা শোনা, পাঠক্রমিক এবং সহ-পাঠক্রমিক বিষয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের কর্মোদ্যম, নিষ্ঠা, আন্তরিকতা, দক্ষতা, যৌথ মানসিকতা লক্ষ করে সার্বিক মূল্যায়নের পথ প্রস্তুত করা। জ্ঞানমূলক ক্ষেত্রের লিখিত অভীক্ষণের মতো অনুভূতিমূলক এবং মানসিক ক্রিয়ার গতি সংক্রান্ত ক্ষেত্রের সামর্থ্য সমূহের যাচাইকরণের ফলাফল নিয়মিত নথিবদ্ধকরণের (রেকর্ড কার্ড) ব্যবস্থা থাকা দরকার। প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়নের রেকর্ড হবে মূলত তিনভাগে বিভক্ত—প্রথমভাগ (F_1), দ্বিতীয় ভাগ (F_2) এবং তৃতীয় ভাগ (F_3)। প্রথম ভাগটি (F_1) সম্পন্ন হবে শিক্ষাবর্ষের সূচনা থেকে প্রথম পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন (First summative evaluation) পর্যন্ত, দ্বিতীয় ভাগটি (F_2) হবে প্রথম পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন এবং দ্বিতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের মধ্যবর্তী সময়ে এবং তৃতীয় ভাগটি হবে দ্বিতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন এবং তৃতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের মধ্যবর্তী সময় জুড়ে। শিক্ষক/শিক্ষিকার পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করে রিপোর্ট কার্ডগুলি প্রস্তুত করবেন।

শিক্ষার্থীর কোনো বিশেষ কর্মদক্ষতার প্রতিফলন কীভাবে ঘটবে, সেই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, রিপোর্ট কার্ডের শ্রেণিভিত্তিক যে নমুনাগুলি দেওয়া হবে তার সঙ্গে বিদ্যালয়ের নাম, শিক্ষার্থীর নাম, শ্রেণি, শাখা এবং ক্রমিক সংখ্যা ইত্যাদি বিষয়গুলি যেখানে থাকবে সেখানে একটি পৃথক অংশে শিক্ষার্থীর কোনো বিশেষ দক্ষতার নথিবদ্ধকরণ ঘটতে পারে। শিক্ষক বা শিক্ষিকা যেভাবে নিয়মমাফিক গঠনমূলক বা প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়নের (যেমন $F_1/F_2/F_3$) জন্য নথিবদ্ধ করবেন তা ***পরের পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হল—***

Scanned with CamScanner

শিক্ষার্থী			অংশগ্রহণ			প্রশ্ন করা ও অনুসন্ধানে আগ্রহ			বাখ্যা ও প্রয়োগের সামর্থ্য			সহানুভূতি ও সহযোগিতা			নান্দনিকতা ও সৃজনশীলতার প্রকাশ		
ক্রমিক সংখ্যা	বিভাগ	নাম	F_1	F_2	F_3	F_1	F_2	F_3	F_1	F_2	F_3	F_1	F_2	F_3	F_1	F_2	F_3

বি: দ্র: F_1 = প্রথম প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন
F_2 = দ্বিতীয় প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন
F_3 = তৃতীয় প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন

পশ্চিমবঙ্গের মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ নিরবচ্ছিন্ন এবং সার্বিক মূল্যায়নের উপর জোর দিয়ে সারা শিক্ষাবর্ষ জুড়ে শিক্ষার্থীর বিকাশের ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণ এবং নথিবদ্ধকরণের উপর জোর দিয়েছে। এই ধরনের মূল্যায়নে প্রস্তুতিকালীন এবং পর্যায়ক্রমিক বা সামগ্রিক উভয় প্রকার মূল্যায়নই যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে।

প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন ঘটবে শ্রেণিকক্ষের ভিতরে এবং বাইরে। এই মূল্যায়নের জন্য পাঁচটি সূচক (Indicator)-এর কথা ভাবা হয়েছে। প্রতিটি সূচকে আবার কতকগুলি নির্দেশিকা ও পরিমাপক (Rubric) অন্তর্ভুক্ত থাকে। এই সমস্ত সূচকগুলি ব্যবহৃত হবে শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশের মাপকাঠি হিসেবে। জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা ২০০৫ এবং শিক্ষার অধিকার আইন-২০০৯ এবং সেই সঙ্গে নির্মিতিবাদ (Constructivist approach)-এর ভাবনা ও দর্শনকে মাথায় রেখেই এইসমস্ত বিষয়গুলি গুরুত্ব পেয়েছে। শ্রেণিকক্ষের ভিতরে এবং বাইরে এই সূচকগুলি শিক্ষক ব্যবহার করবেন। সূচকের সংখ্যা ধরা হয়েছে পাঁচটি। এক একটি সূচক শিক্ষার্থীর বিকাশের একাধিক ক্ষেত্রের সুনির্দিষ্ট প্রতিফলন ঘটাতে সক্ষম হবে। **সূচক এবং সূচকের অন্তর্ভুক্ত নির্দেশিকা ও পরিমাপকগুলিকে পরের পৃষ্ঠায় দেওয়া হল :**

Scanning Copyright By DASCoaching.in
Thank You
Visit Our Educational Website
Regularly For More Update:
https://www.dascoaching.in/
Contact Us On:
Facebook: fb/dascoaching.in
YouTube: DAS Coaching
Mail: mailto:contact.dascoaching@gmail.com
Follow on Dailyhunt Apps: DAS Coaching
Telegram: DAS Coaching

Scanned with CamScanner

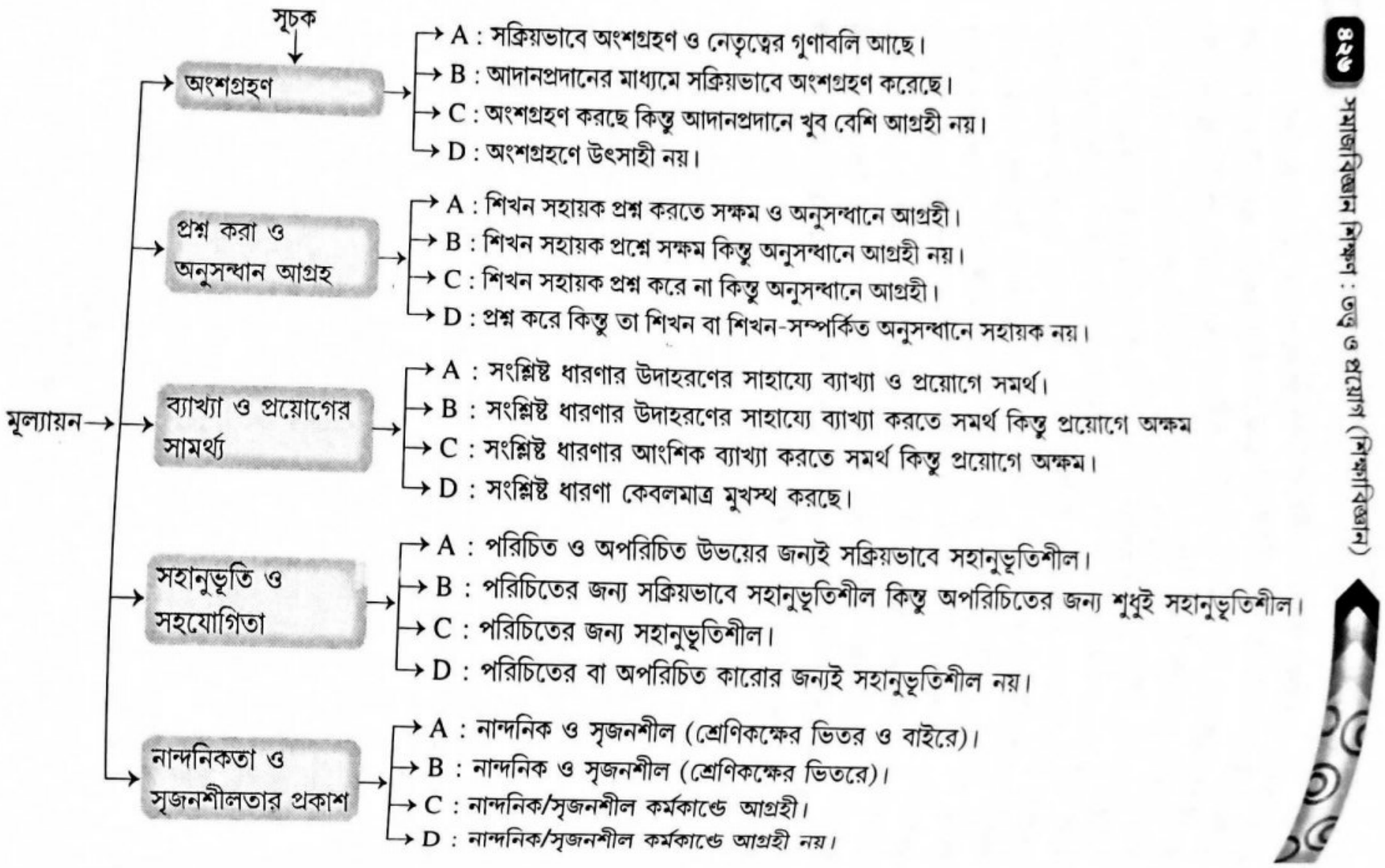

❑ ৫.২.৪ গঠনমূলক ও সমষ্টিগত মূল্যায়ন (Formative and Summative Evaluation) :

মূল্যায়নের প্রকৃতি অনুসারে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি মূল্যায়নকে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। **ব্লুমব্যাকের** মতানুসারে মূল্যায়নকে দু-ভাগে বিভক্ত করা যায়। আবার **গ্রোনল্যান্ড-এর** মতানুসারে মূল্যায়নকে নিম্নলিখিত ভাগে বিভক্ত করা যায় :

১। গঠনমূলক বা প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন (Formative Evaluation)
২। সমষ্টিগত বা সামগ্রিক মূল্যায়ন (Summative Evaluation)
৩। যথাস্থান নির্দেশক মূল্যায়ন (Placement Evaluation)
৪। দুর্বলতা নির্ণায়ক মূল্যায়ন (Diagnostic Evaluation)

মূল্যায়নের উপরোক্ত প্রকারগুলি নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল :

১। গঠনমূলক মূল্যায়ন (Formative Evaluation) :

শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম পরিচালনার সময় নিয়মিতভাবে যে মূল্যায়ন করা হয় তাকে গঠনমূলক মূল্যায়ন বা প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন বা চলমান মূল্যায়ন বলা হয়। এই গঠনমূলক মূল্যায়ন সাধারণত কোনো নির্দেশনামূলক কার্যক্রম চলাকালীন শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতা কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য পূরণে কতখানি অর্জিত হয়েছে তার মূল্য নির্ধারণ বা অ্যাসেসমেন্ট (assessment) করা হয়। এই ধরনের মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রবহমান নির্দেশনামূলক কর্মসূচি এবং উৎকর্ষতার প্রত্যাশিত অগ্রগতি ঘটছে কি না তা পরিমাপ করা হয়। দোষ-ত্রুটি দূর করে শিক্ষার্থী যাতে লক্ষ্য অর্জনের পথে পরিচালিত হতে পারে তার ব্যবস্থা করা হয় বলে এই মূল্যায়নকে গঠনমূলক মূল্যায়ন বলা হয়। গঠনগত মূল্যায়নের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে : "Formative evaluation is a method of judging the worth of a programme while the programme activities are forming or happening. Formative evaluation focuses on the process."

শ্রেণিকক্ষে নির্দেশনাদানকালে পাঠ্য-বিষয়বস্তুকে কতকগুলি ছোটো ছোটো অংশে ভাগ করে পরস্পরের সঙ্গে সঙ্গতি বজায় রেখে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়, যাতে শিক্ষার্থীরা সহজে নির্দেশনার বিষয়বস্তুকে উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়। এজন্য প্রতিটি অংশ পাঠদানকালে শিক্ষার্থীদের প্রশ্নকরণের মাধ্যমে পরীক্ষা নেওয়া হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই কাজ চলে মৌখিকভাবে। শিক্ষার্থীদের ত্রুটিবিচ্যুতি ও দুর্বলতাগুলি চিহ্নিত করে সেগুলি দূর করার জন্য প্রাসঙ্গিক সংশোধনমূলক শিক্ষণেরও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এর ফলে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীরা এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ লাভ করে। এই গঠনমূলক মূল্যায়নের সময় শিক্ষক নিজেও তাঁর অনুসৃত শিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল, শিক্ষণ সহায়ক উপকরণের নির্বাচন প্রসঙ্গে সচেতন থেকে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন এবং পরিমার্জন ঘটাতে সক্ষম হন। প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি

Scanned with CamScanner

শিক্ষার্থীর পাঠ্য-বিষয়বস্তুগত সঠিক ধারণা গঠন করাই হল শিক্ষকের মূল দায়িত্ব। শিক্ষার্থীদের সঠিক ধারণা গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রতিবার্তা বা feedback বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিকতা পায়। এই ধরনের গঠনগত মূল্যায়ন সংগঠিত করার জন্য নিম্নলিখিত কৌশল অবলম্বন করা হয় এবং **নীচের উপকরণগুলি ব্যবহার করা হয় :**

১। শ্রেণিকক্ষে নির্দেশনা চলাকালীন প্রশ্ন করা।

২। নির্দেশনার শেষ পর্যায়ে প্রশ্ন করা।

৩। শ্রেণিকক্ষে ক্যুইজ, বিতর্কসভার ব্যবস্থা করা।

৪। শ্রেণিকক্ষে নিয়মিত পর্যবেক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষা নেওয়া।

৫। প্রত্যহ গৃহকাজ প্রদানের ব্যবস্থা করা।

৬। সপ্তাহে সপ্তাহে পরীক্ষা নেওয়া ইত্যাদি।

এইভাবে গঠনমূলক মূল্যায়ন সম্পাদনের উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়, শিক্ষককে শিক্ষার্থীদের শিখনের মাত্রা এবং তাদের উন্নতি সম্বন্ধে নির্দিষ্ট কতকগুলি তথ্য সংগ্রহ করা; এই তথ্যের ভিত্তিতে শিক্ষক, শিক্ষার্থী উভয়েরই সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিমার্জন ঘটে। এইভাবে নিয়ম করে ধারাবাহিকতা বজায় রেখে স্বল্প ব্যবধানে তথ্য সংগ্রহের কাজ চলতে থাকে।

গঠনগত মূল্যায়নে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর সংগৃহীত তথ্যাবলি থেকে পাওয়া যায়। সেগুলি হল—

১। কোনো বিশেষ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের পূর্ব নির্ধারিত শিখন উদ্দেশ্যের প্রেক্ষিতে শিখন সম্পন্ন হচ্ছে কি না।

২। শিক্ষার্থীদের বৌদ্ধিক ক্ষেত্রের গঠন এবং পুনর্গঠন সংঘটিত হচ্ছে কি না।

৩। শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিত্ব গঠনে সহায়ক পাঠ্য-বিষয়সংক্রান্ত ক্ষমতা (scholastic ability) এবং পাঠ্য-বিষয়বহির্ভূত ক্ষমতাগুলির (Non scholastic ability) সঠিকভাবে গঠন সম্পন্ন হচ্ছে কি না।

৪। শিক্ষাবিজ্ঞান বিষয়টির শিক্ষণের উদ্দেশ্য ঠিকভাবে অর্জিত হচ্ছে কি না।

৫। পূর্ব নির্ধারিত পাঠ্যক্রমের উদ্দেশ্য অনুসারে শিক্ষার্থীদের শিখনের কাজ পরিচালিত হচ্ছে কি না।

৬। শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশের পথে সন্তোষজনকভাবে অগ্রগতি ঘটাতে পারছে কি না ইত্যাদি।

২। সমষ্টিগত মূল্যায়ন বা সামগ্রিক মূল্যায়ন (Summative Evaluation) :

যখন কোনো কর্মসূচি বাস্তবায়নের সমাপ্তিতে সামগ্রিক ফলাফল, প্রভাব এবং অর্জিত উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যমাত্রা নির্ণয়ের জন্য মূল্যায়ন করা হয় তখন সেই মূল্যায়নকে বলা হয় সমষ্টিগত মূল্যায়ন বা সামগ্রিক মূল্যায়ন। সমষ্টিগত মূল্যায়নের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা

হয়েছে "Summative evaluation is a method of judging the worth of a programme at the end of the programme activities. The focus is on the outcome."

এই ধরনের মূল্যায়ন ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা বা কর্ম-পরিকল্পনা নির্ধারণ এবং উন্নততর কার্যক্রম গ্রহণের ক্ষেত্রে পথ নির্দেশ করতে সহায়তা করে। এই সামগ্রিক মূল্যায়নের মাধ্যমে একটি কর্মসূচির সংশ্লিষ্ট সমস্ত তথ্য যোগ করে একটি সমষ্টিগত বা সামগ্রিক চিত্র পাওয়া সম্ভব হয়। একটি নির্দিষ্ট সময়-পরিসরের পর কর্মসূচিটির মূল্যায়ন করা হয়, তাই এই ধরনের মূল্যায়নকে অনেকে প্রান্তিক মূল্যায়ন বা পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নও বলে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে একটি নির্দিষ্ট সময়ের শেষে শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতা পরিমাপের ক্ষেত্রে এই ধরনের মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়। সাধারণত বার্ষিক অভীক্ষা, বোর্ড পরিচালিত পরীক্ষাগুলিকে সমষ্টিগত মূল্যায়ন হিসেবে ধরা হলেও ত্রৈমাসিক বা ষান্মাসিক পরীক্ষাকেও সমষ্টিগত মূল্যায়নের অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

কোনো একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে বা সময় পরিসরে শিক্ষার্থী যখন পাঠ্যসূচির অন্তর্গত বিশেষ একটি বা একাধিক অধ্যায় সংবলিত পাঠ্যাংশের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে পরিচিত হয়ে ওঠে তখনই সমষ্টিগত মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়। সমষ্টিগত মূল্যায়নের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের শিক্ষার পরবর্তী স্তরে বা শ্রেণিতে উত্তীর্ণ করা হয়, পারদর্শিতার ভিত্তিতে গ্রেড বা স্তর চিহ্নিত করা হয়, মেধাগত অবস্থান ও তালিকা নির্ণয় করা হয়, সবশেষে প্রাতিষ্ঠানিক তথা সামাজিক স্বীকৃতিস্বরূপ পারদর্শিতাসূচক শংসাপত্র প্রদানের কাজও করা হয়।

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে সমষ্টিগত মূল্যায়নের বৈশিষ্ট্য হিসেবে নিম্নলিখিত দিকগুলি উল্লেখ করা যেতে পারে :

১। সমষ্টিগত মূল্যায়ন শিক্ষার্থীদের কোনো একটি শ্রেণির বা পাঠ্যসূচির অন্তর্গত কোনো অংশবিশেষের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত অগ্রগতিকে চিহ্নিত বা নির্দেশ করে।

২। শিক্ষা নির্দেশনা চলাকালীন ঘন ঘন গঠনমূল্যায়ন-এর মতো এই সমষ্টিগত মূল্যায়ন করা হয় না। একটি কম বা বেশি দীর্ঘ সময়-পরিসরের শেষে সংঘটিত হয়।

৩। অন্তর্মূল্যায়ন এবং বহির্মূল্যায়ন উভয় প্রকারই এই সমষ্টিগত মূল্যায়নের অন্তর্ভুক্ত।

৪। সমষ্টিগত মূল্যায়নে কখনোই মুখস্থবিদ্যাকে প্রশ্রয় না দিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অর্জিত জ্ঞানের ধারণক্ষমতার (retention level) বৃদ্ধির দিক খেয়াল রাখতে হয়।

৫। সমষ্টিগত মূল্যায়ন শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারদর্শিতার তুলনা, মেধাগত অবস্থানের তালিকা প্রস্তুত, শিক্ষার্থীদের অর্জিত জ্ঞান ও অধীত ধারণার সর্বশেষ অবস্থা, শিক্ষার্থীদের শিক্ষার পরবর্তী উচ্চতর স্তর বা শ্রেণিতে উত্তীর্ণ বা অনুত্তীর্ণকরণ এবং পুরস্কার প্রদান তথা ডিগ্রি ও ডিপ্লোমাসূচক (সামাজিক স্বীকৃতি হিসেবে) শংসাপত্র প্রদানে সহায়তা করে থাকে।

Scanned with CamScanner

○ গঠনমূলক মূল্যায়ন এবং সমষ্টিগত মূল্যায়নের মধ্যে পার্থক্য (Difference between Formative Evaluation and Summative Evaluation) :

গঠনমূলক মূল্যায়ন	সমষ্টিগত মূল্যায়ন
১। পূর্বনির্ধারিত পাঠ্যসূচির অন্তর্গত পাঠ্যবিষয়বস্তুর ছোটো ছোটো অংশ শিখনের স্বল্প-পরিসর সময়ের পর শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতার মাত্রা যাচাই করা হয়।	১। পূর্বনির্ধারিত পাঠ্যসূচির অন্তর্গত পাঠ্যবিষয়বস্তুর বড়ো অংশ জুড়ে শিখনের দীর্ঘকালীন সময়ের পর পাঠ্যবিষয় বস্তুর সামগ্রিক পারদর্শিতা যাচাই করা হয়।
২। শ্রেণিকক্ষে নির্দেশনা চলাকালীন সময়ে বা শিক্ষণ-শিখন কার্য পরিচালনার সময় ক্ষুদ্র পরিসরে পাঠ্যাংশের উপর শিক্ষার্থীর অগ্রগতি যাচাই করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। অর্থাৎ এটি সংকীর্ণ কর্মপরিধি বিশিষ্ট।	২। শ্রেণিকক্ষের নির্দেশনার ভিত্তিতে দীর্ঘ সময়-পরিসরের পর একটি পর্যায়ের প্রান্তে অথবা সমগ্র শিক্ষাবর্ষের শেষে এই ধরনের মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়। সুতরাং এটি বিস্তৃত কর্মপরিধিবিশিষ্ট।
৩। পাঠদানের সময়কালে নিয়মিতভাবে এই মূল্যায়ন করা হয়।	৩। এই মূল্যায়ন করা হয় পাঠদানের শেষে অথবা কোর্স শেষে অথবা সমগ্র কর্মসূচির শেষ প্রান্তে।
৪। গঠনগত মূল্যায়নের পদ্ধতি হল পর্যবেক্ষণ, প্রশ্নকরণ, দৈনিক গৃহকাজ প্রদান, ক্যুইজ পরিচালনা ইত্যাদি।	৪। এই ধরনের মূল্যায়নের পদ্ধতি হল অভীক্ষা গ্রহণ, প্রোজেক্ট সম্পাদন ও পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি।
৫। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর উভয়ের ভূমিকায় ধারাবাহিক প্রতিবার্তা feedback-এর ব্যবস্থা থাকে।	৫। এই ধরনের মূল্যায়নে কোনোরকম প্রতিবার্তা বা feedback-এর ব্যবস্থা থাকে না।
৬। গঠনগত মূল্যায়নের দ্বারা শিক্ষার্থীদের পাঠ্য-বিষয়বস্তুর উপর জ্ঞানলাভ এবং ধারণা গঠনের ক্ষেত্রে অসুবিধা ও দুর্বলতাগুলি চিহ্নিত করে সংশোধন-মূলক শিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় এবং শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতাতে উন্নতিসাধন করার চেষ্টা হয়।	৬। পাঠ্য-বিষয়বস্তুর সামগ্রিক জ্ঞানার্জন এবং ধারণা গঠনের ক্ষেত্রে পারদর্শিতা যাচাই করে শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক উন্নতির সার্বিক চিত্র তুলে ধরে শিক্ষার্থীদের শ্রেণিবিন্যস্ত করা, গ্রেডের ব্যবস্থা করা, মেধাভিত্তিক অবস্থান নির্ণয় ও শংসাপত্র প্রদানের চেষ্টা করা।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, গঠনমূলক মূল্যায়ন এবং সমষ্টিগত মূল্যায়নের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য থাকলেও এই দুটি মূল্যায়ন ব্যবস্থা একে অন্যের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে। গঠনমূলক মূল্যায়ন প্রধানত শিক্ষার্থীদের দুর্বলতা নির্ণায়ক বা diagnostic

প্রকৃতির এবং সমষ্টিগত মূল্যায়ন হল বিচারকরণ বা মূল্য নিরূপণ বা judgemental প্রকৃতির। এজন্য এই দুই ধরনের মূল্যায়নে প্রাপ্ত গ্রেড বা নম্বরকে যোগের মাধ্যমে একত্র করা সমীচীন নয় এবং তা অবৈজ্ঞানিকও বটে। শিক্ষার্থীদের রিপোর্টকার্ডে সেইকারণে গঠনমূলক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র নম্বর এবং সমষ্টিগত মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নম্বর ও গ্রেড উভয়েরই প্রতিফলন ঘটবে বা উল্লেখ থাকবে।

□ ৫.২.৫ নির্ণায়ক ও প্রতিকারধর্মী মূল্যায়ন (Diagnos and Remediation) :

ইতিহাস শ্রেণিকক্ষে সকল শিক্ষার্থী যেমন সম মানের হয় না তেমনি সকল শিক্ষক সকল বিষয় সমান সমান দক্ষতার সঙ্গে শিক্ষাদান করতে পারেন না। শিক্ষার্থীর জন্মগত বা অর্থ সামাজিক পরিবেশগত কারণে অনেক সময় শিক্ষার্থী পাঠে মনোনিবেশ করতে পারে না। আবার অনেক সময় পূর্ণাঙ্গ বিষয় স্বচ্ছতার সঙ্গে বুঝতে পারে না। শিক্ষকের শিক্ষাদান প্রক্রিয়ার ত্রুটিজনিত কারণেও অনেক সময় বিষয়ের বোধগম্যতা আসে না। অনেক সময় ইতিহাসের যে সমস্ত কর্মচর্চা করা হয় সেগুলি শিক্ষার্থীরা ভয়ের কারণে বা জড়তার কারণে যথাযথ ভাবে বুঝতে পারে না। যেভাবেই হোক না কেন যখন বিষয়বস্তুর অস্বচ্ছতা যুক্তকরণে বা ত্রুটি যুক্ত করণে শিক্ষক পুনরায় শিক্ষাদানের যে নীতিগ্রহণ করেন তাকে Remedial Teaching বলে। মনে রাখতে হবে Remedial Teaching সব শিক্ষার্থীর সবসময় সব বিষয়ে দরকার পর্যন্ত হতে পারে। অনেক সময় সাধারণ বা উচ্চমানের (বুদ্ধ্যঙ্কের পরিপ্রেক্ষিতে) শিক্ষার্থীরাও কোনো বিশেষ বিষয় বুঝতে ব্যর্থ হয়। অর্থাৎ একই ধরনের দুর্বল শিক্ষার্থীদের বিষয়ভিত্তিক পুনঃশিক্ষাদান প্রয়োজন।

◆ সংশোধনমূলক শিক্ষণের জন্য দুর্বল শিক্ষার্থী চিহ্নিতকরণ (Identification and Diagnosis of backword learners for remedial teaching) : কোনো বিশেষ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মধ্যে থেকে প্রথমেই দুর্বল বা সংশোধনযোগ্য শিশুদের নির্বাচন করতে হবে। সাধারণত যে ধরনের Test-এর মাধ্যমে এই নির্বাচন করা হয় সেগুলি হল Pre-test নামে পরিচিত। বিশেষ বিষয়ের উপর diagnostic Test বা Attainment test দ্বারা নির্দিষ্ট নম্বরের ভিত্তিতে পশ্চাৎপদ শিক্ষার্থীদের বেছে নিতে হয়। ধরা যাক, দশম শ্রেণির 'ফ্যাসিবাদ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ' নামক কোনো Chapter-এ ১৩০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ২০-৩০ জন ৩০ নম্বরের মধ্যে ১০-এর নীচে পেয়েছে। ওই শিক্ষার্থীদের জন্য পৃথক বিশেষ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে। পাশাপাশি বিভিন্ন Psychological Test-এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর IQ বিশেষ আগ্রহ ইত্যাদি পরিমাপ করা যেতে পারে। এছাড়া শিক্ষার্থীর গৃহ পরিবেশগত আর্থ-সামাজিক অবস্থাও বিচার করতে হবে। বিদ্যালয় পরিবেশের ত্রুটি, শিক্ষকের পাঠদান সংক্রান্ত ত্রুটি থাকলে তাও বিবেচনা করতে হবে।

Scanned with CamScanner

● **সংশোধনমূলক শিক্ষণ** (Remedial Teaching) : Diagnostic Test মাধ্যমে বিষয়ভিত্তিক দুর্বল শিক্ষার্থীদের নির্বাচিত করার পরে তাদের সমস্যার নিরিখে পুনঃশিক্ষণ পরিকল্পনা করতে হয়। যে ক্ষেত্রে ইতিহাস শিক্ষক প্রয়োজনীয় আরো অনেক বেশি পরিমাণে। শিক্ষা সহায়ক উপকরণ ব্যবহার করে বিষয়বস্তু খুব সহজ ও সরল ভাষায় পুনরায় শিক্ষণ কার্যে ব্রতী হবেন। Interactive approach ও শিক্ষার্থীর বিশেষ চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের সমস্যায় সমাধান করবেন। প্রয়োজনে তিনি Self Instructional Material তৈরি করে ওই ধরনের শিক্ষার্থীদের পড়তে উৎসাহিত করবেন। সাধারণত পুনঃশিক্ষণে অনেক সময় শিক্ষক বিরক্তবোধ করেন। কিন্তু Remedial Teaching-এর প্রধান উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীদের বিশেষ বিশেষ বিষয়ভিত্তিক ত্রুটিগুলি মোচন করা এবং শিখনে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।

পুনঃশিক্ষণের পরবর্তী কার্যাবলি (Post Teaching Activities in Remedial Teaching) : পুনঃশিক্ষণ পরবর্তী পর্যায়ে শিক্ষার্থী কাঙ্ক্ষিত আচরণ রপ্ত করতে পারল কিনা তার জন্য পুনরায় একটি Test করা প্রয়োজন। এই Post test-এর মাধ্যমে পুনরায় শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা পরিমাপ করা হয়। যেসব শিক্ষার্থীর সমস্যা সমাধান হল না তাদের পুনরায় নির্বাচিত করে পূর্বের মতই আবার শিক্ষাদান করতে হয়। তবে সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর গৃহ পরিবেশ ও বিদ্যালয়ের অন্যান্য সমস্যায় কথা মাথায় রেখে সেগুলির সমাধানও প্রয়োজন। ইতিহাস শিক্ষণে remedial Teaching অত্যন্ত প্রয়োজন, কারণ ইতিহাসের ঘটনা অবিচ্ছেদ্য নয়। সময়ের নিরিখে ধারাবাহিক ঘটনা-প্রবাহ জনিতে বিশেষ কোনো একটি ঘটনা অজানা থাকলে পূর্ণাঙ্গ ঘটনার ধারণা গঠনে স্বচ্ছতা আসে না।

❑ **৫.২.৬ আদর্শমান ভিত্তিক অভীক্ষা এবং কৃতিত্ব ভিত্তিক অভীক্ষা** (Norm-reference test and Criterion reference test):

অভীক্ষণ (Test) : শিক্ষণ-শিখন কার্যাবলির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর যে শিখন অভিজ্ঞতা অর্জিত হয় তার গুণগত মান নিরূপণের জন্য শিক্ষক যে সমস্ত অভীক্ষা ব্যবহার করেন সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল নর্ম-ভিত্তিক অভীক্ষা (Norm-Reference Test সংক্ষেপে NRT) এবং নির্ণায়ক ভিত্তিক অভীক্ষা (Criterion Reference Test সংক্ষেপে CRT)। নীচে এই দুটি অভীক্ষা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল :

১। নর্ম-ভিত্তিক অভীক্ষা (Norm-reference Test) :

কোনো অভীক্ষায় শিক্ষার্থীদের প্রাপ্ত নম্বরগুলিকে তাৎপর্যপূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করার একটি উপায় হল কোনো বিশেষ শিক্ষার্থীর নম্বরকে অন্যান্য শিক্ষার্থীদের প্রাপ্ত নম্বরের সঙ্গে বা দলের সঙ্গে তুলনা করা। প্রকৃত পক্ষে এটি হল একটি প্রতিযোগিতামূলক মূল্যায়নের দৃষ্টিভঙ্গি,

যেখানে কোনো শিক্ষার্থীর পারদর্শিতাকে অন্যান্য শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতার সঙ্গে তুলনাকারী সম্পর্ক নির্দেশ করে এবং সেই অনুসারে তথ্য প্রদান করে। বিশেষ শিক্ষার্থীটি পাঠ্য-বিষয়বস্তুর উপর কতখানি পারদর্শিতা অর্জন করতে পেরেছে বা পূর্ব নির্ধারিত উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে তার পারদর্শিতা কতখানি অর্জিত হয়েছে তার বিচার করা হয় না। দলের একটি নম্বরকে নর্ম বা সাধারণ মান ধরে তুলনা করা হয়। নর্ম বলতে বোঝায় কোনো একজন শিক্ষার্থীর দলের মধ্যে তার তুলনামূলক অবস্থান। এই প্রসঙ্গে **Gronlund** (1985) বলেছেন : "NRTs are constructed with a view to determine. The serial position of an individual in his group so as to help expression of that position in descriptive languages like high, low or avarage." সুতরাং NRT-এর প্রধান উদ্দেশ্যই হল কোনো পূর্ব নির্ধারিত মানদণ্ড ব্যবহার না করে কোনো শিক্ষার্থীর তার দলের মধ্যে নির্দিষ্ট অবস্থানকে চিহ্নিতকরণ। কিন্তু এই চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে যে নর্ম (norm) ব্যবহার করা হয়, তা স্থির করা হয় বিভিন্নভাবে—কখনো দলের সমস্ত শিক্ষার্থীদের প্রাপ্ত নম্বরের গড়কে, কখনো অভীক্ষার পূর্ণমানকে। প্রকৃতপক্ষে এই নির্দিষ্ট নর্ম (norm) স্থির করা বেশ জটিল এবং ব্যাপক প্রক্রিয়া বিশেষ।

এই ধরনের মূল্যায়নের ফলাফলকে ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের দলে নিজেদের অবস্থান বা rank যেমন প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদি চিহ্নিত করা হয় অথবা তাদের গ্রেড বা স্তর নির্দেশ করা হয়। আঞ্চলিক অথবা জাতীয় স্তরে শিক্ষার্থীদের এইভাবে পারদর্শিতাকে দেখানো হয়। বিভিন্ন কোর্সে প্রবেশ পরীক্ষায় অথবা কর্মক্ষেত্রের পদোন্নতিতে এই ধরনের মূল্যায়নের ব্যবস্থা থাকে।

আমাদের শ্রেণিকক্ষের সমস্তরকম পরীক্ষা, সব রকমের public examination এবং আদর্শায়িত অভীক্ষাগুলি নর্ম রেফারেন্স মূল্যায়নের কাজে ব্যবহৃত হয়। যখন কোনো শ্রেণিতে প্রশ্ন করা হয়—কে সবচেয়ে ভালো ছাত্র? কে প্রথম হয়েছে? কে সবচেয়ে কম নম্বর পেয়েছে? তখন সেই প্রশ্নের উত্তরগুলি দিতে গিয়ে নর্ম-ভিত্তিক মূল্যায়ন করা হয় এবং আমরা ব্যক্তির পারদর্শিতাকে দলের অন্যান্যদের পারদর্শিতার ভিত্তিতে তুলনা করি।

২। নির্ণায়ক ভিত্তিক অভীক্ষা (Criterion Reference Test) :

মূল্যায়নের ক্ষেত্রে কোনো অভীক্ষায় প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের নম্বরগুলিকে তাৎপর্যপূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করার দ্বিতীয় আর একটি উপায় হল কোনো নির্ণায়ক (criterion) কে স্থির করে তার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীদের প্রাপ্ত নম্বরের তুলনা করা। এই পদ্ধতিকে বলা হয় criterion referencing। অধ্যাপক **রবার্ট গ্লেসার** (Robert Glasser) এই ব্যাপারে প্রথম আলোকপাত করেন। তাঁর বক্তব্য ছিল গতানুগতিক Norm Reference পরিমাপের সাহায্যে কোনো একজন শিক্ষার্থীর অন্য শিক্ষার্থীদের তুলনায় আপেক্ষিক অবস্থান জানা সম্ভব হলেও, শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক গুণগত মান যাচাই করা সম্ভব নয় কিন্তু সেক্ষেত্রে

Scanned with CamScanner

Criterion Reference Test-এর মাধ্যমে ওই নির্দিষ্ট শিক্ষার্থীটির পারদর্শিতার সামগ্রিক গুণগত মান যাচাই করা সম্ভব। Criterion Reference Test-এ পারদর্শিতার একটি পূর্ণ নির্ধারিত মাস থাকে এবং এর ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার সামগ্রিক অবস্থা জানা যায়। এই প্রসঙ্গে Nitko-এর বক্তব্যকে স্মরণ করা যেতে পারে : "Criterion referenced test is one that is deliberately constructed to yield measurements that are directly interpretable in terms of specified performance standard."

Popham এবং **Husek** (1969)-এর সংজ্ঞাটিও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। তাঁরা বলেছেন : "A CRT is one that is used to determine the level of success of learner."

CRT-এর উপযোগিতা (Utility of CRT) :

এই ধরনের অভীক্ষার উপযোগিতামূলক দিকগুলি হল :

১। নির্দেশনামূলক উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে কোন্ কোন্ গুলি শিক্ষার্থীর পক্ষে অর্জন করা সম্ভব হয়নি সেগুলি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে CRT গুলি কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে। শিক্ষক তখন সেই উদ্দেশ্যগুলি অর্জন করার ব্যাপারে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

২। পাঠ্য-বিষয়বস্তুর উপস্থাপন তথা শিক্ষণপদ্ধতি ও কৌশল-এর প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, পরিমার্জন ও সংশোধন করার সুযোগ ঘটে এই অভীক্ষার সাহায্যে। শিক্ষণপ্রদীপন ব্যবহারেও শিক্ষক উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেন।

৩। শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক অগ্রগতির পরিচায়ক রিপোর্ট দেওয়ার ক্ষেত্রে CRT অত্যন্ত উপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ করে দেয়।

৪। শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতার সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরার সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণিতে অন্যান্যদের সাপেক্ষে মেধার অবস্থানগত পরিচয়ও প্রদান করার ক্ষেত্রে আলোকপাত করে।

This E-Book Download From>>

www.ebook.dascoaching.in

- **নর্ম-ভিত্তিক অভীক্ষা ও নির্ণায়কভিত্তিক অভীক্ষার মধ্যে পার্থক্য (Difference between NRT and CRT) :**

নর্ম-ভিত্তিক অভীক্ষা বা আদর্শমান প্রাসঙ্গিক অভীক্ষা (Norm-Referenced Test/NRT)	নির্ণায়কভিত্তিক অভীক্ষা বা বিচারবিধি প্রাসঙ্গিক অভীক্ষা (Criterion Referenced Test/CRT)
১। শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতা পরিমাপ করে শ্রেণির অন্যান্য শিক্ষার্থীদের সঙ্গে তুলনা করাই হল উদ্দেশ্য।	১। পূর্বনির্ধারিত মানদণ্ডের সাহায্যে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার মান স্থির করে সামগ্রিক বিকাশের চিত্র তুলে ধরাই হল উদ্দেশ্য।
২। অভীক্ষার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় পাঠ্যবিষয়-বস্তুর সাধারণ বিবরণ অনুসারে।	২। নির্দেশনামূলক উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীদের কাঙ্ক্ষিত আচরণগুলিকে চিহ্নিত করে সেই অনুসারে অভীক্ষার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।
৩। পদের কাঠিন্যমাত্রা সাধারণত ০.৩ থেকে ০.৭-এর মধ্যে থাকে।	৩। কাঠিন্যমাত্রা শিখনকাজের প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল।
৪। পদের কাঠিন্যমাত্রা এবং বিভেদমাত্রা অনুসারে পদ নির্বাচন করা হয়।	৪। শিক্ষণ শিখনের উদ্দেশ্য অভীক্ষা পদগুলিতে কতখানি অনুসরণ করা হয়েছে সেই বিচার কাজ করে।
৫। অভীক্ষায় সাধারণত গড় ও বিচ্যুতির মান অনুসারে ফলাফলের বিশ্লেষণ করা হয়।	৫। পূর্ব নির্ধারিত মানের ভিত্তিতে অভীক্ষার্থী বা শিক্ষার্থীদের অবস্থান নির্ণয় করা হয়।
৬। প্রাপ্ত মূল নম্বর, শতাংশ নম্বর, আদর্শ নম্বর ইত্যাদির সাহায্যে ফলাফল প্রকাশ করা হয়।	৬। সঠিক উত্তর পদের সংখ্যা ইত্যাদির সাহায্যে ফলাফল প্রকাশ করা হয়।
৭। একটি শ্রেণি বা দলের মধ্যে শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক অবস্থান নির্ণয়ে এর ব্যবহার দেখা যায়।	৭। পূর্বনির্ধারিত মানদণ্ডের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর অবস্থান নির্ণয়ে শিক্ষার্থীদের নিজস্ব ক্ষমতা ও দুর্বলতা নির্ণয়ে ব্যবহার করা হয়।

❑ ৫.২.৭ পারদর্শিতার অভীক্ষা গঠন (Construction of Achievement Test) :

শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের জন্য যেসমস্ত পরিমাপক কৌশলগুলি ব্যবহার করা হয় সেই পরিমাপক কৌশলগুলিকে বলা হয় অভীক্ষা। এইসমস্ত অভীক্ষাগুলির মধ্যে যেগুলি কোনো শিক্ষার্থীর বিশেষ কোনো কর্ম-সম্পাদনের দক্ষতাকে পরিমাপ করে সেগুলিকে বলা হয় পারদর্শিতার অভীক্ষা। শিক্ষার্থীর অর্জিত কোনো বৈশিষ্ট্য পরিমাপের ক্ষেত্রে পারদর্শিতার

Scanned with CamScanner

অভীক্ষাগুলি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সুতরাং পারদর্শিতার অভীক্ষা হল এমন এক ধরনের অভীক্ষা যা কোনো শিক্ষার্থীর শিখনকালের মধ্যে অর্জিত দক্ষতাকে পরিমাপ করতে সাহায্য করে। বিদ্যালয় পরিস্থিতিতে কোনো একটি বিশেষ বিষয়ে পারদর্শিতার অভীক্ষা শিক্ষার্থীর শিখনের প্রকৃতি ও মাত্রাকে পরিমাপ করার জন্য পরিমাপক কৌশল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। একজন শিক্ষার্থী তার শিখনকালের নির্ধারিত সময়ে কতটুকু শিখন অভিজ্ঞতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে তার পরিমাপ করা হয় এই পারদর্শিতার অভীক্ষার দ্বারা।

পারদর্শিতার অভীক্ষার বিভিন্ন ভাগগুলি নীচে ছকের সাহায্যে দেখানো হল :

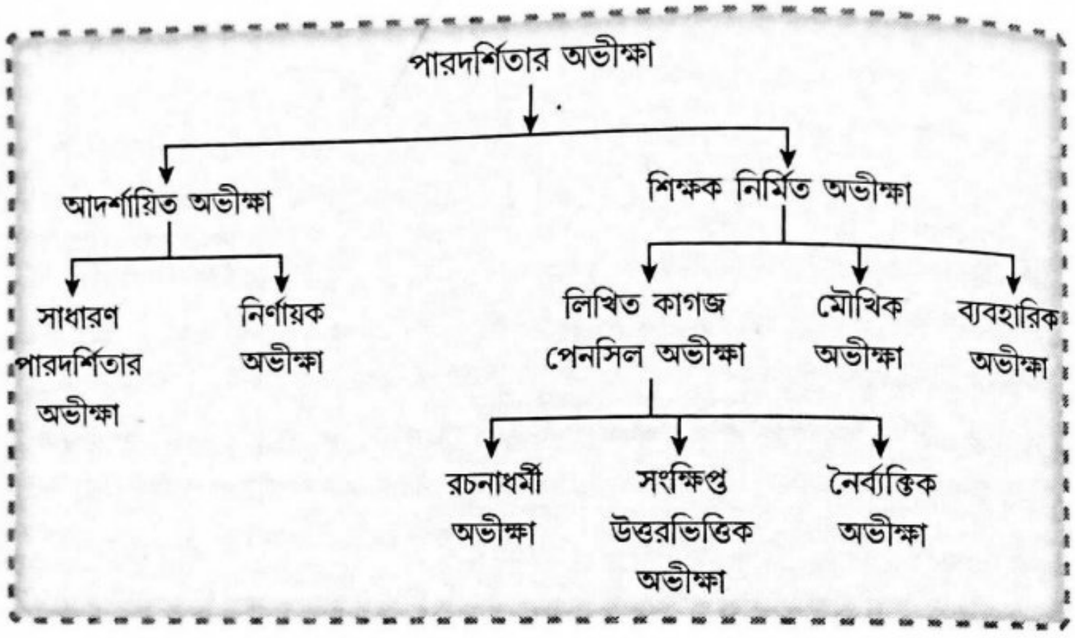

○ সু-অভীক্ষার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Good Test) :

পরিমাপক যন্ত্র হিসেবে যে অভীক্ষা ত্রুটিহীন সেই অভীক্ষাই হল সু-অভীক্ষা অর্থাৎ একটি ভালো অভীক্ষার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল ত্রুটিহীনতা। সাধারণত যেসমস্ত ত্রুটিগুলি দেখা যায় সেগুলি হল—পবির্তনশীল ত্রুটি, স্থায়ী ত্রুটি, ব্যক্তিগত ত্রুটি এবং সংব্যাখ্যানমূলক ত্রুটি। একটি সু-অভীক্ষা অবশ্যই এইসমস্ত ত্রুটি থেকে মুক্ত থাকবে। ত্রুটিমুক্ত এই ধরনের সু-অভীক্ষার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হল নিম্নরূপ—

১। **নৈর্ব্যক্তিকতা** (Objectivity) :

কোনো একটি অভীক্ষার গঠন, প্রয়োগ এবং নম্বরদানের ক্ষেত্রকে যখন অভীক্ষা কোনোভাবে প্রভাবিত করেনা, তখন সেই অভীক্ষার নৈর্ব্যক্তিকতা বৈশিষ্ট্য আছে বলে ধরা হয়। কোনো একটি ত্রুটি অভীক্ষার নৈর্ব্যক্তিকতার সঙ্গে দুটি বিষয় সংশ্লিষ্ট থাকে, যেমন—অভীক্ষার অন্তর্গত পদগুলির নৈর্ব্যক্তিকতা এবং অন্যটি হল নম্বরদানের ক্ষেত্রে নৈর্ব্যক্তিকতা। অভীক্ষাটিকে নৈর্ব্যক্তিক হতে হলে প্রত্যেক প্রশ্নের ক্ষেত্রে একটি মাত্র সঠিক

উত্তর থাকতে হবে। নম্বর প্রদানের ক্ষেত্রে নৈর্ব্যক্তিকতা আনতে হলে সমস্ত পরীক্ষককে একই বা সমান রীতি মেনে নম্বর প্রদান করতে হবে।

২। **নির্ভরযোগ্যতা (Reliability) :**

কোনো অভীক্ষা যা পরিমাপ করে তা কতখানি নিখুঁত বা নির্ভুল বা কতখানি সংগতিপূর্ণভাবে করে তার মাত্রাকে বলা হয় অভীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা। একটি ভালো অভীক্ষার এই বৈশিষ্ট্য অবশ্যই থাকতে হবে। **বিভিন্ন পদ্ধতিতে নির্ভরযোগ্যতা নির্ণয় করা হয়। যেমন—**

(ক) অভীক্ষা প্রয়োগ-পুনঃপ্রয়োগ পদ্ধতি

(খ) সমান্তরাল অভীক্ষা পদ্ধতি

(গ) অন্তর্দ্বিখণ্ডিত পদ্ধতি

(ঘ) অন্তপর্দীয় সংগতিমূলক পদ্ধতি।

৩। **যথার্থতা (Validity) :**

কোনো অভীক্ষার দ্বারা যে গুণ বা বৈশিষ্ট্য পরিমাপ করতে চাওয়া হচ্ছে, অভীক্ষাটি যদি শুধুমাত্র সেই বৈশিষ্ট্য পরিমাপ করতে সমর্থ হয়, তাহলে অভীক্ষাটির যথার্থতা আছে বলে ধরা হয়। **এই যথার্থতা হয় চার প্রকারের যেমন—**

(ক) বিষয় যথার্থতা (Content validity)

(খ) সংগঠনমূলক যথার্থতা (Construct validity)

(গ) অভিজ্ঞতা প্রসূত যথার্থতা (Emperical validity)

(ঘ) ভবিষ্যৎ সম্ভাবনামূলক যথার্থতা (Predictive validity)

৪। **আদর্শায়ন (Stardarditation) :**

সু-অভীক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল অভীক্ষার আদর্শায়ন। পরিমাপের তাৎপর্য নির্ণয় সম্পর্কিত ত্রুটি দূর করার প্রক্রিয়াকে বলা হয় অভীক্ষার আদর্শায়ন। অভীক্ষার আদর্শায়নের জন্য তিনটি শর্ত মেনে চলা হয়। যেমন : (ক) অভীক্ষাটির প্রয়োগ পদ্ধতি, নির্দেশদান, সময়সীমা এবং নম্বর প্রদান পদ্ধতির মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখতে হয়, (খ) অভীক্ষাটির নির্ভরযোগ্যতা এবং যথার্থতা নির্ণয় করতে হয়, (গ) অভীক্ষাটির একটি মান বা নর্ম নির্ধারণ করতে হয় যাতে অভীক্ষার ফলাফল ব্যাখ্যা এবং বিভিন্ন পরীক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বরের মধ্যে তুলনা করা যায়।

৫। **প্রয়োগশীলতা (Practicability) :**

যখন একটি অভীক্ষার প্রয়োগ সম্পর্কিত কাজ সহজ, সরল, ত্রুটিহীন ভাবে করা যায়, তখন বলা হয় অভীক্ষাটির প্রয়োগশীলতা আছে। এই ব্যাপারে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ—

Scanned with CamScanner

(ক) অভীক্ষাটি স্বাভাবিক দৈর্ঘ্য সম্পন্ন হওয়া দরকার।

(খ) অভীক্ষায় নির্দেশগুলি স্পষ্ট, সহজ, সরল ও বোধগম্য হওয়া দরকার।

(গ) নম্বর প্রদানের পদ্ধতি সহজ-সরল হওয়া দরকার।

৬। **উপযোগিতা (utility) :**

যে উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে অভীক্ষাটি নির্মিত হয়েছে অভীক্ষাটি যেন সেই উদ্দেশ্যকে সম্পন্ন করে, তাহলে বলা যাবে অভীক্ষাটির উপযোগিতা আছে।

○ শিক্ষাবিজ্ঞানে পারদর্শিতা অভীক্ষা গঠন (Construction of Achievement Test in Education) :

পারদর্শিতার অভীক্ষা গঠন শিক্ষকের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। অভীক্ষা প্রস্তুতির আগে পর্যাপ্তভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ বিশেষভাবে দরকার। **এই ব্যাপারে নিম্নলিখিত ধাপ বা পর্যায়গুলি অনুসরণ করা যেতে পারে :**

১। উদ্দেশ্য নির্ধারণ (Setting objectives)

২। পাঠ্যসূচি বা বিষয়বস্তুর সম্পূর্ণকরণ (Coverage of the syllabus or contents)

৩। প্রশ্ন বা পদের প্রকার সম্পর্কে সিদ্ধান্তকরণ (Decision about types of items or questions)

৪। সময় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ (Decision about the time)

৫। নকশা প্রস্তুতকরণ (Preparation of the blue print)

৬। পদ বা প্রশ্নগুলির সংগঠিতকরণ এবং সজ্জিতকরণ (Organizing and arranging items or questions)

৭। গুণাগুণ যাচাই এবং পদ বিশ্লেষণ (Try-out and item analysis)

৮। অভীক্ষার চূড়ান্ত রূপ প্রস্তুতকরণ (Preparing the final form of the test)

৯। নম্বর প্রদানের সহায়ক উত্তরপত্র প্রস্তুতকরণ (Preparation of a scoring key)

উপরোক্ত পর্যায়গুলি সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল :

১। **উদ্দেশ্য নির্ধারণ :**

সর্বপ্রথম এবং গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় বা ধাপ হল অভীক্ষার উদ্দেশ্যগুলিকে স্পষ্ট করা। সমস্ত রকম পরিস্থিতিতে অভীক্ষার উদ্দেশ্যগুলিকে সঠিকভাবে নির্ধারিত করে উদ্দেশ্য অর্জনের উপযোগী ক্রিয়াপদ দিকগুলির পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। অভীক্ষা কোন্ কাজের জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে তা মাথায় রাখতে হবে।

২। **পাঠ্যসূচি বা বিষয়বস্তু সম্পূর্ণকরণ :**

অভীক্ষার জন্য যে বিষয়বস্তু নির্ধারিত করা হবে তা প্রত্যক্ষ ভাবে সম্পর্কিত থাকা প্রয়োজন শিক্ষকের শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীরা কী শিখেছে তার ভিত্তিতে। শিক্ষক যে সমস্ত

শিখন অভিজ্ঞতাগুলি শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পরিচিত করিয়েছেন তার একটি রূপরেখা অবশ্যই থাকবে। কোনো বড়ো বিষয় বা টপিক কিংবা কোনো উপ-একক বিষয়বস্তুর রূপরেখা থেকে বাদ দেওয়া উচিত নয়। অবশ্য এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে, শিক্ষকের আলোচিত সমস্ত বিষয়বস্তুকে এর অন্তর্ভুক্ত করা না হতে পারে। এক কথায় বলা যেতে পারে শিক্ষার্থীদের অর্জিত শিখন-অভিজ্ঞতার বিভিন্ন দিক জুড়ে গ্রহণযোগ্যভাবে গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

৩। **প্রশ্ন বা পদের প্রকার সম্পর্কে সিদ্ধান্তকরণ :**

প্রশ্নপত্রে বা অভীক্ষাপত্রে যে সমস্ত প্রশ্নগুলি দেওয়া হবে সেগুলির প্রকৃতি চিহ্নিত করা দরকার। প্রশ্ন বা অভীক্ষা পদের প্রকৃতি অনুসারে রচনাধর্মী সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী, অতিসংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী বা নৈর্ব্যক্তিক প্রকৃতির ইত্যাদি চিহ্নিত করা দরকার। প্রশ্নকর্তা অভীক্ষা পদগুলির কাঠিন্যমাত্রা অনুযায়ী এমনভাবে নির্বাচিত করবেন যেন সেগুলি শিক্ষার্থীদের মানসিক শক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

৪। **সময় সম্পর্কে সিদ্ধান্তগ্রহণ :**

অভীক্ষাপদের সংখ্যা ও প্রকৃতি অনুসারে সমগ্র অভীক্ষাপত্রটিকে বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে তার উত্তর বা প্রতিক্রিয়া দানের জন্য কত সময় লাগতে পারে। সেই অনুসারে সময় নির্ধারিত করতে হবে।

৫। **নকশা প্রস্তুতকরণ :**

সমগ্র অভীক্ষাপত্রটির গঠনের সামগ্রিক অথচ সংক্ষিপ্ত ভাবে উপস্থাপিত করার জন্য এই নকশা। এক্ষেত্রে পূর্ববর্তী পর্যায়গুলিকে খেয়াল রেখে প্রস্তুতির কাজ করতে হয়। একটি অভীক্ষাপত্র গঠনের নকশা বা Blue-print দেওয়া হল :

৬। **পদ বা প্রশ্নগুলির সংগঠিতকরণ এবং সজ্জিতকরণ :**

এই পর্যায়ে অভীক্ষাপত্রে অভীক্ষাপদগুলিকে সামঞ্জস্য বজায় রেখে সংগঠিত এবং সজ্জিতকরণের কাজ করা হয়। অভীক্ষাপদ বা প্রশ্নগুলিকে বিভিন্নভাবে সাজানো যায়। অভীক্ষাপত্র গঠনের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলিকে মাথায় রেখে করতে পারলে ভালো হয়।

(ক) ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের প্রশ্নগুলিকে পৃথক পৃথক বিভাগে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। যেমন—অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্নগুলিকে প্রথম বিভাগে, সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্নগুলিকে দ্বিতীয় বিভাগে, রচনাধর্মী প্রশ্নগুলিকে তৃতীয় বিভাগে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্নগুলি নৈর্ব্যক্তিক ধরনের হয়, সেক্ষেত্রে বহুল ব্যবহৃত বিকল্প উত্তর নির্বাচন বা MCQ (Multiple Choice Question) ধরনের হতে পারে। কারণ এই ধরনের প্রশ্নগুলি নির্ভরযোগ্য, যথার্থ এবং নৈর্ব্যক্তিক।

Scanned with CamScanner

প্রশ্নের ধরন → / উপ একক ↓	জ্ঞান (Knowledge)			বোধ (Understanding)			প্রয়োগ (Application)			দক্ষতা (Skill)			মোট (Total)		
	রচনা ধর্মী	সংক্ষিপ্ত উত্তর ধর্মী	অতি-সংক্ষিপ্ত উত্তর ধর্মী	রচনা ধর্মী	সংক্ষিপ্ত উত্তর ধর্মী	অতি-সংক্ষিপ্ত উত্তর ধর্মী	রচনা ধর্মী	সংক্ষিপ্ত উত্তর ধর্মী	অতি-সংক্ষিপ্ত উত্তর ধর্মী	রচনা ধর্মী	সংক্ষিপ্ত উত্তর ধর্মী	অতি-সংক্ষিপ্ত উত্তর ধর্মী	রচনা ধর্মী	সংক্ষিপ্ত উত্তর ধর্মী	অতি-সংক্ষিপ্ত উত্তর ধর্মী
উপএকক—১															
উপএকক—২															
উপএকক—৩								(খ) ন							
উপএকক—৪															
মোটউপ একক															
সর্বমোট															

বি: দ্র: (খ) = প্রশ্নের সংখ্যা
(ন) = মোট নম্বর

(খ) প্রশ্নগুলি সহজ থেকে কঠিন এইভাবে তাদের কাঠিন্যমান অনুযায়ী রাখা উচিত। এবং প্রশ্নের সংখ্যা সময়ের সঙ্গে না হয়ে অতি দীর্ঘ ধরনের না হওয়াই উচিত।

(গ) প্রশ্নগুলির উত্তর কীভাবে দিতে হবে সে-বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশ থাকা জরুরি। নিদের্শাবলির ভাষা স্পষ্ট, স্বচ্ছ এবং সহজবোধ্য হওয়া দরকার।

(ঘ) নক্‌শা অনুযায়ী প্রশ্নের প্রকৃতি ঠিক রাখা দরকার।

(ঙ) চূড়ান্ত অভীক্ষাপত্রে স্থান পাওয়ার আগে যে পদবিশ্লেষণ করতে হয়, তার জন্য এই পর্যায়ে ২০ থেকে ৩০ শতাংশ প্রশ্ন বা পদ অতিরিক্ত রাখা দরকার।

৭। প্রাথমিক প্রয়োগ এবং পদবিশ্লেষণ :

অভীক্ষাপত্রের প্রশ্ন বা পদগুলির উপযুক্ততা যাচাই করা এবং ত্রুটিমুক্ত করার জন্য সমগ্র অভীক্ষাপত্রটির বিচারকরণ প্রয়োজন। মূলত নিম্নলিখিত কার্য-সম্পাদনের নির্মিত পদবিশ্লেষণ করার দরকার হয়—

(ক) পদগুলির অস্পষ্টতা, দ্ব্যর্থব্যঞ্জক অবস্থা এবং ত্রুটি খুঁজে বের করা,

(খ) প্রত্যেকটি পদের কাঠিন্যমাত্রা (difficulty value) নির্ণয় করা,

(গ) প্রত্যেকটি পদের পার্থক্য নির্ণায়ক ক্ষমতা (discriminating power) নির্দেশ করা।

প্রতিনিধিত্বমূলক একদল শিক্ষার্থীর উপর অভীক্ষাপত্রটির প্রয়োগ করার পর নম্বর প্রদানের কাজ করতে হয়। এরপর পদবিশ্লেষণের (item analysis)-এর মাধ্যমে পদগুলির অস্পষ্টতা, দ্ব্যর্থব্যঞ্জক অবস্থা এবং ত্রুটি সংশোধন করা হয়। খুব কম কাঠিন্যমাত্রা এবং খুব বেশি কাঠিন্যমাত্রা যুক্ত পদ এবং খুব কম পার্থক্য নির্ণায়ক ক্ষমতা যুক্ত পদগুলিকে চিহ্নিত করে নেওয়া হয়।

৮। অভীক্ষার চূড়ান্তরূপ প্রস্তুত করণ :

অভীক্ষাপত্রের পদগুলির উপযুক্ত বিচারকরণ ও পদবিশ্লেষণ করার পর অনুপযুক্ত পদগুলিকে বাদ দিয়ে অভীক্ষাপত্রের চূড়ান্ত রূপ প্রস্তুত করা হয়। এছাড়াও, অভীক্ষাপত্রটিকে আরও বেশি কার্যকরী করে তোলার জন্য কিছু পদকে পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত করা যেতে পারে। এরপর শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতার অভীক্ষা সম্পন্ন করার জন্য চূড়ান্তভাবে গৃহীত অভীক্ষাপত্রটিকে ছাপানোর জন্য পাঠানো হয়।

৯। নম্বর প্রদানের জন্য সহায়ক উত্তরপত্র প্রস্তুতি :

অভীক্ষাপত্রে সন্নিবেশিত সবধরনের পদ বা প্রশ্নগুলির, যেমন—অতিসংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী, সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী এবং রচনাধর্মী প্রশ্নগুলির পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীদের প্রদত্ত উত্তরগুলিকে নম্বর প্রদানের জন্য একটি উত্তরপত্র (Scoring key) পূর্ব নির্ধারিত করে রাখা দরকার।

Scanned with CamScanner

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর
(Short Questions & Answers)

❑ **অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর (Objective type questions & answers) :**

Marks – 2

১। মূল্যায়নের চারটি বৈশিষ্ট্য লিখুন। (Write four characteristics of evaluation.)

উত্তর : মূল্যায়নের চারটি বৈশিষ্ট্য হল :

(ক) মূল্যায়নের পরিধি বিশাল বিস্তৃত। এর দ্বারা শিক্ষার্থীর সকল বৈশিষ্ট্য বা ক্ষমতার গুণগত মান নিরূপণ করা যায়। শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সাধনই হল আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্য। শিক্ষার এই লক্ষ্য যথাযথভাবে অর্জিত হয়েছে কি না তা বোঝা যায় মূল্যায়নের মাধ্যমেই।

(খ) মূল্যায়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এটি শিক্ষার্থীর সামগ্রিক আচরণের বিচার কৌশল স্থির করে এবং শিক্ষার্থীর সতত পরিবর্তনশীল বিকাশকে গুরুত্ব দেয়।

(গ) শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতিতে শিক্ষার্থীর আচরণের পরিমাণগত ও গুণগত পরিবর্তনকে বিবৃত করে।

(ঘ) মূল্যায়নের দ্বারা শিক্ষার্থীর সামগ্রিক সত্তা বা তার বিকাশের সর্বপ্রকার অবস্থা সম্পর্কিত তথ্যাবলি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়।

২। মূল্য নিরূপণ কী? (What is assessment?)

উত্তর : মূল্য নিরূপণ বা মূল্যনির্ধারণ বা অ্যাসেস্‌মেন্ট হল মূল্যায়নের একটি অংশ যার মাধ্যমে আমরা শিক্ষার কোনো একটি বিশেষ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অগ্রগতি নিরূপণ করি। কোনো একজন শিক্ষার্থীকে সামগ্রিকভাবে পরিমাপের চেষ্টা এখানে হয় না, কিন্তু বিষয়ের বিশেষ কোনো ক্ষেত্রে (area) তার নির্দিষ্ট ক্ষমতাকে পরিমাপ করা হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়—পাঠ্য-বিষয়বস্তুর কিছু জ্ঞান, যেমন—শিক্ষার সংজ্ঞা ও ধারণা, শিক্ষার উপাদান হিসেবে শিশু শিক্ষায় আধুনিক শিক্ষকের ভূমিকা, আধুনিক পাঠ্যক্রমের বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি। অ্যাসেসমেন্ট সাধারণত পরিমাপ করে কোনো একজন শিক্ষার্থী একটি নির্দিষ্ট সময় পরিসরে একটি বিশেষ বিষয়বস্তু বা টপিক কতখানি উপলব্ধি করতে পেরেছে। এটি হল শিখনের পর্যবেক্ষণ এবং পরিমাপন প্রক্রিয়া। শিক্ষার্থীরা কতখানি এবং কত ভালোভাবে শিখতে পেরেছে তা উপলব্ধি করতে বা জানতে শিক্ষককে সহায়তা করে এই অ্যাসেসমেন্ট। প্রাপ্ত

ফলাফলের ভিত্তিতে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের আরও গভীরভাবে পাঠ্যবিষয়বস্তুর কোনো একটি বিশেষ ক্ষেত্রকে শিখতে নিবদ্ধ করেন।

৩। পরিমাপ কী? (What is measurement?)

উত্তর : মূল্যায়ন প্রসঙ্গে আমরা অনেক সময় পরিমাপ কথাটিকে ব্যবহার করে ফেলি। সেক্ষেত্রে মূল্যায়ন আর পরিমাপ প্রায় সমার্থক শব্দ হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মূল্যায়ন আর পরিমাপকে একই অর্থে ব্যবহার করা যায় না। কারণ সমাজবিজ্ঞানের অন্তর্গত বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষ করে শিক্ষাবিজ্ঞানে মূল্যায়ন ও পরিমাপ শব্দ দুটিকে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা সমীচীন। সাধারণভাবে পরিমাপকে বস্তুনিষ্ঠ রূপে বর্ণনা করা যায়। কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী কোনো বিষয় বা বস্তুর সংখ্যাগত মান নির্দেশ করাকে বলা হয় পরিমাপ। এই প্রসঙ্গে Tylor বলেছেন, "পরিমাপ হল নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী বস্তু বা বিষয়-এর সংখ্যাগত বিভাজন নির্দেশ করে।"

৪। মূল্যায়ন ও পরিমাপের মধ্যে পার্থক্য কী? (What is the difference between evaluation and measurement?)

উত্তর : মূল্যায়ন ও পরিমাপের মধ্যে পার্থক্যগুলি হল :

মূল্যায়ন (Evaluation)	পরিমাপ (Measurement)
১। মূল্যায়ন হল উদ্দেশ্যমুখী প্রক্রিয়া। শিক্ষার সামগ্রিক উদ্দেশ্যের বিষয়টি গুরুত্ব পায়।	১। পরিমাপের ক্ষেত্রে কিছু উদ্দেশ্য থাকলেও সেটি তেমনভাবে উল্লেখযোগ্য নয়।
২। মূল্যায়ন হল সামগ্রিক প্রকৃতির, এখানে শিক্ষার্থীর সামগ্রিক অগ্রগতির বিচার করা হয়।	২। পরিমাপ সামগ্রিক প্রকৃতির নয়, বিচ্ছিন্ন প্রকৃতির। পরিমাপের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয়ের বৈশিষ্ট্য পৃথক পৃথক ভাবে বিবেচনা করা হয়।
৩। মূল্যায়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া।	৩। পরিমাপ হল একটি সাময়িক প্রক্রিয়া।
৪। মূল্যায়নে শিক্ষার্থীর আচরণগত বৈশিষ্ট্যের পরিমাণগত এবং গুণগত উভয় দিকই বিবেচনা করা হয়।	৪। পরিমাপের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর শুধুমাত্র আচরণগত বৈশিষ্ট্যের পরিমাণগত দিককেই বিবেচনা করা হয়।

৫। মূল্যায়নের দুটি উদ্দেশ্য লিখুন। (Write two purposes of evaluation.)

উত্তর : মূল্যায়নের দুটি উদ্দেশ্য হল :

(i) শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর প্রেষণা সঞ্চার : মূল্যায়ন প্রক্রিয়া শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষককেও শিক্ষণ-শিখন কার্যাবলির ফলশ্রুতির সঙ্গে পরিচিতি ঘটিয়ে যে ধারণা প্রদান করে তা শিক্ষার্থী ও শিক্ষক উভয়কেই শিক্ষণ-শিখন কার্যের মূল স্রোতে নিবদ্ধ রাখতে

Scanned with CamScanner

সহায়তা করে। শিক্ষার্থীর সাফল্যকে নির্দেশ করে শিক্ষকের প্রশংসাসূচক মন্তব্য যেমন শিক্ষার্থীকে প্রেষিত করে তেমনই শিক্ষক নিজেও তাঁর কাজে উৎসাহ পান।

(ii) প্রতিবার্তা ও সংশোধন প্রক্রিয়া সম্পাদন : শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করে তাদেরকে প্রয়োজনীয় প্রতিবার্তা (feed back) প্রেরণ এবং প্রাসঙ্গিক সংশোধন প্রক্রিয়া চালিয়ে শিক্ষার্থীদের শিখনকার্যকে নতুন করে উদ্দীপিত করা সম্ভব। মূল্যায়ন যথার্থভাবে এই কার্যটি সম্পন্ন করে।

৬। মূল্যায়নের দুটি গুরুত্ব উল্লেখ করুন। (State two importance of evaluation.)

উত্তর : মূল্যায়নের দুটি গুরুত্ব হল :

(i) মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার প্রথম পর্যায়ে যেমন শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলিকে নির্ধারণ করা হয় তেমনই শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলি কতখানি বাস্তবায়িত হয়েছে বা উদ্দেশ্যের প্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীর অগ্রগতি কতখানি সম্পন্ন হয়েছে তার বিচার করা হয় মূল্যায়নের দ্বারা। সুতরাং মূল্যায়ন যেমন শিক্ষার উদ্দেশ্য স্থির করে তেমনই শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলির পর্যালোচনা করে।

(ii) শিক্ষার্থী তার শিক্ষাগ্রহণের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন পাঠ্য-বিষয়বস্তু বা পাঠ্যসূচি অনুসরণ করে অগ্রসর হয়। পূর্ব নির্ধারিত এই উদ্দেশ্যগুলির ভিত্তিতে পাঠ্যসূচি অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর যে আচরণগত পরিবর্তন ঘটার কথা, তা যদি না ঘটে তাহলে অন্যান্য বিষয়গুলির সঙ্গে পাঠ্যসূচি তথা পাঠক্রমেরও যথাযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে এবং অনেক ক্ষেত্রে তার ত্রুটিও ধরা পড়ে। সুতরাং অনুসৃত পাঠক্রমের যথাযোগ্যতা যাচাই করাও মূল্যায়নের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

৭। মূল্যায়নের কৌশল হিসেবে রেটিং স্কেল কী? (What is Rating Scale as evaluation device?)

উত্তর : চেকলিস্টের সাহায্যে শিক্ষার্থীর কোনো বৈশিষ্ট্য বর্তমান কি না তা দেখা হয়, কিন্তু রেটিং স্কেলে সেই বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতির মাত্রা কতখানি তা পরিমাপ করে দেখা হয়। অর্থাৎ কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্য শিক্ষার্থীর মধ্যে কী পরিমাণে বিকাশ লাভ করেছে তা পরিমাপ করার জন্য ক্রমবর্ধমান স্কেলের উপর তার অবস্থান চিহ্নিত করা হয়। সাধারণত শিক্ষক তাঁর শিক্ষার্থীর কোনো বৈশিষ্ট্যের গুণগত বা পরিমাণগত অবস্থাকে বিচার করেন তিন/পাঁচ/সাত পয়েন্ট স্কেলে। যেমন কোনো বিশেষ শিক্ষার্থী লেখাপড়ায় খুব ভালো, ভালো, মাঝারি, খারাপ, খুব খারাপ—শব্দের মাধ্যমে বর্ণনামূলক, এই দিকগুলিকে আবার সাংখ্যমানের সাহায্যেও প্রকাশ করা যায়। যেমন ৪, ৩, ২, ১, ০ ইত্যাদি। এই প্রসঙ্গে বলা যায় অনেক সময় ব্যক্তি বা শিক্ষার্থী নিজেই পর্যবেক্ষকের ভূমিকা পালন করে, তখন তাকে বলা হয় self rating।

৮। মূল্যায়নের কৌশল হিসেবে পর্যবেক্ষণ কাকে বলে? (What is observation as evaluation device?)

উত্তর : স্বল্প সময়ে এবং স্বল্প ব্যয়ে একটি বৃহত্তর অংশের শিক্ষার্থীদের নিরপেক্ষ পরিমাপ অভীক্ষণের সাহায্যে সম্ভব হলেও বিস্তারিত মূল্যায়নের জন্য কিছু বিশেষ কৌশল শিক্ষককে গ্রহণ করতে হয়। এইরকম একটি কৌশল হল পর্যবেক্ষণ বা নিরীক্ষণ। এর শব্দগত অর্থ ছিল অভিনিবেশ সহকারে দর্শন। কিন্তু ব্যবহারিক অর্থে পর্যবেক্ষণ বা নিরীক্ষণ হল কোনো কার্যক্রমের ধারাবাহিক কর্মতৎপরতাগুলিকে দেখা এবং তা নৈর্ব্যক্তিকভাবে লিপিবদ্ধ করে রাখা। বস্তুত শিক্ষার্থীর আচরণকে নিখুঁতভাবে লক্ষ করে তা লিপিবদ্ধ করে রাখার প্রক্রিয়াই হল পর্যবেক্ষণমূলক মূল্যায়ন কৌশল। এই মূল্যায়ন কৌশলের অন্তর্ভুক্ত উল্লেখযোগ্য উপকরণগুলি হল :

(১) অতীত সংক্রান্ত তথ্য লিপিবদ্ধ (Anacdotal Record)
(২) চেক লিস্ট (Check list)
(৩) রেটিং স্কেল (Rating Scale)
(৪) সমাজমিতি (Sociometry)

৯। সমাজনীতি কী? (What is Sociometry?)

উত্তর : কোনো একজন শিক্ষার্থী সমাজের চোখে কীরূপ বা তার অবস্থান কী তার পরিমাপ করার কৌশলই হল সমাজমিতি বা সোসিয়োমেট্রি। একটি শ্রেণি বা দলের অন্তর্গত বিভিন্ন শিক্ষার্থীদের মধ্যে একের প্রতি অন্যের পছন্দ অথবা অপছন্দকে চিহ্নিতকরণের দ্বারা দলটির বা শ্রেণিটির অন্তর্গঠনের রূপ সামাজিক অবস্থান এবং ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণের পরিমাণকে বলা হয় সমাজমিতি। শিক্ষার্থী সদস্যদের পছন্দ অথবা অপছন্দগুলি যে রেখাচিত্রের দ্বারা প্রকাশ করা যায় তাকে বলা হয় সোসিয়োগ্রাম। সোসিয়োমেট্রির অভীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্যগুলিকে যখন টেবিলের আকারে প্রদান করা হয় তখন তাকে বলা হয় সোসিয়োমেট্রিক ম্যাট্রিকস। সোসিয়োমেট্রিক ম্যাট্রিক্স থেকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানা যায় :

(ক) দলের সবচেয়ে জনপ্রিয় সদস্যকে।
(খ) দলের সবচেয়ে অপছন্দের সদস্যকে।
(গ) দলের মধ্যে বিভিন্ন উপদলের অস্তিত্বকে।
(ঘ) দলের মধ্যে বিচ্ছিন্ন (isolated) সদস্যকে।

১০। প্রশ্নমালা কী? (What is questionnaire?)

উত্তর : আত্মবিবৃতিমূলক মূল্যায়ন কৌশলের অন্তর্গত অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপায় হল শিক্ষার্থীদের নিকট প্রশ্নমালা বা প্রশ্নগুচ্ছের ব্যবহার এবং এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা। শিক্ষণ-শিখন

Scanned with CamScanner

ebook.dascoaching.in

অথবা শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোনো সমস্যা বা ঘটনার অনুসন্ধান করে যখন তথ্য সংগ্রহ করার প্রয়োজন হয় তখন প্রশ্নমালা অত্যন্ত উপযোগী ভূমিকা গ্রহণ করে। কতকগুলি প্রশ্নের সমন্বয়ে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে উত্তর সংগ্রহের নিমিত্ত প্রশ্ন সংবলিত পত্রকে বলা হয় প্রশ্নমালা বা প্রশ্নগুচ্ছ। সমস্যা বা ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিত উত্তরদাতা (শিক্ষার্থীর) অভিজ্ঞতা, অনুভূতি, বিশ্বাস এবং ধারণার বিষয়ে বিস্তারিতভাবে তথ্য সংগ্রহ করা প্রশ্নমালার মাধ্যমে সম্ভব। প্রশ্নপত্রের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে Bogardus বলেছেন : "A Questionnaire is a list of questions sent to a number of persons for them to answer." সুতরাং একথা সহজেই বলা যেতে পারে যে, প্রশ্নপত্র হল একটি লিখিত ব্যবস্থা যেখানে অনেকগুলি প্রশ্ন অথবা বিবৃতি (statement) অন্তর্ভুক্ত থাকে এবং প্রশ্নগুলি কোনো শিক্ষার্থীর নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য ব্যবহৃত হয়। পরবর্তীকালে যার থেকে মূল্যায়নের কার্য-সম্পাদন করা যায়।

১১। প্রবণতা কী? (What is aptitude?)

উত্তর : প্রবণতা হল কোনো কাজে সফলতা অর্জনের পূর্বাভাস। বুদ্ধির সাথে এর পার্থক্য রয়েছে। বুদ্ধির অভীক্ষা দ্বারা কোনো ব্যক্তির সাধারণ মানসিক ক্ষমতার পরিমাপ করা যায় কিন্তু প্রবণতা হল বিশেষ ধরনের সক্ষমতা। যেমন—একজন শিক্ষার্থী শ্রেণিকক্ষে তেমন পারদর্শিতা (Achievement) প্রদর্শন করতে না পারলেও গানবাজনার প্রতি দারুণ প্রবণতা লক্ষ করা যেতে পারে এবং পরবর্তীকালে দেখা যেতে পারে যে সে গানবাজনাতে দারুণ সাফল্য অর্জন করেছে। স্পিয়ারম্যান তাঁর বুদ্ধির উপাদান তত্ত্বে সাধারণ উপাদান G ও বিশেষ উপাদান S-এর কথা বলেছিলেন। এই বিশেষ উপাদানগুলি বিশেষ সক্ষমতা বা প্রবণতা হিসেবে আমাদের আচরণে প্রকাশ পায়। বুদ্ধির অভীক্ষাগুলি সাধারণ ভাবে G পরিমাপ করে।

১২। মনোভাব বা প্রতিন্যাস কী? (What is attitude?)

উত্তর : আমাদের চারপাশে নানারকম ঘটনা ঘটে। প্রতিন্যাস (Attitude) হল এমন একটি অনুভবমূলক সংগঠন যা কোনো ব্যক্তি ওই ঘটনাগুলিকে ইতিবাচক (Positive) বা নেতিবাচক (Negative) দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করে এবং সেই মতো তথ্য সংগ্রহ করে ও নিজের দৃষ্টিভঙ্গি অন্যদের উপর প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে। তাই প্রতিন্যাস হল একটি আবৃত বা গোপন (Covert) প্রবণতা (tendency)। প্রতিন্যাস সবসময় একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে সংগঠিত হয়। যেমন—Attitude towards women education"—অর্থাৎ নারীশিক্ষার প্রতি প্রতিন্যাস। এই প্রতিন্যাস কারো ক্ষেত্রে ইতিবাচক হবে আবার কারো নেতিবাচক হবে। তবে প্রতিন্যাস হল পরিবর্তনশীল। কারণ এটি হল অর্জিত অনুভবমূলক সংগঠন। শিক্ষার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তির প্রতিন্যাস গঠিত হয়।

সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি

❑ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Very short type questions) : Marks – 1

১। মূল্যায়নের চারটি বৈশিষ্ট্য লিখুন। (Write four characteristics of evaluation.)
২। মূল্য নিরূপণ কী? (What is assessment?)
৩। পরিমাপ কী? (What is measurement?)
৪। মূল্যায়ন ও পরিমাপের মধ্যে পার্থক্য কী? (What is the difference between evaluation and measurement?)
৫। মূল্যায়নের দুটি উদ্দেশ্য লিখুন। (Write two purposes of evaluation.)
৬। মূল্যায়নের দুটি গুরুত্ব উল্লেখ করুন। (State two importance of evaluation.)
৭। মূল্যায়নের কৌশল হিসেবে রেটিং স্কেল কী? (What is Rating Scale as evaluation device?)
৮। মূল্যায়নের কৌশল হিসেবে পর্যবেক্ষণ কাকে বলে? (What is observation as evaluation device?)
৯। সমাজনীতি কী? (What is Sociometry?)
১০। প্রশ্নমালা কী? (What is questionnaire?)
১১। প্রবণতা কী? (What is aptitude?)
১২। মনোভাব বা প্রতিন্যাস কী? (What is attitude?)
১৩। গঠনমূলক মূল্যায়ন কাকে বলে? (What is formative evaluation?)
১৪। সমষ্টিগত মূল্যায়ন কাকে বলে? (What is summative evaluation?)
১৫। কোনো অভীক্ষার নৈর্ব্যক্তিকতা বলতে কী বোঝায়? (What do you mean by objectivity of a test?)
১৬। একটি সু-অভীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা বলতে কী বোঝায়? (What do you mean by reliability of a good test?)
১৭। একটি ভালো অভীক্ষার যথার্থতা বলতে কী বোঝায়? (What do you mean by validity of a good test?)
১৮। অভীক্ষার আদর্শায়ন বলতে কী বোঝায়? (What do you mean by standardization of a test?)
১৯। একটি সু-অভীক্ষার বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী? (What are the characteristics of a good test?)

Scanned with CamScanner

২০। অভীক্ষার প্রয়োগশীলতা বলতে কী বোঝায়? (What do you mean by practicability of a test?

❑ সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্নাবলি (Short answer type questions) : Marks – 5

১। মূল্যায়নের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করুন। (State the nature and characteristics of evaluation.)
২। পরিমাপের ধারণা দিন। (Give the concept of measurement?)
৩। মূল্যায়ন ও পরিমাপের মধ্যে পার্থক্য কী? (What are the difference between evaluation and measurement?)
৪। মূল্য নিরূপণ ও পরিমাপের সঙ্গে মূল্যায়নের সম্পর্ক কী? (What is the relation of evaluation with Assessment and Measurement?)
৫। মূল্যায়নের উদ্দেশ্যগুলি কী কী? (What are the purpose of evaluation?)
৬। মূল্যায়নের গুরুত্বগুলি কী কী? (What are the importance of evaluation?)
৭। প্রশ্নমালার বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী? (What are the characteristics of a questionnaire?)
৮। সাক্ষাৎকার-এর বিভিন্ন পর্যায়গুলি সংক্ষেপে বর্ণনা করুন। (Describe in brief the different steps of Interview.)
৯। সমষ্টিগত মূল্যায়নের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করুন। (State the different characteristies of summative evaluation.)
১০। গঠনমূলক মূল্যায়ন ও সমষ্টিগত মূল্যায়নের মধ্যে পার্থক্য কী? (What are the different between formative and summative evaluation?)

❑ রচনাভিত্তিক প্রশ্ন (Essay type questions) : Marks – 10

১। মূল্যায়নের পরিধি আলোচনা করুন। (Discuss the scope of evaluation.)
২। মূল্যায়নের গুরুত্ব বর্ণনা করুন। (Describe the importance of evaluation.)
৩। মূল্যায়নের কৌশল হিসেবে পর্যবেক্ষণ মূলক কৌশল বর্ণনা করুন। (Describe the observational technique as an evaluation device.)
৪। প্রশ্নমালা কী? প্রশ্নমালার গঠন বর্ণনা করুন। (What is questionnaire? Describe the formation of a questionnaire.)
৫। নিরবিচ্ছিন্ন ও সার্বিক মূল্যায়নের ধারণা বর্ণনা করুন। (Describe the concept of continuous and comprehensive Evaluation or CCE.)
৬। পারদর্শিতার অভীক্ষা কী? শিক্ষাবিজ্ঞানে পারদর্শিতা অভীক্ষা গঠন আলোচনা করুন। What is Achievement Test? Discuss the construction of Achievement Test in Education.)

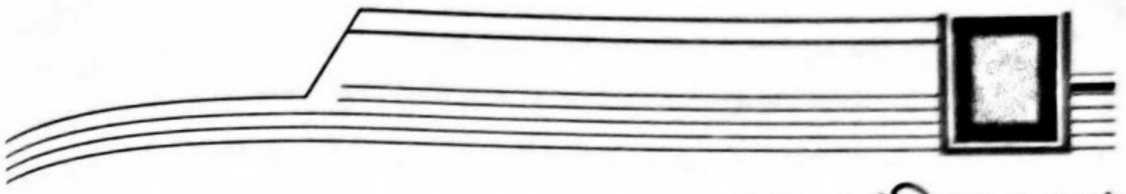

ব্যবহারিক অংশ

PRACTICUM [Engagement with Field]

নতুন বিএড পাঠ্যক্রমের অন্তর্গত অন্যতম বিষয় **'সমাজবিজ্ঞান শিক্ষণ : তত্ত্ব ও প্রয়োগ (শিক্ষাবিজ্ঞান)'** [(Pedagogy of Social Science Teaching (Education)] এখানে একটি অর্ধ রয়েছে এবং সিলেবাসের শেষে একটি অংশ রয়েছে, যেটি হল— 'Practicum' অর্থাৎ এই কোর্সের প্রায়োগিক অংশ। এটির জন্য বরাদ্দ রয়েছে এক ক্রেডিট (One Credit) বা 50 নম্বর। এই Practicum-এর বরাদ্দ সময় 32টি ক্লাস (Class hour)।

Any two of the following :-

- Visit to
  - Historical Places
  - Ecological Places
  - Commercial Places
  - Political Places
- Organization of Programmes
  - Environment Awareness
  - Social Awareness
  - Election Awareness
  - Blood Donation
  - Exhibition
  - Demonstration of Lab-based activities wherever applicable

upload by dascoaching.in

ভূমিকা : এই পত্রে ব্যবহারিক বা প্রয়োগিক অংশে দুই ধরনের বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম ধরনে রয়েছে ঐতিহাসিক স্থান, বাস্তু সংস্থানগত স্থান, বাণিজ্যিক স্থান এবং রাজনৈতিক স্থান পরিদর্শন। দ্বিতীয় ধরনে রয়েছে বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রে সচেতনতা গড়ে তোলার জন্য প্রোগ্রাম সংগঠিতকরণ। এই বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্র হল—পরিবেশ সচেতনতা (Environment Awareness), সামাজিক সচেতনতা (Social Awareness), নির্বাচন সচেতনতা (Election Aareness), রক্তদান (Blood Donation), প্রদর্শনী (Exhibition) এবং পরীক্ষাগার ভিত্তিক প্রতিপাদন (Demonstration of Lab-based activities)।

Scanned with CamScanner

পাঠক্রমের নির্দেশ অনুসারে উপরোক্ত বিষয়গুলি সংগঠিত করার জন্য দলবদ্ধ আলোচনা, বক্তৃতা, আলোচনা, যুক্তভাবে অংশগ্রহণ করা, দলবদ্ধ কাজ করা, গৃহকাজ বা নির্দিষ্ট কোনো অ্যাসাইনমেন্ট সম্পন্ন করা, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য নির্দিষ্ট স্থান পরিদর্শন এবং প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করার কথা বলা হয়েছে।

এই ব্যবহারিক বা প্রায়োগিক অংশটিতে মোট ৬৪ ঘণ্টা বরাদ্দ করা হয়েছে। এই বরাদ্দকৃত সময় তাত্ত্বিক (theoretical) বিষয় এর দ্বিগুণ এবং দুই ক্রেডিট রাখা হয়েছে। এক্ষেত্রে মোট নম্বর বরাদ্দ করা হয়েছে ৫০ (৫০ শতাংশ)। এর দ্বারা উপলব্ধি করা যেতে পারে যে, এই অংশে কোনো ক্ষেত্রে গুরুত্ব তাত্ত্বিক অংশের থেকে বেশি দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ প্রশিক্ষণরত শিক্ষার্থী বা ভাবী শিক্ষক তাত্ত্বিক জ্ঞান আহরণের সঙ্গে সঙ্গে তা যথেষ্টভাবে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে শিখবেন এবং প্রয়োগ করবেন। এর উদ্দেশ্য হল সমাজবিজ্ঞান বিষয়ে ধারণা গঠনের যে উদ্দেশ্য নির্ধারিত করা হয়েছে সেগুলি হাতে-কলমে কাজে লাগাতে পারবেন এবং ত্রুটি বিচ্যুতি নিখুঁতভাবে অনুসন্ধান করে সমাজবিজ্ঞানের অন্তর্গত বিষয়গুলির ধারণা গঠনের কাজে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করবেন।

কর্মসম্পাদনের শর্তাবলি :

এই ব্যবহারিক অংশটি সম্পন্ন করার জন্য শিক্ষককে কতকগুলি বিষয় মনে রাখতে হবে এবং শিক্ষার্থীকে তা শেখাতে হবে। মনে রাখা দরকার— এই পাঠক্রম সম্পন্ন করে শিক্ষার্থী কিন্তু একজন ভবিষ্যতের শিক্ষক হয়ে উঠবেন এবং তিনি ভবিষ্যতের নাগরিক গড়তে সাহায্য করবেন।

এই ব্যবহারিক অংশটি সম্পন্ন করতে তিনটি অংশের দিকে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন :

(১) কার্য সম্পাদনের জন্য প্রাক্ বিষয়বস্তু সম্পর্কিত ধারণা।

(২) কার্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ।

(৩) সমালোচনা ও উপসংহার।

উপরোক্ত তিনটি দিক সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল—

(১) **কার্য-সম্পাদনের জন্য প্রাক্ বিষয়বস্তু সম্পর্কিত ধারণা :** যে-কোনো ব্যবহারিক কার্য সম্পন্ন করতে হলে প্রাথমিকভাবে সেই কার্যটির মূল বিষয়বস্তু সম্পর্কে কার্যসম্পাদনকারী ব্যক্তির ধারণা থাকা দরকার। যে-কোনো কার্যের ধারণাগত দিক হল প্রকৃতপক্ষে সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা। বিষয়বস্তুর ধারণা বলতে কী বোঝায়? বিষয়বস্তুর ধারণা বলতে বোঝায় কার্যটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিস্তৃতি বিবরণ। বিষয়টির পরিচিতি বা ধারণা সঠিকভাবে গঠন করতে হলে বিষয়টির অর্থ ও সংজ্ঞা, প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য, গুরুত্ব বা উপযোগিতার দিকগুলি বিশেষত ব্যক্তি ও সমাজজীবনের সঙ্গে বিষয়বস্তুটির সম্পর্ককে উপলব্ধি করা দরকার। কার্য সম্পাদনকারী

ব্যক্তিকে বিষয়বস্তুটি এত ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে যেন তার হৃদয়ে গেঁথে যায়। কোনো বিষয়বস্তুকে ভালোভাবে বুঝে নিয়ে বা উপলব্ধি করে যদি ঐ বিষয়টিকে পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা ও প্রকাশ করতে পারেন, তাহলে বলা যেতে পারে কার্যসম্পাদনকারী ব্যক্তি কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ধারণাগত দিকটি যথাযথভাবে আয়ত্ত করতে সমর্থ হয়েছেন।

(২) **কার্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ :** ব্যবহারিক কার্য সম্পাদনের জন্য দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিকটি হল কার্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ। কার্য সম্পাদনকারী ব্যক্তিকে বিশ্লেষণী দক্ষতার দ্বারা সমগ্র বিষয়বস্তুটিকে তার বিভিন্ন অংশে পৃথক করা বা ভেঙে ফেলা দরকার। এটি হল বিযুক্তিকরণের একটি প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুকে বিভিন্ন উপ অংশে বিশ্লেষণ বা ব্যাখ্যা করা দরকার হয়। অর্থাৎ সমগ্র সমস্যাটিকে বিভিন্ন অংশে বিশ্লেষণ করে অংশগুলিকে সনাক্ত করতে হবে, বিভিন্ন অংশের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে এবং যুক্তিসহ ব্যাখ্যা করতে হবে। এর ফলে কার্যসম্পাদনকারী ব্যক্তি যে বিশ্লেষণী দক্ষতার পরিচয় দেবেন তার ফলশ্রুতিতে ব্যবহারিক কার্যসম্পাদনে অনেকখানি সহজ হতে পারে।

বিশ্লেষণী দক্ষতার মাধ্যমে বিষয়বস্তুকে বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হলে, পরের ধাপে কার্যসম্পাদনকারী ব্যক্তির কর্তব্য হল বিষয়বস্তুটির সম্পর্কে সঠিক ভাবনা গঠন করে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন তত্ত্বগুলিকে সংগ্রহ করা, তাদের অনুশীলন ও পুনরালোচনা করা। শুধুমাত্র তত্ত্ব পর্যালোচনাই নয়, বিভিন্ন তথ্যাবলিও সেই সঙ্গে সংগ্রহ করতে হবে। ব্যবহারিক কার্য সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় বিষযবস্তুটির সংশ্লিষ্ট তত্ত্ব ও তথ্যাবলিকে গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করতে হবে। এজন্য যথেষ্ট ধৈর্য, অধ্যবসায় ও পরিশ্রমী হওয়া বাঞ্ছনীয়। সুতরাং কার্য সম্পাদনকারী ব্যক্তির মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিষয়টির সম্পর্কে আনুপূর্বিক জ্ঞান এবং সুস্পষ্ট আধিপত্য থাকতে হবে।

তথ্যাবলি সংগ্রহ করার সময়ও কার্যসম্পাদনকারী ব্যক্তিকে যথেষ্ট সতর্ক থাকতে হয়, তথ্যগুলিকে যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য হতে হয়, তাদের যথার্থতাও থাকা জরুরি।

তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় কৌশল নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্য। উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তথ্য বা উপাত্ত সংগ্রহের কৌশল নির্বাচন করা দরকার। বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য বা উপাত্ত সংগ্রহ করা যেতে পারে। তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উপাত্ত উৎসের উল্লেখ করা যেতে পারে :

(i) শিক্ষার্থীদের মিথস্ক্রিয়া পর্যবেক্ষণ

(ii) শিক্ষার্থীদের কার্যের বিশ্লেষণ

(iii) শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার গ্রহণ

উপাত্ত সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন টুল (tool) বা কৌশল অবলম্বন করতে হয়। সেগুলি আগে থেকেই যদি পাওয়া যায়, তাহলে ভালো নতুবা কার্যসম্পাদনকারী ব্যক্তিকে নিজে থেকেই tool প্রস্তুত করে নিতে হয়।

Scanned with CamScanner

উপাত্ত সংগ্রহের জন্য নিম্নলিখিত কৌশল (tool) অবলম্বন করা যেতে পারে :

(i) পর্যবেক্ষণ (observation)
(ii) সাক্ষাৎকার (interview)
(iii) প্রশ্নপত্র (questionnaire)
(iv) প্রক্ষেপণ (projection)
(v) ব্যক্তি তদন্ত (case study)

উপাত্ত সংগ্রহের পরবর্তী কার্যটি হল উপাত্ত বিশ্লেষণ এবং তার বিশদ ব্যাখ্যা প্রদান। প্রশ্নের উপর ভিত্তি করে শ্রেণিকক্ষে প্রাপ্ত উপাত্ত ব্যবহার করা যেতে পারে; ব্যক্তিগত পর্যায়ে প্রাপ্ত উপাত্ত ব্যবহার করা যেতে পারে, ছোটো ছোটো দল থেকে প্রাপ্ত উপাত্ত ব্যবহার করা যেতে পারে। কিছু উপাত্ত রাশিবিজ্ঞানের সাহায্যে আবার কিছু তথ্য রাশিবিজ্ঞানের জ্ঞান ছাড়াই বিশ্লেষণ করা যায়। কিছু উপাত্ত বা পরিমাণগত দিক নির্দেশ করে না, সেগুলিকে সামগ্রিক দৃষ্টিতে পর্যালোচনা করে গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলি লিপিবদ্ধ করা দরকার।

উপাত্ত বিশ্লেষণের পর প্রাপ্ত তথ্যাবলির ব্যাখ্যা প্রদান এবং প্রাপ্ত ফলাফলের বিশ্লেষণ-এর প্রেক্ষিতে সাধারণীকরণে পৌঁছে গিয়ে সর্বশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়।

(৩) **সমালোচনা ও উপসংহার :** সামগ্রিক কার্য সম্পাদন এবং প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তার মূল্যায়ন করা দরকার। এই মূল্যায়নের প্রসঙ্গে সম্পাদিত কার্যটির সামগ্রিক সমালোচনার প্রয়োজন হয়। কার্যটির সম্পাদনের ব্যাপারে যদি আরো উন্নতি ঘটানো বা আরো ভালো ফলাফল করার সম্ভাবনা থাকে তাহলে তা করা দরকার।

❑ **ব্যবহারিক অংশ** (Practicum) :

এক্ষেত্রে পাঠক্রমে দুই ধরনের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে এবং বিষয়গুলির মধ্যে যে-কোনো দুটি বিষয় প্রশিক্ষণরত শিক্ষার্থী বা ভাবী শিক্ষককে হাতে কলমে কাজ করতে হবে। প্রথম ধরনের বিষয়ে আছে—

স্থান পরিদর্শন (Visit to place)

স্থান পরিদর্শনের অংশে আছে :

(১) ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শন (Visit to Historical Places)
(২) বাস্তুসংস্থানগত স্থান পরিদর্শন (Visit to Ecological Places)
(৩) বাণিজ্যিক স্থান পরিদর্শন (Visit to Commercial Places)
(৪) রাজনৈতিক স্থান পরিদর্শন (Visit to Political Places)

ভাবী শিক্ষক যখন কোনো স্থান পরিদর্শন বা পরিভ্রমণের কাজটি করবেন তখন তাঁকে পরিদর্শন বা পরিভ্রমণের একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন বা রিপোর্ট তৈরি করতে হয়। স্বাভাবিকভাবে এই কাজের সঙ্গে যুক্ত দুটি বিষয় হল ক্ষেত্রকর্ম (Fieldwork) সম্পাদন এবং অন্যটি হল

ক্ষেত্র সমীক্ষা (Field survey)। এই ক্ষেত্রকর্ম এবং ক্ষেত্র সমীক্ষার সম্পর্কে ভাবী শিক্ষকের কিছু ধারণা থাকা দরকার।

স্থান পরিদর্শনের কার্যটি সম্পন্ন করার পর ভাবী শিক্ষক তাঁর আনুপূর্বিক বিবরণ তাঁর প্রতিবেদনে উল্লেখ করবেন। প্রতিবেদনের একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা নিম্নলিখিতভাবে উপস্থাপন করা হল—

(১) **ভূমিকা :** যে স্থানটি পরিদর্শন করা হয়েছে তার সম্পর্কে একটি প্রাথমিক ধারণা উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। পূর্বপরিকল্পনার কিছু কথাও আলোচনা করার প্রয়োজন আছে।

(২) **পরিদর্শনের উদ্দেশ্য :** স্থানটি কেন পরিদর্শন করা হয়েছে এবং পাঠ্যসূচির কোন্ উদ্দেশ্যটি পূরণ করার জন্য তথা শিক্ষা লাভের জন্য সম্পন্ন হয়েছে তা এই অংশে উল্লেখ করা থাকবে।

(৩) **পরিদর্শন পদ্ধতি :** পরিদর্শন পদ্ধতিটিকে তিনটি অংশে বা পর্বে ভাগ করে আলোচনা করা হবে। সেগুলি হল—(ক) প্রাক্‌ক্ষেত্র সমীক্ষা পর্ব (খ) ক্ষেত্র সমীক্ষাকাল পর্ব (গ) ক্ষেত্রসমীক্ষা পরবর্তী পর্ব।

(৪) **পরিদর্শন বর্ণনা :** যে নির্দিষ্ট স্থানটি পরিদর্শনের জন্য নির্ধারিত করা হয়েছিল তা পরিদর্শন তথা পর্যবেক্ষণের পর স্থানটির বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া দরকার। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার প্রকৃতি অনুসারে স্থানটির প্রাকৃতিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক, বাস্তুসংস্থাগত, বাণিজ্যিক অথবা রাজনৈতিক পরিচয় দেওয়া যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

(৫) **স্থানটির তাৎপর্যপূর্ণ দিক :** নির্ধারিত এবং পরিদর্শিত স্থানটির যে সমস্ত বিশেষ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ দিকগুলি বর্তমান সেগুলি সবিস্তারে বর্ণনা করতে হবে।

(৬) **পরিদর্শনকালীন সমস্যা ও অসুবিধা :** নির্ধারিত স্থানটি পরিদর্শনকালে ভাবী শিক্ষক যদি কোনো অসুবিধার মুখোমুখি হন এবং সেই অসুবিধার কারণে সমস্যায় পড়েন তাহলে সেই অসুবিধা বা সমস্যার নির্দিষ্ট করে উল্লেখ করতে হবে।

(৭) **ভবিষ্যৎ পরামর্শ :** পরিদর্শনকালে অসুবিধা বা সমস্যাগুলি সম্পর্কে যাতে ভবিষ্যতে অন্য পরিদর্শকরা সচেতন হতে পারেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন তার জন্য ভাবী শিক্ষক বা ক্ষেত্রসমীক্ষকের কিছু পরামর্শ থাকা দরকার এই অংশে।

(৮) **ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ও আশা :** নির্ধারিত স্থানটি পরিদর্শনের পর ভাবী শিক্ষকের যে সামগ্রিক উপলব্ধি জন্মাবে তার প্রেক্ষিতে বিচার বিশ্লেষণ করে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা বা আশা প্রত্যাশার একটি দৃষ্টিভঙ্গি উল্লেখ করা থাকবে।

(৯) **উপসংহার ও মন্তব্য :** ভাবী শিক্ষক একটি বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য উপস্থাপন করে এই অংশে প্রতিবেদনের উপসংহার টানবেন।

Scanned with CamScanner

(১) ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শন (Visit to Historical Places) :

ইতিহাস পাঠদানের ক্ষেত্রে শিক্ষামূলক ভ্রমণের (Educational Excursion) গুরুত্ব অপরিহার্য অপরিসীম। ইতিহাসের ঘটনাকে বাস্তবায়িত, চাক্ষুষ ও জীবন্ত করে তুলতে গেলে ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণ একান্ত অপরিহার্য। তবে শিক্ষামূলক ভ্রমণ অতীতের সঙ্গে বর্তমানের যোগসূত্র রচনা করে। তাই বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তকে লিখিত ঘটনাবলি ও মানচিত্র পাঠের সঙ্গে এক নিবিড় ও আত্মিক যোগ-সাজস গড়ে তোলা যায় এই শিক্ষামূলক ভ্রমণের মাধ্যমে। দেখে, শুনে শিখতে পারলে বা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলে সেই শিক্ষা দীর্ঘস্থায়ী হয়। এমন অনেক ঐতিহ্যবাহী মন্দির, মসজিদ, গির্জা, অট্টালিকা, ভগ্ন স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের নিদর্শন, প্রাসাদ, মিনার, স্মৃতিসৌধ প্রাচীন কীর্তি প্রভৃতি স্বচক্ষে দর্শন করলে অতীত ঘটনাবাহি সত্যি বাস্তবায়িত হয়ে ওঠে। তাই বলা যায় "Travelling makes a man perfact" কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'দেশভ্রমণ হল প্রকৃত শিক্ষার গবেষণাগার।'

শিক্ষণে ভ্রমণের গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা (Importance of Excursion in Teaching History) :

শিক্ষণ প্রসঙ্গে শিক্ষামূলক ভ্রমণের গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। যেমন–

(i) ঐতিহাসিক স্থান পরিভ্রমণের ফলে শিক্ষার্থীদের সামনে পুস্তকের লব্ধ জ্ঞানের সামগ্রী প্রত্যক্ষ হয়, ফলে তাদের মানসচক্ষে ইতিহাসের নির্জীব ও বিমূর্ত বিষয় বাস্তব ও জীবন্ত হয়ে ওঠে।

(ii) ভ্রমণ শ্রেণিকক্ষের একঘেয়েমির হাত থেকে শিক্ষার্থীকে মুক্তি দেয়।

(iii) শিক্ষা ভ্রমণের দ্বারা বর্তমান ও অতীতের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হয় এবং ইতিহাস শিক্ষায় পরিপূর্ণতা লাভ করা যায়। (History is the unending dialogue between the present and the past)।

(iv) হাতে-কলমে শিক্ষা বা অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের (Work experience) মধ্য দিয়ে ঐতিহাসিক স্থান পরিভ্রমণ করলে ইতিহাস বিষয়ে জ্ঞান আরও পরিপক্ক হয়।

(v) ভ্রমণের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী বিভিন্ন ঐতিহাসিক উপাদান উপকরণের সঙ্গে পরিচিত হয়। এই জাতীয় পরিচয় হয় চাক্ষুষ ও প্রত্যক্ষ। Johnson তাঁর Teaching of History গ্রন্থে বলেছেন—"The most effective appeal to the sence of reality is of course through reality itself."

(vi) ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণ করলে, কোনো স্থানের ভৌগোলিক অবস্থান, ঐ স্থানের অতীত ঐতিহ্য ভৌগোলিক পরিবেশ ও বিশেষত্ব সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা বাস্তবজ্ঞান লাভে সমর্থ হয়।

(vii) শিক্ষামূলক ভ্রমণের মাধ্যমে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা জন্মে, ভীতির ভাব দূর হয়, ফলে পারস্পরিক সহযোগিতা, সহমর্মিতা, বন্ধুত্ব ও সমবেদনার মনোভাব গড়ে ওঠে।

(viii) ভ্রমণের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের ইতিহাস প্রসিদ্ধ নায়কদের স্মৃতিবিজড়িত স্থানে দাঁড়ালে ঐতিহাসিক চেতনা জীবন্ত বলে মনে হয়।

(ix) এই ভ্রমণের ফলে শিক্ষার্থীদের কৌতূহল জন্মায়। অতীত গৌরবময় ঐতিহ্যের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়।

(x) ঐতিহাসিক ভ্রমণের ফলে বিভিন্ন স্থানীয় ব্যক্তিদের আচার-ব্যবহার, চাল-চলন, সামাজিক রীতিনীতি ও অনুষ্ঠানের সঙ্গে পরিচয় ঘটে এবং তাদের সঙ্গে কথোপকথনে পারস্পরিক ভাব বিনিময় হয়।

(xi) ঐতিহাসিক ভ্রমণের ফলে শিক্ষার্থীর দেহ, মন ও আত্মার পরিপূর্ণ বিকাশলাভ হয়।

(xii) তবে ভারতের বহু ভ্রমণযাগ্য ঐতিহাসিক স্থান দেখার আগ্রহ আমাদের মনকে আকর্ষণ করে থাকে। আজও তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— পাটলিপুত্র, উজ্জয়িনী, মথুরা, থানেশ্বর, বারানসী, আগ্রা, দিল্লি, তক্ষশীলা, নালন্দা, সাঁচি, অজন্তা, আন্দামান নিকোবর, সিমলা, ভাইজ্যাক, আরাকু, পুরী, গোয়া, সুরাট, মাদ্রাজ, কুরুক্ষেত্র, ব্যাঙ্গালোর, অমৃতসর।

এছাড়া আমার রাজ্য পশ্চিমবঙ্গে ভ্রমণের কয়েকটি জায়গা ইতিহাস বিখ্যাত হয়ে আছে, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— মুর্শিদাবাদ, বিষ্ণুপুর, বেড়াচাঁপা, বেলুড়, দক্ষিণেশ্বর, তারাপীঠ, মুকুটমণিপুর, গঙ্গাসাগর, সুন্দরবন, সজনেখালি, বকখালি, হলদিয়া, নবদ্বীপ, বক্রেশ্বর, শান্তিনিকেতন, কৃষ্ণনগর, কলকাতা প্রভৃতি।

সর্বশেষে একথা বলা যায় যে, ইতিহাস শিক্ষণ প্রসঙ্গে এই ভ্রমণ একান্ত অপরিহার্য শিক্ষার অঙ্গ। কারণ ভ্রমণ শুধু আমাদের আনন্দদায়ক না হয়ে উদার মানসিকতা ও চরিত্র গঠনে এবং বাস্তব জ্ঞানার্জনে সাহায্য করে। নেতাজি সুভাষ চন্দ্র তাঁর 'তরুণের স্বপ্ন' গ্রন্থটিতে বলেছিলেন—দেশ ভ্রমণের মাধ্যমে জাতীর উন্নয়ন করা যায়। তিনি মনে করেন, যে জাতি যত বেশি দেশভ্রমণ করে সে জাতি তত বেশি সভ্যতার, অগ্রগতির পথে বলিষ্ঠতা অর্জন করতে সক্ষম হবে।

বস্তুত আমাদের দেশে শিক্ষার্থীরা দর্শনীয় ও শিক্ষণীয় নিদর্শনগুলি যেমন— ছবি, মডেল, চার্ট, পুস্তক, মানচিত্র, Historical album, মূর্তি প্রভৃতি সংগ্রহ করে নিজেদের বিদ্যালয়ে Museum গড়তে পারে। তাই বিদ্যালয় বা কলেজ কর্তৃপক্ষ এবং শিক্ষক শিক্ষার্থীর ঐকান্তিক সহযোগিতায় শিক্ষামূলক ভ্রমণ নিঃসন্দেহে অনুকূল পরিবেশ গড়ে তুলতে পারে। সুতরাং ইতিহাস পাঠে শিক্ষামূলক ভ্রমণ হল এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

Scanned with CamScanner

● **ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ :**

কোনো ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শনকালে ভাবী শিক্ষক কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানার অবশ্যই চেষ্টা করবেন। সেই সমস্ত বিষয়গুলি হল—

(১) পরিদর্শনের জন্য নির্ধারিত স্থানটির অবস্থানগত বৈশিষ্ট্য বা পরিচয়। অবস্থানগত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে থাকবে স্থানটির অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ। রাজনৈতিক অবস্থান হিসেবে তার প্রাদেশিক অবস্থান।

(২) ঐতিহাসিক স্থানটির উৎপত্তি ও বিকাশগত বৈশিষ্ট্য।

(৩) স্থানটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব এবং ঐতিহাসিক গুরুত্ব প্রাপ্তির সময়কাল।

(৪) স্থানটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব প্রাপ্তির কারণসমূহ।

(৫) স্থানটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অবদানকারীদের অবদানের সামান্য পরিচয়।

(৬) স্থানটির অতীত ঐতিহাসিক গুরুত্বের সঙ্গে বর্তমান ঐতিহাসিক গুরুত্বের তুলনামূলক পরিচয়।

(৭) স্থানটির উন্নয়ন ও অবনমন অথবা ধ্বংসপ্রাপ্তির ঘটনা জড়িত থাকলে তারও পরিচয়।

(৮) স্থানটির বর্তমান রক্ষণাবেক্ষণের পরিচয়, সরকারি পদক্ষেপ ও দায়িত্ব পালনের পরিচয়।

(৯) ঐতিহাসিক স্থানটির রাস্তাঘাট, স্থানীয় যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা।

(১০) স্থানটিতে যে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, চিকিৎসালয় ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান যেমন—গ্রন্থাগার, মিউজিয়াম প্রভৃতির পরিচয়।

(১১) স্থানটির জনবিন্যাস সংক্রান্ত পরিচয়, যেমন—কত ধরনের জাতি, আদিবাসী গোষ্ঠী প্রভৃতির জনসংস্থাগত বিবরণ। মানুষের পেশাভিত্তিক জীবনের পরিচয় ইত্যাদি।

(১২) ঐতিহাসিক স্থানটির ঐতিহ্যগত শিল্প সংক্রান্ত পরিচয়। স্থাপত্য, ভাস্কর্যের পরিচয়, অন্যান্য শিল্প-সাহিত্যগত পরিচয় এবং বিবরণ।

(১৩) ঐতিহাসিক স্থানটির উৎসব ও পার্বণ সংক্রান্ত পরিচয়।

(১৪) স্থানটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব বর্তমানে কতখানি প্রাসঙ্গিক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ।

(১৫) ঐতিহাসিক স্থানটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গবেষণাধর্মী কার্যের পরিচয়।

● **ঐতিহাসিক স্থানের কিছু দৃষ্টান্ত :**

ঐতিহাসিক স্থানগুলিকে স্বদেশে মোটামুটি তিন দিক থেকে আমরা ভাগ করতে পারি। (i) আঞ্চলিক ক্ষেত্র, (ii) প্রাদেশিক ক্ষেত্র (iii) রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্র।

(i) **আঞ্চলিক ক্ষেত্রের ঐতিহাসিক স্থান :** ভাবী শিক্ষকের (প্রশিক্ষণরত) নিজের জেলা বা অবস্থিত ঐতিহাসিক স্থানগুলিকে এর অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। যেমন—উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলায় অবস্থিত বেড়াচাঁপা, নদিয়া জেলায় কৃষ্ণনগর, বাঁকুড়া জেলায় বিষ্ণুপুর, মুর্শিদাবাদ জেলায় মুর্শিদাবাদ ইত্যাদি। ব্যক্তির নিজের জেলার ঐতিহাসিক স্থানটি তার নিকট আঞ্চলিক ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক স্থান হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

(ii) **প্রাদেশিক ক্ষেত্রের ঐতিহাসিক স্থান :** পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত ঐতিহাসিক স্থানগুলিকে এই অংশে বিবেচনা করা যেতে পারে, যেমন—

(iii) **রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের ঐতিহাসিক স্থান :** আগ্রার তাজমহল, দিল্লির কুতুবমিনার, লালকেল্লা।

প্রতিবেদন লিখনে সাধারণ নিয়মাবলি

(১) সাধারণত A-4 মাপের (30 সেমি দৈর্ঘ্য ও 21 সেমি প্রস্থ বিশিষ্ট) কাগজের সাদা পৃষ্ঠায় সুন্দর হস্তাক্ষরে প্রতিবেদন লিখতে হবে।

(২) কর্মসূচি সংগঠিতকরণের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ তথা প্রতিবেদনটি প্রশিক্ষণরত শিক্ষার্থীগণ তথা ভাবী শিক্ষক শিক্ষিকাগণ কম বেশি 15-20 পৃষ্ঠায় রচনা করবে।

(৩) প্রতি পৃষ্ঠার বাঁদিকে ও ওপরের দিকে 35 মিলিমিটার এবং ডানদিকে ও নীচের দিকে 20 মিলিমিটার জায়গা বাদ দিতে হবে বা মার্জিন রাখতে হবে।

(৪) হাতের লেখা হবে পরিচ্ছন্ন, স্পষ্ট, নির্ভুল বানান যুক্ত ও সুন্দর।

(৫) মলাট পৃষ্ঠার ওপরের দিকে সংগঠিত কর্মসূচিটির নাম বা শিরোনাম লিখতে হবে।

(৬) মাঝের অংশে স্পষ্ট অক্ষরে লিখতে হবে শিক্ষার্থীর নাম।

(৭) নীচের অংশে লিখতে হবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম এবং যে শিক্ষাবর্ষে পরীক্ষাটি দেওয়া হচ্ছে সেই শিক্ষাবর্ষের উল্লেখ থাকবে।

(৮) ভিতরের প্রথম পৃষ্ঠায় থাকবে সংগঠিত কর্মসূচিটির শিরোনাম, শিক্ষার্থীর নাম, শ্রেণি, রেজিস্ট্রেশন নম্বর, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম, প্রতিবেদন উপস্থাপনের শিক্ষাবর্ষ।

(৯) ভিতরের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় থাকবে বিষয়সূচি এবং তৃতীয় পৃষ্ঠা থেকে শুরু হবে প্রতিবেদনের মূল লেখা।

(১০) প্রতিবেদনের সঙ্গে সংযুক্ত থাকবে প্রাসঙ্গিক কিছু ছবি বা আলোকচিত্র এবং তথ্যাবলি।

(১১) প্রতিবেদন উপস্থাপন শেষে থাকবে শিক্ষার্থীর স্বাক্ষর।

(১২) প্রতিবেদনের সবশেষে শিক্ষকের মূল্যায়ন বা মন্তব্য সহ স্বাক্ষর।

Scanned with CamScanner

❑ ঐতিহাসিক স্থানের চিত্র

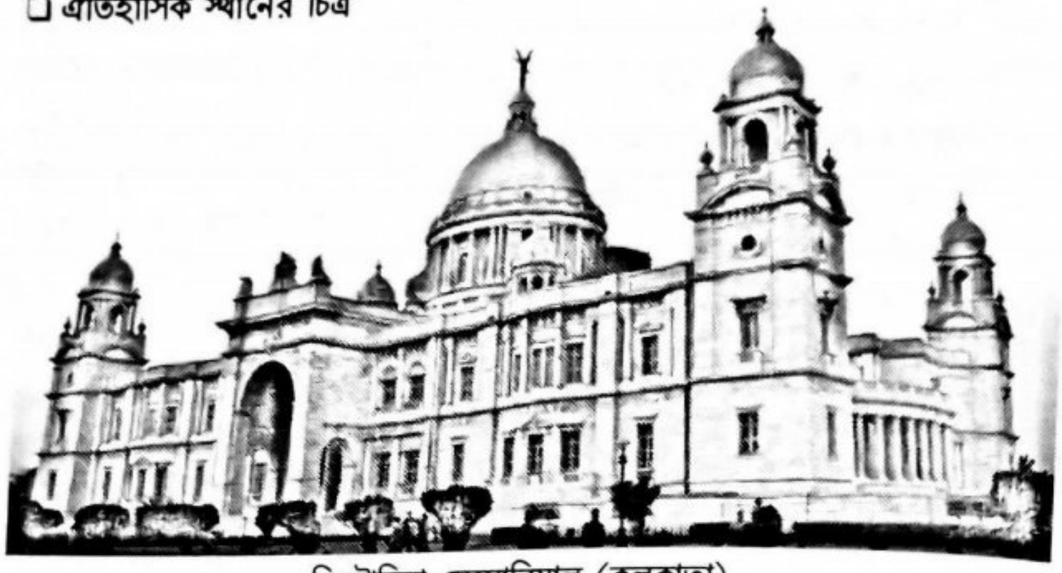

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল (কলকাতা)

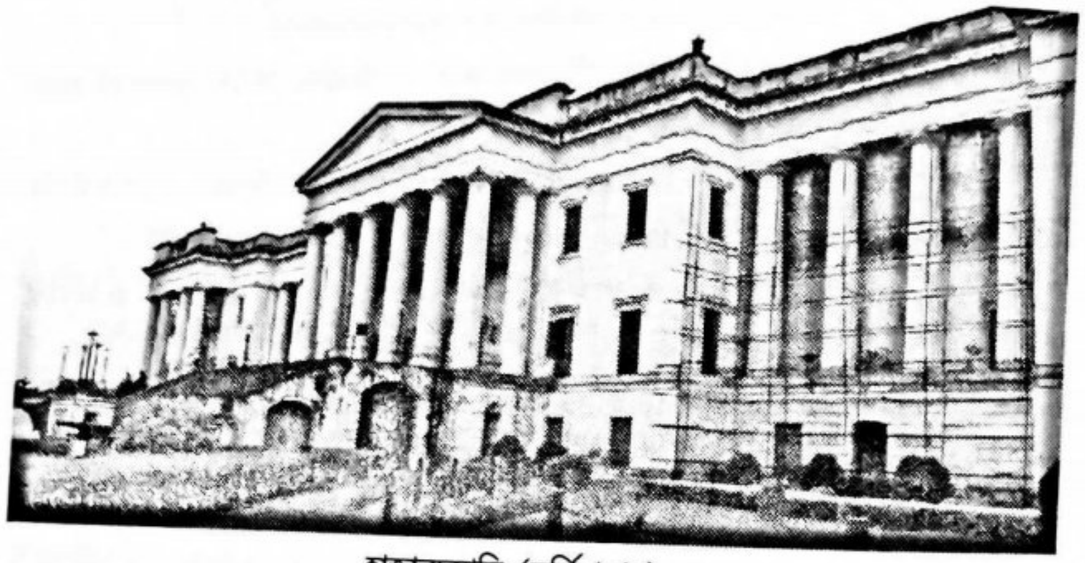

হাজারদুয়ারি (মুর্শিদাবাদ)

রাজবাড়ি (কোচবিহার)

ইন্ডিয়া গেট (দিল্লি)

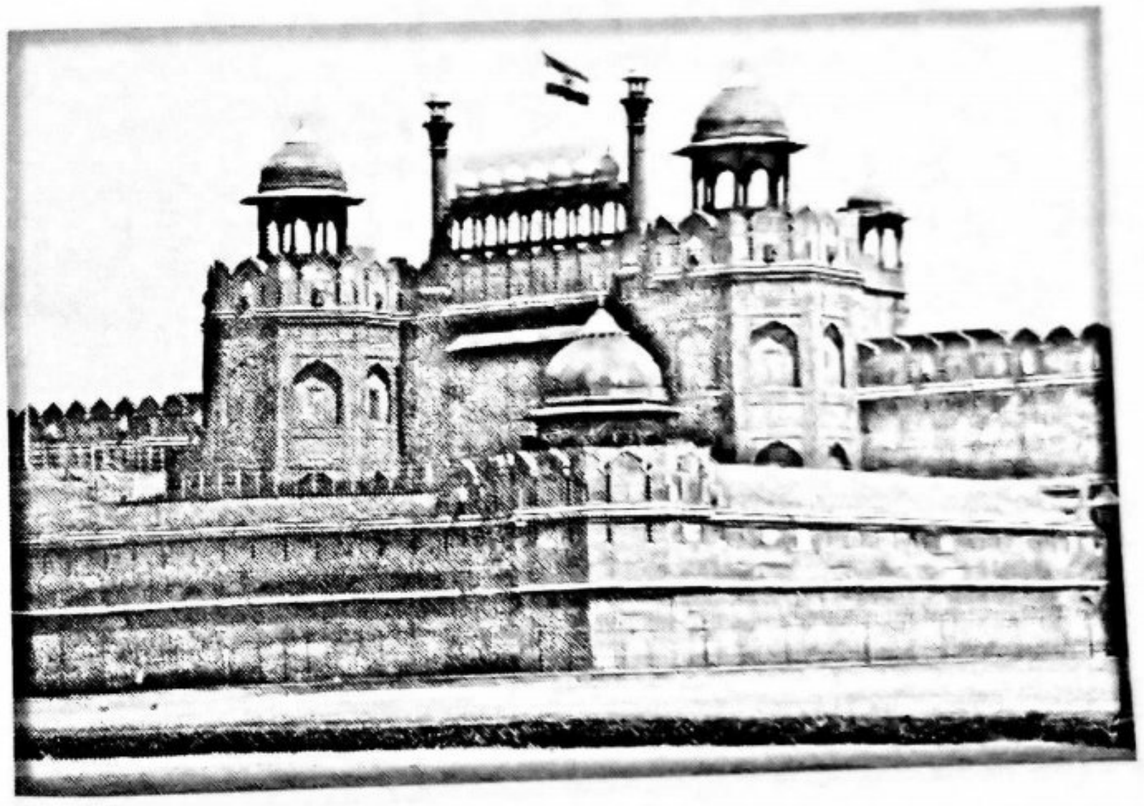

লালকেল্লা (দিল্লি)

Scanned with CamScanner

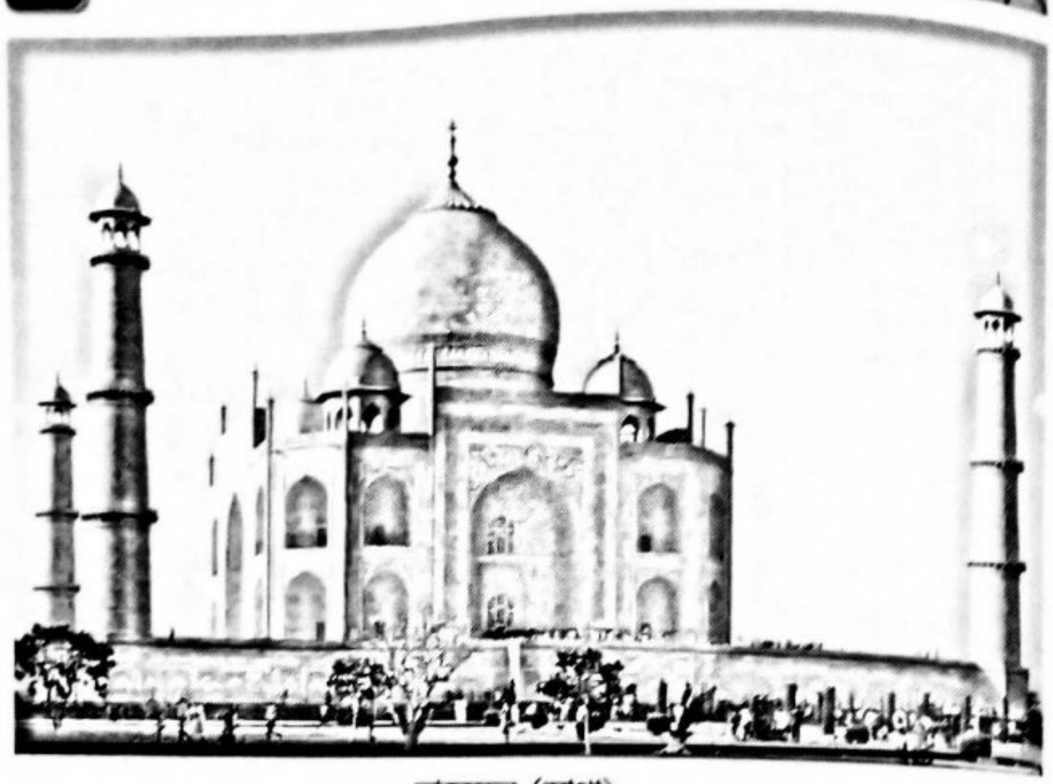

তাজমহল (আগ্রা)

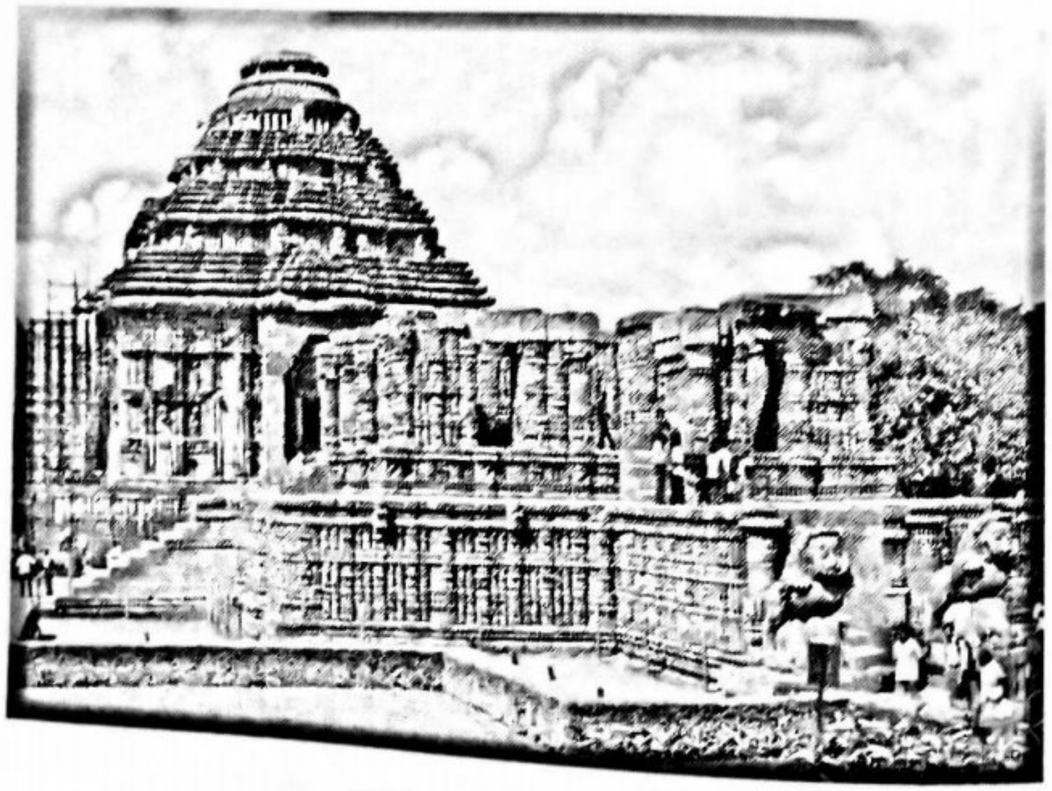

কোনারক মন্দির (ভুবনেশ্বর)

ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শনের ক্ষেত্রে প্রতিবেদন উপস্থাপন করতে হবে নিম্নলিখিত ফর্ম্যাটে

(i) **ভূমিকা (Introduction) :** ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শন প্রসঙ্গ উত্থাপন।

(ii) **উদ্দেশ্য (Objectives) :** যে উদ্দেশ্য নিয়ে ঐতিহাসিক স্থানটি পরিদর্শন করা হয়েছে, সেই উদ্দেশ্যগুলি এক এক করে উল্লেখ করতে হবে।

(iii) **সামগ্রিক পরিকল্পনা (Total Planning) :** ঐতিহাসিক স্থানটি পরিদর্শনের জন্য কীভাবে সামগ্রিক পরিকল্পনাটি গ্রহণ করা হয়েছিল তার বিস্তারিত বিবরণ এই অংশে থাকবে। স্থান পরিদর্শনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কীভাবে সম্পন্ন করা হবে তার পূর্বনির্ধারিত সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনাকে তুলে ধরা দরকার।

(iv) **আর্থিক পরিকল্পনা (Financial Planning) :** সমগ্র পরিদর্শনের কাজটি সুচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তার সংস্থান কীভাবে করা হয়েছে, আর্থিক সংস্থানের পর প্রাপ্ত অর্থ পরিদর্শনের ক্ষেত্রে কোথায় কীভাবে কত পরিমাণ খরচ করা হয়েছে তার বিস্তৃত ও স্পষ্ট একটি বিবরণ থাকবে এই অংশে।

(v) **পরিদর্শনের বিবরণ (Description of visit) :** মূল পরিদর্শনের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা থাকবে এই অংশে। স্থানটির অবস্থান, জলবায়ু, উৎপত্তি, বর্তমান অবস্থা, যোগাযোগ ব্যবস্থা সহ বিভিন্ন দ্রষ্টব্য স্থানগুলির বা অংশগুলির বিবরণ, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট সহ আলোচনা থাকা দরকার এই অংশে।

(vi) **প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব (Need and Importance) :** ঐতিহাসিক স্থানটি পরিদর্শনের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব কতখানি তা এই অংশে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

(vii) **উপসংহার ও মন্তব্য (Conclusion and Remark) :** সমগ্র পরিদর্শনের পর উপসংহারমূলক সামান্য আলোচনা এবং প্রাসঙ্গিক ব্যক্তিগত কিছু মন্তব্য এই অংশে স্থান পাবে।

(viii) **কৃতজ্ঞতা স্বীকার (Acknowledgement) :** সমগ্র পরিদর্শনের ক্ষেত্রে যে সমস্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে বিভিন্ন ধরনের সহযোগিতা পাওয়া গেছে সেই সমস্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে এই অংশে।

ebook.dfascoaching.in

Scanned with CamScanner

○ (২) বাস্তু সংস্থানগত স্থান পরিদর্শন (Visit to Ecological Places) :

❑ বাস্তু সংস্থানের ধারণা (Concept of Ecology) :

ইকোলজি (Ecology) বা বাস্তু সংস্থান শব্দটির মধ্যে প্রাচীনত্ব নেই। ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন **হেনরি থোরু** (Henry Thoreaw) কিন্তু তিনি তাঁর পরিষ্কার ব্যাখ্যা দেননি। ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে জার্মান জীববিজ্ঞানী আর্নস্ট হেকেল (Ernst Haeckel) প্রথম এই শব্দটি বর্তমান অর্থে ব্যবহার করেন। 'Ecology' শব্দটি দুটি গ্রিক মূল শব্দ 'oikos' এবং 'logy' থেকে উদ্ভূত। 'oikos' (ইকোস) শব্দটির অর্থ হল গৃহ (আবাস বা বাস্তু) এবং 'logy' (লজি) শব্দটির অর্থ হল বিজ্ঞান (বা শাস্ত্র)। সুতরাং আক্ষরিক অর্থে ইকোলজি (Ecology) বা বাস্তুসংস্থান হল জীব সমূহের 'আবাস' বা 'বাস্তু' সম্পর্কে অধ্যায়ন বা জ্ঞানচর্চা।

আপন অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে প্রতিটি জীবের কতকগুলি চাহিদা থাকে। পরিবেশ থেকেই জীব তার প্রয়োজনীয় চাহিদাগুলি পূরণ করার চেষ্টা করে। এইভাবে জীব ও তার পরিবেশের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। জীব আর পরিবেশের সম্পর্কটি বেশ জটিল প্রকৃতির। জীবের সঙ্গে পরিবেশের অন্তর্গত জৈব ও অজৈব উভয় প্রকার উপাদানের দ্বারাই প্রভাবিত হওয়ার ঘটনা ঘটে। পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার দ্বারা জীব এইভাবে তার অস্তিত্ব রক্ষার চেষ্টা করে। কোনো একটি জীব তার বেঁচে থাকার জন্য তার নির্দিষ্ট পরিবেশে কীভাবে জৈব ও অজৈব উপাদানগুলির সঙ্গে সহাবস্থান করে তা নিম্ন বর্ণিত রেখাচিত্রের সাহায্যে দেখানো যেতে পারে।

জীব ও পরিবেশের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক

কোনো নির্দিষ্ট পরিবেশে অবস্থানকারী কোনো জীব কীভাবে তার খাদক গোষ্ঠীর হাত থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে, খাদ্য সংগ্রহের চেষ্টা করে, রোগ প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে, স্ব-প্রজাতি রক্ষার্থে অপত্যের সৃষ্টি করে, আশ্রয় বা বাসস্থান তৈরি করে, প্রভৃতি বিষয়গুলি পরিবেশের সঙ্গে জীবটির পারস্পরিক সম্পর্কের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। জীব ও পরিবেশের এই পারস্পরিক সম্পর্কের বিজ্ঞানসম্মত অধ্যয়ন বা পঠনপাঠন হল বাস্তুসংস্থানের বিষয়বস্তু। এই প্রেক্ষিতে বাস্তুসংস্থানগত কতকগুলি মূল প্রশ্ন হল—

(১) কোনো একটি জীব কেন একটি নির্দিষ্ট পরিবেশে অবস্থান করে?

(২) জীবটির তার নির্দিষ্ট আবাসস্থল ছাড়া অন্যত্র কেন বৃদ্ধি ব্যাহত হয়?

(৩) জীবটি তার প্রয়োজনীয় খাদ্য কীভাবে সংগ্রহ করে?

(৪) জীবটি কীভাবে তার অপত্য জীব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়?

(৫) জীবটি তার জন্ম লাভের পর কীভাবে অন্য স্থানে ছড়িয়ে পড়ে?

(৬) জীবটির মৃত্যুর কারণগুলি কী কী?

সুতরাং পরিবেশের সঙ্গে জীবের পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে আরও বহু প্রশ্ন জড়িয়ে আছে। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে, উপরোক্ত ক্ষেত্রে জীব-পরিবেশের সম্পর্ক স্থাপনের একটি মাত্র জীবের কথা ধরা হয়েছে। প্রশ্নগুলি একই প্রজাতিভুক্ত সমস্ত জীবের ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য তেমনি আবার কোনো একটি অঞ্চলে সমগ্র জীব গোষ্ঠীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এই প্রসঙ্গে আরো একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য হল একটি জীবগোষ্ঠী তার পরিবেশের সঙ্গে পারস্পরিক ক্রিয়া বা মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে যে কার্যকরী ব্যবস্থা বা প্রণালী গড়ে তোলে তাকে বলা হয় **বাস্তুতন্ত্র** (Ecosystem)। অন্যদিকে কোনো একটি স্থানের জলবায়ু, মৃত্তিকা প্রভৃতি প্রাকৃতিক উপাদানগুলির ভিত্তিতে ওই নির্দিষ্ট স্থানের উদ্ভিদ ও প্রাণী স্থানীয় পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্কের প্রেক্ষিতে যে বৃহৎ জীবতন্ত্র গড়ে তুলতে সক্ষম হয়, তাকে বলা হয় **বায়োম**। যেমন—নাতিশীতোষ্ণ পর্ণমোচী অরণ্য বায়োম। বিভিন্ন বায়োম সম্মিলিতভাবে গড়ে তোলে **জীবমণ্ডল** (Biosphere)।

● বাস্তুসংস্থানগত স্থান (Ecological Places) :

বাস্তুসংস্থানকে ভিত্তি করে বা জীব ও পরিবেশের পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলশ্রুতিতে গড়ে ওঠে বাস্তুসংস্থানগত স্থানগুলি। সেদিক থেকে একটি বৃহৎ প্রাকৃতিক অঞ্চল যেমন সুন্দরবন বাস্তু সংস্থানগত স্থান তেমনি আবার সুন্দরবনের অন্তর্গত ক্ষুদ্র অঞ্চল যেমন—কোনো পুকুর, নদী, জলাজমি ইত্যাদি। ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ এই সমস্ত অঞ্চল বা স্থানগুলিতে জীব ও পরিবেশের পারস্পরিক ক্রিয়া বা মিথস্ক্রিয়া, খাদ্য-খাদক সম্পর্ক, খাদ্যশৃঙ্খল, খাদ্যজাল, খাদ্য পিরামিড, বাস্তুতন্ত্রে শক্তি প্রবাহের ধারণা গঠনের জন্য প্রশিক্ষণরত শিক্ষক বা ভাবী শিক্ষকের কোনো বাস্তুসংস্থানগত স্থান পরিদর্শন করার প্রয়োজন অবশ্যই আছে। মানব সভ্যতাকে

Scanned with CamScanner

বাঁচিয়ে রাখার জন্য পরিবেশ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা গঠন, পরিবেশের মধ্যে ভারসাম্য রাখার প্রাসঙ্গিকতা, পরিবেশ সংরক্ষণ সংক্রান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হলে বাস্তুসংস্থানগত স্থান পরিদর্শনের প্রয়োজন আছে।

● বাস্তুসংস্থানগত স্থান পরিদর্শনের শিক্ষাগত গুরুত্ব :

বাস্তু সংস্থানগত স্থান পরিদর্শনের ফলশ্রুতিতে যে সমস্ত শিক্ষামূলক গুরুত্ব উপলব্ধি করার সুযোগ আসে সেগুলি হল—

(১) প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পর্কে এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের অন্তর্গত উপাদান সম্পর্কে ধারণা লাভ।

(২) পরিবেশের সঙ্গে জীবের পারস্পরিক ক্রিয়া বা মিথস্ক্রিয়াকে উপলব্ধি করা।

(৩) বাস্তুতন্ত্রের বাস্তব ধারণা গঠন।

(৪) বাস্তুতন্ত্রে অবস্থানকারী জীবদের সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন।

(৫) কোনো নির্দিষ্ট বাস্তুতন্ত্রে উৎপাদক, খাদ্য-খাদক সম্পর্ক, খাদ্যশৃঙ্খল, খাদ্যশৃঙ্খলের গুরুত্ব উপলব্ধি।

(৬) কোনো বাস্তুতন্ত্রের অন্তর্গত উপাদানগুলির মধ্যে কোনটি উৎপাদক, তার প্রকৃতি, কোনটি খাদক, কোনটি কোন শ্রেণির খাদক তা সনাক্তকরণ এবং উপাদানগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ককে সঠিকভাবে জানার সুযোগ ও তথ্য সংগ্রহ করার সুযোগ।

(৭) বাস্তুতন্ত্রের অবস্থানকারী সজীব উপাদানগুলির একটির পরিবর্তন কীভাবে অন্যটির জীবনে প্রভাব বিস্তার করে তা জানার সুযোগ।

(৮) বাস্তুতন্ত্রের অন্তর্গত জড় উপাদানগুলির সঙ্গে সজীব উপাদানের সম্পর্ক, জড় উপাদানগুলির পরিবর্তনে সজীব উপাদানগুলির পরিবর্তনে কী প্রভাব ফেলে তা জানার সুযোগ লাভ।

(৯) বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য রক্ষা এবং ভারসাম্য নষ্ট করার ক্ষেত্রে মানুষের কার্যাবলি উপলব্ধি।

(১০) বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য নষ্টের প্রেক্ষিতে মানবজীবনে তার প্রভাব ও সমস্যা সম্পর্কে উপলব্ধি।

(১১) নিজের অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে বাস্তুতন্ত্রের সঠিক রক্ষণে মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্যকে উপলব্ধি।

(১২) বাস্তুতন্ত্রের উপাদানগুলির বিজ্ঞানসম্মতভাবে সংরক্ষণ করার দৃষ্টিভঙ্গি গঠন।

● বাস্তুসংস্থানগত স্থান পরিদর্শনের ক্ষেত্রে জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহ :

বাস্তুসংস্থানগত স্থান পরিদর্শনকালে ভাবী শিক্ষককে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানার অবশ্যই চেষ্টা করবেন। সেই সমস্ত বিষয়গুলি হল—

(১) বাস্তুসংস্থানগত স্থানটি ভৌগোলিক অবস্থান। রাজনৈতিক অবস্থানগত পরিচয়ও জানা প্রয়োজন।

(২) বাস্তুসংস্থানগত স্থানটির উপাদানগুলির সম্পর্কে পরিচয়।

(৩) বাস্তুসংস্থানগত স্থানটির জড় উপাদান, সজীব উপাদানগুলি কী কী সে সম্পর্কে ধারণা।

(৪) বাস্তুসংস্থানগত স্থানটির মধ্যে সজীব উপাদানগুলি খাদ্য-খাদক সম্পর্কে কীভাবে আবদ্ধ সেই সম্পর্কে পরিচয়।

(৫) বাস্তুসংস্থানগত স্থানটির অতীত ও বর্তমান অবস্থার পরিচয়।

(৬) বাস্তুসংস্থানগত স্থানটির মধ্যে উপাদানগুলির মধ্যে সঠিক ভারসাম্য কতখানি বজায় আছে।

(৭) বাস্তুসংস্থানগত স্থানটির পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে মানবীয় ভূমিকা কতখানি বর্তমান।

(৮) বাস্তুসংস্থানগত স্থানটির ভারসাম্য বিঘ্নিত হলে তা পুনরুদ্ধারের জন্য স্থানীয় মানুষ ও সরকারি ক্ষেত্রে কী কী কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে এবং দায়িত্ব পালনে তাদের ভূমিকা কতখানি।

(৯) বাস্তুসংস্থানগত স্থানটিতে কোনো সংরক্ষণের প্রয়োজন আছে কিনা।

(১০) বাস্তুসংস্থানগত স্থানটিতে কোনো জীবের (উদ্ভিদ বা প্রাণী) বিলুপ্তি ঘটেছে কিনা, বিলুপ্তির সম্ভাবনা আছে কিনা, থাকলে তার জন্য কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে কিনা।

● বাস্তুসংস্থানগত স্থানের কিছু দৃষ্টান্ত :

দার্জিলিং, ডুয়ার্স-অঞ্চল, হিমালয়ের পাদদেশ, হিমালয়ের ওপর অন্যান্য অঞ্চল, সুন্দরবনের বিভিন্ন অঞ্চল, পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়, বাঁকুড়ার শুশুনিয়া, বিহারীনাথ প্রভৃতি পাহাড়ি অঞ্চল, বীরভূম ও বাঁকুড়ার পশ্চিমপ্রান্তে ছোটনাগপুর মালভূমির অংশ। এছাড়াও বিভিন্ন অঞ্চলের পুকুর, স্থানীয় বনাঞ্চল, জলাজমি ইত্যাদি। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ছড়িয়ে রয়েছে নানান ধরনের বৈচিত্র্যপূর্ণ বাস্তুসংস্থানগত স্থান।

Scanned with CamScanner

❑ বাস্তুসংস্থানগত স্থানের চিত্র

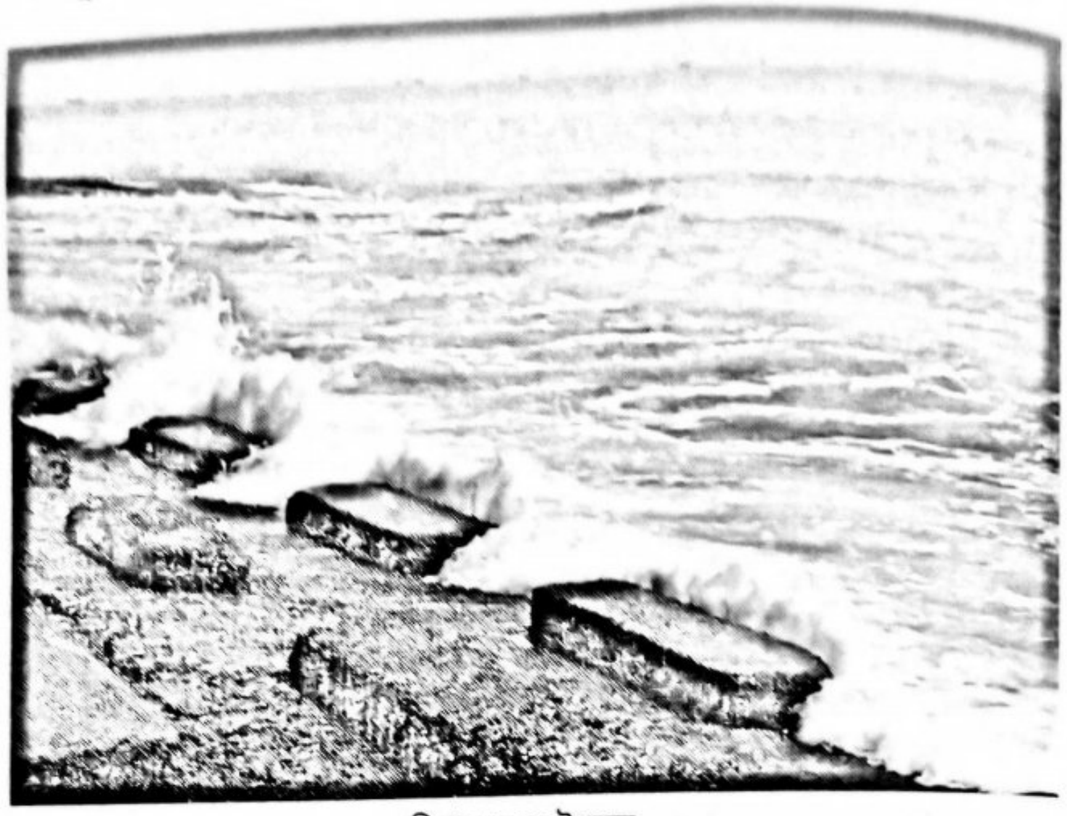

দিঘার সমুদ্র সৈকত

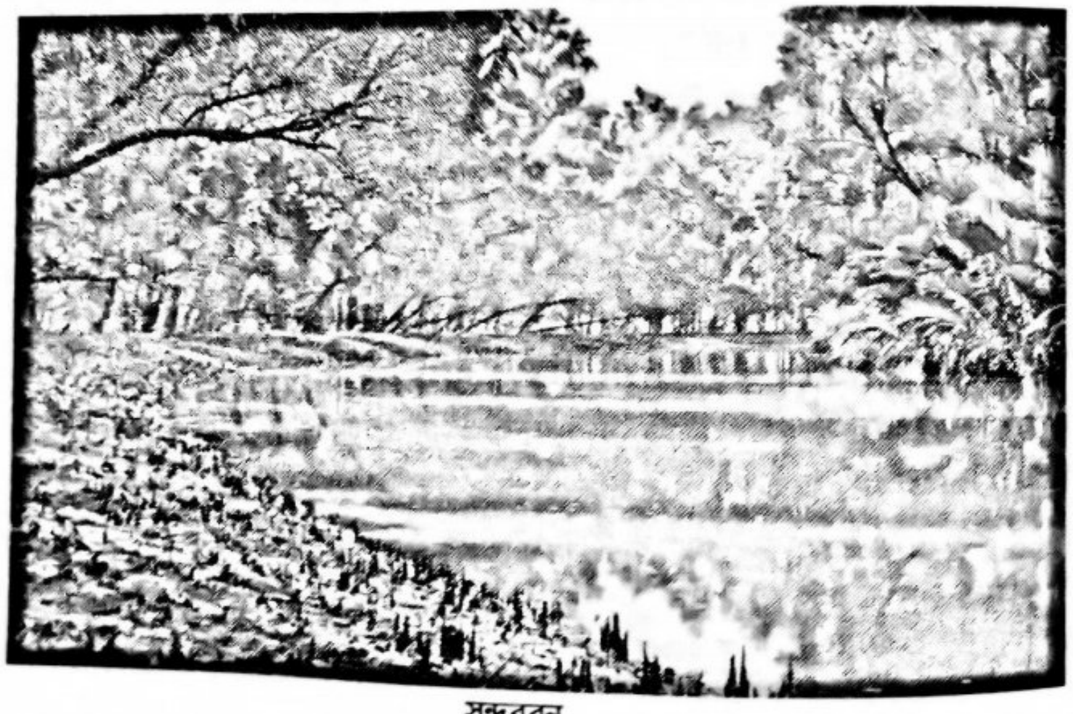

সুন্দরবন

উপরোক্ত কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করে কর্মসূচি সংগঠিত করার পর প্রশিক্ষণরত শিক্ষক-শিক্ষিকা বা ভাবী শিক্ষক-শিক্ষিকাকে প্রতিবেদন উপস্থাপন করতে হবে। প্রতিবেদন উপস্থাপনের (Reporting) বিষয়টি নিম্নলিখিত ছকের সাহায্যে করা যেতে পারে।

(১) ভূমিকা (Introduction)
(২) উদ্দেশ্য (Objectives)
(৩) কর্ম পরিকল্পনা (Plan of Work)
(৪) আর্থিক পরিকল্পনা (Financial Plan)
(৫) কর্মসূচি সংগঠিতকরণ (Organization of Programme)
(৬) প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব (Need and Importance)
(৭) উপসংহার ও মন্তব্য (Conclusion and Remark)
(৮) কৃতজ্ঞতা স্বীকার (Acknowledgement)

Scanning Copyright By DASCoaching.in
Thank You
Visit Our Educational Website
Regularly For More Update:
https://www.dascoaching.in/
Contact Us On:
Facebook: fb/dascoaching.in
YouTube: DAS Coaching
Mail: mailto:contact.dascoaching@gmail.com
Follow on Dailyhunt Apps: DAS Coaching
Telegram: DAS Coaching

Scanned with CamScanner

কর্মসূচি সংগঠিতকরণ (Organization of Programmes)

ব্যবহারিক বা প্রায়োগিক এই বিভাগটিতে আছে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি সংগঠিতকরণ। এই বিভাগের পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি হল নিম্নরূপ :

(i) পরিবেশ সচেতনতা (Environment Awareness)
(ii) সামাজিক সচেতনতা (Social Awareness)
(iii) নির্বাচন সচেনতা (Election Awarness)
(iv) রক্তদান (Blood Donation)
(v) প্রদর্শনী (Exhibition)
(vi) পরীক্ষাগার ভিত্তিক কার্যাবলির প্রতিপাদন (Demonstration of Lab-based activities)

উপরোক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে প্রশিক্ষণকে শিক্ষার্থী বা ভাবী শিক্ষকদের মধ্যে ধারণা ও তাদের প্রয়োগশীলতার দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে কতকগুলি নির্দিষ্ট কর্মসূচি সংগঠিতকরণের কথা এখানে বলা হয়েছে। সেই অনুসারে কাঙ্ক্ষিত ধারণা গঠন ও সেগুলির প্রয়োগশীলতার দৃষ্টিভঙ্গিকে আত্তীকরণের মাধ্যমে ভাবী শিক্ষকগণ ভবিষ্যতে নিজেদের কর্মস্থল বা বিদ্যালয়ে বিভিন্ন শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মধ্যেও নতুন পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুসারে পাঠদানের কাজটি সুসম্পন্ন করতে সক্ষম হবেন। পূর্বোক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে এবার আমরা পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনা করার চেষ্টা করবো।

(1) পরিবেশ সচেতনতা (Environment Awareness) :

পরিবেশ সচেনতা কথাটির মধ্যে দুটি পৃথক শব্দ বর্তমান, একটি হল পরিবেশ ও অন্যটি হল সচেতনতা।

প্রথমেই আমরা দেখে নিই 'পরিবেশ' ও 'সচেনতা' বলতে কী বোঝায়? পরিবেশ বলতে বোঝায় আমাদের চারপাশের অবস্থানকারী বিভিন্ন উপাদান সমূহ, যেমন—জল, মাটি, আলো, বাতাস, পাহাড়, পর্বত, জঙ্গল, মরুভূমি, পশু-পাখি, বিভিন্ন জীবজন্তু ও কীট পতঙ্গ, উদ্ভিদ, জীবাণু প্রভৃতি এবং তাদের পারস্পরিক বিষয় নিয়ে একটি মাধ্যম। 'পরিবেশ'-এর ইংরেজি প্রতিশব্দ 'environment' যার মূলে রয়েছে ফরাসি শব্দ 'environ', যার অর্থ হল পার্শ্ববর্তী এলাকা বা আমরা যাকে বলি 'চারপাশ'। সুতরাং পরিবেশ বলতে আমরা বোঝাতে পারি, আমাদের চারপাশে যা রয়েছে তা, অর্থাৎ যে বাস্তব পরিধির মধ্যে আমরা বাস করি, সেই পরিধিতে অবস্থানকারী বস্তু সমূহ। আমাদের বসবাসের পরিধিতে অবস্থানকারী এই সমস্ত বস্তুগুলিকে বলা হয় পরিবেশের উপাদান। এই সমস্ত উপাদানগুলির পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বা মিথস্ক্রিয়ার সম্মিলিত সত্তাই হল পরিবেশ।

এবার দেখা যাক সচেতনতা (awarness) বলতে কী বোঝায়? সচেতনতা বা awarness হ'ল কোনো ঘটনা, পরিস্থিতি বা সমস্যার বিশ্লেষণ বা পর্যালোচনা করার দক্ষতা বা সামর্থ্য। এই ধরনের দক্ষতা বা সামর্থ্য বিকাশলাভ করে তিনটি পর্যায়ের মাধ্যমে। এই তিনটি পর্যায় হল—সংবেদন, প্রত্যক্ষণ ও ধারণা গঠন। সংবেদন-এর দ্বারা যে প্রাথমিক অনুভূতি জন্মায় তাকে অর্থবহ করে তোলে প্রত্যক্ষণ। প্রাথমিক অনুভবের অর্থপূর্ণ উপলব্ধির পর মানুষ যখন একটা বোধে উপনীত হয় তখনই ঘটে ধারণা। এইভাবে প্রত্যয় লাভ মানবিক সচেতনতার এক ধরনের সক্রিয় অবস্থা। সেদিক থেকে শিক্ষা মানুষের সচেতনতার প্রকাশ ঘটায়। সুতরাং সচেতনতার অর্থ বলা যেতে পারে চেতনার সঙ্গে অর্থাৎ দেখে শুনে বুঝে কোনো কার্যসম্পাদন করা।

এবার আমরা বলতে পারি 'পরিবেশ সচেতনতা' বলতে বোঝায় আমাদের চারপাশে অবস্থানকারী ও প্রভাব বিস্তারকারী বিভিন্ন জৈব ও অজৈব উপাদান সমূহের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও সম্পর্ককে যথার্থভাবে উপলব্ধি বা অবগতিকরণ বা পরস্পরের অস্তিত্ব রক্ষার সহায়ক। দৃষ্টান্ত হিসেবে আমরা বলতে পারি বৃক্ষছেদন রোধ ও বৃক্ষরোপণ কার্য—পরিবেশ সচেতনতার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক।

এই ধরনের পরিবেশ সচেতনতা গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন সচেনতার শিক্ষা। এটি এমন এক ধরনের প্রক্রিয়া যা মানুষের চেতনাকে জাগ্রত করে পরিবর্তিত পরিবেশ কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনের উপযোগী করে তোলে।

● পরিবেশ সচেতনতার বিভিন্ন দিক (Scope of environment awarness) :

পরিবেশ সচেতনতা গড়ে তোলার জন্য প্রথাহীন ও প্রথাগত উভয় ধরনের শিক্ষাকে গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন আছে। প্রথাগত শিক্ষাক্ষেত্রে পরিবেশ বিষয়ে শিক্ষালাভের জন্য বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় স্তরে নিম্নলিখিত চারটি বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া দরকার। সেগুলি হল :

(i) সামাজিক সচেতনতা (Social awareness)
(ii) বাস্তবজীবন পরিস্থিতি উপলব্ধি (Exposure to real life situation)
(iii) পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ে ধারণা (Concepts of environment conservations)
(iv) স্থিতিশীল উন্নয়ন (Sustainable development)

উপরোক্ত চারটি দিক সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল :

(i) সামাজিক সচেতনতা (Social awareness) :

সবচেয়ে উন্নত ও বুদ্ধিমান প্রাণী হিসেবে মানুষ স্বীকৃতি পেলেও অন্যান্য জীবের মতো পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের সাথে পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে তারও সৃষ্টি হয়েছে এই প্রকৃতিতে। সুতরাং প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। মানুষের কাছে পরিবেশ প্রতিভাত হয়েছে দু'ভাবে—প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সামাজিক পরিবেশ হিসেবে। মানুষকে

Scanned with CamScanner

তার অস্তিত্ব রক্ষা তথা জীবন ধারণের জন্য নির্ভর করতে হয় দুটি মৌলিক উপাদানের উপর, সেগুলি জল, মাটি, সূর্যালোক, বায়ু, উদ্ভিদ ও প্রাণী। এই উপাদানগুলির মধ্যে মানুষ নিজে প্রাণী উপাদান এবং মানুষ ছাড়া অন্যান্য সজীব উপাদানগুলির পরিবেশকে দূষিত করার ব্যাপারে কোনো ভূমিকা নেই। অথচ মানুষ নিজে বুদ্ধিমান ও উন্নত জীব হওয়া সত্ত্বেও দূষণে তার ভূমিকা যথেষ্ট। এই বিষয়ে মানুষের যথেষ্ট সচেতন হওয়ার প্রয়োজন আছে। সমাজের সমস্ত মানুষকে সচেতন করার এই বিষয়টিই হল সামাজিক সচেতনতা।

(ii) বাস্তব জীবন পরিস্থিতি উপলব্ধি (Exposure to real life situation) :

পরিবেশ ও মানুষের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক, মানুষের অস্তিত্ব রক্ষায় পরিবেশের গুরুত্ব, মানুষের করণীয় ও দায়িত্ব এই বিষয়গুলিকে নিয়ে চিন্তা করতে হলে মানুষকে তার নিজের বাস্তব জীবন পরিস্থিতিকে উপলব্ধি করতে হবে। প্রতিটি স্বতন্ত্র পারিবেশিক পরিস্থিতিতে সেখানকার মানুষকে উপলব্ধি করার দরকার বাস্তব জীবন পরিস্থিতি বা সেখানকার সমস্যাগুলিকে নিয়ে। পাহাড়ি অঞ্চলের মানুষের যেমন বৃক্ষচ্ছেদন ও ভূমিক্ষয় সম্পর্কে সচেতন করা দরকার তেমনি সমতলের মানুষের জ্ঞান থাকা দরকার জলদূষণ, মাটি দূষণ, বায়ুদূষণ প্রভৃতি সম্পর্কে।

(iii) পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয় ধারণা (Concept of environment conservation) :

পরিবেশে অবস্থানকারী বস্তুসমূহ বা উপাদানগুলির প্রকৃতপক্ষে বিনাশ ঘটে না, ঘটে সেগুলির রূপান্তর। বস্তু বা উপাদানগুলির এই বৈশিষ্ট্য বা ধর্মকে কাজে লাগিয়ে পরিবেশকে মানুষের সংযমী ও বিবেচনাধর্মী ক্রিয়াকলাপের দ্বারা সংরক্ষণ গুরুত্ব পেয়েছে। সমাজবদ্ধ মানুষের সমস্ত রকম উদ্দেশ্য, প্রয়োজন এবং চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে প্রকৃতির সজীব ও জড় উপাদানগুলির যথাযথভাবে ব্যবহার করার জন্য সংরক্ষণবিদদের যুক্তিসম্মত নির্দেশ কার্যকরী করাকে বলা হয় **পরিবেশ সুরক্ষা**। এই প্রসঙ্গেই এসেছে পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়টি। এই বিষয়টি সম্পর্কে ধারণা থাকাও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

(iv) স্থিতিশীল উন্নয়ন (Sustainable development) :

প্রাকৃতিক উপাদানগুলিকে সঠিকভাবে সংরক্ষণ করতে না পারলে এবং এগুলির পরিবর্ত দ্রব্য উদ্ভাবন করতে না পারলে মানুষের প্রয়োজনীয় সীমিত সম্পদমূলক উপাদানগুলি অচিরেই নিঃশেষ হয়ে যাবে। এই ঘটনা পৃথিবীতে মানবজাতির অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে তুলবে। এই পরিস্থিতিতে স্থিতিশীল উন্নয়নের প্রসঙ্গটি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

- স্থিতিশীল উন্নয়নের মাধ্যমে একদিকে বর্তমান চাহিদা যেমন মেটানো যায় তেমনি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রয়োজন মেটানোর ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকে না।
- স্থিতিশীল উন্নয়নের মাধ্যমে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখা এবং মানুষের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নতি ঘটানো সম্ভব।
- স্থিতিশীল উন্নয়ন সামাজিক সাম্য ও সামাজিক ন্যায় রক্ষা এবং সামাজিক বিশৃঙ্খলাকে হ্রাস করতে সক্ষম।

স্বাভাবিকভাবেই স্থিতিশীল উন্নয়নের দিকটি সম্পর্কে আমাদের যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন আছে।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে পরিবেশ সচেতনতা গড়ে তোলা একটি অতীব উল্লেখযোগ্য বিষয় যা শুধু শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষার্থী কিংবা শিক্ষিত মানুষজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এর বিস্তৃতি ঘটানো দরকার আছে সমস্ত রকম মানুষের মধ্যে। পরিবেশ সচেতনতা গড়ে তোলার জন্য কতকগুলি কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে—

(ক) ক্ষেত্র সমীক্ষা সম্পাদন
(খ) অনুসন্ধান মূলক কার্যসম্পাদন
(গ) প্রকল্পমূলক ক্রিয়া সম্পাদন
(ঘ) প্রচারকার্য, বিতর্কসভার আয়োজন, সেমিনার প্রভৃতি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা ইত্যাদি।

উপরোক্ত কার্যকরী পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করতে হলে যে কর্মসূচি সংগঠিত করতে হবে তার জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নির্মাণ ও বাস্তবায়িত করার পর প্রতিবেদন লিখনের মাধ্যমে তুলে ধরতে হবে।

❑ পরিবেশ সচেতনতামূলক কর্মসূচির চিত্র

চিত্র-১

Scanned with CamScanner

চিত্র-২

চিত্র-৩

প্রতিবেদন লিখন (Reporting) এর কাজটি নিম্নলিখিত ছক বা ফর্ম্যাটকে (format) অনুসরণ করে করা যেতে পারে :

● **প্রতিবেদন লিখন (Reporting) :**

(১) **ভূমিকা (Introduction) :** পরিবেশ সচেতনতার বিষয়টি সম্পর্কে দু-চারটি কথা, তার পরিপ্রেক্ষিত ও প্রাসঙ্গিকতা উল্লেখ করতে হবে। পরিবেশ সচেতনতার যে দিকটি সম্পর্কে কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে হবে।

(২) **উদ্দেশ্য (Objectives) :** পরিবেশ সচেতনতার যে দিকটি কর্মসূচি সংগঠিতকরণের জন্য গ্রহণ করা হয়েছে তার উদ্দেশ্যগুলি পয়েন্ট ভিত্তিক উল্লেখ করতে হবে।

(৩) **কর্ম পরিকল্পনা (Plan of Work) :** পরিবেশ সচেতনতার সুনির্দিষ্ট দিকটি যা সংগঠিত করা হচ্ছে বা হয়েছে তার বিস্তারিত ও পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা তুলে ধরতে হবে। কর্ম পরিকল্পনাটি পর্যায়ক্রমিক ভাবে কীভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে তার পরিকল্পিত বিস্তারিত বিবরণ এখানে লিপিবদ্ধ করা থাকবে।

(৪) **আর্থিক পরিকল্পনা (Financial Plan) :** আর্থিক সংস্থানের বিষয়, তা খরচ করার সুনির্দিষ্ট যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল তার একটি স্বচ্ছ রূপরেখা থাকবে এই অংশে।

(৫) **কর্মসূচি সংগঠিতকরণ (Organization of Programme) :** গৃহীত কর্ম পরিকল্পনা অনুসারে কীভাবে সমগ্র কর্মসূচিটি সংগঠিত করা হয়েছে তা আনুপূর্বিক বিবৃত করা হবে এই অংশটিতে প্রয়োজনীয় তথ্য, চিত্রাবলি পরিবেশিত করা হবে।

(৬) **প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব (Need and importance) :** পরিবেশ সচেতনতার সুনির্দিষ্ট দিকটি যা সংগঠিত করা হয়েছে তার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সমাজ ও ব্যক্তিজীবনে কতখানি তা উল্লেখ করতে হবে।

(৭) **উপসংহার ও মন্তব্য (Conclusion and Remarks) :** সমগ্র কর্মসূচি রূপায়ণ তথা সংগঠিত করার পর উপসংহারমূলক সামান্য আলোচনা এবং প্রাসঙ্গিক কিছু মন্তব্য এই অংশে স্থান পাবে।

(৮) **কৃতজ্ঞতা স্বীকার (Acknowledgement) :** সমগ্র কর্মসূচিটি পরিকল্পিতভাবে সংগঠিত করতে গিয়ে যে সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা, ব্যক্তিবর্গ, প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে বিভিন্ন ধরনের সহযোগিতা পাওয়া গেছে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার দিকটি তুলে ধরতে হবে সযত্নে ও আন্তরিকভাবে।

পরিবেশ সচেতনতা প্রসঙ্গে কয়েকটি দিক : পরিবেশ সচেতনতা প্রসঙ্গে যে সমস্ত দিকগুলি পরিকল্পিতভাবে গ্রহণ করা যেতে পারে সেগুলির মধ্যে কয়েকটি হল :

Scanned with CamScanner

(১) বৃক্ষছেদন হ্রাস ও বৃক্ষরোপণ কার্যাবলি
(২) জলদূষণ নিয়ন্ত্রণের পদক্ষেপ গ্রহণ প্রসঙ্গ
(৩) পরিবেশ পরিচ্ছন্নতার দৃষ্টিভঙ্গি গঠন
(৪) বিদ্যালয়ের নিকটবর্তী কোনো গ্রাম্য পরিবেশ সমীক্ষা
(৫) বিদ্যালয়ের নিকটবর্তী কোনো শহরাঞ্চলের কোনো ওয়ার্ডের পরিবেশ সমীক্ষা ইত্যাদি।

(2) সামাজকি সচেতনতা (Social awareness) :

সামাজিক সচেনতার বিষয়টিতে দুটি দিক উল্লেখ করা হয়েছে, একটি সমাজ প্রসঙ্গ এবং অন্যটি হল সচেতনতার প্রসঙ্গ। আমরা প্রথমে সমাজ বা সামাজিক প্রসঙ্গটি সংক্ষেপে আলোচনা করবো।

সমাজ সম্বন্ধে সমাজ তাত্ত্বিকগণ যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাকে মোটামুটিভাবে দুটি ধারায় বিভক্ত করা যেতে পারে—একটি হল প্রক্রিয়া এবং অন্যটি হল সুসংবন্ধ কাঠামো। দুটি দৃষ্টিভঙ্গিই পরস্পর পৃথক নয়, দুটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার ফলশ্রুতি। **ম্যাকাইভার** এর মতো সমাজতাত্ত্বিক সমাজকে একটি প্রক্রিয়া হিসেবে দেখেছেন, তাঁর মতে—সমাজ সতত পরিবর্তনশীল সামাজিক সম্বন্ধজাল (ever-changing web of social relationships)। আবার সমাজকে যে সমস্ত সমাজতাত্ত্বিক সুসংবন্ধ কাঠামো হিসেবে দেখেছেন তাঁদের মতে— সমাজ হল ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পর সংযুক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত আচার-ব্যবস্থার সমাবেশে গড়ে ওঠা সুসংবাদ এক কাঠামো।

সচেতনতার প্রসঙ্গটি আমরা আলোচনা করেছি পরিবেশ সচেতনতার প্রসঙ্গটি আলোচনা করতে গিয়ে। সেখানে আমরা দেখেছি সচেতনতা বলতে বোঝায় চেতনা বা উপলব্ধির সঙ্গে অর্থাৎ দেখেশুনে বুঝে কার্য-সম্পাদন করা।

সুতরাং সামাজিক সচেতনতা বলতে আমরা বোঝাতে পারি সমাজের সমস্ত সদস্য বা মানুষকে জীবন পরিস্থিতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পরিবেশের বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও সামাজিক উপাদানগুলি বিষয়ে সচেতন করার প্রসঙ্গ।

পরিবেশ সচেতনতা গড়ে তোলার মতো সামাজিক সচেতনতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও অত্যন্ত জরুরি হল সচেতনতার শিক্ষা (awarness education)। এই ধরনের শিক্ষা প্রক্রিয়া সমাজবদ্ধ মানুষকে পরিবর্তিত পরিবেশে মানুষের চেতনাকে জাগ্রত করে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনের উপযোগী করে গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

সামাজিক প্রক্রিয়া প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি মানুষে মানুষে পারস্পরিক সম্পর্ক এক অবিচ্ছেদ্য প্রবাহ। সমাজতাত্ত্বিক **জিনসবার্গ** (Ginberg) এর মতানুসারে প্রধান গোষ্ঠী আর প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ই সামাজিক কাঠামো। অন্যদিকে **স্যামুয়েল কোনিগ** (Samuel Koenig) এর মতানুসারে মানুষের কার্যকারণ সম্পর্কের মধ্যেই রয়েছে মানুষের গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনযাত্রা

সংক্রান্ত নানাবিধ মানবিক সম্পর্ক। এই সমস্ত পরিবর্তনশীল মানবিক সম্পর্কই হল সামাজিক প্রক্রিয়া। মানব সমাজের গঠনগত দিক থেকে তার কার্যকারণ দিক পৃথক করা সম্ভব নয়। বরং সামগ্রিক দিক থেকে বলা যেতে পারে সমাজবদ্ধ মানুষের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সমন্বিত রূপই হল সামাজিক প্রক্রিয়া। এই সামাজিক প্রক্রিয়াই সমাজকে করে তোলে গতিশীল। এই সামাজিক প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধরন প্রসঙ্গে **পার্ক** ও **বার্জেস** (Park and Burges) যা বলেছেন তা হল :

(i) প্রতিযোগিতা (Competition)
(ii) দ্বন্দ্ব (Conflict)
(iii) উপযোজন (accomodation)
(iv) আত্তীকরণ

সমাজতাত্ত্বিক **মারটন** এবং **ম্যাকাইভার** উপরিউক্ত সামাজিক প্রক্রিয়াগুলির সঙ্গে সংযুক্ত করেছেন সহযোগিতাকে (co-operation)। এই সমস্ত সামাজিক প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে সহযোগিতাকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমাধান প্রক্রিয়া বলে সমাজতাত্ত্বিকগণ মনে করেন। সমাজের অস্তিত্ব সহযোগিতাকে বাদ দিয়ে সম্ভব নয়। সমাজতাত্ত্বিক সি. এইচ. কুলে (C. H. Cooley) তাঁর 'Social Organization' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন যে, সামাজিক সচেতনতা ও বিচারশীল সহযোগিতা সম্প্রসারণই ইতিহাসের মূল ঘটনা এবং সহযোগিতার মতো সামাজিক প্রক্রিয়া ছাড়া সমাজে মানুষে মানুষে সম্পর্ক গড়ে ওঠা সম্ভব নয়। স্বাভাবিকভাবেই সামাজিক সচেনতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সমাজ ও সামাজিক ক্রিয়াকে যথাযথ অনুধাবন যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

সামাজিক সচেতনতার বিভিন্ন দিক : যে-কোনো একটি রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে বা বৃহত্তর সামাজিক ক্ষেত্রে বা জাতির জীবন ক্ষেত্রে সামাজিক সচেতনতার বিভিন্ন দিককে তুলে ধরা যেতে পারে। যেগুলি মানব সমাজের অস্তিত্ব রক্ষা তথা প্রগতির ধারাকে বহন করে নিয়ে যেতে সক্ষম। সেইরকম কতকগুলি সামাজিক সচেতনতার দিক হল :

(i) সর্বজনীন শিক্ষা প্রসঙ্গে প্রচার ও প্রসার,
(ii) বয়স্ক শিক্ষার প্রচার ও প্রসার,
(iii) সমাজ জীবনে কুসংস্কার ও অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ,
(iv) সমাজ সেবামূলক ক্রিয়ার অংশগ্রহণ,
(v) সৃষ্টিশীল সামাজিক কাজের দৃষ্টিভঙ্গি গঠন,
(vi) সমাজ কল্যাণমূলক মূল্যবোধ গঠন,
(vii) সামাজিক সংহতি স্থাপন,
(viii) জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণ ইত্যাদি।

Scanned with CamScanner

সামাজিক সচেতনতার উপরোক্ত বিভিন্ন দিকগুলিকে সুনির্দিষ্টভাবে গ্রহণ করে পরিকল্পিতভাবে বিভিন্ন কর্মসূচি সংগঠিতকরণ সম্ভব। এজন্য যে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে, সেগুলি হল :

(ক) ক্ষেত্রসমীক্ষা সম্পাদন

(খ) অনুসন্ধানমূলক কার্য সম্পাদন

(গ) প্রকল্প ভিত্তিক কার্য সম্পাদন

(ঘ) প্রচারকার্য, বিতর্কসভা, সেমিনার বা আলোচনা চক্রে প্রভৃতি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা ইত্যাদি।

ebook.dascoaching.in

❑ **সমাজ সচেতনতামূলক কর্মসূচির চিত্র**

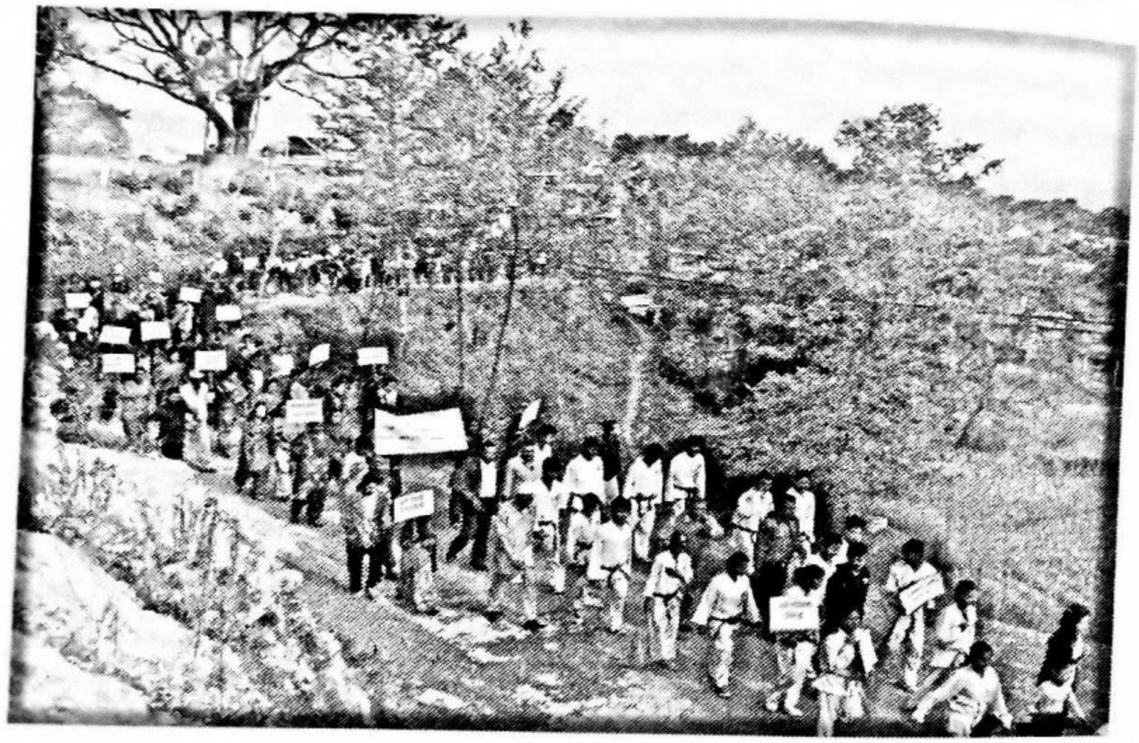

উপরোক্ত কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করে কর্মসূচি সংগঠিত করার পর প্রশিক্ষণরত শিক্ষক-শিক্ষিকা বা ভাবী শিক্ষক-শিক্ষিকাকে প্রতিবেদন উপস্থাপন করতে হবে। প্রতিবেদন উপস্থাপনের (Reporting) বিষয়টি নিম্নলিখিত ছকের সাহায্যে করা যেতে পারে।

(১) ভূমিকা (Introduction)

(২) উদ্দেশ্য (Objectives)

(৩) কর্ম পরিকল্পনা (Plan of Work)

(৪) আর্থিক পরিকল্পনা (Financial Plan)

(৫) কর্মসূচি সংগঠিতকরণ (Organization of Programme)

(৬) প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব (Need and Importance)

(৭) উপসংহার ও মন্তব্য (Conclusion and Remark)

(৮) কৃতজ্ঞতা স্বীকার (Acknowledgement)

(4) রক্তদান (Blood Donation) :

'পরের জন্য আত্মবিসর্জন ভিন্ন পৃথিবীতে স্থায়ী সুখের অন্য কোনো মূল্য নাই'। এ পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে মানুষ আসে, মানুষ যায়। অনাদিকাল ধরে চলেছে যাওয়া আর আসার এই অনন্ত খেলা। মৃত্যু তো জন্মেরই অনিবার্য পরিণতি। মানুষ তাই যুগে যুগে এই মৃত্যুকে মহিমান্বিত করতে চেয়েছে। চেয়েছে জন্মগ্রহণের ঋণকে অর্থময় করে তুলতে। মানুষের বড়ো পরিচয় সে সামাজিক জীব। পারস্পরিক সহযোগিতায় তার অগ্রগতি, পরহিতে প্রাণদান তার স্থায়ী সুখ, প্রেমমৈত্রীর মেলবন্ধনে তার অস্তিত্ব, বিকাশ। বিচ্ছিন্নতায় তার ধ্বংস। স্বার্থপরতায় তার অনগ্রসরতার অভিশাপ। যুগে যুগে তাই ইতিহাস -সাহিত্য-কাব্যে উচ্চারিত হয়েছে মানবসেবার জয়গান। 'রক্তদান' সেই পরহিত ব্রতেরই এক সুমহান ঐতিহ্য। বর্তমান বিশ্বে এর ব্যাপ্তি ও গভীরতা তাই আরও বেশি।

সেই প্রাচীন যুগ থেকেই রোগ নিরাময়ের চেষ্টা করছেন ভিষকশ্রেণি। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে চিকিৎসা বিজ্ঞানেও হয়েছে উন্নতি। কিন্তু এক মানুষের রক্ত অন্য মানুষের দেহে সঞ্চালিত করে তাকে বাঁচিয়ে তোলার জন্য প্রয়োজন ছিল আধুনিক যুগে। এজন্যে চিকিৎসা-বিজ্ঞানে চলেছে দিনের পর দিন অক্লান্ত সাধনা। চিকিৎসা-বিজ্ঞানীর নিরলস পরীক্ষা-নিরীক্ষায় একদিন রক্তদানের প্রাথমিক জটিলতা দূর হল। তাঁরা দেখেছেন মানবদেহে অন্য প্রাণীর রক্ত সঞ্চালন করে কোনো ব্যক্তিতে নিরাময় করা যায় না। বরং তার পরিণতি হয় ভয়াবহ। দেখেছেন মানুষের রক্তও নির্বিচারে অন্য মানুষের দেহে সঞ্চালিত করা যায় না। রক্তের উপাদান এক হলেও ব্যক্তিভেদে তার তারতম্য ঘটে। ভিয়েনার চিকিৎসা-বিজ্ঞানী **কার্ল ল্যান্ড স্টিনার** এক স্মরণীয় নাম। তিনি রক্তের গ্রুপ নির্ণয়ে আরও গবেষণা করলেন। মানুষের রক্তকে চারটি গ্রুপে বিভক্ত করা হল, A, B, AB আর O গ্রুপ। অবশ্য রক্তের গ্রুপ

Scanned with CamScanner

নির্ণয়ের প্রথম কৃতিত্ব বিজ্ঞানী **Landois**-এর ১৮৭৫ সাল। রোগাক্রান্ত ব্যক্তির রক্তের গ্রুপের সঙ্গে মিলিয়েই সুস্থদেহের রক্ত তার মধ্যে সঞ্চালিত করা হয়। অবশ্য তার আগে Rh গ্রুপও দেখা হয়।

রক্তদান শুভচেতনাসম্পন্ন মানুষের কাছে এক মহান ব্রত। পরহিতের এর অভ্রান্ত প্রমাণ। মুমূর্ষ মানুষকে বাঁচানোর প্রয়োজনে ছাত্র-যুবক, কত খ্যাত-অখ্যাত মানুষ এসে মিলিত হয় এই কর্মযজ্ঞে। রক্তদান সম্পর্কে অনেকের মধ্যেই রয়েছে ভ্রান্ত ধারণা। কিন্তু উপযুক্ত বয়সে একজন সুস্থ ব্যক্তির দেহ থেকে ২৫০ সি. সি. রক্ত এককালে টেনে নেওয়া যায়। এতে শরীরের কোনো ক্ষতি হয় না। ঘাটতি রক্ত সাতদিনের মধ্যেই পূর্ণ হয়ে যায়। শুধু রক্তদান নয়, রক্ত সংরক্ষণও এর একটি প্রয়োজনীয় দিক। চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা গ্রহণ করেছেন রক্তদানের বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি। রক্তসংরক্ষণের বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া হয়েছে আবিষ্কৃত। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ব্লাড-ব্যাঙ্ক। হাসপাতালে, চিকিৎসাকেন্দ্রে রয়েছে এই ব্লাড-ব্যাঙ্ক। প্রথম ব্লাড-ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয় আমেরিকার শিকাগো শহরে। সনর ১৯৩৭ সাল। প্রতি সুস্থ মানবদেহ থেকে ২৫০ সি.সি. রক্ত নিয়ে একটি বোতলে রাখা হয়। বোতলটি ৫০ সি.সি. অ্যাসিড সাইট্রেট ডেক্সট্রোজ সম্বলিত। বোতলের রক্ত জমাট না বাঁধার বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেন বৈজ্ঞানিক **Houstain**, ১৯১৪ সালে। রক্তের গ্রুপ ধরে প্রত্যেকটি বোতলকে পৃথক পৃথক শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। প্রতিটি বোতলের গায়ে সেই রক্তের ব্যবহারযোগ্য সময়সীমাও উল্লেখ থাকে। রক্তের অবিকৃত থাকা নির্ভর করে তাপমাত্রা ও অন্যান্য পারিপার্শ্বিকতার ওপর। ৪° ডিগ্রি থেকে ৬° সেন্টিগ্রেড তাপসমন্বিত ফ্রিজে তিন মাস পর্যন্ত এই রক্ত বিশুদ্ধ থাকে।

রক্তদান মানুষের সংস্কৃতির এক অনন্য অভিজ্ঞান। এখানে সাদা-কালোর ভেদ ঘুচে যায়। ধর্মান্ধতার ঠাঁই নেই। সব রক্তের রং লাল। জাতিবর্ণ বর্ণ নির্বিশেষে রক্তদান এক পবিত্র কর্তব্য। মনুষ্যত্বের প্রকাশ। মনে রাখতে হবে, রক্তদানের অর্থ একটি অকাল মৃত্যুকে রোধ করা, একজন মুমূর্ষুকে বাঁচিয়ে তোলা। এ জনসেবারই অঙ্গ। মানুষ নামেরই বড়ো পরিচয়। স্বার্থপরতার পাষাণ প্রাচীরে আজ মানুষের বিবেক মাথা কুটছে। কেঁদে কেঁদে ফিরছে এক নগ্ন প্রাণ। রক্তদান হয়তো মানুষের এই কান্নার অবসান, দহন-জ্বালার শীতল প্রলেপ। সনর এসেছে এই মহান ব্রতকে দিক-দিগন্তে ছড়িয়ে দেওয়ার। সনর এসেছে নবজাতকের কাছে এক নতুন অঙ্গীকার রেখে যাওয়ার। এ অঙ্গীকার মানবতার, এ অঙ্গীকার নতুন করে উজ্জীবনের, এ অঙ্গীকার স্বার্থপরতার নির্মোক ভাঙার, আত্মপরতা বিসর্জনের।

● **রক্তদানের গুরুত্ব :**

(১) রক্ত মানবদেহের একটি অপরিহার্য উপাদান। মানুষ প্রতিনিয়ত খাদ্যবস্তু গ্রহণ করছে। সেই খাদ্য পরিপাক যন্ত্রের নানা ক্রিয়া পদ্ধতির মাধ্যমে ও দেহের ভিতরকার হরমোন ইত্যাদির সাহায্যে রক্তে পরিণত হচ্ছে।

(২) এই রক্ত সারা দেহে সঞ্চালিত হয়, সেজন্যেই মানুষ সক্রিয় ও সজীব, রক্তই জীবন। রক্তের অভাবে মৃত্যু। রক্তই প্রাণের বিকল্প। কোনো রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় আজও রক্ত তৈরি সম্ভব হয় নি। তাই রক্তের প্রয়োজনে মানুষ মানুষের কাছেই ছুটে আসে।

(৩) রক্তের বিকল্প রক্তই। সতেজ রক্তের ছোঁয়া পেয়েই আর্ত মরণাপন্ন মানুষ বেঁচে উঠে।

(৪) প্রয়োজনের চেয়ে কিছু বেশি পরিমাণ রক্ত মানুষের শরীরে থাকতে পারে। নানা কারণে দেহে রক্তের পরিমাণ কমে। ক্রমাগত রোগভোগের ফলে রক্তের পরিমাণ ক্রমশ কমতে থাকে। দুর্ঘটনায় অত্যধিক রক্তক্ষরণ হয়। চিকিৎসাশাস্ত্রে রক্তের প্রয়োজনীয়তা ক্রমশই বাড়ছে। রক্তের অভাবে হাজার হাজার শিশুর জীবনে নেমে আসে অকালমৃত্যুর অভিশাপ। প্রতিদিন মরছে প্রাণদায়ী সতেজ রক্তের অভাবে কত রোগাক্রান্ত মানুষ।

(৫) রক্তদানের মাধ্যমে যেমন সামাজিক দায়িত্ব পালন করা যায় তেমনি অপর একটি জীবনকে বাঁচাতে পেরে আনন্দ ও তৃপ্তি অনুভূত হয়।

(৬) অপরকে রক্তদানের মাধ্যমে অন্যদেরকেও এই দানে উৎসাহিত করা যায়।

● **রক্তদান শিবির :**

(১) ১৯২৫ সালে কলকাতায় শুরু হয় রক্তদান সঞ্চালনের কাজ। আজ পশ্চিমবঙ্গে প্রত্যেক মহকুমায় স্থাপিত হয়েছে ব্লাড-ব্যাঙ্ক।

(২) সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে সাধারণ মানুষকে রক্তদানে অনুপ্রাণিত করা হচ্ছে।

(৩) রক্তদানের কাজে এগিয়ে এসেছে অনেক সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। এর জন্য আলোচনাচক্র, স্লাইড-প্রদর্শন ইত্যাদি নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। দিন দিনই রক্তদানের সংখ্যা বাড়ছে। এগিয়ে এসেছেন অনেক সমাজসচেতন মানুষ। এ কাজে মহিলারাও পিছিয়ে নেই।

(৪) আর্ত পীড়িতের প্রয়োজনে তাঁরা স্বেচ্ছায় রক্তদানের প্রয়োজন উপলব্ধি করেছেন। এগিয়ে এসেছে ক্লাব সংঘ স্কুল কলেজ থেকে যুব-ছাত্র-জনতা।

(৫) স্থানীয় কোনো ক্লাবে কিংবা পূজা প্রাঙ্গণে, কোনো বিশেষ দিনে এই রক্তদান শিবির আয়োজন করা যেতে পারে।

(৬) স্থানীয় কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তির জন্ম কিংবা মৃত্যু দিনে রক্ত সংগ্রহের অভিযান করা যেতে পারে।

(৭) স্বাধীনতা দিবস, প্রজাতন্ত্র দিবস ও অন্যান্য উৎসব-অনুষ্ঠানে খোলা হয় স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির। খেলোয়াড় রক্ত দেন। রক্ত দেন অভিনেতা -শিল্পী -সাহিত্যিক। রক্তদানে অংশ নেন বিভিন্ন স্তরের সাধারণ মানুষ।

Scanned with CamScanner

❑ রক্তদান কর্মসূচির চিত্র

উপরোক্ত কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করে কর্মসূচি সংগঠিত করার পর প্রশিক্ষণরত শিক্ষক-শিক্ষিকা বা ভাবী শিক্ষক-শিক্ষিকাকে প্রতিবেদন উপস্থাপন করতে হবে। প্রতিবেদন উপস্থাপনের (Reporting) বিষয়টি নিম্নলিখিত ছকের সাহায্যে করা যেতে পারে।

(১) ভূমিকা (Introduction)
(২) উদ্দেশ্য (Objectives)
(৩) কর্ম পরিকল্পনা (Plan of Work)
(৪) আর্থিক পরিকল্পনা (Financial Plan)
(৫) কর্মসূচি সংগঠিতকরণ (Organization of Programme)
(৬) প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব (Need and Importance)
(৭) উপসংহার ও মন্তব্য (Conclusion and Remark)
(৮) কৃতজ্ঞতা স্বীকার (Acknowledgement)

This E-Book Download From>>
www.ebook.dascoaching.in
Scanned with CamScanner

আমাদের প্রকাশনায় B.Ed. (2 Year)-এর অন্যান্য বই

SEMESTER-I

- **শিশু ও বিকাশ** ড. বিজন সরকার
- **সমকালীন ভারতবর্ষ ও শিক্ষা**
  অধ্যাপক (ড.) দুলাল মুখোপাধ্যায়
  তারিণী হালদার ⋄ বিনায়ক চন্দ
- **পাঠক্রমে ভাষার বিস্তৃতি**
  ড. বীরবল সাহা ⋄ শম্ভুনাথ মাজি
- **বিষয়বস্তুর ধারণা ও সম্পর্ক**
  অধ্যাপক (ড.) দুলাল মুখোপাধ্যায়
  ড. উদয়শঙ্কর কবিরাজ
- **জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্র ও বিষয়ের বোধ**
  ড. খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ⋄ ড. চন্দন অধিকারী
- **পাঠক্রমে ভাষার ভূমিকা** সোমনাথ হাজরা
- **Childhood and Growing up**
  Dr. P.K. Chand ⋄ Dr. sujit Pal ⋄ Rakibrita Biswas
- **পঠন প্রণালীর পাঠ্যপুস্তকে প্রতিফলন**
  ড. বীরবল সাহা ⋄ শম্ভুনাথ মাজি
- **পাঠ্যপুস্তক : পঠন ও প্রতিফলন**
  মহুয়া বন্ধু (চ্যাটার্জী) ⋄ সন্দীপ শর্মা

SEMESTER-II

- **শিখন ও শিক্ষণ** ড. বিজন সরকার
- **প্রজ্ঞা ও পাঠক্রম** (প্রথম ভাগ) তারিণী হালদার
- **নাটক ও শিক্ষায় চারুকলা** ড. সুজাতা রায় মান্না
- **Assessment for Learning**
  Dr. Parsuram Pradhan ⋄ Dr. Mitali Panda
- **Learning & Teaching**
  Dr. Rajib Mukhopadhyay ⋄ Dr. Mitali Panda
- **শিখনের মূল্যায়ন**
  অধ্যাপক (ড.) কমলকৃষ্ণ দে ⋄ ড. সুভাষচন্দ্র ভাট
  ড. খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

SEMESTER-II & III (Semester II ও III-এর জন্য মেথড পেপারগুলি পৃথক খণ্ডে)

Pedagogy of Language Teaching

- **ভাষা শিক্ষণ তত্ত্ব (বাংলা)**
  ড. সুজাতা রাহা ⋄ বৈশালী বসু
- **Thoughts & Practice in Teaching English**
  Sudhakar Sardar
- **নবরূপে সংস্কৃত শিক্ষণ পদ্ধতি ও প্রয়োগ**
  গীতা দাস ⋄ নিবেদিতা চৌধুরী

Pedagogy of Social Science Teaching

- **সমাজবিজ্ঞান শিক্ষণের পদ্ধতি ও কৌশল (ইতিহাস)**
  তারিণী হালদার ⋄ গৌতম কুমার বিশ্বাস
- **সমাজবিজ্ঞান শিক্ষণের পদ্ধতি ও কৌশল (ভূগোল)**
  ড. জয়ারতি দাশগুপ্ত ⋄ সম্পাদনা : ড. জয়ন্ত মেটে
- **সমাজবিজ্ঞান শিক্ষণের পদ্ধতি ও কৌশল (দর্শন ও তর্কবিদ্যা)**
  কাকলি মুখোপাধ্যায়
- **সমাজবিজ্ঞান শিক্ষণের পদ্ধতি ও কৌশল (শিক্ষাবিজ্ঞান)**
  অধ্যাপক (ড.) দুলাল মুখোপাধ্যায় ⋄ ড. উদয়শঙ্কর কবিরাজ

Pedagogy of Science Teaching

- **বিজ্ঞান শিক্ষণের পদ্ধতি ও প্রয়োগ (জীবনবিজ্ঞান)**
  ড. দেবী প্রসাদ নাগ চৌধুরী ⋄ ড. সুজিত পাল ⋄ অম্লান গাঙ্গুলি ⋄ ড. মিতা হাওলাদার
- **বিজ্ঞান শিক্ষণের পদ্ধতি ও প্রয়োগ (ভৌতবিজ্ঞান)**
  ড. প্রতাপ কুমার জানা ⋄ ড. সুভাষচন্দ্র ভাট ⋄ সম্পাদনা : ড. কমলকৃষ্ণ দে

Pedagogy of Mathematics Teaching

- **আধুনিক গণিত শিক্ষণের পদ্ধতি ও প্রয়োগ** ড. সুরপতি প্রামানিক

SEMESTER-IV

- **লিঙ্গবৈশিষ্ট্য বিদ্যালয় ও সমাজ**
  অধ্যাপক (ড.) দুলাল মুখোপাধ্যায় ⋄ উদয়শঙ্কর কবিরাজ
- **বিদ্যালয়, জেন্ডার ও সমাজ**
  ড. বীরবল সাহা ⋄ শম্ভুনাথ মাজি
- **প্রজ্ঞা ও পাঠক্রম** (দ্বিতীয় ভাগ)
  তারিণী হালদার ⋄ ড. বিমান মিত্র
- **অন্তর্ভুক্তিমূলক বিদ্যালয় সংগঠন** ড. ঊর্মি চক্রবর্তী
- **বৃত্তিমূলক কর্মশিক্ষা**
  ড. জয়ন্ত চৌধুরী ⋄ অরুণাভ সামন্ত
- **স্বাস্থ্য ও শারীর শিক্ষা**
  ড. দীপন চক্রবর্তী ⋄ অরুণাভ সামন্ত
- **স্ব ধারণা** ড. বিজন সরকার
- **শান্তির জন্য শিক্ষা**
  তারিণী হালদার
- **নির্দেশনা ও পরামর্শদান**
  অধ্যাপক (ড.) দুলাল মুখোপাধ্যায়
  ড. উদয়শঙ্কর কবিরাজ
- **নির্দেশনা ও পরামর্শদান**
  মহুয়া বন্ধু (চ্যাটার্জী)
- **পরিবেশ শিক্ষা ও জনশিক্ষা**
  ড. দেবীপ্রসাদ নাগ চৌধুরী ⋄ ড. সুজিত পাল
- **যোগ শিক্ষা** ড. মলয়কুমার মুখোপাধ্যায় ⋄ ড. সুজিত পাল
- **বিজ্ঞান ও শিল্পকলার ধারণা**
  ড. অমিতাভ রায় ⋄ অরুণাভ সামন্ত

ISBN 81-89169-22-X
9788189169447

Scanned with CamScanner